বিষয়সূচী

কৈফিয়ৎ

প্রায় বিশ বছর আগের কথা। হঠাৎ একদিন নিজের কক্ষপথ ছেড়ে ছিটকে পড়া তারার মতোই হারিয়ে গেলাম। স্বেচ্ছানির্বাসনও বলা যায়। একেবারে অচেনা লোক ছিলাম না। অন্তত খবরের কাগজগুলো খবর রাখত। সামান্য খবরের গন্ধ পেলে যাঁরা দুর্গম গিরিলঙ্ঘনেও পেছপা নন, আমি কিন্তু তাঁদেরকেও হারিয়ে দিলাম। অনেক খোঁজাখুঁজি করে যখন তাঁরাও আমার খোঁজ পেলেন না, তখন দেখি আমি নিখোঁজের কলামে ছবিসহ সংবাদ রূপে হাজির। জিজ্ঞাসা—'যে মহিলাটি এমন ছিলেন, তেমন ছিলেন, তিনি আজ কোথায় ?'

পরে মনে হলো—ভাগ্যিস হারিয়ে যেতে পেরেছিলাম ! নয়তো খবর-পাগল রিপোর্টারদের পাল্লায় পড়লে কি আর রক্ষে ছিল ?

আমার তখন মুখ বন্ধ, গলা বন্ধ, বুক বন্ধ। নিজের জ্বালায় নিজে মরি। কাকে যে কি বলে দিতাম ঠিক ছিল কি ? ফলাও করে কাগজে বেরুতো। পড়ে হয়তো মনে হতো—'এ তো আমি নই। একথা তো বলতে চাইনি আমি।' তাই এখনও ভাবি—সেদিন নিঃশব্দে সরে গিয়ে কি ভাল কাজই করেছিলাম !

কিন্তু মানুষটা তো বেঁচেই ছিলাম। সহকর্মী, বন্ধু-বান্ধবদের এড়াই কি করে ? কমরেড ভবানী সেন বলেছিলেন—'আপনি থাকবেন কি করে ?' জবাব দিইনি। মনে মনে ভাবলাম—বেরুতে তো চাইনি, কিন্তু থাকতে পারলাম না বলেই তো বেরুতে হলো। অন্যদের কি হয় জানি না, কিন্তু আমার যে দম বন্ধ হবার যোগাড়। একটু খোলা বাতাসে নিঃশ্বাস নিতে চাই।

আমাদের সঙ্গে এক কমরেড থাকতেন। তিনি দিনরাতই বলতেন—'এ পার্টি ভাগ হওয়াই দরকার, একসঙ্গে আর থাকা যায় না।' একদিনই জবাব দিলাম, 'বেশ তো, কর না তোমরা ভাগ, আমি এতে নেই।' পার্টি গড়তে এসেছিলাম —ভাঙতে আসিনি। আদর্শের জন্য এসেছিলাম—সেই আদর্শই যদি টুকরো হয় তো আমি আর কি করব ? আদর্শের নামে একে অপরের চোখে বিষ হয়ে যাচ্ছে, বন্ধুর বুকে বসানোর জন্য বন্ধু নিজের মনে ছুরি সানাচ্ছে—এ যদি পার্টি-কাজ হয় তো এ কাজে আমার বিশ্বাস নেই। আমার স্থান তার বাইরেই হোক্।

আমি জানি, রাজনীতি যাঁরা করেন—কথাটা তাঁদের কাছে বিতর্কের। তাই এ নিয়ে আমি কথা বাড়াব না। আমি সবল কি দুর্বল, তার বিচার অন্যেরা

করুন। শুধু আমার পক্ষে এটা একান্ত অসম্ভব বলেই আমাকে নীরবে সরে আসতে হলো।

নিঃশব্দেই ছিলাম। কিছু করি না—তাই আমার সঙ্গে কারো বিরোধও নেই। দেখা হলে প্রীতিসম্ভাষণই করি এবং পাইও। বয়সে যাঁরা প্রাচীন তাঁরা হয়তো আমার মানসিক অবস্থা বুঝতে পারতেন; সতীশদা[1] একদিন বললেন, 'আপনি কিছু লেখেন না কেন?' বললাম, 'কি লিখব?' বললেন, 'কেন আপনার অভিজ্ঞতার কথা।' চুপ করে গেলাম। কিছুদিন বাদে গোপালদাও[2] বললেন, 'আপনি লিখছেন না কেন?' সেই একই প্রশ্ন এবং একই জবাব।

ভয় পেলাম, একে আমি লেখক নই। আমাদের মহিলা সমিতির মাসিক পত্র 'ঘরে-বাইরে'তে স্বনামে, বেনামে লিখতে হতো। কিন্তু তাকে কি লেখা বলে? মুষ্টিমেয় মেয়েরা ছাড়া কেই বা তা পড়ত? দীর্ঘকাল আগে একদিন এক লেখকবন্ধু, গোলাম কুদ্দুস, হঠাৎই আমায় বললেন, 'আপনি গল্প লেখেন না কেন?' অপরাধের মধ্যে একটা চটকল এলাকার মেয়েদের কাজকর্ম, ঘরসংসারের কথা রিপোর্টাজ আকারে 'জনযুদ্ধে' দিয়েছিলাম এবং তাঁরা ছেপেছিলেন। কুদ্দুস সাহেবের হাতে সেটা দেখলাম। বললাম, ওটা তো রিপোর্ট। ওতে সবই তো সত্যি কথা। গল্প লিখতে গেলে তো অনেক মিথ্যে বানিয়ে লিখতে হয়, সে আমার মাথায় আসবে না। লাজুক মানুষ কুদ্দুস সাহেব খুব হাসলেন।

এ তো অনেক দিনের কথা। তখন তো আকণ্ঠ মেয়েদের মধ্যে কাজে ডুবে আছি। কত সত্যি গল্পই যে সেখানে ভেসে বেড়াত সেটা দেখবার মতন সাহিত্যিক চোখই কি আমার ছিল? না, সময় বা মনই আমার ছিল?

এখন ভাবলে ছবির মতন লাগে। কত বিচিত্রই না ছিল আমার অতীতের দিনগুলি। ভাবি, কেন তখন টেনেটুনে একটু সময় করে বসিনি। হয়তো চোখে দেখা চিত্রগুলির কিছু ছবি এঁকে রাখতে পারতাম। এখন তো কত কিছুই হারিয়ে গেছে! সাহিত্যিক আমি নই। হবার কথা মনে হলে ভয়ও পাই, হাসিও পায়। ও আমার জন্য নয়। এখন তো আরও অবসর। কত প্রাকৃতিক

১. কমরেড সতীশ পাকড়াশী অনুশীলন পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। প্রথম মহাযুদ্ধের সময়ে প্রথমবার আন্দামানে বন্দী হয়ে যান। ১৯৩৮ সনে যান দ্বিতীয়বার। ছাড়া পাবার পরেও গ্রামে অন্তরীণ ছিলেন। চিরদিনের বিপ্লবী জীবন। পরে কমিউনিস্ট পার্টির নেতা।

২. কমরেড গোপাল হালদার সুসাহিত্যিক, সুপণ্ডিত ও সাহিত্যসমালোচক। কৃষক-আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা এবং কমিউনিস্ট পার্টির নেতা।

সৌন্দর্যের জায়গায় ঘুরে বেড়াই। মুগ্ধ হয়ে কত দৃশ্য চোখ চেয়ে বসে বসে দেখি। কিন্তু কলম নিয়ে বসতে ইচ্ছা হয়নি। ভাবি, যে সুন্দরকে আমি দু'চোখ ভরে দেখছি—তা কি আর আমার কলমের মাথায় আসবে—না কাউকে তা দেখাতে পারব। তার চেয়ে আমিই দেখি। ছাইভস্ম লিখে কাজ কি ?

কিন্তু সাহিত্য থাক্। আমার পুরনো দিনগুলিতে আমায় ঘিরে সত্যি সত্যি গল্পের মানুষেরা তো ছিল। লিখলে তাতে গল্প না হোক্—ঘটনা তো থাকত।

সতীশদা, গোপালদা এঁরা যখন বলেছিলেন—তখন লিখিনি ভয়ে। যদি গায়ের ঝাল সে লেখায় বেরিয়ে পড়ে ? যদি নিজের কান্নাই কাঁদতে বসি ?

আজ আর সে ভয় নেই। মনের মধ্যে রাগ, দুঃখ, ক্ষোভ, বিক্ষোভ কোথায় যে মিলিয়ে গেছে ! আজ এত বছর বাদে তাদের বেঁচে থাকার কথাও নয়। থিতিয়ে যাবার কথা। আশা করি গেছেও তাই।

কিন্তু বন্ধুরা এখনও ছাড়ে না। গল্প লেখা না হোক্ বলার অভ্যেস আমার কিছুটা আছে। যদি কোন একটা অতীত ঘটনা তাদের বলেছি তো গেছি। অমনি বলবেন, 'আপনি লিখছেন না কেন ? লিখুন, লিখুন। খুব ভালো জিনিস হবে। আর কিছু না হোক আপনার ব্লাডপ্রেসার কমে যাবে।' এ উপদেশ আমাদের বন্ধুবর অজিত রায়ের। কিন্তু আমার লেখা পড়ে কার কি লাভ ? মূল্যই বা কতটুকু ? তবে জীবনের প্রায় পঁচিশটা বছর কেটেছে আমার রাজনীতির আবর্তে। রাজনীতি বুঝি, সে দাবী আমি করি না। কিন্তু এরই পথ ধরে আমি যোগস্থাপন করতে পেরেছিলাম বাংলার জন-জীবনের সঙ্গে। তাদের সুখ-দুঃখ, ঘর-সংসার কত কিছুই তো আমার চলার পথের দু'ধারে দর্শক হয়ে দেখেছি। মনের মধ্যে অতীতের পাতা ওল্টালে আজও তারা এসে ভিড় করে দাঁড়ায়। এদের কত যে মরে গেছে ঠিক নেই। কিন্তু যারা বেঁচে আছে তারাই আমার কলমে কথা বলুক না—আমি শুনি। আর এই করতে করতে তৎকালীন বাংলার নারীজাগরণের এক টুকরো ছবি যদি ফুটে ওঠে তো উঠুক না।

এছাড়া আমার রূপসী বরিশাল তো আছেই। দুই বাংলাই আমি দেখেছি। জীবনের প্রথম যা কিছু সঞ্চয় বা সম্পদ তা তো আমার ওখান থেকেই আহরণ। এতদিন পরে মনে হলো তাই-ই লিখি না কেন ? কিন্তু যা-ই লিখি তাতে রাজনীতি এবং আমার নিজেরও এসে যাবার আশঙ্কা আছে। একেবারে 'সঞ্জয় উবাচ' বলে লিখতে কি পারব ? জানি না। সে দোষ ঘটে গেলে সেটা হবে আমার বিগত ২৫ বছরের অভ্যেসের দোষ। তার জন্য

আগে থেকেই মাফ্ চেয়ে রাখছি।

আর একটা কথা। আজ এই বয়সে ঠাকুমার ঝুলি খুলে বরং বসতে পারি। কিন্তু ইতিহাস লিখতে নয়। ওসব করতে গেলে তথ্যসন্ধানের পরিশ্রমই আমার এখনকার দেহমনে সইবে না। অতএব দিন-ক্ষণ, সন-তারিখ এতে কমই থাকবে এবং থাকলেও নির্ভুল না হবারই আশঙ্কা। এছাড়া রাজনৈতিক কথাগুলিতে মতান্তরের সম্ভাবনা তো রইলই। কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখে ভুলও থাকতে পারে। আমার সহকর্মীদের চোখে নিশ্চয়ই সেটা ধরা পড়বে। এজন্যও আগে থেকেই ক্ষমা চেয়ে রাখছি।

বরিশাল

বরিশালের কথা মনে হলেই যেন দেখতে পাই লাল সুরকির রাস্তা। লাল ফিতের মতন আঁকাবাঁকা পথ পেঁচিয়ে আছে সারা শহরটিকে। পথের দু'ধারে সর্বত্রই বাড়িঘর নয়। কোথাও একদিকে বাড়ি—আর অন্য দিকে পুকুর। আবার কোথাও বা সামান্য চওড়া খাল বা নালার মধ্যে গজিয়ে রয়েছে ঘন বেতবন। উঁকি দিলে তলায় দেখা যাবে সবুজ কচুরিপানা। তার ধারে ধারে কচুবন, বন-ঝাঁটালি, ডুমুর গাছ, আকন্দ—আরও কত কি সবুজের জড়াজড়ি। বেতবন থেকে বেতফল কোঁচড় ভরে তুলে আনা ছিল প্রায় সব ছেলেমেয়েদেরই একটা সখ। তারপর ঐটুকুন ছোট্ট ফলের খোসা ছাড়িয়ে বাকী আঁটিসর্বস্ব ফলগুলোকে নুনে ঝেঁকে খাওয়া। মানে, মুখে দেওয়া আর বীচি ফেলা। পেটে যেত না কিছুই কিন্তু বেতের কাঁটার আঁচড়ে রক্তাক্ত হয়ে ঐ অভিযানেই ছিল সকলের আনন্দ।

এইসব নালার ধারে ঢেঁকিশাক, হিঞ্চে, থানকুনি—কত রকমের সত্যি রান্নাঘরের বা মিথ্যে খেলাঘরের আনাজপাতি যে থাকত! এসব কেউ তুললেও মানা করে না, পয়সা দিয়েও কেউ কেনে না।

প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই দেখেছি, হয় শোবার ঘর, নয়তো রান্নাঘরের পিছনে অযত্নে বর্ধিত করবী, জবা, শিউলি, গন্ধরাজ আর কাঠচাঁপা। এসব গাছ আপন মনে ফুল দিয়ে যায়। আবার সাবধানে না হাঁটলে পায়ে ঠেকবে ভুঁইচাঁপা, দোলনচাঁপা প্রভৃতি সুগন্ধি ফুল। রাস্তার ধারে এখানে-সেখানে ছড়ানো বকুল গাছও পাওয়া যাবে। সকাল বেলা সেই বকুল ফুল বিছানো রাস্তায় মানুষের হাঁটাচলা আরম্ভ হবার আগেই ছেলেমেয়েরা তা আঁচল ভরে তুলে নিত। শিমূল, কৃষ্ণচূড়ারাও ছিল। বাচ্চাদের মাথার ওপর লাল-ছাউনি দিয়ে তাদের খেলাঘর বানিয়ে দিত। অতবড় গাছে কেউ চড়তে যেত না। কিন্তু ঝরেপড়া লালফুলে শিশুরা যে নিত্যনতুন ঠাকুরঘর বানিয়ে পুজো পুজো খেলত, জানি না ঠাকুরদের সে পুজো চোখে পড়ত কিনা। আর নারকেল বীথি? এজন্য তো বরিশাল বিখ্যাত। কিন্তু আমার চোখে যেন লেগে রয়েছে টিয়া-রং-এর নারকেল পাতার আড়ালে সকালের ঝিকিমিকি রোদে টিয়া পাখিদের খেলা। বরিশাল ছাড়বার পর এত টিয়ার ঝাঁক বোধহয় আমি

আর কোথাও দেখিনি। বোধহয় নারকেল গাছের সঙ্গে ওদের মানায় ভালো।

এইসব গাছগাছালি কেউ কখনো লাগিয়েছিল—না ওরা আপনা থেকেই বরিশালের সঙ্গে সঙ্গে জন্মেছে—জানি না। তবে ওদের বাদ দিলে বরিশালকে চেনা যাবে না, এটা জানা কথা।

শহরের পূর্বদিক ঘিরে কীর্তনখোলা নদী। বেশ চওড়া এবং খরস্রোতা। নদীর বকচর থেকে উঠলেই চওড়া লাল সুরকির রাস্তার ওপারে সারি দেওয়া ঝাউবন। জ্যোৎস্নারাতে ঐ নদী, রাস্তা আর ঝাউবনের মৃদুমন্দ শন্‌শন্‌ আওয়াজ যেন জাদু সৃষ্টি করত। গরমের দিনে রাত দশটার আগে নদীর পার খালি হতো না।

খুলনা থেকে যে স্টীমার সকাল বেলা ঘাটে ভিড়ত—তার যাত্রীরা আধঘণ্টা আগে থেকেই ডেকে দাঁড়িয়ে যেত। শহর যেন জননীর মতন হাত ইশারায় ডাক দেয়। ঐ তো বসন্ত রোগীর ঘর, শহর-সীমানার প্রান্তে। এর পরে, ঐ তো বেলস্‌ পার্ক। তারপরেই ঝাউবন—লালরাস্তা। আর পেছন ফিরে নদীর ওপারে তাকালে 'কাউয়ারচক' গ্রামখানি যেন কালিদাসের 'বনরাজিনীলা'। শেষ রাতের আঠারো বাঁকী নদীর ১৮টি বাঁক ঘুরে তবে কীর্তনখোলার বিস্তীর্ণ বক্ষ। এসে গেলাম ঘাটে। আর যেন দেরি সয় না। খালাসীরা 'ব্যাগারিজে' 'ব্যাগারিজে' (ব্যাক্ হার ইজি) বলে চেঁচাবে, ধীরে সুস্থে গড়িয়ে গড়িয়ে স্টীমার এগুবে, ঘাটে সিঁড়ির তক্তা লাগাবে—তবে যাত্রী ছাড়বে। এতক্ষণ ধৈর্য থাকে? এই ছিল আমার সুন্দর বরিশাল।

ছিল বললাম এইজন্য যে, ১৯৭২ সনে গিয়ে আমিই আমার বরিশালকে চিনতে পারিনি। ঝাউবন নেই, লাল সুরকির রাস্তায় কালো আস্তরণ পড়েছে। কীর্তনখোলা শীর্ণা। বকচরে উঠেছে ডকইয়ার্ড। আরও কত কি।

কান্না পেয়েছিল—শহরে আর কি জায়গা ছিল না? ভাগ্যিস গাছগাছালি-গুলো আছে। আর রাস্তার এপাশে-ওপাশে সেই ঝোপ-ঝাড়গুলোও আছে। পরিবর্তন শহরেই, গ্রামে বিশেষ নয়। বরিশালের গ্রামগুলোকে বোধহয় কোন ময়দানবও সহসা বদলে দিতে পারবে না। কারণ বাংলাদেশে বরিশালই একটি মাত্র জিলা যেখানে খালবিল নদীর জন্য রেল-লাইন আজও যেতে পারেনি। তাই বোধহয় যা দেখে এসেছিলাম তাই-ই মোটামুটি আছে।

যা ছিল তার কথাই বলি। শহর ছেড়ে গ্রামে গেলে গাঙ, খাল-বিল আর যতদূর চোখ যায় সবুজ খেত আর সবুজ বনানী; জলের দেশে জলের ভয় নেই কারুর। সাঁতার জানে সবাই। আমরা ছেলেবেলায় দেশের গ্রামের বাড়িতে

গেলে বাড়ির ছোট নৌকোটি নিয়ে বেড়িয়ে পড়তাম। লম্বা বাঁশের লগি ঠেলে চলছি, কিন্তু নৌকো আর সামনে যায় না। একবার এদিকে, একবার ওদিকে মুখ ফেরায়। মুসলমান বৌ-এরা খালের ঘাটে বসে হাসছে আর বলছে, 'এ্যাল্লাহ্, মাইয়াডার কাণ্ড। আবার নাও বায়। আগে পড়ুক, ত্যাহন বোঝবে।' কখনও মাঝি নিয়ে যেত বিলে সাপলা তুলে আনতে। সাদা বেগুনী ও নীল ফুলে বিল ছেয়ে রয়েছে। বিলের জলের তলা পর্যন্ত পরিষ্কার দেখা যায়। কতরকমের শেওলা যে হতে পারে। আর ছোট-বড় নানারকম মাছের হুড়োহুড়ি খেলা। সকলের গায়ের রং পর্যন্ত দেখা যায়। এক একটা বিল ২.৩ মাইল পর্যন্ত আড়ে-পাশে হয়। মাঝে মাঝে কচুরিপানার ধাপগুলো যেন চর বলে মনে হতো। তরতাজা বেগুনী ফুলগুলো ছিঁড়ে আনতে লোভ হতো। মাঝি বলতো, 'ওহানে যায়না, তেনারা থাহেন।' সাপ বলবে না, বুঝে নিতে হবে।

আর গাঙের জলে যদি যান তো সাঁতার জানলে সাঁতার দেবেনই। তবে জলে কিন্তু ঢেউ খেলে—ছোট খাটো নদী বিশেষ। ছ'পারে অবশ্যই সবুজ ক্ষেত। তারও ওপারে ঘন সবুজ বন। গাঙে নৌকো চালাতে গেলে লগিতে চলবে না। বৈঠা ধরতে হবে। গভীরতাটা এতে চেনা যায়।

আমার এক দিদির বাড়ি ছিল গৈলা গ্রামে। আমি ও আমার ছোট ভাই একবার বেড়াতে গিয়েছিলাম। কত আর বয়স হবে। আমার ১৬/১৭, ভাই তো ছোটই। ফিরবার সময় জামাইবাবু নিজে আমাদের সঙ্গে আসতে পারলেন না। নিজেদের বুড়ো মুসলমান মাঝি দিয়ে, নিজেদের নৌকোয় আমাদের ছ'জনকে তুলে দিলেন। বিকেলে শহরে পৌঁছে যাবার কথা। যুগটা তো ছিল কয়েক যুগ আগের। তাই মুসলমান হলেও বাড়ির বিশ্বাসী বৃদ্ধ মাঝির সঙ্গে আসতে আমিও ভয় পাইনি—ছেড়ে দিতে জামাইবাবুও ভয় করেন নি।

বড় গাঙে নৌকো পড়েছে। বেলা তখন ছপুর। সবে আমরা খাওয়া শেষ করেছি। ওদিকে আকাশ জুড়ে মেঘ। যেন কালি লেপে দিয়েছে। শুরু হলো ঝড়ের মাতন। গাঙের জল উথাল-পাথাল। নৌকো ঠিক রাখা যায় না। মুষলধারে বৃষ্টি। আকাশের এপাড় থেকে ওপাড়ের বুক চিরে বিদ্যুতের ঝলকানি আমাদের পাশ দিয়ে যাচ্ছে। কড়মড় করে বাজও যেন আমাদের নৌকো ছুঁয়ে যাচ্ছে। বাজকে বরিশালে বলে ঠাডা। ঠাডা কথাটাই যেন আমার পছন্দ হয়। আবস্থাটা বুঝিয়ে দেয় ভাল। মাথার উপরে 'খাড়াঝিল্‌কি' (বিদ্যুতের চমক) আর ঠাডা,—আর আমাদের আঁকড়ে পড়ে থাকা নৌকোটি গাঙের জলে লাফাচ্ছে। মাঝি বুদ্ধি করে নৌকো ধানক্ষেতের মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। ছ'জনেই

উপুড় হয়ে আছি। একবার মুখ তুলে মাঝিকে জিজ্ঞেস করলাম, 'মাঝি ভাই, নৌকো যদি ডোবে? মাথায় যদি ঠাডা পড়ে?' মাঝি বললো, 'ছিঃ বুন্‌ডি, ওকথা কয় না, আল্লার নাম লও, মুস্কিল আসান হইয়া যাইবে।' আমরাও হরিনাম ছেড়ে আল্লার নাম জপতে লাগলাম। ঘণ্টাখানেক বাদে মুস্কিল আসান হলো। আকাশ শান্ত, নদী শান্ত। এতক্ষণের দাপাদাপি আর মাতলামি বুঝি স্বপ্নেই দেখেছিলাম। মাঝি নৌকো ছাড়ল। খানিক বাদে সন্ধ্যাও উৎরে গেল। এইবার তরুণীমনে একটু যেন ভয় ভয়। ঠিক যাচ্ছি তো? আবার জিজ্ঞেস করি, 'মাঝি ভাই, রাত হচ্ছে যে।' মাঝি বললো, 'ভয় কি? মোর জান্‌ডা তো আছে। তোমাগো বাড়ি পৌছাইয়া দেবার আগে মোর থামন নাই।' বাড়ি পৌছে গেলাম।

সেদিন নৌকো যাত্রায় কতই না অপরূপ সৌন্দর্য চোখে পড়ল। ভয় পেয়েছিলাম ঠিকই। বরিশালের ঝড়ে কে না ভয় পায়। কিন্তু এ যেন বাড়িতে বসে দেখা ঝড় নয়। অন্য কি এক আশ্চর্য কাণ্ড। হঠাৎ যেন আকাশ-বাতাস-জল একযোগে প্রলয় নাচন লাগিয়ে দিল। বাতাসের যত রাগ যেন ধানক্ষেতের উপর। শতবার করে ধানগাছগুলিকে মাটিতে লুটিয়ে দিচ্ছে, আর শতবার করে ওরা মাথা তুলছে। আর আকাশের সে কী ঘন ঘন গর্জন! প্রকৃতির এমন ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য সহজে বড় চোখে পড়ে না। তখনকার কম বয়সের চোখে কি সুন্দরই না দেখেছিলাম। কিন্তু আজ মনে হয় অপরূপ সুগন্ধে ভরা মাঝির মনটিই ছিল সবচেয়ে সুন্দর।

'আইতে শাল যাইতে শাল, তার নাম বরিশাল।' এমন অপবাদ যারা বরিশালকে দেন, আমার লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন না—মেলে কি? মিথ্যে আমি লিখিনি। অমন সুন্দরই যদি না হবে, তবে কবি জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'কে কোথায় পেয়েছিলেন? বাংলার মুখকে তিনি কোথায় দেখেছিলেন? একথা অবিশ্যি ঠিক, পূর্ব বাংলার সব জিলাই প্রায় একই রকম। কিন্তু বরিশাল ছাড়া পূর্ববঙ্গে জলে-ঘেরা, জলে-ভরা দ্বীপের মতন অন্য কোন জিলা নেই। আর এই জন্যই বোধহয় বরিশালের সৌন্দর্যে একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। জীবনানন্দ কোন জিলার উপরেই পক্ষপাতিত্ব করেননি নিশ্চয়ই। কিন্তু কবি তিনি বরিশালের। জীবনের প্রথম প্রভাতে চোখ মেলে বরিশালের আলোই দেখেছিলেন। ছোটটি থেকে বড়টি হয়েছিলেন তিনি বরিশালেই। বরিশালের মধ্যেই তিনি 'রূপসী বাংলা'র প্রথম 'মুখ' দেখেছিলেন।

শুধু কি রূপ? গুণেরও যে অবধি ছিল না। আমার বরিশাল-জননী

আমাদেরকে দুধে-মাছে মানুষ করে দিয়েছিল। বরিশালের বালাম চাল আর মুসুরির ডাল হলে আর কেউ কিছু চাইবে না। কিন্তু তার উপরে যদি খানকতক ইলিশ-সুন্দরীর চাকা পাতে পড়ে? আর থালার পাশে জামবাটি ভরা দুধ আর মর্তমান কলা থাকে? আজকাল না খেয়ে খেয়ে অত ইলিশও কারো পেটে সয় না, আর জামবাটি ভরা দুধেও কেউ চুমুক দেয় না।

মনে পড়ে মুসলমান ফেরিওয়ালা সারাদিন ধরে আসছে তো আসছেই। রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে একটু জিরিয়ে নিচ্ছে। এক ঘটি জল চাই। ঘরে যা থাকত মা তাই দিতেন। পিঠে, পায়েস, তালক্ষীর, নারকলনাড়ু—এসব তো প্রায়ই ঘরে থাকত। দিলে কি খুশি হয়েই না খেতো। আর বলতো, 'মোগো বৌগুলান এমন রাঁনতেই পারে না। যতই জিনিসপত্তর লইয়া যাই—এরহম সোয়াদই হয় না।'

এইসব গল্পগাছার পর দুধের আধমনী কলসীটি বড় কড়াইতে উপুড় করে ঢেলে দিত। মা হা-হা করে উঠতেন, কর কি—কর কি! অত দিও না। কে শোনে? বলতো, 'দিমু না তো এ্যাহন দুফুরডার সময় যামু কোহানে? ভাবেন না মাঠাইরেন, আপনার পোলাডায় দিয়া গেছে।' দুধের সের তো ৩/৪ পয়সা। তবু মা বলতেন, 'এতগুলি পয়সা তো লাগবে!' উত্তর হলো, 'পয়সা কি মুই এ্যাহনি চাইছি? যিদিন হয় দিয়েন।'

আমের দিনেও একই ব্যবহার। আমওয়ালা ঝুড়িসুদ্ধ আম দাওয়ায় উপুড় করত। তাতে হয়তো দেড়শো, দু'শো মালদাই আম। দাম একঝুড়ি বড়-জোর দেড় টাকা। তাও চালানী আম বলে এই দাম। দিশি আমের ঝুড়ি দশ-বারো আনার বেশী নয়।

আর ইলিশ? ইলিশের ফেরিওয়ালা আসবে সন্ধ্যেবেলা। মাছের খন্দ পড়েছে বেশী। বাজারে কাটেনি অত। সন্ধ্যের মধ্যে বিক্রী না হলে মিউনিসিপ্যালিটির হুকুমে ও মাছ আবার নদীতে ঢালতে হতো। তাই কী কাকুতি-মিনতি! এদিকে ইলিশের হাল্কা ঝোল, সরষের ঝোল, কলাপাতায় করে ভাতে ভাপানো-পোলাও এসব খেয়ে খেয়ে আমাদের পেটে তো চড়া পড়ার জো। আর যেন দেখলেও বমি পায়। বাবা বলতেন, কিছু পয়সা দিয়ে দাও, মাছ ফেলে দিয়ে বাড়ি চলে যাক। রাতের বেলা ও মাছ কে নেবে? মা তাই করতেন।

ব্রিটিশ আমল থেকে অনেক চেষ্টা করেও বরিশালে কেউ রেল-লাইন নিতে পারেনি। ওখানে বরফ কলও নেই। দিনেরটা দিনে না-বিকোলেই নয়।

এখন কান্না পায়। হায় আল্লা, এমন যন্ত্রসভ্যতা তুমি আমাদের কেন দিলে ? বেশ তো ছিলাম ভাতে-ডালে, মাছে-দুধে ! এখন শুনছি সেই বরিশালেই ইলিশ নেই।

দেশটা কেন যে ভাগ হলো ! আমাদের বাড়িরই অর্ধেক রইল সেখানে আর অর্ধেক রইলাম এখানে। আর ওদের জন্য নিত্য আমার বুক কাঁপুনী।

অথচ এমন তো ছিল না। ঐ ফেরিওয়ালাদেরই তো আমাদের কত ভাল লাগত। কেউ এলে সহজে কি ছাড়তাম ? ঘরে কি রান্না হয়েছে থেকে শুরু করে কত গল্পই না চলত। পর তো কোন দিন ভাবিনি।

অথচ ওদের উপর অত্যাচার হতেও কম দেখিনি। হিন্দুদের চূড়ান্ত হিন্দুয়ানী এক-এক সময় আমার গায়ে জ্বালা ধরিয়ে দিত। একদিন গৈলাতে আমার দিদির বাড়ির অন্য হিস্যায় এক বাড়িতে একটি লোক চেলা কাঠের বোঝা মাথায় নিয়ে দিতে এসেছে। লোকটি ঘুরপথে সদর দিয়ে না এসে পেছন দিয়ে দুই ঘরের মাঝখানের সরু পথ দিয়ে উঠোনে চলে এসেছে। ঘর দুটির একখানা ছিল রান্নাঘর। আর যায় কোথায় ? কর্তা ব্যক্তিরা লাফিয়ে পড়লেন, 'হারামজাদা, তুই রান্নাঘর ছুঁইয়া দিলি ?' লোকটি বোঝাতে চেষ্টা করল— 'ছুঁই নাই কর্তা, মধ্যখান দিয়া আইছি। বেড়ায় ছোঁয়া লাগে নাই।' কিন্তু কর্তা কি থামেন ? 'ব্যাটা তুই ঘরের চালে চালে যে ছোঁয়া আছে, তার তলা দিয়া তো আইছস্—রান্নাঘরে ছোঁয়া লাগল না ? আবার তর্ক ?' ঘা কয়েক জুতো পড়ল পিঠে। লোকটি কাঁদতে কাঁদতে বললো, 'কর্তা, ওহান দিয়া তো আপনাগো কুকুরডাও যায়, ভাতের হাঁড়ি কি তাতে ফেলা যায় ? মুই তো এট্টা মানুষ, কর্তা।' গরীব মুসলমানের মুখে এতবড় যুক্তির কথাটায় কর্তার রাগ আরো বেড়েই গেল। জুতো নিয়ে আবার ছুটতেই দৌড়ে পালিয়ে গেল লোকটি।

আমার বাবার জানা ও মাকে বলা জমিদার ও কৃষকদের মধ্যে দেনাপাওনা নিয়ে অনেক বাদ-বিসংবাদের কথা প্রায়ই মার কাছ থেকে শুনতাম। বাবা একটা জমিদারী এস্টেটের কমন-ম্যানেজার ছিলেন। আদায়-উসুলে প্রজায়-জমিদারে লেগে উঠলে কমন ম্যানেজারের উপর সালিশির ভার পড়ত। বাবা সর্বদাই দুই পক্ষকে আলাদা বসিয়ে বা একত্র বসিয়ে মুখের কথায় মীমাংসা করিয়ে দিতেন।

একবার শুনলাম গোলমাল খুব জোর। কৃষক পক্ষের নেতা এক পালোয়ান মুসলমান। বাবার ডাক পড়ল। কৃষকনেতা বাবার কথা মেনে নিতে রাজী হলো। বাবা মীমাংসার শর্ত দিলেন। কৃষকরা মানল, কিন্তু বাবুরা রাজী

হলেন না। বাবুরা কৌশল করে দুপুরে খাওয়ার পর বাবা যখন ঘুমিয়েছেন—সেই ফাঁকে বাইরের থেকে ঘরের তালা আটকে দিলেন। তারপর কৃষক-নেতাকে ধরে এনে মেরে আধমরা করে ফেললেন। চীৎকার শুনে বাবা দরজা খুলতে গিয়ে তালা দেখে অসহায় হয়ে রইলেন। ওদিকে পালোয়ান লোকটা পায়ে হেঁটে এসেছিল কিন্তু চালিতে করে তাকে বাড়ি নিয়ে গেল। তারপরে বাবুদের সঙ্গে বাবার কি হলো সে গল্প অনাবশ্যক। কিন্তু এই ছিল জমিদারের জুলুম। শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান নিয়ে যেখানে বাস, সেখানে জমিদারের মধ্যে হিন্দু জমিদাররাই সংখ্যায় বেশী ছিল। মুষ্টিমেয় মুসলমান জমিদারও ছিল। কিন্তু চাষীদের শিক্ষা দিতে উভয়েরই ছিল একই পদ্ধতি। আর স্বভাবতই মুসলমান চাষীরাই ছিল সংখ্যায় বেশী।

হিন্দুদের উপরে মুসলমানদের কেন এত রাগ—আজ যেন তা কিছুটা বুঝি। আমার এক সম্পর্কিত মামা কোন একটা এস্টেটের নায়েব ছিলেন। নায়েবদের অত্যাচারের কাহিনী এ দেশে সুবিদিত। আমার নায়েব মামার বৃদ্ধ বয়সে চাকুরীটি যায়, এই প্রচলিত অত্যাচারের মাত্রাধিক্যের জন্য। চাকুরী হারিয়ে নিজে যখন সপরিবারে দুঃখের জীবনে পড়েছিলেন তখন তার মুখেই শুনতাম তার অত্যাচারের সীমা ছাড়ানোর কাহিনী। একটা কাহিনী আমার মনে এখনও দাগ কেটে আছে। খাজনার দায়ে একটা পরিবারের উপর মাল ক্রোক জারী হয়েছে। চাষীর ঘরে থাকেই বা কি? যা-ও বা ছিল—সব নেওয়া হলো। অসহায় মেয়ে-পুরুষ ও শিশুগুলি উঠোনে পড়ে কাঁদছে। এমন সময় ঘর থেকে বেরুলো একটা গুড়ের হাঁড়ি। সেটা বেরুতেই মেয়েরা গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে হাঁড়িটা ধরে বাবুর পায়ে মাথা কুটতে লাগল, 'বাবুগো, এই গুড়ের ঠিল্লাডা মাফ দেন, বাচ্চাগো খাওনের লইগ্যা রাখছিলাম। আমাগো তো সব নিছেন—ঐডা থুইয়া যান বাবু।' মামার ভাষায় শুনেছিলাম—'পায়ে-পড়া মেয়েদের পা দিয়েই সরিয়ে গুড়ের হাঁড়িটাকে ওদের কোলের একটা ছেলের মতোই জোর করে কেড়ে এনেছিলাম। সেই গুড় নিজের বাচ্চাদের যখন খাইয়েছি তখন ওদের কথা মনেও পড়েনি। কিন্তু আজ পড়ে। আজ আমি ওদেরই মতন খেতে পাই না। ভগবান উপরে আছেন, শাস্তি হবে না?' মামা প্রায়ই একটা না একটা কৃতকর্মের কথা বলে চোখের জল ফেলতেন।

কিন্তু এ চোখের জল তো সেদিনের সেই নিঃস্ব চাষীদের চোখে পড়েনি যে তাদের ক্ষমা আমরা পাব। তাই তাদের তিলে তিলে জমে ওঠা বিক্ষোভের বারুদ যেদিন ফাটলো সেদিন আমরাই বা কোথায়, আর আমার সেই 'মাঝি

ভাই'-ই বা কোথায়! শুধু মাঝি ভাই কেন? কত ভাইয়েরাই তো ছিল সেদিন—আজ যাদের মনে করে দুটো হাত আপনিই কপালে ঠেকে।

আমার বড়দিদিরা থাকতেন পটুয়াখালিতে। ১৯২৭ সন হবে। কি একটা সামান্য কারনে শহরে দাঙ্গা লেগেছে। আমার জামাইবাবু ওখানে খুব জনপ্রিয় ছিলেন। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমান ভেদ ছিল না। রাস্তায় তার দেখা হলো ফাটা মাথা দিয়ে ঝরঝর করে রক্ত ঝরছে এমন এক মুসলমানের সঙ্গে। সে নিজের ফাটা মাথাটা দু'হাত দিয়ে চেপে ধরে দৌড়চ্ছে আর পথে জামাইবাবুকে দেখে বলছে, 'বাবু শীগগির বাড়ি যান, দাঙ্গা লাগছে।' জামাইবাবু অবাক। এর নাম কি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা? দাঙ্গা কি তবে আকাশ থেকে পড়ে? হিন্দুর কাছে মার খাওয়া এক মুসলমান আর এক হিন্দুকে সাবধান হতে বলে নিজে রক্তাক্ত মাথা চেপে ছুটে পালাল। কারা এ দাঙ্গা সৃষ্টি করে? যারা করে তারা হিন্দুও না, মুসলমানও না।

আমাদের বাড়িটা ছিল অনেকটা কুসংস্কার মুক্ত। আমার বাবা কোনরকম বাছবিচারই মানতেন না। মা'র একটু খুঁতখুঁত থাকলেও আমাদের জন্য তাও আর টিকে থাকল না। আমার ছোড়দিকে একটি মুসলমান ছেলে, ছাবেদালি নাম, 'মা' বলে ডাকত। ছোড়দিও তাকে ছেলের মতোই স্নেহ করতেন। প্রথম প্রথম আমাদের রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে সে খেত। পরে আমাদের চাপে পড়ে মা তাকে ঘরের মধ্যেই খেতে অনুমতি দিলেন।

আমি তো এই পরিবেশে মানুষ, এই বরিশালে মানুষ। তাই ভাগ হওয়াটা যে আমার কতখানি বুকে বিঁধেছিল তা আর বোঝাই কাকে? আমার কমিউনিস্ট পার্টিও যে ভাগ হাওয়াটাই মেনে নিল, সে ছিল আমার সব চেয়ে বড় দুঃখ।

বরিশালের ত্রয়ী

নৈসর্গিক সৌন্দর্যের অধিকারী বরিশালের একটি স্বর্গীয় সৌন্দর্যও ছিল। সে ছিল বরিশালের চরিত্র। নদীমাতৃক বরিশাল যেমন অফুরন্ত মাতৃস্তন্য পানে সদাপুষ্ট ছিল তেমনি তিনটি দেবতুল্য চরিত্রবান পুরুষের হাতে গড়া ছিল ঐ যুগের বরিশালের মানুষ। তাঁদের চরিত্রের মাধুর্য ও দেবত্বের প্রভাব থেকে তখনকার যুবা-বৃদ্ধ কেউই বড় একটা বাইরে ছিলেন না। অশ্বিনীকুমার দত্ত, কালীশচন্দ্র পণ্ডিত ও জগদীশ আচার্য ছিলেন সেই তিন মহাপুরুষ।

এই ত্রয়ীর মধ্যমণি ছিলেন অশ্বিনীকুমার দত্ত। দেবকান্তি পুরুষ। তাঁরই পাশের বাড়িটা ছিল আমাদের। তাঁর বাড়ির সামনেটায় রেলিং দেওয়া ছিল। রেলিং-এর বাইরে সুরকির সরকারী রাস্তা। আর বাড়ির সামনের উঠোনের ঠিক মধ্যস্থলে ছিল একটি মস্ত বড় তমালগাছ। গাছটির গোড়া বড় একটি গোলাকার বেদী করে বাঁধানো ছিল। আর বেদীর পাশে খানিক সবুজ ঘাসে ভরা গোল জায়গা ছেড়ে দিয়ে, ছিল একটি পায়ে-চলার গোল সুরকির রাস্তা। তমালের ঘনস্নিগ্ধ ছায়ায় চওড়া বেদীটির উপর কখন বা ক্লান্ত পথিক ঘুমোয়, কখনও বা ছেলের দল খেলে। আবার কখনও বা মধুচক্ররূপী অশ্বিনীকুমারকে ঘিরে ঈশ্বরীয় আলোচনার মধুপান করতেন শহরের গুণী ব্যক্তিরা।

অশ্বিনীকুমার ছিলেন সাধক, প্রেমিক, যোগী ও রাজনীতিজ্ঞ। তমালতলার বৈঠকে বা তাঁর ঘরে যে রাজনীতি-আলোচনার বৈঠক বসত তা বুঝবার বয়স আমাদের মতো ছেলেমেয়েদের তখন ছিল না। কখনও কখনও তমালতলায় খেলতে খেলতে চোখে পড়ত ঘরের বৈঠকের মধ্যে আরাম কেদারায় বসা একটি অপূর্ব পুরুষকে। আমার মা তাঁকে কাকাবাবু বলতেন। আমরা বলতাম দাদু। মাঝে মাঝে মায়ের সঙ্গে তাঁকে প্রণাম করতে যেতাম। আশীর্বাদ করতেন, 'লেখাপড়ায় ভাল হও'। মার সঙ্গে নানা কথা বলতেন।

ভারি সুন্দর লাগত দেখতে যখন রোজ ভোরবেলা হয় ধুতির খুঁটটি, নয়তো একটি পাতলা উড়ুনী গায়ে দিয়ে তমালতলার গোল চত্বরে হেঁটে বেড়াতেন। গৌরবর্ণ রূপ, গোঁফ জোড়াটি ধবধবে সাদা, মাথায় ঝকঝকে টাক। কানের পাশে ও মাথার পেছনে কিছু সাদা চুল। হেঁটে বেড়াচ্ছেন যেন এক তপস্বী পুরুষ। ছেলেবেলার দেখা সে ছবিটি এখনও আমার চোখে ভাসে।

একদিন ভোরবেলা গোপাল মেথর বাড়ির পায়খানা সাফ্ করতে এসে ঝাড়ু হাতে খোদ কর্তাবাবুর সামনে পড়ে গেল। উপুড় হয়ে সে প্রণাম করতে গিয়ে দেখল কর্তাবাবুর বুকের উপর সে আলিঙ্গনাবদ্ধ। মুখে বলছেন, 'গোপাল তুই-ই ধন্য, তুই-ই প্রেমিক। মানুষকে ভালবাসিস বলেই তো তাদের এই নোংরা তুই অনায়াসে ঘাটতে পারিস।' এসব কথার বিন্দুবিসর্গও গোপালের কানে যায়নি, মাথায়ও না। তার দুই চোখের জলে সে তার কর্তাবাবুর পা দু'খানি ধুয়ে দিচ্ছিল। এ কাহিনী আমার জামাইবাবুর কাছে শোনা। তিনিও ঐ বাড়িতে খুব যেতেন সে সময়ে।

যে গভীর চিন্তায় তাঁকে আমরা ডুবে থাকতে দেখতাম তা প্রকাশ হলো তাঁর লিখিত 'ভক্তিযোগ' গ্রন্থে। বড় হয়ে সে বই আমি গভীর মনোযোগে পড়েছি। বড় হয়ে জেনেছি যে, অশ্বিনী দাদু সে সময়ে বরিশালের অদ্বিতীয় রাজনৈতিক নেতা ছিলেন। নীরবে তিনি সারা জিলার মানুষের উপরে যে বিস্ময়কর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাতে সুদূর গ্রামে-গঞ্জে তাঁর বক্তৃতা করে বেড়াতে হতো না। অশ্বিনীবাবু সকলকে এটা করতে বলেছেন, মাত্র এই কথাটুকু তাদের কানে পৌঁছলেই যথেষ্ট। তাঁকে বরিশালের 'গান্ধীজী' বলা চলত। তিনি কৃষকদের এত কাছের মানুষ ছিলেন এবং তাঁর উপর গ্রামের ভালবাসাও এত গভীর ছিল যে শুনেছি কৃষকরা তাঁর নাম করে ক্ষেতে ফসল লাগাত। তাদের বিশ্বাস ছিল—এতে ফসল ভাল হবে। সেবাব্রত ছিল তাঁর জীবনের অঙ্গ। দূরের মানুষকে কাছে টানতে তাঁর মধ্যে যেন একটি চুম্বকশক্তি কাজ করত।

জীবিতকালে তাঁর দেবকান্তি দেখে আমরা ছোটরা তাঁকে ভক্তি করতাম। বড় হয়ে জেনেছি তাঁর ধর্মজীবনের ইতিহাস। সর্বসংস্কার মুক্ত অশ্বিনীকুমার ব্রাহ্মসমাজের ধর্মমতে বিশ্বাসী ছিলেন। পরে ৺ বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ৺ বিজয়কৃষ্ণের কথা আমি অল্প বয়স থেকেই অনেক শুনতাম। তার প্রভাব আমাদের পরিবারেও ছিল। তাই অশ্বিনী দাদুকে বড় হয়ে যখন চিনতে শিখলাম তখন বরিশালবাসীর সঙ্গে আমিও তার দেবচরিত্রের প্রভাবে এসে গেছি।

আমার নিজের দাদু, দাদামশাই, অনেক আগেই পরলোকগত। আমি তাঁকে দেখিনি। অশ্বিনী দাদু ও আমার দাদু রজনীকান্ত দাসের মধ্যে সখ্য ছিল —মা'র কাছে শুনেছি। অশ্বিনীবাবু দাদুকে 'রজুদা' বলে ডাকতেন। দাদু শহরের শ্রেষ্ঠ উকিল ছিলেন ও আমৃত্যু মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান ছিলেন।

ওখানে তখন এই ধরনের বুদ্ধিজীবীরা এ্যানি বেসান্তের ভক্ত। থিওসফিক্যাল সোসাইটির একটি শাখা বরিশালেও গড়ে তুলেছিলেন। প্ল্যানচেটে আত্মা আনবার দিকে এঁদের সকলের ঝোঁক ও বিশ্বাস ছিল। শুনেছি, শেষরাত্রে আমার দাদু বিছানার মধ্যেই ধ্যানে বসে থাকতেন। ঐ প্ল্যানচেট থেকেই হোক বা যে প্রকারেই হোক তাঁর মৃত্যু-দিনটি তিনি নাকি বহু পূর্বেই জানতে পেরেছিলেন। একদিন রাত্রে ঘুম থেকে দিদিমাকে ঠেলে তুলে তিনি নাকি বলেছিলেন—'জেনে রেখো অমুক সনের অমুক তারিখে আমার মৃত্যু। এ যদি সত্য না হয় তবে দেবধর্ম সব মিথ্যে।' দাদু তখন সুস্থ কর্মঠ পুরুষ। দিদিমা ওসব কথায় কানই দিলেন না। ভাবলেন রাত্রির দুঃস্বপ্ন।

কিন্তু আশ্চর্য, একথার কত পরে জানিনা, কিন্তু অনেক বছর পরে শুনেছি, দাদুর মৃত্যু হয় ঠিক ঐ তারিখেই। মাথায় স্ট্রোক হয়ে তিনি অর্ধ-অজ্ঞান অবস্থায় বিছানায় পাঁচ মাস পড়েছিলেন এবং ঐ নির্দিষ্ট দিনটিতেই তিনি পরলোকগমন করেন। এসব কথা উনিশ শতকের গোড়ার দিকের।

দাদুর দানশীলতার কথা শহরে সবাই জানত। বৈঠকখানার ঘরে ফরাস পাতা বড় চৌকিতে দাদুর একদিকে থাকত মক্কেলদের বসবার জায়গা, আর এক পাশে থাকত প্রার্থীদের। একটির পর একটি প্রার্থীর কথা এককানে শুনতেন ও অন্যকানে নিজের পেশার কথা। ফাঁক পেলে যা জমা পড়ত তার কিছু কিছু কাগজে মোড়ক হয়ে চুপি চুপি প্রার্থীর হাতে চলে যেত। কাজটি গোপনে সারতেন মুহুরির ভয়ে।

দাদুর সংসারের মধ্যে ছিলেন দিদিমা আর আমার মা। মায়ের বিবাহের পরে তো দুটি প্রাণীর সংসার, কিন্তু তিনি পালন করতেন বিরাট একটি পরিবার। বাড়ির উত্তর পাশে একখানা মস্তবড় আটচালা ঘর ছিল। তাতে অন্তত জনা পঁচিশেক লোক থাকত। এঁরা কেউ ছাত্র, কেউবা সামান্য চাকুরী-ওয়ালা। ঐ ঘর ছিল তাদের আশ্রয়। দুবেলা খাবার ঘণ্টা বাজত। ঐ ঘণ্টা বাজার লোহার তারটি একটি নারকেল গাছের সঙ্গে বাঁধা ছিল। সে আমি বড় হয়ে দেখেছি।

এছাড়া দেশের বাড়িতে যাবার সময় পারিবারিক খরচ বাদে দাদু ভিন্ন একটি ক্যাশবাক্স নিয়ে যেতেন। সেটি ভরা থাকত খুচরো টাকা-পয়সায়। বিকেলবেলা এক এক বৌ-এর এক একদিন ডাক পড়ত। দাদু তাদের কারো জ্যেষ্ঠ-শ্বশুর, কারো খুড়-শ্বশুর, কারো বা দাদা-শ্বশুর। বৌদের কাছ থেকে খুঁটিয়ে জেনে নিতেন বাপের বাড়ির সংসারের কথা। তারপর বৌ-এর হাতে

একটি মোড়ক চলে যেত। বলতেন, 'মাকে পাঠিয়ে দিও।'

নিজের প্রজাদের সঙ্গেও এই ব্যবহারই চলত। এক-একজন এক-এক প্রয়োজনে আসত এবং খুশি মনে চলে যেত।

দাদুর বিষয়ে একটা প্রবাদ ছিল: তার এক হাত দান করত, অন্য হাত জানত না।

এই দানশীলতার সুযোগ নিয়ে মৃত্যুশয্যায় তাঁর নিজের আয়ে নির্মিত বসতবাটি ও তার সংলগ্ন ৭ বিঘা জমি পর্যন্ত দেশের বাড়ির জ্যেঠতুতো-খুড়তুতো তিন শরিকেরা চার ভাগের তিন ভাগ নিয়ে নিলেন। মা পেলেন এক ভাগ। উইল লিখে এনে কে যেন পড়ে শোনাল ও হাতে একটা কলম গুঁজে দিল। দাদু নিঃশব্দে হাত বাড়িয়ে সই করে দিলেন। তাঁর একমাত্র সন্তান, আমার মা, বঞ্চিত হলেন। দিদিমা কাঁদতে লাগলেন। ঘরে যাঁরা অন্য লোক ছিলেন হায় হায় করতে লাগলেন। মাকে গিয়ে বলতে বললেন তাঁর নিজের কথা। মা বলেছিলেন, 'আমি আমার এতবড় বাপের মেয়ে এই-ই আমার বড় পরিচয়, সামান্য সম্পত্তিতে আমার কি হবে?

পরবর্তী সময়ে আমার বাবা জমির অর্ধাংশ ও বাড়িটার বাকী বারো আনা কিনে নিলেন অন্য শরিকদের কাছ থেকে। চার আনা মা'র প্রাপ্যই ছিল। তাই গোটা বাড়িটা আমাদের হয়েছিল। আমার দাদুর নামেই বাড়ির নামকরণ হলো। বাবার নামে নয়।

অশ্বিনীকুমারের সুহৃদ আমার এই দাদুর সঙ্গে হঠাৎ রাজনীতিতে অমিল হয়ে গেল। সেটা ১৯২৬ সন হবে। সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর প্রভাবে পড়লেন আমার দাদু। দাদুকে তাঁর মানবপ্রীতি ও দানশীলতার জন্য অশ্বিনী-কুমার অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু ইংরেজদের সঙ্গে আপসে লোক্যাল সেল্ফ গভর্নমেন্টের নির্বাচনে অশ্বিনীকুমারের ঘোরতর আপত্তি। আমার দাদু দাঁড়ালেন। অশ্বিনী দাদু বললেন, 'রজুদা, তুমি তুলসী বনের বাঘ।' দাদু হেরে গেলেন। এই দাদুই একবার বরিশালবাসীদের উপরে ফুলার সাহেবের অত্যাচারে অত্যন্ত চটে গিয়েছিলেন। শহর-প্রধান হিসাবে একখানা কড়া চিঠি তিনি ফুলার সাহেবকে পাঠালেন। সাহেব দুঃখ প্রকাশ করে সে চিঠির জবাব দিয়েছিলেন।

নির্বাচনের পর আবার দুই বন্ধুর সৌহার্দ্য যেমন ছিল তেমনই রইল।

দাদুর মৃত্যুশয্যার পাশেও অশ্বিনীকুমার। দাদুর দানশীলতার কথা তখন শহরে সুবিদিত। তাছাড়া যে মিউনিসিপ্যালিটি তাঁর প্রাণ স্বরূপ ছিল, মৃত্যু-

শয্যাতেও তার কথা ভুলতে পারছেন না। প্রলাপের মধ্যেও অশ্বিনীদাদুকে বলেছিলেন শহরের বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য কি ব্যবস্থা করা যায়। এক সময়ে দাদু চোখ বুজলেন। দাদুর একমাত্র সন্তান আমার মা। তিনিই তাঁর পিতার শেষকৃত্যের অধিকারী। তার কি ব্যবস্থা হবে আলোচনা ওঠায় উপস্থিত সকলে দাদুর সিন্ধুক খোলার ভার দিলেন অশ্বিনীকুমারকে। তিনি খুলে সেখানে মাত্র সাড়ে চার টাকা পেলেন। আশ্বিনীদাদু আমার দাদুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে উঠলেন, 'রজুদা, তুমি রাজর্ষি ?'

একজন মহর্ষি, আর একজন রাজর্ষি। দুজনের সখ্য ছিল অচ্ছেদ্য। মতবিরোধ হলো আবার মিটেও গেল। সখ্যে চিড় খায়নি।

আজকাল রাজনীতি অনেক কড়া। সখ্য সহজেই শত্রুতায় পরিণত হয়।

অশ্বিনীকুমারের বিরাট জীবনের কথা আমি লিখতে বসিনি। আমি লিখেছি তাঁকে আমার বাল্যবয়সের চোখে যতটুকু দেখা এবং আমার মায়ের কাছে ও জামাইবাবুর কাছে যা শোনা।

চারণকবি মুকুন্দ দাস ছিলেন বরিশালের সন্তান। এ নিয়ে আমাদের গর্বের সীমা নেই। মুকুন্দ দাস যে একদিন চারণকবি হয়ে সারা পূর্ববাংলাকে মাতিয়ে তুলেছিলেন তা ঐ অশ্বিনীকুমারের প্রেরণায়। বরিশালের পশ্চিম প্রান্তে একটি কালিবাড়ী প্রতিষ্ঠা করে সেখানে মুকুন্দ দাস থাকতেন। কিন্তু তাঁর আসর ছিল খোদ কর্তামশাই অশ্বিনীকুমারের বাড়িতে। মাঝে মাঝেই গান হতো। আমাদের বাড়ি থেকেও শোনা যেত। মানুষকে পাল্‌টে গড়ে তোলার কি যে জাদুমন্ত্র জানতেন অশ্বিনীকুমার! নইলে মদ্যপ মুকুন্দ চারণকবি হয়ে বরিশালকে মাতালো আর কারাবরণ করল ?

কাজী নজরুল ইসলামকে তখনও আমরা দেখিনি। কিন্তু তাঁর 'অগ্নিবীণা' 'বিষের বাঁশী'র কবিতাগুলি প্রাণপণে মুখস্থ করছি আর বুকের মধ্যে বই লুকিয়ে একে ওকে চালান করছি। যতদূর মনে পড়ে 'বিষের বাঁশী' নিষিদ্ধ বই ছিল। কিন্তু নজরুলকে আমি চিনেছি শুধু তাঁর বই পড়ে নয়। বেশী করে চিনেছি ঐ মুকুন্দ দাসের কম্বুকণ্ঠের গানে ও আবৃত্তিতে। গেরুয়া পরা, গেরুয়া উত্তরীয় গলায়, নজরুলের মতোই একমাথা ঝাঁকড়া ও কোঁকড়া চুল—এই বেশে চারণ-কবি যখন স্টেজে উঠে দরাজ গলায় 'দুর্গম গিরি কান্তার মরু', 'কারার ঐ লৌহ কপাট ভেঙে ফেল্‌ কররে লোপাট', 'জাতের নামে বজ্জাতি সব'—ঐ সব গাইতেন তখন যেন এসব আর শুধু গান ও কবিতা থাকত না। আমাদেরকে যেন ইলেকট্রিক শক্‌ মারত। 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গানটি কেন যেন

আমাকে অদ্ভুতভাবে স্পর্শ করত। যেন মনে হতো ঐ নারী আমি নিজেই, 'ধর্ষিতা নাগিনী' শুনলে মনে হতো আমিই যেন খাড়া হয়ে ফণা তুলেছি।

মুকুন্দ দাসের যাত্রা ছিল শহরের একটা প্রবল আকর্ষণ। সব যাত্রাই ছিল সমাজসংস্কার বা রাজনীতিতে দেশবাসীকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য। যাত্রায় প্রায়ই উনি সাজতেন গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী। আর একটি ছেলে সাজত ওঁর বিধবা মেয়ে অথবা সন্ন্যাসিনী শিষ্যা। যাত্রার বিষয়বস্তু হতো কোন সময়ে বাল্যবিধবা মেয়ের উপর সামাজিক অত্যাচারের কাহিনী অথবা গরীবের উপরে অত্যাচার। যাত্রাগুলিকে সবাই 'স্বদেশী যাত্রা' আখ্যা দিয়েছিল। নজরুলের গান, তাঁর নিজের স্বরচিত গান, যাত্রার সংলাপ সব মিলে দেশাত্মবোধ জাগানো ও সামাজিক কুসংস্কারের বিরুদ্ধে মানুষের মানসিক বিতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলাই ছিল এই যাত্রার মূল কথা।

মেয়েরা এ যাত্রা দেখতে ভেঙে পড়ত আর কেঁদে ভাসাত। গানগুলো যেন জাদু জানত। নইলে যখন গাইতেন—'ও আমার বঙ্গনারী, পরো না বিলিতি শাড়ি, ভেঙে ফেল বেলোয়ারী চুড়ি'—তখন যেন কে আগে স্টেজে গিয়ে হাতের চুড়ি ভেঙে দিয়ে আসবে—তার একটা প্রতিযোগিতা লেগে যেত। শুধু কাঁচের চুড়ি ভাঙা নয়, কাঁদতে কাঁদতে হাতের সোনার চুড়ি খুলে দিয়ে আসতেও আমি দেখেছি। ঘরে গিয়ে বিলিতি কাপড় ছেড়ে 'বঙ্গলক্ষ্মী' মিলের মোটা শাড়ি ধরতে মেয়েদের আর অন্য প্রচারের দরকার হতো না। একা মুকুন্দ দাসের যাত্রাই যথেষ্ট ছিল। সেই দীর্ঘ চেহারার সন্ন্যাসীর গলায় ঝকমক্ করছে সব মেডেল আর বজ্রকণ্ঠ, এ যেন আজও আমার চোখে ভাসে, কানে বাজে।

আজ কবি নজরুলও নীরব, মুকুন্দ দাসও নীরব। আজ সেই অনুভূতি আর কোথায় পাব? তারুণ্যের তরল রক্ত তো আজ ঘন।

কিন্তু সেদিনের সেইসব শিহরণ ও উত্তেজনাময় মুহূর্তগুলি—সবই হয়তো আমার অজান্তেই আমার ভবিষ্যত জীবনের কিছুটা রূপরেখা রচনা করেছিল।

অশ্বিনীদাদুকে ঘরের মানুষ ভেবেছি, তাঁর প্রতি আমার মায়ের শ্রদ্ধাভক্তি থেকে মনে হতো তিনি একজন বড়দরের মানুষ। কিন্তু কত বড় দরের সেটা বড় হয়ে বুঝেছি তাঁর লেখা বই পড়ে এবং তাঁর হাতের জীবন্ত রচনা মুকুন্দ দাসকে দেখে।

ত্রয়ীর দ্বিতীয় পুরুষ ছিলেন ৺জগদীশচন্দ্র। তাঁর চিরব্রহ্মচারী জীবন ও ধর্মপ্রাণতার জন্য তিনি লোকের কাছে আচার্য জগদীশচন্দ্র বলে পরিচিত ছিলেন। আচার্য পদবীটি ছিল তাঁর প্রতি লোকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি।

অশ্বিনীকুমারকে বুঝবার বয়স আমার ছিল না কিন্তু জগদীশচন্দ্রকে খুব কাছে থেকে দেখবার ও বুঝবার বয়স আমার হয়েছিল। আমি তখন ব্রজমোহন কলেজে পড়ি। উনি ছিলেন অশ্বিনীকুমার প্রতিষ্ঠিত ব্রজমোহন (অশ্বিনীকুমারের পিতা) স্কুলের প্রধান শিক্ষক। শিক্ষকতায় ও পরিচালনায় অসাধারণ দক্ষতা তাঁর জীবনে এসেছিল। ইংরেজি, অঙ্ক ও দর্শন—এই তিনটি বিষয়ে তাঁর সমান ব্যুৎপত্তি ছিল। একদিন তাঁর আশ্রমে গিয়েছি। তখন তিনি বার্ধক্যের দুয়ারে। গিয়ে দেখি অঙ্ক কষছেন। জিজ্ঞেস করলাম—"এ কি করছেন আপনি? এখন আপনি অঙ্ক দিয়ে কি করবেন?" বললেন, "দিদি, মানুষের মাথায় মাকড়সার জালের মতন থাকে। ওগুলো কেটে যায় অঙ্ক কষলে।" তিনি ডিফারেন্শিয়াল ক্যালকুলাসের অঙ্ক করছিলেন। আমাকে বললেন, "তুইও রোজ অঙ্ক করিস, বুদ্ধি খুলবে।" মনে ভাবলাম—বুদ্ধিতে আর কাজ নেই, অমন নীরস জিনিস আমার দ্বারা হবে না। সর্ব বিষয়ে ও সর্ব শাস্ত্রে এমন অগাধ পাণ্ডিত্য অথচ এমন নিরভিমানী আর কেউ আমার চোখে পড়েনি।

ত্রয়ীদের এক বিষয়ে অদ্ভুত মিল ছিল। ইনিও ছিলেন দেবকান্তি পুরুষ। গায়ের রং যেন ফেটে পড়ত। মাথায় ও মুখে কাঁচা-পাকা চুল-দাড়ি। দেখলেই মনে হতো ঋষি।

তাঁর আশ্রমটি ছিল একটি ছাত্রাবাস। একটি ঠাকুরঘর ও তাঁর নিজের বাসগৃহটি নিয়েই এই ছাত্রাবাস। ছাত্রাবাসের খরচ চলত কিছুটা অল্প সংখ্যক ছাত্রদের দেওয়া টাকায়। গরিব খানা। ডাল, ভাত, তরকারী। আচার্যদেবের খাদ্যও তাই-ই। ঠাকুরঘরের সকাল বিকাল পূজা, আরতি উনি নিজে করতেন না। কয়েকজন ভক্ত ছিলেন—তারাই করতেন। ছিল না মন্ত্রশিষ্য তাঁর—কিন্তু ওঁর ভক্ত ছিল শহরের অগণিত মানুষ। সন্ধ্যেবেলা আমার মা ও ছোড়দির সঙ্গে আমি প্রায়ই যেতাম। গান শুনতে ভালবাসতেন। অতুলপ্রসাদ ও রবীন্দ্রনাথের ভক্তিমূলক গান শুনতে চাইতেন। একটার পর একটা ফরমাস হতো। আর ছোড়দি একটার পর একটা গেয়ে যেতেন। সঙ্গে আমাকে ঠেকা দিতে হতো। উনি যেন গান শুনে কোন্ অতলে ডুবে যেতেন।

প্রতি রবিবার সকালে পূজো, মন্দিরের পাঠঘরে গান ও পাঠের আসর চলত। কত লোক যে নীরবে উপবিষ্ট থাকতেন। কাপড়ের পর্দার এপিঠে মেয়েরা, ওপিঠে পুরুষেরা। তাঁর ফরমাস্ মতন গান চলত। তারপর উনি গীতা, ভাগবত বা উপনিষদের অংশবিশেষ ব্যাখ্যা করে শোনাতেন। মা'দের সঙ্গে আমিও প্রায়ই যেতাম। এছাড়াও তাঁর বাসগৃহে সর্বদা ধর্মালোচনা শুনতে

গুণগ্রাহীরা কেউ না কেউ আসতেন। শান্ত নিস্তব্ধ পরিবেশ। নানারকম গাছপালায় ঘেরা আশ্রমটি যেন প্রাচীন ঋষিদের আশ্রমকে স্মরণ করিয়ে দিত।

একবার জন্মাষ্টমীতে উনি আমায় আদেশ করলেন—শ্রীকৃষ্ণের গীতাধর্মের উপর একটি প্রবন্ধ পাঠ করতে। আমার তো হৃৎকম্প। লিখেছিলাম একটা এবং পাঠের আসরে কম্পিত বক্ষে পড়েও দিয়েছিলাম। আজও সেকথা মনে পড়লে হৃৎকম্পটাই বেশী মনে পড়ে। কিন্তু পর দিন সকালবেলা দেখি, একি কাণ্ড! স্বয়ং সেই দেবপুরুষ একখানি মালা নিয়ে আমাদের বাড়িতে হাজির। আমার গলায় পরিয়ে দিয়ে বললেন, "এই নাও দিদি তোমার শিরোপা, বড় ভাল লেগেছিল তোমার রচনাটি।" আমি এখন কি করি। এমন পুরস্কার জীবনে এই প্রথম। গলা থেকে মালাখানি খুলে নিয়ে তাঁরই পায়ে দিয়ে প্রণাম করলাম।

তাঁর স্নেহ প্রকাশের অনেক ঘটনার একটির উল্লেখ না করে পারছি না। ওঁর শোবার ঘরের পিছনে একটা চালতা গাছ ছিল। একদিন আমি তার তলায় ঘুর ঘুর করছি দেখে বললেন, "কি খুঁজছিস দিদি, চাল্‌তা?" হেসে ফেললাম। পরদিনই সকালে দেখি চাদরের তলায় দু'হাতে দু'টি চালতা নিয়ে উনি এসে হাজির। অবাক হয়ে ভাবলাম—এত ক্ষুদ্র জিনিস নিয়েও মহাপুরুষরা ভাবেন?

তখন আমি ভাগবত পড়েছি। সন্ন্যাসিনী হবার আকাঙ্ক্ষাই তখন আমার প্রবল। আমার সন্ন্যাসিত্বের ধারণা—অতি কঠিন এক কৃচ্ছ্র সাধন। তার মধ্যে কোন মধুর রস-টসের স্থান নেই। ভগবানের সঙ্গে পিতা-মাতা ছাড়া আর কোন সম্পর্ক স্থাপন? অসম্ভব, চলতেই পারে না। আমি গীতাধর্মের অনুরাগী। একদিন দুপুরে তর্ক করতে গেলাম জগদীশচন্দ্রের সঙ্গে। দুম্ করে বলে ফেললাম, "আপনাদের ভাগবত পড়তে আমার ভাল লাগে না।" বললেন, "কেন?" বললাম "অনেক অশ্লীল কথা লেখা আছে।" যেন দুঃখ পেলেন। বললেন, "এখন তো ও জিনিস বুঝবে না, আগে দাঁত উঠুক তবে কচি আমের মর্ম বুঝবে।" আমার শান্ দেওয়া সব ধারালো যুক্তিগুলো আর বলাই হলো না। যেন থাবড়া মেরে বন্ধ করে দিলেন।

এই জগদীশচন্দ্রের তৈরি ছাত্রাবাসের সংযমী ছাত্রদের ও পূজাঘরের পবিত্রমনা পূজারীদের প্রভাবে এবং শহরের ঘরে ঘরে তাঁর নিজের যাতায়াতে, জ্ঞান ও প্রেম বিতরণে বরিশাল শহর তখন ভরপুর। এই মানুষটির নীরব সাধনা তাঁর ক্ষুদ্র আশ্রমটি ছাড়িয়ে সারা শহরে যেন কি এক প্রভাব বিস্তার করেছিল

—যার বাইরে যাওয়া তখন কারো পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাঙলাদেশের যুদ্ধের সময়েও শুনেছি তারা জগদীশ-আশ্রমের গায়ে হাত দেয়নি।

আসল কথাটাই এতক্ষণ বলা হয়নি। ইনিও অশ্বিনীকুমারের আসরের মানুষ ছিলেন। অশ্বিনীকুমারের সত্য, প্রেম, পবিত্রতার প্রচারক ছিলেন এই সুগভীর জ্ঞানের অধিকারী মানুষটি।

তৃতীয় পুরুষ কালীশচন্দ্র। লোকে কালীশ পণ্ডিত মশাই বলে জানত। ব্রজমোহন স্কুলের ইনি ছিলেন সংস্কৃতের পণ্ডিত। ইনিও অশ্বিনীকুমারের আসরের মানুষ। কিন্তু এঁর ধর্ম পাণ্ডিত্যে প্রকাশ পেত না—পেত লোক-সেবায়। ইনি একটি আতুরাশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন। সেখানে রুগীরা সেবা পেত। নিজে অকৃতদার ছিলেন এবং এই নিয়েই থাকতেন। পথ থেকে রুগী কুড়িয়ে নিয়ে এসে ওখানে তুলতেন এবং অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের সারিয়ে তুলতেন। অশ্বিনীকুমার নিজের ছাত্রদের নিয়ে বরিশালে 'লিট্‌ল ব্রাদারস অফ দি পুয়োর' নামক সংগঠন করেছিলেন এবং তাদের সেবামন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। সেই সংগঠনের ভার নিলেন অশ্বিনীকুমারের যোগ্য উত্তরপুরুষ এই পণ্ডিত মশাই। তিনি তাঁর ছাত্রদের অসীম মমতায় সেবাব্রতী করে তুলেছিলেন। যুবক ছেলেরা স্বেচ্ছাসেবক হয়ে তাঁকে ঘিরে থাকতেন এবং পণ্ডিতমশাই-এর নির্দেশে চলতেন। এই স্বেচ্ছাসেবক ছেলেরা শুধু আতুরা-শ্রমেই রুগীসেবা করতেন—তাই নয়, শহরের যে কোন বাড়ি থেকে ডাক পড়লে এঁরা সেখানে গিয়ে প্রয়োজনমতো রোগীর সেবা করে আসতেন। পণ্ডিতমশাই এদের 'ডিউটি' ভাগ করে দিতেন। তখনকার দিনে কলেরা, বসন্ত, টাইফয়েড এ সবের তো কোন চিকিৎসাই ছিল না। আর মহামারীরূপে প্রতিবছর শহর-গ্রামে এদের আগমন ছিল অবাধ। চিকিৎসা না থাকলে একমাত্র সেবাই রোগীকে একটু সান্ত্বনা ও আরাম দিতে পারে। অতএব স্বেচ্ছাসেবকের কাজ ছিল খবর পেলেই পাখা আর জলপট্টি নিয়ে রুগীর শিয়রে বসা, আর বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই শেষ গতিটি করে ফিরে আসা। রাত দশটা থেকে দুটো এবং দুটো থেকে সকাল পর্যন্ত এরা দু'জন করে আসতেন। এই ডিউটির কোন নড়চড় হতো না। কোন বাড়িতে এরা কিছু খেতেন না। অনেক সময় বাড়ির লোকেরাও অনুপস্থিত থাকত কিন্তু এরা বসে থাকতেন। আমার দাদার একবার টাইফয়েড হয়েছিল। মা আর একলা পেরে উঠছিলেন না। আশ্রমে খবর দিতে হলো। ওরা সন্ধ্যার পরে দু'জন এসেই মার হাত থেকে জলের পাইপটি ও পাখাটি নিয়ে নিতেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় হোমিওপ্যাথি ওষুধ

খাওয়ানো আর জ্বর দেখার কাজও ওরাই করতেন—মাকে করতে দিতেন না। মার পাশে শুয়ে একটু বিশ্রাম করাবার জন্য ছেলেরা কি চেষ্টাই না করতেন।

এইসব সেবাব্রতীরাই ছিলেন কালীশ পণ্ডিতের সন্তানদল। নিজে সন্তানের পিতা ছিলেন না কিন্তু যে সন্তানদের তিনি নিজের হাতে তৈরি করেছিলেন অন্তিমকালে তাদের সেবাধর্ম নিজে চোখে দেখে যেতে পেরেছিলেন—এই ছিল তাঁর আদর্শের সার্থকতা। বরিশালের এই চারিত্রিক আবহাওয়াই এই ছোট্ট শহরটিকে স্বাতন্ত্র্য দিয়েছিল।

আর যাঁরা নিজ নিজ চরিত্রবলে বরিশালে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন তাঁরাও খুব কম ছিলেন না। তাঁদেরও আমি ভুলিনি এবং মনে হলে আজও প্রণাম করি।

বরিশালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে ছিল জীবনানন্দের বাড়ি। জীবনানন্দের পিতা সত্যানন্দ দাস ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের আচার্য। তিনিও এক সাধক ও পণ্ডিত পুরুষ ছিলেন। সত্যানন্দ দাসের ভগ্নী স্নেহলতা দাস ছিলেন আমাদের স্কুলে প্রধানা শিক্ষয়িত্রী। সর্বদা সাদা সরু পাড়ের ধবধবে ধুতি পরা বেশ। চিরব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মিকা। পরবর্তী জীবনে সমাজের আচার্য। স্কুলজীবনে ইনি ছিলেন আমাদের 'প্লেইন লিভিং এ্যাণ্ড হাই থিংকিং'-এর আদর্শ। আমরা স্কুলে যেতাম সাদা শাড়ি ও সাদা জামা পরে এবং খালি পায়ে। এর বেশী পোশাক আমরা জানতামই না। বড়দির সামনে সাজপোশাক করার কথা মনেও হতো না। শাড়িটা পেঁচিয়ে পরার ঢংটা তখনও বরিশালে পৌঁছে উঠতে পারেনি। রেললাইন ছিল না তো! কলকাতার হাওয়া পৌঁছাতেই যুগ পার হয়ে যেত। বরিশালের আবহাওয়াটা ঐসব মহাপুরুষদের প্রভাব এবং রেলযোগের অভাবের জন্যই বোধহয় বেশ কিছুকাল বেঁচে ছিল।

আমরা যখন আই. এ. ক্লাসে পড়ি তখন বন্ধুরা মিলে যুক্তি করলাম এবার আমরা চটি পায়ে দেবো। বোধকরি চটি না পরেই ছিলাম ভাল। লাল সুরকি পায়ে ফুটতো না। আর এখন আত্মরক্ষার তাগিদেও খালিপায়ে দু'পা ছুটতে পারব না।

ব্রাহ্মসমাজের আর একজন প্রচারক ও আচার্য ছিলেন মনমোহন চক্রবর্তী। আমাদের বাড়িতে প্রায়ই আসতেন। অনেকের বাড়িতেই তাঁর যাতায়াত ছিল। নিরভিমান সদালাপী বৃদ্ধটি মাঝে মাঝে তাঁর 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকায় আমার লেখা নিতে আসতেন। মাঘোৎসবে ব্রাহ্মিকাদিবসে আমাকে বলতেন লেখা পাঠ করতে। দু'একবার করেও ছিলাম, এই নিয়ে অনেক ঝগড়া

করতাম তাঁর সঙ্গে। 'আপনাদের মেয়ের কথাটি বলবেন না, আর আমাকেই মঞ্চে ওঠাবেন। ভারি আহ্লাদ পেয়েছেন।' এ রকম ঝগড়ায় আমরা উভয়েই আমোদ পেতাম।

এছাড়া বরিশালের বিপ্লবী রাজনীতির ধারক ছিল স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ সরস্বতী প্রতিষ্ঠিত ওখানকার শঙ্কর মঠ। স্বামীজী ব্যক্তিগতভাবে এই রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু ঐ মঠ যুগান্তর পার্টির কেন্দ্র ছিল বলে আমরা জানতাম। আমি ওখানে আমার ছোড়দির সঙ্গে কয়েকবার গেছি। ছোড়দি যেতেন মঠ দেখতে। আমার চোখ দু'টো ঘুরত মঠের বড়গোছের একটি লাইব্রেরীর বইগুলোর উপর। ভাবতাম, ঐ সব বই-এর পিছনে নিশ্চয়ই পিস্তল রাখা হয়। আর বিপ্লবীরা এখানে কেউ থাকেন কিনা জানবার জন্যও উৎসুক থাকতাম। হঠাৎ শুনলাম, একদিন পুলিস ঐ মঠের সমস্ত কিছু তল্লাসী করে; এমনকি মাটি খুঁড়ে, মন্দিরের বেদী খুঁড়ে পর্যন্ত দেখে। অস্ত্রশস্ত্রও নাকি পায়। গ্রেপ্তার হলেন নিশিবাবু, যিনি আমাদের লাইব্রেরী দেখাতেন। এই শঙ্কর মঠের প্রভাব নিঃশব্দে ওখানকার যুবমানসে বিপ্লবের অঙ্কুর রোপণ করত। জানি না, অন্য কোন জিলায় বিপ্লবীরা এই ধরনের মঠকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিলেন কিনা। বরিশালের ধর্মীয় আবহাওয়ার সঙ্গে এই বিপ্লবী আবহাওয়া মিশ্রিত হয়ে তাকে নিঃসন্দেহে নতুন বৈশিষ্ট্য দিয়েছিল।

এই ছিল বরিশাল। এখনও মনে হয় ঐ আবহাওয়ায় আবার যদি ফিরে যেতে পারতাম! আমি জানি না পূর্ববঙ্গে একমাত্র বরিশাল ছাড়া অন্য জিলাগুলি এমন একটি ভাবময় আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিল কিনা।

আমার কথা

এইবার আমার নিজের কথা একটু বলতেই হবে। নইলে বোঝাতে পারব না কলকাতার এই রাজনীতির পরিবেশে আমি এসে গেলাম কেমন করে।

একে আমি ছিলাম ঐ ত্রিমূর্তির প্রভাবিত এবং বরিশালে বর্ধিত। তার উপরে আমার পরিবারেও একটা ধর্মীয় আবহাওয়া ছিল। আমার এক ভগ্নীপতি ছিলেন খুব ধর্মপ্রাণ ও বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর সম্প্রদায়ভুক্ত। তিনি আমার পিতৃতুল্য ছিলেন। আমরা ভাইবোনেরা বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ধর্মপ্রাণতার প্রভাবে পড়ে গেলাম। বিশেষ করে আমি। আমাদের একটি মন্দির ছিল। আমার দাদু-দিদিমার সমাধি মন্দির। ঐ মন্দিরে কালী ও কৃষ্ণমূর্তি স্থাপিত ছিল। দু'বেলা সেখানে পূজা সন্ধ্যারতি ইত্যাদি হতো। এসব অনুষ্ঠান ঘরে ঘরেই হয়। তা নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় না। আমার ভগ্নীপতির পরিকল্পনা ছিল তিনি ভবিষ্যতে একটি আশ্রম তৈরি করবেন। সেটি হবে ব্রহ্মচারী ও ব্রহ্মচারিণীদের সাধনক্ষেত্র। আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না, উনি আমাকেই বেছে নিলেন ঐ আশ্রমের ভবিষ্যত আশ্রমিকা হিসাবে। সুতরাং আমার চলাফেরা, মানসিক চিন্তাধারা ইত্যাদি সব কিছুরই উপরে উনি কড়া নজর রাখতেন। এমন কি কোন ভাল পাড়ের শাড়ি আমি পরলে তিনি বিলাসিতা মনে করতেন—রঙীন তো দূরের কথা। আত্মীয়স্বজনদের সঙ্গে হাসি-রসিকতা করি তাও তাঁর পছন্দ ছিল না। কারণ তাতে মন বিক্ষিপ্ত হয়। আমি তখন কলেজে পড়ি। এসবের কতটুকুই বা বুঝি! তবুও মনে হতো জগদীশচন্দ্র একটু যেন অন্যরকম। এতটা কড়া নন। দিনের যতটা সময় কলেজে বা বাড়িতে পড়াশুনায় কাটত তা বাদে আর বাকী সময় আমি সাধনা ও ধ্যান-ধারণা নিয়ে কাটাই—এই তিনি চাইতেন। এ সবেও আমার আপত্তি ছিল না, কারণ নিজের মনে ধর্মীয় আকর্ষণ আমার ছিলই। বই কিনে কিনে একটা আলমারী ভর্তি করে তিনি আমায় দিয়েছিলেন। সবই ধর্মগ্রন্থ। রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ থেকে সমস্ত মহাপুরুষদের জীবনী, দর্শনশাস্ত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতি গ্রন্থাবলী তাতে ছিল এবং আমি তা পড়তাম। বুঝি না-বুঝি তবুও পড়তে আমার ভালই লাগত। অশ্বিনীকুমারের 'ভক্তিযোগ' তিনিই আমার হাতে দিয়েছিলেন, এতে আমার জীবনে অনেক লাভ হয়েছে নিশ্চয়ই স্বীকার

করব। কিন্তু অন্য কোন বই আমি পড়তে পেতাম না। কোন গল্প-উপন্যাসের বই, প্রবাসী, ভারতবর্ষ প্রভৃতি মাসিক পত্রিকাও আমার জন্য নিষিদ্ধ পুস্তক ছিল। কোন ভ্রমণ-কাহিনীও আমাদের বাড়িতে আসত না। বি. এ. তে বাংলা ছিল আমার বিশেষ বিষয়। তাতে কিছু কিছু উপন্যাস ও প্রাচীন গীতিকাব্য আমার পাঠ্য ছিল—যা তিনি সম্পূর্ণ অপাঠ্য মনে করতেন। এই কড়া শাসনে মাঝে মাঝে আমি যেন হাঁপিয়ে উঠতাম। আমার ছোড়দির কথা আগেই উল্লেখ করেছি। ইনি তাঁর স্বামী ছিলেন। তাঁদের স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটাকে গুরু-শিষ্যা সম্পর্কও বলা চলত। তবে ছোড়দি আমার মতো এতটা ভয়ে ভয়ে চলতেন না। কলেজের কোন মেয়ে বন্ধুর বাড়ি যাওয়া এবং কোন ছেলের সঙ্গে কথা বলাও আমার বারণ ছিল।

এসব যদি আমার নিজস্ব স্বভাব হতো তো দ্বন্দ্বের কোন কারণ হতো না। কিন্তু বেশী নিষেধের বেড়াটা মাঝে মাঝে আমার আত্মসম্মানে আঘাত দিত। তবু একদিন আমাকে গেরুয়াধারিণী হতে হবে—এ আমি আপত্তি করিনি।

কিন্তু যত বড় হচ্ছি তত আমার মনে দ্বন্দ্ব আসতে লাগল। শেষ পর্যন্ত দুটো ব্যাপার নিয়ে দ্বন্দ্বটা মূর্ত হয়ে উঠল। একদিকে বাইরের রাজনীতির আকর্ষণ ও অপরদিকে ধর্মের এই কড়া শাসন আমার চিন্তাধারাকে অশান্ত করে তুললো। তাছাড়া সংসারী হয়ে কেউ ভগবান লাভ করে না, আমার চেয়ে আমার বাবা-মা ভগবানের থেকে অনেক দূরে—একথা ভাবা আমার গুরুতর অন্যায় মনে হতো।

ওদিকে বিপ্লবী-আন্দোলনের বীর ও বীরঙ্গনাদের আত্মত্যাগ আমাকে ভীষণভাবে বিচলিত করছে। গান্ধীজীর আইন-অমান্য আন্দোলনও আমাকে নাড়া দিচ্ছে। এর মধ্যে মনুষ্যত্বের আহ্বান পাচ্ছি। কিন্তু আমার ভগ্নীপতি ঘোরতর রাজনীতি-বিরোধী।

যাঁর মুখের উপর কোন কথা বলার সাহস আমার ছিল না, যাঁকে আমি গুরুর মতোই শ্রদ্ধা করি, এসব নিয়ে তাঁরই সঙ্গে একদিন বিতর্কে মুখ খুললাম। রাজনীতির প্রশ্নে পরিষ্কার বলে দিলাম—'এ কাজকে আমি পবিত্র বলে মনে করি। দেশের জন্য যাঁরা এভাবে ফাঁসিতে যেতে পারেন তাঁদের আমি শ্রদ্ধা করি। কারণ তাঁরা তো সকলের জন্য নিজেকে দান করে মুক্তপুরুষ হয়ে গেলেন।' গান্ধীজীর আন্দোলনের প্রতিও সমর্থন জানালাম। যিনি নিজে একজন তপস্বী হয়ে দেশের স্বাধীনতার জন্য এভাবে জনসাধারণকে পথ দেখাচ্ছেন, সে পথে কেন আপনার আমার সমর্থন থাকবে না? আমরা কি তবে স্বাধীনতা চাই না?

আমার এই তর্কের জবাবে তিনি কিছুই বলেন নি। আমি আর তাঁর পথের পথিক নই এটা বুঝে নিলেন। খুব দুঃখ হলো যখন দেখলাম তিনি ভয়ানক মুষড়ে পড়েছেন। আমি তাঁকে আমার মতন করে বোঝাতে চেষ্টা করলাম। আমি ধর্মত্যাগী নই। কিন্তু ধর্ম ও রাজনীতিতে কোন বিরোধ আমি দেখি না, আর তাছাড়া সংসারের সব মানুষ সন্ন্যাসী নয় বলেই ভগবানের চোখে নিম্নস্তরের, একথাও আমার মানতে ভাল লাগে না। কিন্তু এ সবের উত্তরে তিনি আর মুখ খুললেন না।

একটা থমথমে অশান্তিতে দিন কাটছিল। মন্দিরেও যাই, উপাসনাতেও বসি, কিন্তু ভাল লাগে না কিছুই।

ওদিকে আমার মায়ের মধ্যে দেখি দেশপ্রেমের পরিষ্কার চেতনা। একদিন মা খেতে বসেছেন। খবরের কাগজ এল দীনেশ গুপ্তর ফাঁসির সংবাদ নিয়ে। দেখলাম মা'র চোখে অবিরল জলের ধারা। খানিকক্ষণ ভাতের থালায় হাত রেখে না খেয়ে উঠে গেলেন। প্রতিদিনের এমন সংবাদে 'আহা, বাছারে' বলে মায়ের কান্না আমার বুকে যেন হাতুড়ি পিটাত। ক্ষুদিরাম ও ভগৎ সিং-এর ফাঁসির সংবাদে মাকে এমনি বিচলিত হতে দেখেছি। চট্টগ্রামের বিপ্লবীদের কয়েকখান ছবি আমি পেয়েছিলাম—যারা সৈন্যদের গুলিতে নিহত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রীতিলতার ছবিও ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে সেই ছবিগুলি আমি দেখতাম ও মনে মনে এই পথে যাবার জন্য প্রবল আকর্ষণ বোধ করতাম।

এই সময়ের অনেক আগে আমার ১৪/১৫ বছর বয়সে গান্ধীজী এলেন বরিশালে। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ও তাঁর পুত্র চিররঞ্জন প্রভৃতি অনেক নেতাদের আসবার কথা। সেটা বোধ হয় ১৯২৩ সন ছিল। কংগ্রেসের একটা অধিবেশন ওখানে হবে। ঐটুকু শহরে এতবড় একটা ব্যাপারে যেন শহরময় তোলপাড় ঘটিয়ে দিল।

আমার বাবা তখন বেঁচে ছিলেন। সবাই তাঁকে বললেন, আপনার বাড়িতে গান্ধীজী ও কস্তুরবার থাকবার ব্যবস্থা করুন। মাতা কস্তুরবারও আসবার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আসেননি। থাকবার ব্যবস্থা করতে মা-বাবা তৎক্ষণাৎ রাজী। তাঁদের থাকবার জন্য কামরা সাজানো হলো। রান্না ঘরের আলাদা ব্যবস্থা হলো। শুনেছিলাম ওঁরা স্বপাক খান। আমাদের বাড়িতেও যেন উৎসবের ঢেউ আছড়ে পড়ল।

তারপর স্বেচ্ছাসেবকরা আবার এসে জানালেন আপনাদের বাড়িতে দেশবন্ধু থাকবেন। গান্ধীজী থাকবেন অশ্বিনীবাবুদের বাড়ি। শেষপর্যন্ত দেশবন্ধুও

বরিশালে এলেন না। পরে জেনেছি, দেশবন্ধু তখন কঠিন রোগে শয্যাশায়ী। হয়তো শহরের লোকেরা উৎসাহের আতিশয্যে দেশবন্ধুর আসবার কথা ভেবেছিলেন। আমাদের গৌরববোধে অনেকখানি আঘাত লাগল বটে। কিন্তু যাঁরা এসেছিলেন তাঁদের যত্ন-অভ্যর্থনা করতে পেরে আমরা খুবই খুশি। বরিশালের ডাব খেয়ে ওঁরা খুব আনন্দ পেয়েছিলেন। এক-একটা ডাবে এত জল আর তা এত মিষ্টি যে ওঁরা তাতে অবাক হয়ে গিয়েছিলেন। উঠোনে ডাবের খোলার পাহাড় জমেছিল। এসব আমার মনে পড়ে।

কংগ্রেসের প্রকাশ্য অধিবেশন হবে একটা স্কুলের বিরাট মাঠে। নানা সাজ-সজ্জায় মঞ্চ তৈরি হলো। গান্ধীজীর ভাষণ হবে সেখানে।

মা ও ছোড়দির সঙ্গে আমিও গেলাম। দেখি মাঠ ছাপিয়ে লোকে লোকারণ্য।

এই সভায় একটা অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। গান্ধীজী এসেই শুনলেন এইটুকু শহরে পতিতা নারীর সংখ্যা প্রায় তিন শত। উনি বললেন, ঐ সভায় বিশেষ-ভাবে তাদেরকে আমন্ত্রণ জানাতে। সেটা করা হলো। তাদের বসবার জন্য আলাদা জায়গা গান্ধীজীর মঞ্চের কাছাকাছি করে দেওয়া হলো।

আমরা গান্ধীজীর ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে। হিন্দী তো কিছুই বুঝি না। অনুবাদকের সাহায্যে যা বুঝলাম তিনি অসহযোগের কথা বললেন। এছাড়া আলাদা করে ঐ পতিতা মেয়েদেরকে কিছু বললেন। তার সারাংশ ছিল 'তোমরা পতিতা নও—নারী, মাতৃজাতি। তোমরা দেশের কাজে আত্মদান করো—আমি তোমাদের জীবিকার দায়িত্ব নেব।' যখন তিনি ডাক দিলেন, 'তোমরা যারা আসবে—আমার কাছে এস'—তখন সত্যিই তাদের মধ্য থেকে পনের-কুড়ি জনের মতো উঠে এল। সেদিন থেকে এই মেয়েরা কংগ্রেসের কর্মী হয়ে গেলেন। পনের-কুড়ি জনই শেষ পর্যন্ত এল কিনা ঠিক মনে নেই। শহরে তখন কংগ্রেসের নেতৃত্বে অনেক চরকা ও খাদির কুটির শিল্পাশ্রম খুলে গেছে। ঐসব আশ্রমে এরা স্থান পেলেন।

এদের একজনের সঙ্গে আমাদের বিশেষভাবে পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল। নাম ছিল সরোজিনী। সবাই সরোজদি বলে ডাকত। সরোজদি স্থান পেলেন জগদীশচন্দ্রের আশ্রমে। পূজাঘরের কাজ করার ভার পেলেন। জগদীশচন্দ্র তাকে লেখাপড়া শেখাতেন। সরোজদির হাতের রান্নাও খেতেন। ঐ আশ্রমে অন্যান্য সেবিকা মেয়েদের সঙ্গে সরোজদিও থাকতেন। ঘটনাটি শহরে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিল।

গান্ধীজীর সভার পর আমাদের বাড়িতে নতুন একটা জিনিস চালু হলো। বাড়িতে একদিন ফেরিওয়ালা খদ্দর বিক্রী করতে এল। আমরা মা-বোনেরা আদর করে সেই শাড়ি কিনলাম। বাড়িতে আমরা আগে মিহি বিলিতি কাপড় পরতাম। মা-বাবা অনেক আগেই বিলিতি ছেড়ে সকলের জন্য বঙ্গলক্ষীর কাপড় বরাদ্দ করে দিয়েছিলেন।

কিন্তু আমার এখনকার অবস্থায় শুধু তো এতে হয় না। কিছু কাজ তো চাই। আমাকেও কিছু একটা করতে হবে এই প্রেরণা কেবলই যেন আমাকে ঠেলতে লাগল। ধীরে ধীরে কংগ্রেসের কর্মকেন্দ্রগুলিতে একটু একটু যাতায়াত করতে লাগলাম ছোড়দির সঙ্গে সঙ্গে। ওদিকে বিপ্লবীরাও আমার মন জুড়ে আছেন। তাঁদের জন্যও তো কিছু করা দরকার। কংগ্রেসের কর্মকেন্দ্র আমাকে বিশেষ আকৃষ্ট করল না।

ইতিমধ্যে স্নেহলতা দাসের স্কুলেই অল্পদিনের জন্য একটা কাজ নিয়েছি। সেখানে একটি টিচারের সঙ্গে এইসব নিয়ে আলাপ হতো। সে আমায় ওদের গোপন বইপত্র দিত। মৃতদের ছবি দেখে ও জীবনকথা পড়ে শিহরিত হতাম। শান্তিসুধা ঘোষের সঙ্গে তখন কেবল আলাপ হচ্ছে। তাঁদের 'যুগান্তর' দলের কর্মী হতে পারি কিনা এসব ভাবছি। আমাদের বাড়িতে ওবাড়ি সম্পর্কে ভয়ের কোন কারণ আছে কেউ জানত না। তাই ওবাড়িতে যাবার অনুমতি আমার ছিল। বিশেষত আমার ভগ্নীপতি শান্তিদির বাবার সঙ্গে ধর্মালাপ করতে প্রায়ই যেতেন। আমি তাঁর সঙ্গেও যেতাম। কিন্তু কি কারণে আমি যেতাম তা তিনি জানতেন না।

একদিন হঠাৎ দেখলাম শান্তিদির বাড়িতে পুলিস এল। তল্লাসী করে কি সব সাংঘাতিক জিনিস নিয়ে গেল এবং শান্তিদিকেও গ্রেপ্তার করল। মনটা খুব দমে গেল। 'যুগান্তর' পার্টিতে আর আমার তবে যাওয়া হলো না। এই তবে আমার রাজনীতির শেষ! খুব দুঃখ হলো।

কিন্তু বেকার থাকতে হলো না। মহারাজ (অমিয় দাশগুপ্ত), অমৃত নাগ আমাদের প্রতিবেশী, আত্মীয় সমান। ছাত্র বয়স থেকেই ওরা আমাদের বাড়িতে সর্বদা আসত। বিশেষ করে অমৃত নাগের বাড়ির সকলেরই আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল। আমিও ওদের বাড়ি যেতাম। অমৃতর দিদি আমার সমবয়সী। দু'জনে খুব ভাব ছিল। ওদের বাড়িতে প্রমথ সেন নামে এক ছাত্রের সঙ্গেও আলাপ হয়। সে মার্কসীয় বইপত্র খুব পড়ে। আমাকেও পড়তে দিত।

ওদের কাছেই কার্ল মার্কস, লেনিন, কমিউনিজম—এই সব অন্য এক রাজ্যের নতুন কথা শুনলাম। আমাকে চার দেওয়ালের বাইরে আনার একটা প্রচণ্ড ঝোঁক ওদের ছিল এবং এই রাজনীতিই ছিল তার সূত্র।

কিন্তু আমি আমার অভিভাবক নই। এমন কি মা-ও নন। আমাকে তখনও আমার বাড়ির ধর্মীয় শাসন মেনে চলতে হতো।

কমিউনিজমে নিরীশ্বরবাদ আছে, ওদের কাছে শুনেছি। এই রাজনীতি গ্রহণ করা আমার পক্ষে যে অসম্ভব। কিন্তু ঐ ছেলেগুলোও নাছোড়বান্দা। মাঝে মাঝে 'গণদাবী' এবং এই ধরনের নিষিদ্ধ পুস্তক আমাকে পড়তে দিত। হঠাৎ একখানা বই, 'এ. বি. সি. অব কমিউনিজম', আমার হাতে এসে গেল। কে দিয়েছিল মনে নেই। বইখানা খুব গোপনে আমি একটু একটু করে পড়লাম। এর মধ্যে যেন আমার ধর্ম ও রাজনীতি দুই-ই খুঁজে পেলাম। নির্যাতিত মানুষের সেবা ও মুক্তির জন্য সংগ্রাম করতে হবে—এ তো ধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও শিক্ষাও তো এই। বই-এর মধ্যে ধর্ম আছে কি নেই, এই চুলচেরা বিচারটা আমি এড়িয়ে চলতাম। তা দিয়ে আমার দরকারই বা কি। যারা ধর্মের নামে মানুষকে শোষণ করে তারা সমাজের শত্রু—এ তো অবশ্যই মানি। কিন্তু তাতে তো ভগবান নেই একথা প্রমাণ হয় না।

বইখানা তিনতলার চিলেকোঠার ঘরে বসে পড়তাম। কয়েকটি ছাত্রী জুটে গেল। তাদেরও পড়াতাম। লুকিয়ে রাখতাম একটা সুপারি রাখা মস্ত পিপের মধ্যে। অন্তত হাত দুই সুপারির নীচে। দিন কয়েক পরে বই বের করতে গিয়ে দেখি সেখানে নেই। বুঝলাম সর্বনাশ হয়ে গেছে। ছোড়দি বা জামাইবাবু নিশ্চয় বই দেখে ফেলেছেন। এরপর কি করে যে রটে গেল আমি কমিউনিস্ট হয়ে গেছি—ভগবান জানেন। এর মানে তো আর কিছু নয়, আসলে আমি ভগবান মানি না। কমিউনিজম মানেই তো ওই। ভয়ে দুরু দুরু বক্ষ। জেরায় পড়লে কাকে কি বলব। বইখানা দু'দিন বাদে আবার যথাস্থানেই পেলাম। এরপর আর বই লুকিয়ে রাখি না। সাহস সঞ্চয় করছি। একদিন স্বয়ং আমার ধর্মপ্রাণা মা-ই জিজ্ঞেস করে বসলেন, 'তুই নাকি কমিউনিস্ট হয়ে গেছিস্? ভগবান মানিস্ না?' বললাম, 'কে তোমায় বললো ধর্ম মানি না?' বললেন 'সবাই-ই তো বলে।' সবাইটা কারা তা বুঝলাম। মাকে বললাম, 'মা, আমি একখানা নতুন ধরনের বই পড়ছি। বইখানা ইংরেজী। তোমায় আমি বাংলা করে শোনাব। শুনে যদি তোমার অমত হয় তো আমি এপথে যাব না। মা রাজী হলেন।

সোৎসাহে মাকে বই পড়ে শোনাচ্ছি। আর কাউকে ভয় পাচ্ছি না। মা যত শোনেন তত বলেন, 'কৈ এর মধ্যে ভগবান না-মানার কথা তো নেই। জীবেই তো ভগবান, জীবসেবাই তো ধর্ম। এই যদি রাজনীতি হয় তো আমার কোন আপত্তি নেই। তুমি একাজ করলে তোমার নিজেরও উন্নতি হবে, আমারও আনন্দ হবে।'

যে ছেলেগুলো আমাকে বাইরে আনবার জন্য পেছনে লেগে থাকত এবার তাদের মস্ত মজা। আমার নামটা নিয়ে ওরা খুব ঠাট্টা করত। কি যন্ত্রণাই পেয়েছি নামখানা নিয়ে।' মন্দিরের বাগানে গাছে যখন জল দিতাম— তখন ওরা বলত, 'শকুন্তলা আলবালে জল সেচন করিতেছেন।' স্কুলে যখন যেতাম তখন রাস্তায় ছেলেরা বলত, 'ঐ যে দুইডা নামের মাইয়াডা যায়।' কলেজে যখন পড়তাম তখন ইংরেজীর প্রফেসর নাম ডেকেই বলতেন, 'মনি-কুন্তলা, শকুন্তলা, কপালকুন্তলা—আহা, কি নামই রেখেছেন!' কলেজে উঠেও আমরা বেড়া দেওয়া ঘরে পড়তাম। প্রফেসরের মঞ্চ থেকে তিনি আমাদের মুখ দেখতে পেতেন। আর ছেলেরা দেখতে পেত শুধু কালো কালো মাথা-গুলো। প্রফেসরের মন্তব্যে ক্লাসসুদ্ধ হো হো চলত। আমি টুপ করে মাথাটা নামিয়ে ফেলতাম। ক্লাস শেষ হলে মাথা নুয়ে নুয়ে আমরা আমাদের লাগোয়া কমনরুমে যেতাম।

খোলা ক্লাসে ছেলেদের সঙ্গে বসা আমাদের নিষিদ্ধ ছিল। অশ্বিনীদাদুর ভ্রাতুষ্পুত্রবধূ সাবিত্রী মামীমাই এ কলেজে ছাত্রী হিসাবে প্রথম প্রবেশ করেছিলেন। কিন্তু প্রথম আসার জন্য তাঁর কপালে আরও দুঃখ জুটেছিল। ঘোড়ার গাড়িতে দুটি দরজা বন্ধ করে আসতেন। ঠিক ক্লাসের দুয়ারে গাড়ি থামত। উনি একগলা ঘোমটা দিয়ে গাড়ি থেকে নেমেই টুক করে ক্লাস-ঘরের পিছনের দিকে লাগোয়া ছোট একটি রুমে ঢুকে পড়তেন। ঢুকলেই দরজাটি বন্ধ হয়ে যেত। তাকে সাহায্য করার জন্য সঙ্গে একটি পরিচারিকা থাকত। তাঁর বসবার জায়গার সামনেই ছিল আগাগোড়া কাঠের পার্টিশন এবং কাঠের উপরে মোটা কাঁচের বেড়া। এর মধ্য দিয়ে কেউ কাউকে দেখতে পেত না। প্রফেসরকে যাতে উনি দেখতে পান সেজন্য তাঁর চোখের সামনে কাঁচের মধ্যে একটি বড় গোল ফুটো করা হয়েছিল। নাম-ডাকার সময়ে হাতের চুড়ির শব্দ শুনে প্রফেসর তাঁর উপস্থিতি বুঝতেন। অশ্বিনীকুমারের ঘরের বৌ পড়তে যাবেন অশ্বিনীকুমারেরই পিতার নামে স্থাপিত ব্রজমোহন কলেজে। তাতেই যদি তাঁর এই দুর্দশা তবে আমাদের কথা তো বাদই দেওয়া যায়। প্রগতিশীল

শিক্ষিত একটি শহরে মেয়েদের কী পরিমাণ পর্দা মেনে চলতে হতো এখন ভাবলেও অবাক লাগে। যখন ছোট ছিলাম তখনকার কথা মনে পড়ে, মা হয়তো সামনের বা পাশের বাড়ি যাবেন। আমরা কেউ আগে রাস্তায় দাঁড়াতাম। দুদিকে যখন কেউ থাকত না তখন ইশারা করতাম। মা একগলা ঘোমটা মাথায় এক দৌড়ে রাস্তাটা পার হতেন। শুনেছি, আমার দিদিমা এই বিশ গজ পথটুকু পার হতেন ঢাকা দেওয়া পাল্‌কি চড়ে। আর আমরা পার্টিশন-ঘেরা ক্লাসে পড়ছি—এ আর একটা বেশী কথা কি? তবু তো কলেজে পড়ছি।

একবার শুনলাম স্নীতি চট্টোপাধ্যায় নামে একজন কে আসবেন আমাদের কলেজ দেখতে। পাড়াগাঁয়ের মেয়ে আমি, বাইরের জ্ঞানগম্যি যদি এতটুকুও থাকে! আমার খুব ফুর্তি হলো—একজন 'মহিলা' আসছেন, তাঁকে সব বলা যাবে। ক্লাসে যখন তিনি এলেন, দেখি ইয়া লম্বাচওড়া এক ভদ্রলোক। পরে আমার কল্পনার কথা শুনে অন্য মেয়েরা হেসেই খুন।

বেঁচে গেলাম—তাঁকে আমাদের আর কিছু বলতে হলো না। ধীরে ধীরে তিনি আমাদের পার্টিশনের দিকে এগোলেন। জিজ্ঞেস করলেন, 'এটা কি?' প্রিন্সিপ্যাল মাথা চুলকে বললেন, 'এখানে মেয়েরা বসে।' শুনে ভীষণ চটে গেলেন। বললেন, 'এখুনি এটা সরিয়ে ফেলুন।'

আমরা খুব খুশি। কিন্তু দেখলাম ওটা আমাদের বছরে আর ঘুচল না। বছর দুই পরে মেয়েরা এই স্বাধীনতার অধিকারী হলেন।

এসব কথা এখন মনে হলে ভাবি এ যুগের মেয়েদের বোধহয় এত দ্বিধাদ্বন্দ্ব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয় না। তাছাড়া আজকের মেয়েরা যে স্বাধীনতা ভোগ করেন তা পাকা ফলটির মতন টুক করে তাদের হাতে আসেনি, এটাও তাদের জানা দরকার। পূর্বসূরীদের লাঞ্ছনাটা মনে রাখলে ভালই।

এবার আমার নামের কথাটা শেষ করি। এই নামের জন্য মায়ের উপর ভীষণ চটে যেতাম। এমন একটা বিতিকিচ্ছিরি নাম না দিলে কি চলত না? মা বলতেন, 'ওরে এটা ভাল নাম।'

আমার মা ইংরেজী না জানলেও উচ্চশিক্ষিতা ছিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র, মধুসূদন—এঁদের কাব্যগ্রন্থ মায়ের কণ্ঠস্থ ছিল। মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা কাব্য আমি মায়ের কাছে পড়তে শিখেছি। বাবার সাহায্য নিয়ে উপনিষদ-বেদান্তও মায়ের অজানা ছিল না। নামের ব্যাপারে এমন বিদুষী মায়ের কথাও তো ফেলতে পারি না।

এই নামের জ্বালা ঘুচল আমার কলকাতা এসে। বন্ধু অমিতা সেন

অনেকদিন আগেই গত হয়েছেন। তার সঙ্গে গিয়েছিলাম জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রদর্শনে। জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নামটি কি? ভয়ে ভয়ে বললাম। শুনে কিন্তু কবি বললেন, 'বা:, বেশ নামটি তো! কে দিয়েছে এই নাম?' এইবার গর্বের সঙ্গে বললাম, 'আমার মা।'

রাজনীতিক্ষেত্রে আর এক কবি—সরোজিনী নাইডুও আমার নামের খুব তারিফ করেছিলেন। সেই থেকে আমি নির্ভয়। আমার মায়ের দেওয়া নামটা তাহলে খারাপ নয়।

কি বলতে গিয়ে কোথায় চলে এসেছি। খারাপ কাজ করিনি। পরবর্তীকালে যে বরিশালের মেয়েরা শিক্ষায়, স্বাধীনতায়, স্বদেশী আন্দোলনে অগ্রণী হয়ে উঠল তাদের পূর্ববর্তিনীদের হাস্যকর সামাজিক অবস্থাটা একটু তুলে ধরা গেল।

আগের কথায় আবার ফিরে আসি। মায়ের অনুমতি পাবার পর আমি একলাই রাস্তায় বেরোই। ছেলেদের সঙ্গে বই আদান-প্রদান করি। আমার ছাত্রীদের ক্লাসটির উন্নতির কথা ওদের কাছে বলি। আর রাত্রিবেলা মা'র কাছে শুয়ে শুয়ে সারাদিন কি হলো গল্প করি। কিন্তু বরিশালে তখন কমিউনিস্ট পার্টি কোথায়? শুধু জানি পার্টি কলকাতায়।

ওদিকে আমি যখন এইসব বই নিয়ে ব্যস্ত তখন পুলিসের কানে গিয়ে পৌঁছালো আমি শান্তিসুধার চেলা। মফঃস্বলের পুলিসেরা শামুক গতিতে চলে। আমাদের ভালই। আমি যখন কমিউনিজমে বিশ্বাসী, ওরা তখন একদিন আমায় ধরে নিয়ে গেল সন্ত্রাসবাদী বলে। আমার মাকে এতটুকু বিচলিত হতে দেখলাম না। পুলিস আমাকে শুধু শুধুই হয়রানি করল। টেবিলের উপর থেকে একটা পেতলের ভারী ভাঙ্গা টুকরো তুলে আমাকে জিজ্ঞেস করল, 'এটা কি বলতে পারেন?' অনুমান করলাম বোমার কিছু হবে-টবে। নীরস মুখে জবাব দিলাম, 'পেপার ওয়েট বলে তো মনে হচ্ছে।' হাতে তুলে নাচাতে নাচাতে বললে, 'জানেন, এটা আপনাদের শান্তিদির বাড়ির উঠোন থেকে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গেছে? শান্তিদির সঙ্গে এত কিসের ভাব? এত যাতায়াত কেন?' বললাম, 'আমাদের বাড়ির সবাই তো ওদের বাড়ি যায়। তাছাড়া উনি ঈশান-স্কলার, তাঁর বাড়ি যাব না? আমি যাই অঙ্ক শিখতে।' ৫/৬ ঘণ্টা ধরে এইরকম আবোল তাবোল বকিয়ে আমাকে ছেড়ে দিল। কিন্তু শান্তিদির ব্যাপারে আমি নিজেই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম। বিপ্লবী মেয়েরা এসব তাহলে করতে পারে? শান্তিদির মতন অমন শান্ত মিষ্টি মেয়েও! আমার শ্রদ্ধা বেড়ে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখলাম মা খুব শান্ত। একটুও বিরক্ত হননি বা ভয় পাননি। কিন্তু আমার আত্মীয়মহলে গোরগোল উঠল। আমাকে দেখতে এলেন পাড়ার মহিলারা ও আত্মীয়ারা। আমি পালিয়ে গেলাম। তাদের মতে এটা খুব নিন্দনীয় ব্যাপার। বয়স্কা মেয়েকে পুলিসে ধরে নিয়ে যাওয়া! মা একলাই সকলের সঙ্গে কথা বললেন। সবাই যেন চুপ করে গেলেন—আর কথা বাড়ালেন না।

এই অবস্থায় আমি না-এদিক না-ওদিক। বই পড়ে আর কতদিন চলে, কিছু একটা করা তো চাই! অথচ আমার ধর্মজীবনের পরিকল্পনাই বা ছাড়ি কি করে? তাছাড়া জামাইবাবুর দীর্ঘশ্বাস আমাকে নাড়া দেয়। রাত্রে ঘুমোতে পারতাম না। উঠে বারান্দায় পায়চারি করতাম। মা লক্ষ্য করতেন। একদিন উঠে এসে আমাকে পাশে বসালেন। বললেন, 'আমি তোর মা, তোর এত কষ্ট কিসের আমাকে তা বল্।' আমার উভয় সংকটের কথা বললাম। মা বললেন, 'তুই কলকাতা চলে যা। ওখানে বোর্ডিং-এ থেকে এম. এ. পড়বি। এখানে থাকলে তুই বাঁচবি না।' আমি বললাম, 'সে-যে অনেক টাকার ব্যাপার।' মা বললেন, 'আমি যেমন করে পারি পড়াব—এ তোর বাবার নির্দেশ।'

মায়ের সস্নেহ আশ্রয় পেয়ে আমি যেন বেঁচে গেলাম। মনটা হাল্কা হয়ে গেল। অবশ্য ভয়ও পেলাম। পাড়াগাঁয়ের মেয়ের কাছে কলকাতা কি জানি কেমন হবে! তবে এখনকার ডাঃ ফুলরেণু গুহ, তখনকার 'ডলি', আমার খুব বন্ধু ছিল। আমাদের দুটো বাড়ি ছিল মুখোমুখি। ডেকে ডেকে আমরা কথা বলতাম। ও আগেই চলে গেছে কলকাতায়। চিঠি পেতাম। কিন্তু ও থাকত ওর মামাবাড়ি। আমি থাকব কোথায়? দাদাও কলকাতা থেকে ওকালতি পড়ছিল। কলকাতার কিছু বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টায় একটা বোর্ডিং ঠিক হলো। এবার যাওয়া।

কলকাতায় পার্টির সঙ্গে যোগাযোগ

বরিশালবাসীর কলকাতা আগমন সম্পর্কে একটা গল্প প্রচলিত আছে। মামা নতুন আসবেন কলকাতায়, সঙ্গে ভাগ্নে। মামা বললেন, 'আরে লণ্ঠনডা লইয়া চল্।' ভাগ্নে বললো, 'কইলকাতায় লণ্ঠন লাগবে না মামা।' মামা অপ্রসন্ন মনে অভিজ্ঞ ভাগ্নের কথা মেনে নেন। শেয়ালদা স্টেশনে সন্ধ্যার পরে পৌঁছে মামা একেবারে হাঁ। 'আরে এ দেহি ইন্দিরপুরী, অ্যাত বাতি পাইছে কই ?'

আমার অবস্থা ঠিক মামার মতো নয়। আগে একবার কলকাতা দেখে গেছি। বরিশালে রেলপথ নেই। খুলনা পর্যন্ত স্টীমার আসে। সেই বৃহদাকার গারো ফ্লোরিকান স্টীমারগুলি আমার এখনও চোখে ভাসে। ফ্লোরিকান স্টীমারটাই সেদিন ঘাটে ছিল। ওকেই সবাই পছন্দ করত। দেখতে ভারি সুন্দর।

সবাইকে প্রণাম করে স্টীমার ঘাটে চললাম। সঙ্গে উঠিয়ে দিতে কে এসেছিল এখন মনে নেই। তবে কেউ একজন ছিল, কলকাতাতেই যাবে। আসার সময় সকলেরই চোখে জল। মা চোখের জল মুছছেন আর এটা-ওটা গুছিয়ে দিচ্ছেন। জামাইবাবু কেবল ঘর-বার করছেন, অত্যন্ত গম্ভীর। তাঁর দুঃখ আমি বুঝি। আসার আগের দিন ঘুমিয়ে পড়েছি একটু। হঠাৎ ছোড়দি জামাইবাবুর কথায় ঘুম ভেঙ্গে গেল। জামাইবাবুকে ছোড়দি-সান্ত্বনা দিচ্ছেন, 'তুমি এত কষ্ট পাচ্ছ কেন, আজকাল কত মেয়েই তো কলকাতা পড়তে যায়।' তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে উত্তর দিলেন, 'আমি যে জানি ও আর ফিরে আসবে না। সব চেয়ে আমার দুঃখ ও যে ধর্মবিশ্বাসই হারিয়ে ফেলেছে।'

স্টীমারে উঠে কথাগুলি এত মনে হতে লাগল যে বুকের মধ্যে তা যেন কাঁটা হয়ে রইল। মায়ের জন্য খুব কষ্ট হলো। মাকে ছেড়ে কোনদিন থাকিনি। এমন কি স্কুল ছেড়ে কলেজে গিয়েও দিনের ঐটুকু সময় মাকে না দেখে থাকতে কষ্ট হতো। এখন তো কতদিন ছেড়ে থাকতে হবে।

ওদিকে পরিচিত যাত্রীরা খুব খাওয়ার আয়োজন করছে। একদল খেতে যাবে তাঁর একদল জায়গা ও মাল পাহারা দেবে। বরিশাল, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি পূর্ববঙ্গীয়রা একটি বিষয়ে একমত। স্টীমারের মুসলমান বাবুর্চিদের হাতের মুরগীর ঝোল যে না খেয়েছে তার জীবনই বৃথা। আমি তো জীবনে এই প্রথম মুরগী খাচ্ছি। এটি আমাদের বাড়িতে নিষিদ্ধ ছিল। খেয়ে খুব ভালই লেগেছিল—এখনও মনে পড়ে।

কলকাতা পৌঁছে এক আত্মীয়-বাড়িতে উঠলাম। কয়েকদিন ওখানে থাকার পর আমহার্স্ট স্ট্রীটে একটা মেয়েদের বোর্ডিং-এ এলাম। ইউনিভার্সিটিতে দর্শনশাস্ত্র নিয়ে ভর্তি হলাম। ঐ বোর্ডিং থেকে সোজা হ্যারিসন রোডের মোড়েই আমার দাদা থাকত মেসের একখানা একতলা ঘরে। ও তখন বি. এল. পড়ত। প্রথম প্রথম দাদা রোজ আমাকে বোর্ডিং থেকে নিয়ে এসে ইউনিভার্সিটিতে পৌঁছে দিত। পরে অবশ্য ঐ সোজা রাস্তাটা হেঁটে এসে রাস্তার পাশে দাদার ঘর থেকে তাকে ডেকে নিতাম। ও আমাকে ক্লাস পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে আসত। কোন্‌টা ক্লাসঘর সেটা চিনতেই আমার কয়েক মাস লেগে গিয়েছিল। বাসে উঠতে পারতাম না, উঠলে কোথায় নামতে হবে ঠিক করতে অনেক দিন লেগে গেল। বছরখানেক হেঁটেই যাতায়াত করলাম। পরে অবশ্য বোর্ডিং বদলে যখন কলেজ রোতে ইউনিভার্সিটি হোস্টেলে এলাম—তখন একলা যেতে আসতে শিখলাম। বাঙাল তো অনেকেই ছিল কিন্তু আমি ছিলাম একেবারে তস্য বাঙাল।

বোর্ডিং-জীবন এই আমার প্রথম। আমহার্স্ট স্ট্রীটেও মধ্যবিত্ত পূর্ববঙ্গীয় মেয়েরাই থাকত। কলেজ রোতেও তাই। বোর্ডিং দেখে বুঝলাম, বাঙালরাই উচ্চশিক্ষায় বেশী আসছে। ক্লাসে গেলে কিছু কিছু কলকাতার মেয়ে দেখা যেত।

আমহার্স্ট স্ট্রীটে বেলা হালদারের বোর্ডিং একটু অন্যরকম। স্কুলে পড়া মেয়ে থেকে ইউনিভার্সিটিতে পড়া মেয়েরা থাকত। বেলা হালদারের ছোট মেয়েটিকে আমার বেশ ভাল লাগত। নাম শীলা হালদার। পরবর্তী জীবনে সিনেমায় নেমেছিল। নাম হতে না হতেই আত্মহত্যা করে। এই শীলা আমার কাছে পড়তে আসত।

শীলার ডাক নাম ছিল ছোট। একবার ছোট যেন কোথায় নজরুলের 'জাগো নারী' গানটা গেয়ে নাচবে। ও সাহায্য নিতে এল আমার কাছে। নাচ শিখতে অবশ্যই নয়—কবিতাটার অর্থ বুঝতে। আমার কাছে শুনতে শুনতে ওর চোখে-মুখে ভাব এসে যেত। দেখতে ও সুন্দরী ছিল। নাচের মতন ফিগারও ছিল। কোন জায়গায় মুখ, কপাল, চোখ, হাত ও দেহের ভঙ্গিমা কেমন হবে আমি এগুলো বলে দিতাম আর ও নিজেই নাচত। সত্যিই শেষ অবধি নাচটা ভাল হয়েছিল। গানের ভাবটা সুন্দর ফুটেছিল।

ওখানে অন্যান্য সব মেয়েরাই ছিল বয়সে আমার চেয়ে ছোট। সবাই প্রায় বরিশাল ও ফরিদপুরের মেয়ে। কাজেই ওখানে আমার মন্দ লাগত না।

ইউনিভার্সিটি বোর্ডিং-এ এসে দেখেছি কেউ কেউ বেশ বড় ঘরের। আবার কেউ বা টিউশনি করে পড়ছে। এদের সকলের সঙ্গেই আমার বেশ ভাব ছিল। আমাকে

আধুনিকা করার জন্য নতুন করে শাড়ি পরাতে ও ক্রীম-পাউডার ব্যবহার করাতে কয়েকজন উঠে পড়ে লেগেছিল। মেয়েদের মধ্যে আমার খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন ছিল অমিতা সেন (খুকু)। সে আর নেই। সবাই জানে অমিতা রবীন্দ্র-সঙ্গীতে সুগায়িকা ছিল। জ্যোৎস্নারাতে ছাদের উপরে বসে ও আমাদের গান শোনাত। আমরা মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনতাম। আজও রেকর্ডে ওর গান বাজলে মনটা যেন কেমন করে উঠে।

মা এসেছিলেন আমি কেমন আছি তাই দেখতে। খুকুর গান শুনে মা ওর প্রতি খুবই আকৃষ্ট হয়েছিলেন। বোর্ডিং-জীবন মা'র পছন্দ হলো এবং আমার জন্য নিশ্চিন্ত হলেন।

বোর্ডিং-এ থেকে কলকাতার পুরনো আমলের মানুষদেরও দেখবার সুযোগ হয়েছিল আমার। খাস সাবেকি বাসিন্দারা কয়েক ঘর ছিলেন আমাদের ঠিক সামনের গলির ওপারের চারতলা বাড়িটায়। বিকেল বেলা আমরা ও-বাড়ির নানা ফ্ল্যাটের মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করতাম। আমাদের বিয়ে হয়নি শুনে তাঁরা 'ওমা' বলে গালে হাত দিয়ে খুব হাসাহাসি করতেন। এঁরা কিন্তু গরীব নয়। বেশ বড়লোক। বিকেলবেলা খুব সেজেগুজে থাকতেন। হাতে, গলায় আর কানে বেশ মোটা মোটা গয়না। দেখতেও বেশ ভারি ছিলেন মহিলারা। সিঁথিতে ও কপালে সিঁদুর। বিকেলটায় তাঁরা বেশ সুন্দরী ও সুবেশ। কিন্তু এঁরা অন্যরূপে দেখা দিতেন সকালে। বাবুরা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেই মহিলারা প্রায় অর্ধউলঙ্গ। পরনে একখানা গামছা, কোমর থেকে গোঁজা আর একখানা গামছা বুকের ওপর। স্নান সেরেই এই বেশ। এর পরেই রান্নাবান্না। উলঙ্গ ছেলেপিলেরা খেয়ে উঠে স্নান করত। ঐ গামছা পরেই তাঁরা দুপুরে খেতেন। কিন্তু খাবারের পাত্র এমন অদ্ভুত আর কোথাও দেখিনি। রান্নাঘরের মেঝেটি বেশ ঝকঝকে করে ধোওয়া-মোছা। তারই উপর একরাশ ভাত এবং ভাতের উপরিভাগে থাকত তরকারি সাজানো। ঝকঝকে থালা বাসনগুলো সাজানো রয়েছে, দেখতে পেতাম। কিন্তু তাতে না খেয়ে মেঝেতে কেন খেত, আমরা বুঝেই পেতাম না।

বিকেলে গা ধোওয়ার পর্ব সেরে সাজগোজ হতো। অনেকে আবার ভেলভেট পাড়ের মিহি শাড়িখানা সেমিজ ছাড়াই পরতেন। গায়েও ব্লাউজ নেই। সেমিজ ছাড়া শাড়ি পরতে তো আমার মাকেও দেখেছি। কিন্তু মা শাড়িখানা পরতেন দোফেরতা দিয়ে আর চাবি ঝোলানো আঁচলখানা এমনভাবে গায়ে জড়ানো থাকত যে আদুল গা দেখাই যেত না। কিন্তু এ যেন অন্যরকম। আমার ভাল লাগত না। সেজেগুজে প্রতীক্ষা করলে কি হবে, বাবুরা ফিরতেন সেই রাত দু'টোয়। কড়া

নাড়ার শব্দ পেয়ে আমাদের ঘুম ভেঙ্গে যেত। কিন্তু দরজা খোলার যেন গরজ নেই। অনেক বাদে জিজ্ঞাসা করা হতো, 'কে'? জবাব শুনতাম, 'তোমার গোলাম, হরিবাবু, লোকে বলে হরে।' এরপর ঘটাং করে দরজা খুলত এবং বন্ধ হবার শব্দ পেতাম।

খুব বিশ্রী লাগত। এ কেমন কলকাতা? বরিশালে তো এরকম দেখিনি। এসব সুশ্রী শাড়ি-পরা বৌ, আর এমন বিশ্রী মদ-খাওয়া স্বামী, ভাবতেও কেমন লাগে। অবশ্য এটা কলকাতার একটা সামান্য চিত্র মাত্র। তখনো বলা যায় কলকাতায় আমি প্রবেশ করিনি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির পাদপীঠ কলকাতা থেকে আমি তখন অনেক দূরে। কলকাতার আরও একটা চিত্র আমার খুব খারাপ লাগত। বরিশালে এসব দেখিনি। এখানকার কিছু কিছু লোকদের খুব অসভ্য মনে হতো। আমাদের সব মেয়েদেরই অভিজ্ঞতা ছিল—রাস্তায় হাঁটলেই কানের পাশ দিয়ে যুবা-প্রৌঢ় নির্বিশেষে লোকগুলো যেন কি সব অসভ্য কথা বিড়বিড় করে বলে যেত। কিছু তার কানে আসত। আবার ঘাড় ফেরালেই লোকগুলো হন্ হন্ করে চলে যেত। আমরা এর নাম দিয়েছিলাম 'বিড়বিড় সমস্যা'।

একদিন ইউনিভার্সিটি থেকে বেরিয়ে কলেজ স্কোয়ারের ভেতর দিয়ে আসছি। হোস্টেলে ফিরছি। বেলা তখন দুপুর। স্কোয়ারটা প্রায় জনশূন্য। হঠাৎ একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ইউনিভার্সিটিতে পড়েন বুঝি?' বললাম, 'হ্যাঁ'। তারপর কি বিষয়, কেমন লাগছে, কে কে পড়ান ইত্যাদি আলাপ করতে করতে আমার সঙ্গে সঙ্গে চলছেন। আমি বরিশালের মেয়ে শুনে খুব খুশি। ওখানে কলেজের একজন প্রফেসর নাকি তাঁর ভাই। আমি গোপালবাবুর ছাত্রী শুনে ভদ্রলোক আমার মাথায় পিঠে হাত বুলোচ্ছেন। আমি খানিকটা সম্মান দেখানোর জন্যই প্রণাম করতে যাচ্ছি, আর উনি শক্ত করে আমার হাতখানা ধরে ফেলেছেন—আর ছাড়েন না। ভাবলাম আমার হাতের বালাটা নিতে চাইছে বোধহয়। ওমা, শেষে দেখি আমাকে সুদ্ধই হাত ধরে টানছে। ব্যাপারটা পরিষ্কার হতেই এক ঝটকায় হাত ছাড়িয়ে মুহূর্তে পায়ের চটি খুলে দাঁড়িয়েছি। নির্লজ্জ লোকটা তখনও বলছে, 'এত চটছেন কেন? এ তো আকছারই হচ্ছে।' তারপর দ্রুত পালিয়ে গেল। এমন হালচালে একলা হলে আমাদের খুব সাবধানেই চলতে হতো।

এরও অনেক পরে যখন আমি ডোভার লেনে থাকি এবং স্কুলে পড়াই তখন একবার রাত দশটা নাগাদ ২নং বাসে ফিরছি। বাসটা প্রায় খালি। দেখি একটা গাড়ি বাসটার পাশে পাশে চলছে। থামলে থামছে—চললে চলছে। রমণী চ্যাটার্জী স্ট্রীটে নামলাম। রাস্তাটা তখন নির্জন হয়ে গেছে। কিন্তু আমি চলছি,

গাড়িটাও চলছে আমার পাশে পাশে। একটু ভয় হলো। দূরত্ব রেখে জোরে জোরে হাঁটছি। হঠাৎ গাড়ি খুলে লোকটা বেরিয়ে বললো, 'এ পাড়ায় থাকেন বুঝি? উঠুন না একটু লেকে বেড়িয়ে আসি।' আমি প্রস্তুতই ছিলাম। চট্ করে জুতো তুললাম। লোকটা কুকুরের মতন ভয়ে ভয়ে গাড়িতে উঠে চলে গেল।

আমার বরিশালকে মনে পড়ত, ওখানকার লোকেরা তো এরকম করে না। কিন্তু কলকাতা এমন কেন?

এরও পরে, তখন থাকি ফার্ন রোডে। সেখানে এক ভদ্রমহিলা থাকতেন, আমার চেয়ে অল্প ছোট। একটা ছেলে তাকে সব সময় রাস্তায় 'ফলো' করত। মহিলাটি আমাদের বললেন সে-কথা। আমরা তখন ফন্দী করে ওকে বাড়িতে আনালাম। মহিলাটিই ওকে আসতে বলেছিল। আর যায় কোথায়! জন দুই ছেলে তৈরি রেখেছিলাম। তাদের জেরায় ছেলেটার তখন যাই-যাই দশা। পকেটে একখানা ট্রামের মান্থলি পাওয়া গেল। সেটার নাম-ঠিকানা, নম্বর প্রভৃতি টুকে রাখা হলো। বলা হলো আর কোনদিন এ পাড়ায় দেখলে তাকে পুলিসে দেওয়া হবে। আমি বললাম—'যার পেছনে ঘুরছিলে তাঁর মুখের দিকে তাকাও তো! দেখ তো উনি তোমার মায়ের বয়সী কিনা!' ছেলেটা বার বার প্রণাম করল আর বললো, 'আমায় ক্ষমা করুন, জীবনে এমন কাজ আর করব না।' তারপর রেহাই পেল।

খুব ভাবতাম এখানকার লোকগুলো কেন এমন হয়। সবাই নিশ্চয়ই নয়। কিন্তু একটা অংশ তো! মনে হতো এরা মেয়েদের রাস্তায় একলা চলাফেরা নতুন দেখছে। বরিশালেও তো আমরাই রাস্তায় চলাফেরা করেছি নতুন, কিন্তু এমন তো দেখিনি। দেখব কি করে? একে তো প্রায়ই চেনামুখ, তার উপর সেখানকার আবহাওয়াটাই যে অন্যরকম। তবে সে যুগে স্কুলে উপরের ক্লাসে ওঠার পরই আমাদেরও রাস্তায় হাঁটা বন্ধ হয়ে যেত। স্কুলটা বাড়ির কাছে হলেও হেঁটে যাবার উপায় নেই। ঘোড়ার গাড়িতে যাওয়া-আসা। যেদিন শেষ ব্যাচে যেতাম সেদিন বাড়ি পৌঁছাতে প্রায় রাত হয়ে যেত। গিয়ে দেখতাম, মা-বাবা দুশ্চিন্তায় পায়চারি করছেন। অথচ আধমাইল দূরে স্কুলে কেউ আনতে গেলেই হেঁটে আসা যেত। কিন্তু সেটা নিয়মবিরুদ্ধ। বরং কলকাতা এসেই দেখলাম, রাস্তায় ট্রামে-বাসে মেয়েরা দিব্যি একলাই চলে। অবশ্য তখনও সংখ্যায় কম বলেই আমরা কিছুটা অসুবিধায় পড়তাম। ভাবি, সে যুগ আর এ যুগ—কতই তফাৎ! দু-একটা অভদ্র লোক রাস্তায় বিরক্ত করলেই তখন গায়ে জ্বালা ধরত। কিন্তু আমাদের চোখের উপরেই তো ঘটনাগুলো ঘটতে দেখলাম। ১৯৪৩-এর পর পেটের দায়ে গৃহস্থ ঘরের মেয়েরাই রাস্তায় কেনাবেচা হতে লাগল। এসব কথায় পরে আসব।

এদিকে কলকাতায় আমার যখন একবছর হয়ে গেছে, তখন মহারাজ (আময় দাশগুপ্ত), প্রমথ সেন, অমৃত নাগ প্রভৃতি বরিশালের ছেলেরা কলকাতায় এসে গেছে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশুনা করতে। ওদের সঙ্গে দেখা হবার পর আবার নতুন করে মার্কসীয় বই-পত্র পড়া শুরু হলো। তখন আমাদের চেষ্টা হলো কমিউনিস্ট পার্টিকে খুঁজে বের করা। এ ব্যাপারে বরিশালেও যোগাযোগের চেষ্টা হচ্ছে। পার্টি তখন আণ্ডারগ্রাউণ্ড। পরে শুনেছি, এখান থেকেই পার্টি-নেতা বরিশাল গিয়ে যোগাযোগ করেন। কিন্তু তখনও আমরা সেটা জানতাম না। আমরা যে ক'জন খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম—সেই গল্পটাই বলি। ছেলেদের মধ্যে একজন এসে বললে—'পাওয়া গেছে, জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে নেতা থাকেন। নাম সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।' একদিন গিয়ে কথাবার্তা হলো। ঠিক হলো ফের একদিন যাব। সেদিন আমি সৌম্যেনবাবুকে সোজা জিজ্ঞেস করলাম—'আমার কাজটা কি হবে—তা তো বলেননি ?' উনি বললেন, 'আপনি টাকাকড়ি তুলবেন পার্টির জন্য—এই আর কি !' কথাটা আমার পছন্দ হলো না। ভাবনাও হলো। থাকি বোর্ডিং-এ। কলেজ আর বোর্ডিং ছাড়া যাতায়াত নেই কোথাও। কলেজের মেয়েদের সঙ্গেও বেশী কথা বলতাম না, ভাব হয়নি তেমন কিছু।

আমরা সৌম্যেন ঠাকুরের পার্টিতেই যোগ দিলাম। কিন্তু আমার মনে আবার সেই ভগবান ও কমিউনিজমের দ্বন্দ্বটা ঠেলে উঠল। আমাদের একজন মার্কসপন্থী বান্ধবী হোস্টেলে এলেন মার্কসীয় পুস্তক একত্র হয়ে পড়তে। উনি প্রস্তাব করলেন, 'নিরীশ্বরবাদ থেকেই শুরু করা হোক।' একটা ধাক্কা খেলাম। আবার সেই ! আমি দর্শনশাস্ত্র নিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম। পরীক্ষাটা অবশ্য শেষ পর্যন্ত দর্শনশাস্ত্রে দিইনি। বাংলাতে দিয়েছিলাম। দর্শনশাস্ত্র পড়তে আমার খুব ভাল লাগত। ডাঃ মহেন্দ্র সরকার আমাদের থিওলজির ক্লাস নিতেন। পড়াতে পড়াতে ওঁর মুখখানা লাল টকটকে হয়ে উঠত। প্রৌঢ় ভদ্রলোক। দেখে মনে হতো উনি কিছু অনুভব করছেন। মুগ্ধচিত্তে ওঁর পড়ানো আমি শুনতাম।

কিন্তু মনের দ্বন্দ্ব তো কাটে না। শ্যাম রাখি কি কুল রাখি অবস্থা। মহারাজের মনেও এই রকম দ্বন্দ্ব। ও কয়েকদিন মহেন্দ্র সরকারের পড়ানো শুনল। ওরও খুব ভাল লাগল। দু'জনে পরামর্শ করলাম—মহেন্দ্রবাবুর কাছেই যাব। তাঁকেই জিজ্ঞাসা করা যাক। শেষ পর্যন্ত আমি আর যাইনি, মহারাজ একলাই গেল। 'ভগবান আছেন কিনা', 'দেখা পাওয়া যায় কিনা'—এই সব প্রশ্ন শুনে ভদ্রলোক হেসে বললেন—'আগে বড় হও তখন নিজেই বুঝবে।' এ কোন্ হেঁয়ালি, এ যে আর এক জগদীশচন্দ্র। এখনও যদি দাঁত ওঠেনি—তবে উঠবে আর কবে ?

হোস্টেলে বসে সেদিনের সেই মার্কসিজ্‌ম পড়ার ক্লাসে এতো রাগ হয়েছিল। ভগবানের সঙ্গে কেন কমিউনিজ্‌ম্‌-এর এই ঝগড়া? প্রচারের এই উল্টো পদ্ধতির কথা ভাবলে এখনও আমার রাগ যায় না কেন? কমিউনিজমের অর্থনীতি, শ্রমিকের নেতৃত্বে নতুন সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা, প্রত্যেক মানুষের প্রতি রাষ্ট্রের ন্যায়বিচার, যত্ন, অধিকার ও মর্যাদা দান, নারীশক্তির মুক্তি, শিশুকল্যাণের প্রতি সরকারের আন্তরিক দরদ—এসব দিয়ে মানুষকে কি কমিউনিজম বোঝানো যায় না? খুব যায়। আমার কমিউনিস্ট জীবনভোর আমি তো তাই করেছি। এবং পরেও কি দেখিনি কালিঘাটের পাণ্ডারাও পার্টির সদস্য পদ পেয়েছে, পাণ্ডাগিরি বজায় রেখেই। প্রচারের প্রথম পর্বেই যদি আমরা গৃহস্থ পরিবারকে তাঁর ঠাকুরের আসনটিকে বিসর্জন দিতে বলি তবে তার অন্তরের সবচেয়ে স্পর্শকাতর স্থানটিতে আঘাত দিয়ে প্রথমেই তো তাকে যোজন দূরে ঠেলে দিলাম। পার্টির মধ্যে সামাজিক মতে বিয়ে, শ্রাদ্ধ নিয়ে অনেক শাস্তি ও সমালোচনা হতে দেখেছি। পূজোমণ্ডপে স্থানীয় এম. এল. এ-র উদ্বোধনী বক্তৃতা করায় পার্টির বিচারে তাকে নাজেহাল হতে দেখেছি। কিন্তু এখন এই বয়সে মনে হয় আমরা যদি এইসব ছেলেমানুষীগুলি না করতাম তো ভালই হতো, খারাপ হতো না। অন্যেরা গোড়াতেই ধর্মহীন, সমাজহীন এক উদ্ভট জীবন হিসাবে আমাদের দেখিয়ে ঘায়েল করতে সুযোগ পেত না। আমাদের রাজনীতিতে আকৃষ্ট এমন কত মহিলার সম্মুখীন আমাকে হতে হয়েছে, যাদের ঘরে ঠাকুরের আসনটি দিব্যি ফুলে-জলে-বাতাসায় সাজানো রয়েছে। মহিলারা আমাকে দেখে কুণ্ঠিত প্রশ্ন করেছেন। আমি বলতাম তাতে কি? আপনার ঠাকুর তো আপনার মনে। আপনি তো আর জাত মানেন না, মানুষকে ছোট অস্পৃশ্য মনে করেন না তবেই তো হলো। এতে কোন দোষ নেই। মহিলাদের স্বস্তির নিঃশ্বাসটি দেখে নিজের কথা মনে পড়ত। কেউ যদি আমাকে এমন করে বলত তবে তো এত মানসিক দ্বন্দ্বে আমায় ভুগতে হতো না।

আমার আজও প্রশ্ন, সত্যিই কি আমাদের দেশে এই প্রচারের কোন প্রয়োজন ছিল? রাশিয়ার ও ভারতের অবস্থা কি এক ছিল? ইংরেজ রাজত্বে কি ধর্মগুরু বা গির্জা-মন্দিরের দ্বারা ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামো তৈরি বা শাসিত ছিল? বরং ইংরেজ সরকারের সহায়তা নিয়েই রামমোহন রায় ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে ও বিধবা-বিবাহের সপক্ষে আইন পাশ করাতে পেরেছিলেন। এইটুকু করতে গিয়ে রামমোহনকে দেশ ছাড়তে হলো আর বিদ্যাসাগরের লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। যদিও একাজ করতে গিয়ে তাঁদের হিন্দুশাস্ত্র ঘেঁটে প্রমাণ করতে হয়েছিল সতীদাহ হতেই হবে আর বিধবা-বিবাহ হতেই পারে না, এমন কথা শাস্ত্রে

নেই। কিন্তু আইনের অধিকার দিয়েও মানুষের মন থেকে তাঁরা এ প্রচলিত কুসংস্কারগুলোকে দূর করতে পারেন নি। যে নারী-সমাজের জন্য তাঁদের দুঃখবরণ, সেই নারীরাই মুখ ফিরিয়ে রইল তাদেরই কল্যাণে রচিত আইনের প্রতি। সে কল্যাণকে গ্রহণ করার মানসিক প্রস্তুতি তাদের ছিল না। অবশেষে আর এক দফা সমাজের প্রবল বিরোধিতা উপেক্ষা করে বিদ্যাসাগরকে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পথ ধরতে হলো। বসতে হলো 'অ, আ, ক, খ'র বই লিখতে। এই মহাপুরুষদের আশীর্বাদে বাঙালী নারী-সমাজের বিদ্যামন্দিরে প্রথম প্রবেশের অধিকার মিললো। অপেক্ষায় রইলেন ঈশ্বরচন্দ্র, মেয়েরা শিক্ষায় উন্নত হয়ে কবে নিজেদের প্রয়োজনে ঐ সব আইনের অধিকার জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে।

আমরা ভুগছি যুগ যুগ ধরে এ দেশের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অপশাসনে। এরা হিন্দু সমাজের উপর যে সামাজিক শাসন চালিয়ে এসেছে তার মারাত্মক ফল থেকে আজও আমরা উদ্ধার পাইনি। অশিক্ষিত জনসাধারণ এবং বিশেষ করে নারী-সমাজকে পঙ্গু করে নিজেদের স্বার্থ-সাধনই ছিল তখনকার ব্রাহ্মণ শ্রেণীর উদ্দেশ্য। সে জন্য যে সমস্ত কুসংস্কারের বীজ তারা জনসাধারণের মনের মধ্যে রোপণ করেছিল, কালে কালে সে বীজ সহস্র ডালপালা মেলে বিষবৃক্ষের মতন মানুষের মনগুলোকে আঁকড়ে ধরে রইল। সমাজ-জীবনে আজকের উৎকট অপসংস্কৃতির জন্ম এখান থেকেই।

জ্ঞানে-বিজ্ঞানে এত উন্নতির পরও আজকের উপরতলার মানুষেরা কতটুকু সংস্কার মুক্ত হতে পেরেছে? আজও ক্রিয়াকর্মে ব্রাহ্মণের প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়নি। পুজো-পার্বণে শনি, মনসা প্রভৃতির পট নিয়ে যে কেউ রাস্তা জুড়ে বসে যেতে পারে। এতে বাধা দিতে সেই সংস্কার আজও ভয় দেখায়। আর কালী, দুর্গা, সরস্বতী, বিশ্বকর্মা প্রভৃতি বড় বড় ঠাকুরদের এলাকা দখলের দাপট তো উদ্বাস্তুদের জবর দখলের আন্দোলনকেও হার মানায়। আলোর বন্যায়, বাদ্যভাণ্ডের কোলাহলে, মাইকের কান ফাটানো চিৎকারে, বোমা-পটকার গর্জনে দেবদেবীদের আগমন ও নির্গমন রীতিমতন ভীতিজনক। এই বিপুল আয়োজনের বিশাল ব্যয়ভার চাপানো হয় প্রতিটি গৃহস্থ, প্রতিটি দোকানদার, ইচ্ছুক-অনিচ্ছুক নির্বিশেষে সকলের উপর। এই 'পিটুনিকর' আদায়কারীরা লোকেদের কাছে আতঙ্ক বিশেষ। এরা বাসযাত্রী ও কণ্ডাক্টারের ব্যাগও ছিনতাই করে থাকে। প্রতিবাদে 'টু' শব্দ করার উপায় নেই। ছোরাছুরি পটকা এ সব পকেটেই থাকে। এইভাবে সংগৃহীত অর্থে অন্তত দেবদেবীদের পূজো হয় না, এটা সকলেই মানেন; কিন্তু বলবার সাহস কারো নেই।

পত্র-পত্রিকায় এসব জবরদস্তি ও বিকৃতরুচির বিরুদ্ধে প্রতি বছরেই চিঠিপত্র ও সম্পাদকীয় মন্তব্য থাকে। কিন্তু সরকারী শাসনযন্ত্র নির্বিকার, কমিউনিস্ট পার্টিও।

যে ধরনের ব্যাপক প্রচার ও আন্দোলনের সাহায্যে এই অপসংস্কৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা যায় কমিউনিস্ট পার্টির তাতেও বোধহয় আর উৎসাহ নেই। সম্ভবত এ সব ধর্ম ও অধর্মের প্রশ্নটাও আগের মতন তীব্র আকারে নেই। তাছাড়া হয়তো তাঁরা বোঝেন এই ধর্মীয় মত্ততা ঠেকানোর সাধ্য তাঁদেরও নেই। পার্টির পক্ষে এ বড় করুণ অবস্থা।

ধর্মাধর্ম নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আসল গল্পটা বলা থেমে গেল। কমিউনিস্ট পার্টিকে খোঁজা হচ্ছিল। সৌম্যেনবাবুর পার্টি আমাদের পছন্দ হচ্ছিল না। বোঝা যাচ্ছিল এটা আসল কমিউনিস্ট পার্টি নয়। বরিশাল থেকেও এ খবর এলো। সৌম্যেনবাবুর পার্টি হলো ফোর্থ ইন্টারন্যাশনাল-এর সঙ্গে যুক্ত। আমরা তো খুঁজছি থার্ড ইন্টারন্যাশনাল-এর অনুমোদিত পার্টি। মনে মনে ভাবলাম, এখন আবার কোথায় থার্ড ইন্টারন্যাশনাল খুঁজতে যাব। ওরা কোথায় থাকেন? ইতিমধ্যে গোপাল হালদারের সঙ্গে আমার আলাপ হয়ে গেল। আমি চাইছিলাম কোন কিছু কাজের সঙ্গে যুক্ত হতে। গোপালদা আমাকে বিমলপ্রতিভা দেবীর কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি রাজনীতিতে কোন্ গোষ্ঠীভুক্ত জানতাম না। তবে মহিলাকে আমার খুব ভাল লাগল। সাহসী ও অমায়িক, কর্মী ও স্নেহশীল, একাধারে সর্বগুণসম্পন্ন ছিলেন। তাঁর তখন মধ্য বয়স। কিন্তু কমনীয় মুখশ্রী, ফর্সা রং ও দেহের মসৃণতা নিয়ে যৌবনকে তখনও তিনি ধরে রেখেছেন। সর্বোপরি মনে হয় তাঁর হাতের অপূর্ব রান্নার কথা। রান্নার যে অত সব স্বাদ তা জানা ছিল না। প্রথম দিনই উনি আমাদের চিংড়ি মাছের মালাইকারি খেতে দিলেন। গোপালদা দেখলাম পরম নির্লিপ্তভাবে চোখ বুজে চিংড়ির মাথা খাচ্ছেন। আমি জিজ্ঞাসা করে ফেললাম, 'এটাকে কি রান্না বলে'? বিমলদি হেসে বললেন, 'ও কিছু না, ঐ একটু চিংড়ির মালাইকারি করেছিলাম আর কি?'

বিমলদির সঙ্গে এই আমার প্রথম পরিচয়। তারপর থেকে একাই যাতায়াত করতাম। ওঁর কাছে একজন আসতেন, তিনি মহিলা শক্তি-সঙ্ঘের নেত্রী। তাঁর ওখানেও যেতাম। মেয়েদের নানারকম ব্যায়াম ও কুচকাওয়াজ শেখানো হতো। বিমলদির মারফতে কিছু কিছু কংগ্রেসী মহিলাদের সঙ্গেও দেখা হতে লাগল, যেমন হেমপ্রভাদেবী, লাবণ্যপ্রভা চন্দ ইত্যাদি।

এদিকে আমার বন্ধুরা এবার খবর আনলেন—সন্ধান পাওয়া গেছে। বি. পি. সি. সি. অফিসে আজ একটা মিটিং আছে। ওখানে কমরেড মুজাফ্‌ফর আহ্‌মেদ ও সোমনাথ লাহিড়ীকে দেখতে পাওয়া যাবে। ওঁরাই হচ্ছেন থার্ড ইন্টারন্যাশনালের ভারতীয় নেতা। এটা বোধহয় ১৯৩৭-৩৮ সাল হবে। আমরা চারজনেই

গেলাম। মোটং-ঘরের বাইরে বসে সবাইকে দেখছি। কাউকেই আমাদের নেতা বলে পছন্দ হচ্ছে না। একজন ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করায় তিনি ওঁদের দুইজনকে দেখিয়ে দিলেন। মুজাফ্‌ফর আহমেদ কিছু বলতে উঠলেন। সবটা কানে গেল না। খুব মৃদু ও মিষ্টভাষী মনে হলো। বেশ লাগল। আরও ভাল লাগল ভাবতে— উনি একজন মুসলমান কমরেড। তারপরে উঠলেন সোমনাথ লাহিড়ী। চেহারা দেখেই আমি হতাশ। এ তো একেবারে পাটকাঠি! কিন্তু কথা বলেন বেশ। যদিও কি বলেছিলেন এখন কিছু মনে নেই।

এবার বরিশালে খবর পাঠাতে হবে। তারপর সেখান থেকে আমাদের পরিচয়-পত্র আসবে। তবে পার্টির সঙ্গে আমাদের যোগাযোগ হবে। কত যে দেরি হবে! এসব যোগাযোগের খবর আমি রাখতাম না। কিন্তু ধীরে ধীরে দেখলাম কাছের লোকদেরই কাছে আসছি।

রাজনীতির পথে

পার্টির কাছাকাছি আসার পর কতগুলো বিষয়ে আমি যেন একটু দ্বিধায় পড়লাম। বরিশালে যখন রাজনীতিতে প্রথম আকর্ষণ অনুভব করি তখন দেশের স্বাধীনতার জন্য আন্দোলনকেই আমি বুঝতাম। কোন্ পথে স্বাধীনতা আসবে তা নিয়ে মতান্তর থাকতে পারে। কিন্তু মূলত এবং প্রথমত আমরা তো স্বাধীনতা চাই এবং তা নিয়ে সংগ্রাম করতে চাই। এ পর্যন্ত পার্টির যতটুকু কাছাকাছি এসেছি তাতে আমরাও স্বাধীনতা সংগ্রামে সহযোদ্ধা—ঠিক একথাটা শুনতে পাইনা কেন? কংগ্রেস-পরিচালিত আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক কি? আমরা কি তার ভেতরে না বাইরে? মার্কসীয় রাজনীতির ক্লাস খুব একটা হতো না। হলেও এসব আলোচনা হতো না। জিজ্ঞেস করতে পারি এমন কোন পার্টি-নেতার সঙ্গে জানাশোনা ছিল না। কেবল মনে হতো বরিশালে থাকতে যে রাজনীতি আমাকে প্রবলভাবে নাড়া দিত—সে তো স্বাধীনতার সংগ্রাম। তা বিপ্লবী পথে হোক বা কংগ্রেসী পথেই হোক। কিন্তু কোথায় সে সব? বেশ হতাশ বোধ করতাম। কমিউনিজম ও স্বাধীনতার সংগ্রাম—এ দুটো কি আলাদা জিনিস? আমার কিছু আত্মীয়-স্বজনের প্রশ্নের সম্মুখীন হলে উত্তর দিতে পারতাম না। খানিকটা বোকার মতন অভিযোগ শুনতে হতো—পরাধীন দেশে যারা স্বাধীনতার আন্দোলনে থাকে না তাদের আবার রাজনীতি কি? অনেক কষ্টে যেসব কলকারখানা গড়ে উঠেছে সেগুলোকে নষ্ট করার জন্য যারা মজুর ক্ষেপায়, ধর্মঘট করে, তারা দেশের ক্ষতি করে। এ সমস্ত অভিযোগ সঠিক নয়, মনে মনে বুঝতাম। কিন্তু তর্ক করার জোর পেতাম না। তাছাড়া এদেশেও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে পার্টি-নেতৃত্বে শ্রমিক শ্রেণীর যে সব বড় বড় অভ্যুত্থান ঘটেছে সে সময়ে তাও জানা ছিল না। মার্কসীয় দর্শন যতটুকু তখন পড়েছি তাতে এ আলোচনা পাইনি। খুবই মুস্কিলে পড়লাম। পার্টি-নেতারা তখন গোপনে থাকেন। অবশ্য পার্টি-নেতাদের খুঁজতে গিয়ে দু'জন নেতাকে বি. পি. সি. সি. মিটিং-এ দেখেছি, সে কথা আগেই বলেছি। কিন্তু তাতে কি? আমরা কি করব—সে তো কেউ বলে না। বেশ উদ্বেগ বোধ করছি। তবে কি এও সৌম্যেন ঠাকুরের পার্টির মতো ব্যাপার? আমার কাজ কি হবে শুধু টাকা তোলা?

অবশেষে ৩৮-৩৯ সনের কোন সময়ে উপর থেকে নির্দেশ এলো কংগ্রেসের

সদস্য হতে এবং একসঙ্গে কাজ করতে। সদস্য হলাম এবং আমাকে দক্ষিণ কলিকাতার এ্যাডহক্ কমিটিতেও নেওয়া হলো। এটা সম্ভব হয়েছিল প্রখ্যাত কমিউনিস্ট নেতা বারীন চ্যাটার্জীর জন্য। উনি আগে থেকেই কংগ্রেস আন্দোলনের সঙ্গে ছিলেন এবং এই 'এ্যাডহক্' কমিটিরও সদস্য হন।

বাঙলাদেশে এ্যাডহক্ কমিটির জন্ম হলো কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী নেতৃত্বের সঙ্গে সুভাষচন্দ্রের স্বাধীনতা আন্দোলনের পদ্ধতি সম্পর্কে মতবিরোধ নিয়ে। ১৯৩৯ সনে ত্রিপুরী কংগ্রেসে সুভাষ সভাপতি নির্বাচিত হলেন গান্ধীজীর প্রস্তাবিত প্রার্থী পট্টভি সীতারামাইয়াকে পরাজিত করে। গান্ধীজী এ পরাজয়কে নিজের পরাজয় মনে করে ক্ষুব্ধ হলেন। এবং গান্ধীজীর অসহযোগিতার কারণে সুভাষচন্দ্র সভাপতি পদ থেকে শেষ পর্যন্ত পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। এই বিরোধ চরমে উঠল ১৯৪০ সনে। তখন যুদ্ধ-পরিস্থিতি। স্বাধীনতার আন্দোলন সম্পর্কে সুভাষ চাইলেন ইংরেজ সরকারকে ৬ মাসের সময় দিয়ে চরমপত্র দিতে। এই সময়ের মধ্যে স্বাধীনতা না দিলে দেশব্যাপী গণসংগ্রামের ডাক দেওয়া ছিল তাঁর প্রস্তাব। দক্ষিণ-পন্থীদের দাবী ছিল প্রদেশিক স্বায়ত্তশাসন ও কেন্দ্রে দেশীয় রাজাদের সঙ্গে একত্রে ফেডারেশন গঠন। দেশের বামপন্থীরা সুভাষচন্দ্রের সমর্থক ছিলেন। ত্রিপুরীতেও কমিউনিস্ট সহ সমস্ত বামপন্থী প্রতিনিধিরা সুভাষকে ভোট দিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতিতে দক্ষিণপন্থী নেতৃত্ব সুভাষচন্দ্রের চরমপত্রের প্রস্তাব গ্রহণ করতে শঙ্কা বোধ করলেন। কিন্তু সুভাষচন্দ্র তাঁর প্রস্তাবের সমর্থনে আন্দোলন চালাতে থাকলেন। পরবর্তী সময়ে শৃঙ্খলাভঙ্গের অপরাধে সুভাষচন্দ্রকে কংগ্রেস থেকে বহিষ্কৃত করেন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব।

তখন বাঙলাদেশে সুভাষই ছিলেন কংগ্রেসের অবিসম্বাদিত নেতা। তাঁকে বাদ দিয়ে এখানে কংগ্রেস হতে পারে না। সংগঠন স্বভাবতই ভেঙ্গে গেল। অবশেষে কেন্দ্র থেকে এখানে এ্যাডহক কংগ্রেস কমিটি গঠন করে দেওয়া হলো। 'এ্যাডহক্' কমিটি এখানে হলো বটে কিন্তু তার পিছনে কোন গণসমর্থন ছিল না। আমাদের নেতারা সংগঠিত শ্রমিক ও কৃষকশ্রেণীকে কংগ্রেসের মঞ্চে আনা হোক—এ নিয়ে সর্বদা চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। পার্টির নেতৃত্বে তখন নানাদিকে শ্রমিক ও কৃষকের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটছে। এরই জন্য কংগ্রেস নেতৃত্ব সভয়ে কমিউনিস্ট পার্টিকে দূরে সরিয়ে রাখেন। স্বাধীনতার আন্দোলনটা পাছে সংগ্রামী আন্দোলনে পরিণত হয়ে যায় এবং কোন বৈপ্লবিক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, এটা কংগ্রেস নেতৃত্ব চাইতে পারেন না তাদের শ্রেণীচরিত্রের ভিত্তিতেই। এখানেই কমিউনিস্ট পার্টি ও সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরোধ ছিল। কমিউনিস্ট পার্টি

কংগ্রেসের গণসংগ্রাম-বিরোধী নীতির তীব্র সমালোচক ছিল। তথাপি এখানে এ্যাড্-হক্ কমিটির সঙ্গে থাকা পার্টি সঙ্গত মনে করেছিল। কারণ স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসের বিকল্প কোন সর্বভারতীয় সংগঠন ছিল না।

আমার মনের যে শূন্যতা বোধের উল্লেখ করেছি, তার কারণ ছিল—এই পরিস্থিতিটাকে বিশ্লেষণ করে বুঝতে না পারা। কিন্তু দক্ষিণ কলিকাতা কংগ্রেস কমিটিতে থেকে আমিও বুঝতে পারলাম—এঁদের কিছু করণীয় নেই। কোন আন্দোলনের কথাই এঁরা বলতেন না। বোধহয় বুঝেছিলেন, বাঙলাদেশে সুভাষহীন কংগ্রেস কোন জনসমর্থন পাবে না। প্রায় একঘরে অবস্থা। তাছাড়া কেন্দ্র থেকেও আন্দোলনের নির্দেশ থাকত না। অতএব এখানে এসেও আমার কোন কাজ নেই।

পার্টি-নেতৃত্বে মহিলাদের গণসংগঠন গড়ে ওঠার অনেক আগেই ছাত্র সংগঠন গড়ে উঠেছে মোটামুটি বড় আকারে। তাদের মিটিং-মিছিলে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জোরালো কণ্ঠ কানে আসে আর আমার মনটা চঞ্চল হয়ে ওঠে।

ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে আমি থাকতে চেষ্টা করতাম। ওরাও আমাকে ডাকত। আমি ছাত্রীজীবন পার হয়ে এসেছি, তবু ডাকত—ওদের কোন কোন ছাত্রসভায় সভানেত্রী হবার জন্য। তখন পর্যন্ত আমি বক্তৃতা করতে পারি না। দু'চার কথা যা হোক বলে দিতাম মাত্র। তার মধ্যে জোরটা বেশী থাকত ভাল লেখাপড়া শেখার উপর। বিশ্বনাথ মুখার্জী তখন অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছাত্রনেতা। তার বক্তৃতা শুনতে খুব ভাল লাগত।

এই ছাত্রদের সঙ্গেই শুরু হয় আমার গ্রামগঞ্জে যাওয়া। এর আগে বরিশাল বা কলকাতা শহরেই যা ঘোরাঘুরি করেছি। স্বাধীনভাবে শহরের বাইরে যাইনি।

সেবার আমি বরিশালে ছিলাম। ওখানে ছাত্রদের একটা বড় মিটিং হবে টাউন হলে। আমি মাকে ও ছোড়দিকে নিয়ে মিটিং শুনতে গেলাম। বিশ্বনাথ মুখার্জী বক্তৃতা করল। মা তো বক্তৃতা শুনে মুগ্ধ। বিশ্বনাথের জ্বালাময়ী বক্তৃতা যে অজান্তে আমার কি উপকারই করেছিল সেদিন! বাড়ি এসে মা ঘুরে ফিরে ওর কথাই বলছেন। সুযোগ বুঝে মাকে আমি বললাম—"মা ছাত্ররা আমাকে বলছে ওদের সঙ্গে বানরীপাড়া যেতে, সেখানে ওদের সম্মেলন হবে। যাব?" আগেই ছেলেরা এ প্রস্তাব আমাকে দিয়েছে। মাকে বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। টাউন হলের মিটিং শুনে মা আর না বলতে পারলেন না। একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'তুই ছেলেদের সঙ্গে একলা যাবি? সে কি করে হয়?' বললাম, 'না, মনোরমা মাসীমাও যাবেন।' মনোরমা মাসীমার কথা পরে বলব। বরিশালের কেউ এঁর

সঙ্গে মেয়েকে যেতে দিতে আপত্তি করবে না। মা রাজী হয়ে গেলেন। রাত ১০টায় মা ও দাদা নৌকোঘাটে গিয়ে আমাকে বিশ্বনাথ মুখার্জী ও মনোরমা মাসীমার সঙ্গে নৌকোতে নিশ্চিন্ত মনে তুলে দিলেন। বাড়িতে একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'তুই যে যাবি, ওর মতন বক্তৃতা করতে পারবি?' বললাম, 'ওরকম পারব না, তবে যা হয় কিছু বলতেই তো হবে।' নৌকোয় উঠে মনে মনে কাকে যেন নমস্কার করলাম। একান্ত মনে চাইলাম যাত্রা. শুরুর যাত্রা আমার যেন চলতেই থাকে। বাড়ি ফিরে শুনেছিলাম আমি নাকি কার সঙ্গে পালিয়ে গিয়েছি। মা-ই আমাকে বাঁচালেন সে দুর্নাম থেকে।

এবার বানরীপাড়ার গল্পটা বলি। আমাকে ও বিশ্বনাথকে একটা বাড়িতে ওঠানো হলো। মাসীমার তো সব বাড়িই তাঁর নিজের ঘর। কোথায় চলে গেলেন। আমরা ঘরের বারান্দায় গিয়ে বসেছি। দু'পাশে দু'টো চৌকিতে বিছানা পাতা। অনুমান করলাম—আমার ও বিশ্বনাথের জন্য। ভেতর থেকে ঘরের দরজা বন্ধ। কোন মহিলা আমার কাছে আসছেনও না, ভেতরেও ডাকছেন না। একটু রাগ হলো। আমি কি পুরুষ নাকি? একটু পরে বিশ্বনাথ দলবল নিয়ে বেরিয়ে গেল। কিন্তু দরজা না খুললে আমি ভেতরে যাই কি করে? কাপড় ছাড়ব, স্নান করব, না নেত্রী হয়ে এখানে বসে থাকব? বাড়ির পুরুষরা তো আমার সামনে আসছেনই না, কারণ আমি মহিলা। মেয়েরাও আসছেন না, আমি নেত্রী—অতএব পুরুষ-সমান বলে। উঠে দরজায় ধাক্কা দিয়ে বললাম, 'খুলুন একবার দরজাটা। কাপড় ছাড়ব আমি। একটু ফাঁক হলো, ভদ্রলোকটি পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। ভেতরে একহাত ঘোমটা টানা দুটি মহিলা দাঁড়িয়ে আছেন। কি যে বলব বুঝতে পারছি না। কাপড় ছাড়া হলো। দু'চারটি ছোট ছেলে-মেয়ে আমাকে পুকুর ঘাটে নিয়ে গেল। স্নান সেরে এসে দেখি বিশ্বনাথ ফিরেছে। ঐ বারান্দাতেই মস্ত দুটো পিঁড়ি পেতে আমাদের বসতে দিল। খাওয়া হতেই বিশ্বনাথ আবার বেরিয়ে গেল। বলে গেল একটু জিরিয়ে নিতে। ২॥/৩টায় ছেলেরা আসবে, মিছিলে যেতে হবে। তাই হলো। ছাত্রদের সঙ্গে শ্লোগানমুখর মিছিলে আমরা গ্রামখানি ঘুরে এলাম। এতে সুবিধা আছে। নেতারা যে সত্যিই এসেছে গ্রামবাসীকে এটা দেখানো হয় এবং মিটিং-এ যাতে লোক আসে তার প্রচারও হয়। এ ব্যাপারে পরে আমি অভ্যস্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

মিটিং-এ স্কুলের ছাত্ররাই এসেছে। সভানেত্রী হয়ে তাদের কলরব থামানোই ছিল আমার প্রধান কর্ম।

বিশ্বনাথকে বলতে ডাকা হলো। ঝড়ের গতিতে সে বলে যাচ্ছে। চারপাশে

কিছু কিছু গ্রামের ভদ্রলোকেরা ছিলেন। কিন্তু আসল শ্রোতা স্কুলের ছোট ছেলেরাই। সেক্ষেত্রে বক্তৃতাটা ছোটদের মাথার উপর দিয়েই যাচ্ছিল বলতে হবে। আমি দেখছি ছেলেগুলি মাঝে মাঝে ফিক্ ফিক্ করে হাসছে। বিশ্বনাথ যখনই বলছে—'বানোয়ারী-পাড়া' তখনই ওরা হাসছে। গ্রামের নামটা 'বানরীপাড়া' একটা চিরকুটে লিখে ওর হাতে গুঁজে দিলাম। পরে বিশ্বনাথ এই নামই বলতে থাকল—ছেলেদের হাসিও থামল।

সভাশেষে আমি সেই বাড়ি ফিরে গেলাম। বিশ্বনাথ ওখান থেকেই চলে গেল শহরে। আমার কয়েকটা দিন থাকার কথা, মনোরমা মাসীমার সঙ্গে অন্যান্য গ্রামে যাব এবং মহিলা-সভা করব। রাত্রের খাওয়ার পর আমি একটা চৌকিতে শুয়ে পড়লাম। বারান্দাটাও ঘরই। বাইরের দরজা বন্ধ করা হলো এবং ঘর ও বারান্দার মধ্যেকার দরজাটিও বন্ধ। বাতি নিভে গেল। অন্ধকারে একা আমার ভয় করতে লাগল। কখন একটু ঘুমিয়েছি। হঠাৎ শব্দ। উঠে বসলাম। আমার পাশের টিনের বেড়ার উপরে শব্দ। জোরে ওদের বললাম, 'শুনুন এ শব্দ কিসের?' সবাই উঠলেন এবং লণ্ঠন নিয়ে বাইরে দেখে এসে বললেন, 'আমাগো ছাগলডা বেড়ায় গা চুলকাইতাছে। ভয় পাইবেন না।' সকালে মুখহাত ধুয়ে বসে আছি তো বসেই আছি, কেউ আসছেও না—কিছু খেতেও দিচ্ছে না! বুদ্ধি করে রান্না ঘরে চলে এলাম। দেখি চা বানানোর তোড়জোড় চলছে। বুঝলাম এতেই দেরি। বললাম, 'চা কে খাবে? আমি?' ঘোমটা নেড়ে উত্তর হলো—'হ্যাঁ'। বললাম—'আমি তো চা খাই না, সকালে একটু ডাল-ভাত খাই।' উনুনে বরিশালের মুসুরী ফুটছিল। বৌ-এরা মুখ চেপে হাসতে লাগল। একটা পিঁড়ি টেনে বসে বললাম, আর আপনারা যদি ঘোমটা না খোলেন তো ডাল-ভাতও খাব না। 'নিজেই গিয়ে ঘোমটা তুলে দিয়ে বললাম—'দেখুন তো, আমি কি পুরুষ মানুষ?' এবার বাধ ভাঙল। মুখ ফুটল। হাসাহাসির ধুম পড়ে গেল। ওরা বললো, 'পুরুষ না অইলে কি অইল? আপনে কত বিদ্বান, আপনের লগে আমরা কি কথা কমু?' বললাম, 'কেন, ডাইল-ভাতের কথা কইথে তো বিদ্বান হওন লাগে না।' ভাব হলো, ডাল-ভাত খেতে খেতে নানান গল্প হলো। সমাজতন্ত্রের কথা নয়, সোভিয়েটের মেয়েদের কথা নয়। কলিকাতা শহর ও বরিশাল শহর—এই দুটো নামই বিশ্বসংসারে তাদের জানা নাম। এখানকার গল্পই করলাম। মেয়েরা স্কুলে যায়, পাস করে, ডাক্তার হয়, বড় চাকরী করে—এই সব গল্প। শুনে ওদের চোখগুলো বড় হয়ে গেল। বড় বড় নিঃশ্বাস ফেলে বলে, 'আমাগো কপালে কি আর ওসব আছে?' হায় আমার দেশ! বরিশাল শহর থেকে এক রাত্রের নৌকো পথ। বর্ধিষ্ণু গ্রাম বানরীপাড়া। স্কুল

আছে, ছেলেরা পড়ে। তাইতো আমাদের আসা। আর সেখানেই মেয়েদের এই অবস্থা ? যারা এদেরও অনেক তলায়, তারা না জানি আরও কত তলায় ! ঘোরা তো আমার সবে শুরু। দেখি যদি ঘুরতে ঘুরতে সেই তলদেশে পৌঁছে আমার অজানা দেশের অচেনা নারীসমাজের খোঁজ পাই ! তাদের গল্পই হয়তো বেশী বলতে হবে।

এই সঙ্গে আরো একটা ছাত্র-সম্মেলনের কথা বলে নিই। নয়তো ভুলে যেতে পারি। এই ছাত্র-সম্মেলনের বেশ কয়েক বছর পরে খুলনা জিলার খলিশখালি গ্রামে সম্মেলন। আমাদের ওঠানো হলো একটি ক্ষয়িষ্ণু জমিদার বাড়িতে। বাড়িটির দুই শরিক হয়ে গেছে এবং রেষারেষিও আছে। অতএব অতিথি আপ্যায়নে প্রতিযোগিতাও আছে। ক্ষয়িষ্ণু হলেও জমিদার বাড়ি। আমরা কি করে যে এখানে ঠাঁই পেলাম। বোধহয় ক্ষয়িষ্ণু বলেই। হাজার হোক্ একটা সম্মেলনের জাঁকজমক তাদের বাড়ির পাশের জমিতে হলে কত লোকের আসা-যাওয়া হবে। নেতা ব্যক্তিরা যে বাড়িতে থাকে সে বাড়ির মানও একটু বাড়ে বৈ কি ! তবে দুই শরিক মিলে ভারসাম্যের ব্যবস্থাও করেছেন। বাড়ির একাংশে আমরা, অপরাংশে পুলিসেরা আশ্রিত। তখনকার সময়ে এসব ব্যাপারে পুলিসের অনুমতি নিতে হতো। এরা পুলিস ও আমাদের পাশাপাশি রেখে সুবুদ্ধির কাজ করেছিলেন। সম্মেলনের অনুমতি সহজেই মিললো।

আমাদের আপ্যায়নে জমিদারী স্টাইলের কোন ঘাটতি ছিল না। দোতলার একখানা ঘরে আমি একলা। আর ছেলেরা সব নীচে। আহার-ব্যবস্থার প্রাচুর্যে আমি শঙ্কিত। সামনে সাজানো ১০টা বাটির সবটাই শেষ করতে হবে—সামনে দাঁড়ানো কর্তার হুকুম। বাড়ির মেয়েরা ঘোমটা টেনে খাবার দিয়ে নীচে চলে গেলেন। আমাকে সামনে বসে খাওয়াচ্ছেন কর্তা। গিন্নীর কপালে এ মানটুকুরও ভাগ নেই। মনে ভাবলাম, রাজার মহিষী আর প্রজার ঘরণী সবারই কপাল ঐ 'সাতপাকে' বাধা। আমার সামনে ইনিও এলেন না।

শুনলাম অপরাংশে পুলিসরা বেশ খোসমেজাজে খাচ্ছেদাচ্ছে।

ছাত্রসম্মেলনের সভানেত্রী আমি। বিশ্বনাথ ও অন্য ছাত্রনেতারা বক্তৃতা করলেন। খুলনা ও দৌলতপুর কলেজ থেকে কলেজের ছেলেরাও এসেছিল। সম্মেলনটা বেশ বড় হলো। আমি এখন কিছুটা বক্তৃতা করতে পারি। ছাত্র ঐক্য, ইউনিয়ন, সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী কথাবার্তা—এসব বলতে শিখে গেছি। তবে ভাল ছাত্র হতে হবে এই সুবাক্যটি বলতে আমি ভুলি না।

পরের দিন মহিলাদের সভা। এবার জায়গাটি পর্দা দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়েছে। আমি গিয়ে দেখি পুলিসরা আমার পাশেই টেবিল নিয়ে বসেছে। জিজ্ঞেস করলাম,

'আপনারা এখানে কি করতে এসেছেন?' বললো, 'রিপোর্ট নিতে।' বললাম, 'পর্দার বাইরে গিয়ে বসুন। এটা মেয়েদের সভা। দেখছেন না কালকের খোলা মিটিং এটা নয়। এটা পর্দানশীন মেয়েদের জন্য।' ওরা বললো, 'ওখানে গেলে ভাল শুনতে পাব না।' আমি বললাম, 'যতটা শুনতে পাবেন তাতেই চলবে। আর একান্তই থাকতে চাইলে শাড়ি-চুড়ি পরে আসতে হবে, নইলে নয়। দেখছেন তো একটিও ছেলে নেই এখানে।' পুলিসের চারজন লোক অগত্যা হেসে মাথা নীচু করে বাইরে চলে গেল।

মেয়েদের সভায় স্বভাবতই আমার বক্তৃতায় থাকল দেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে মেয়েদের ভূমিকা, মেয়েদের শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা, তাছাড়া চলাফেরায় ও ঘরে মেয়েদের অসম্মানকর পর্দাপ্রথা সম্পর্কে বক্তব্য।

ছাত্র-আন্দোলনের একটা প্রভাব আমার উপরে ছিল। তাছাড়া ছাত্রদের সভায় শুধু দেশের স্বাধীনতার কথাই নয়, সমাজতন্ত্রের কথাও আলোচিত হতো। সারা ভারত ছাত্র ফেডারেশনের পুরোধা ছিলেন তৎকালীন সর্বভারতীয় নাম করা সেরা ছাত্ররাই, তখন দেশের হাওয়ায় সোশ্যালিজমের একটা আকর্ষণীয় হাতছানি ছিল। তরুণ সমাজের চোখে-মুখে তখন সমাজতন্ত্রের স্বপ্ন। স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দেশেও সমাজতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত হবে—এই আকাঙ্ক্ষায় তরুণমন উদ্বেল ও চঞ্চল। সোভিয়েট রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক সাফল্য চুম্বকের মতন এদেশের যুবসমাজকে টানছে। এই স্বপ্নে বিভোর হয়ে আমরাও তো বরিশাল থেকে এখানে এসে মিলেছি।

কমিউনিস্ট-নেতৃত্বে পরিচালিত ছাত্র ফেডারেশনই ছিল তখন ভারতে একমাত্র ছাত্রসংগঠন। এই ছাত্র ফেডারেশনের আন্দোলন একটি কারণে আমার নজর টানত। সেই কারণটি হচ্ছে—ছাত্র ফেডারেশনের মঞ্চে কলেজের মেয়েদেরও যোগদান। আমার মতন দ্বিধাদ্বন্দ্বের কাঁটা এদের পায়ে ফুটত না। পার্টির প্রতি আকৃষ্ট মেয়েরা বাড়ির বাধায় আর ভয় পাচ্ছে না। পরে অবশ্য প্রয়োজনবোধে ছাত্র ফেডারেশনের একটি অঙ্গ হিসাবে পৃথকভাবে ছাত্রী সংগঠনও গড়ে তুলতে হয়েছিল।

কিন্তু আমার জন্য ছাত্র আন্দোলন নয়। আমি আরও কাজ চাই। ছাত্র-সভায় সভানেত্রী হয়ে আর কত দিন কাটাব?

শ্রমিক-কৃষক আন্দোলন থেকে আমি অনেক দূরে। আসলে স্বাধীনতার আন্দোলন হচ্ছে না। অথচ মনে মনে এটাই আমি চাইছি। বিলিতী বর্জন, আইনঅমান্য-আন্দোলন—এসব কি আর হবে না? তবে স্বাধীনতা আসবে কি করে? সমাজতন্ত্রের পথই বা খুলবে কিভাবে? জিজ্ঞাসার আমার অন্ত নেই। কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব তখন সংগ্রামী আন্দোলনের সংকোচন চাইছেন।

এই সময়ে বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ডাক এল। এটা সম্মিলিতভাবে করার জন্যই পার্টির নির্দেশ ছিল। ভারতের বিপ্লবীরা তখনও জেলে বন্দী আছেন। বাঙলার বিপ্লবীরা আন্দামানে ও অন্যান্য জেলে। রাজনীতিতে এঁরা কংগ্রেসের সমধর্মী ছিলেন না। গান্ধীজী এঁদের একেবারেই পছন্দ করতেন না। কিন্তু চাপে পড়ে এঁদের মুক্তির কথা বলতেও হচ্ছিল। তাই দ্বিধা সত্ত্বেও কংগ্রেসকে এই আন্দোলনে আসতে হয়েছিল। অবশেষে জানলাম, এবার আমরা কংগ্রেসের সঙ্গে একসঙ্গে আন্দোলন করব।

আমি তখন স্কুলে চাকরী করি। ডোভার লেনে একটা ফ্ল্যাট নিয়ে কয়েকজন শিক্ষয়িত্রী মিলে থাকছি। পরের দিকে শ্রীমতী ফুলরেণু গুহও আমাদের সঙ্গে থাকত। সে তখন লেবার পার্টি করত, বামপন্থী। কিন্তু আমরা এ নিয়ে ঝগড়া করতাম না। বরং হাসিঠাট্টাই করতাম। বেশ সহ-অবস্থান করছিলাম।

মেয়েদের একটা মিটিং হবে গড়িয়াহাটার মোড়ে। বিষয়ঃ বন্দী-মুক্তি। সব পার্টির মহিলা সদস্যরা সেখানে আসবেন সংবাদ পেয়ে আমিও গেলাম সভায়। গিয়ে দেখি বিমলদি, লাবণ্যপ্রভাদি, হেমপ্রভাদি, লীলা রায়, সুধা রায় এবং আরও অনেকে আছেন। ভিড়ের মধ্যে একজন মেয়ে এসে আমার হাতখানা ধরে একটু চাপ দিয়ে একপাশে সরিয়ে নিয়ে গেল। আমি তাকে চিনি না। বললো—'তুমি মণিকুন্তলা?' বললাম—'হ্যাঁ'। ও বললো—'তুমি আমাদের লোক। অর্থাৎ কমিউনিস্ট, আমার কাছে কাছে থেকো। তোমাকে এখানে কিছু বলতে হবে।' সর্বনাশ! বক্তৃতা করব? আমি কি জানি? কি বিষয়ে বলব? গলা শুকোতে লাগল, হাত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। বুকের আওয়াজ নিজের কানে শুনছি। ছাত্রদের মিটিং আর এই মিটিং তো এক নয়।

মেয়েটির নাম জেনে নিলাম। লতিকা সেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে আমার প্রথম বন্ধু। কমলাকেও দেখলাম। সকলকেই চেনে। এক জায়গায় এক সেকেণ্ডও দাঁড়ায় না। লতিকা পরিচয় করিয়ে দিল। বললো, 'ও তাই নাকি?' ব্যস, ঐ পর্যন্ত। সর্বদা যেন ছটফট করছে। লতিকা বললো—'যখন ভোট হবে আমি যেদিকে দেব—তুমিও সেদিকে দেবে।' তাই-ই দিয়েছিলাম।

লতিকার নির্দেশে মিনিট ২/৪ কি একটু বলেছিলাম, মনেও নেই। এইসব নেত্রীবর্গের সামনে আমার বক্তৃতা করা! ভয়ে ঘেমে গিয়েছিলাম। জানি না আমার বক্তৃতার জন্য কিনা, লীলাদি আমার সম্পর্কে একটু উৎসুক হলেন। ওঁদের বাড়িতে ডাকলেন। শ্রীঅনিল রায়ের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন। কথা-

বার্তায় তিনি বুঝলেন যে, আমার মতে আমি শক্ত। কিন্তু লীলাদি ও রেণুকা সেনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল।

সেদিনের সেই মিটিং থেকেই লতিকা আমার বন্ধু। খুবই প্রিয় বন্ধু। কমরেড কথাটা মুখে আসত না। বন্ধু বলতেই ভাল লাগে। অমন শান্ত মিষ্টি ও হাসিখুশি মেয়ে আমি খুব কমই দেখেছি। বেশ একটু গভীরতা ও গাম্ভীর্য ওর মধ্যে ছিল। নীরব ধরনের কর্মী। ডোভার লেনে লতিকা আমাদের সঙ্গে কিছুকাল থেকেও ছিল। একসঙ্গে থাকায় ঘনিষ্ঠতা আরও বেড়েছিল। এই প্রিয় বন্ধুকে আমরা হারিয়েছিলাম কিভাবে—তা অন্যত্র বলব।

মহিলা'দের সেই মিটিং-এর পরেই আমাদের একটা কর্মী গ্রুপ তৈরি হলো। তাতে ছিলাম—লতিকা, কমলা, আমি, শান্তি সরকার, চিত্রা ও সতী। এই গ্রুপের নেত্রী ছিল লতিকা। সেই-ই ছিল পার্টি'র প্রথম মহিলা সদস্যা। আমি ভেবেছিলাম আমরাও সব সদস্য হয়ে গেছি। কিন্তু বহু পরে যখন কার্ড পেলাম তখন জানলাম—আমরা সভ্য হয়েছিলাম ১৯৪২ সনে।

অবাক হয়ে ভাবলাম, এতদিন তবে দুয়োরেই পড়েছিলাম? তাহলে ঐ গ্রুপটা ছিল পার্টি'র বাইরের? সেটা তো দেখলাম। ভেতরটা তাহলে কি?

গণআন্দোলনের প্রথম প্রোগ্রাম আমরা পেলাম—বন্দীমুক্তির জন্য একটা মস্তবড় মিছিলের আয়োজন করা। তখনকার দিনের একজন ইউনিভার্সিটি ছাত্রী-নেত্রীর বাড়িতে একটা স্বেচ্ছাসেবিকা মিটিং করার কথা হলো। সারা সপ্তাহ ধরে আমরা বালিগঞ্জের চেনা-অচেনা কত বাড়ি ঘুরলাম মেয়ে যোগাড় করতে, আমাকে অনেকেই কথা দিয়েছিল আসবে বলে। মিটিংটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। মেয়ে যোগাড় করতে না পারলে ভারি বিশ্রী হবে। বিলেত থেকে কে একজন মহিলা এসেছেন, তিনি বক্তৃতা করবেন। সুতরাং কারো চেষ্টার কোন ত্রুটি ছিল না। কিন্তু হায় কপাল, মেয়ে হলো আমাদের নিয়ে জনা দশেক। অর্থাৎ, বেশী এল ৪/৫ জন। বক্তা মেয়েটি বসে আছেন; আমি ঘরে ঢুকে বোমার মতো ফাটলাম। এসব মেয়েরা যেন কি! এই তো এখান থেকে এখানে আসা। ফের আবার ডাকতে গেলাম—কেউ এল না। বক্তা মেয়েটি বললেন, 'থাক্ তাতে কি হয়েছে, এই দিয়েই শুরু করি।' বক্তার দিকে তাকালাম, বয়সে তো আমার চেয়ে বেশ ছোটই মনে হয়। এই বয়সেই বিলেত-ফেরত! খাঁদা খোঁদা মুখখানা, অথচ তারুণ্যের লাবণ্যে ভরা, দেখলেই ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কে এই মেয়েটি? আমাদের বন্ধু, না নেতা? কি বলব—তুমি না আপনি? শেষ পর্যন্ত মেয়েটিই মীমাংসা করে দিল। ও নিজেই আমাকে মনিদি বলে ডাকল এবং তুমি করে কথা বললো। জেনে

নিলাম ওর নাম—রেণু। সুবিখ্যাত ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের ভাইঝি। আশ্চর্যের সীমা রইল না। এইসব ঘর থেকেও ছেলে-মেয়েরা পার্টিতে আসছে! আনন্দ হলো। এই সেই রেণু যে আমার রাজনৈতিক জীবনে একান্ত ঘনিষ্ঠ কর্মী, সহচর ও বন্ধু। আর পার্টি ও বাইরের জীবনে স্বনামখ্যাতা রেণু চক্রবর্তী।

বন্দীমুক্তির মিছিলটা খুব বড়ই হলো। ছাত্রছাত্রীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ। যতদূর মনে পড়ে শ্রমিকরাও বেশ বড় সংখ্যায় এসেছিলেন। আমরা মেয়েরাও কম ছিলাম না। সেদিনের ঘরোয়া মিটিং-এ যারা আসেনি তারাও এল। কংগ্রেস মহিলারাও সবাই ছিলেন। লীলা রায়, রেণুকা সেন, সুধা রায়—সবাই ছিলেন। আমরা কমিউনিস্ট মেয়েরা তো ছিলামই। খুব ভাল লাগল আমার।

বন্দীমুক্তি আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে গণসংগঠন গড়ার জন্য আমাদের খুব আগ্রহ হলো। ছাত্রীরাও স্কুলে কলেজে সংগঠিত হচ্ছে। এবার আমাদের মহিলা সংগঠন করতে হবে।

যে ছাত্রীসংগঠনের কথা বলেছিলাম, সেটা সারা ভারতেই রূপ নিয়েছে। এবার লক্ষ্ণৌতে ওদের সম্মেলন হবে। সারা ভারত থেকে ছাত্রীরা আসবে। রেণু সভানেত্রী হয়ে যাচ্ছে।

শান্তি সরকার এখানকার ছাত্রী। রেণু-র সঙ্গে আমি এবং শান্তিও যাচ্ছি। বক্তৃতা করতে মোটেই নয়। কারণ ইংরেজীতে আমি খাটো। কিন্তু বিলেত-ফেরত মেয়ে রেণুই তো আছে। এই ছাত্রীসংগঠনের নেত্রী হলো বিশ্বনাথের ভ্রাতুষ্পুত্রী কল্যাণী মুখার্জি। পরে কল্যাণী কুমারমঙ্গলম্। বাংলায় তো মোটামুটি সুবক্তা, ইংরেজীতেও মন্দ নয়।

আমাদের তিনজনের জায়গা হলো কলেজের প্রিন্সিপ্যাল শ্রীনির্মল সিদ্ধান্তের বাড়ি। এটা রেণুর জন্যই হলো। এঁরাও ব্রাহ্মসমাজের লোক। আমার খুব ভাল লাগল এই ভেবে যে এঁরাও আমাদের আত্মীয়। পরে অবশ্য দেখেছি, এই সমাজের বহু শিক্ষিত বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কমিউনিস্ট পার্টি'র বন্ধু, সমর্থক ও সদস্য। সম্ভবত ধর্মীয় কুসংস্কারের বাধা এঁদের সমাজে নেই এবং সমাজতন্ত্রেও এদের ভয় নেই। বিষয়টিকে এঁরা দার্শনিক দিক থেকে বিচার করে দেখতে পেরেছিলেন। তাই বহু সুপণ্ডিত ব্যক্তিও পার্টি'র ঘনিষ্ঠ ছিলেন।

সম্মেলনে কত মেয়েকে যে নতুন দেখলাম! পেরিন ভারুচা—পার্শী মেয়ে। বিমলা বাকায়া, কমল, মনোরমা, সাটিন, সরলা, শকুন্তলা—এরকম আরো কত অবাঙালী মেয়ে। শীলা ভাটিয়া এবং স্নেহ—এদেরও দেখেছিলাম। এদের সংগীত ও নাট্যানুষ্ঠান আমরা মুগ্ধ হয়ে দেখেছি। স্নেহকে হীর-রঞ্জা নাটকে খুব ভাল

অভিনয় করতে দেখেছি। বিমলা বাকায়ার নেত্রীত্বে পাঞ্জাবী মেয়েদের লোকনৃত্য খুব ভাল লেগেছিল। এই সব ছাত্রী-নেত্রীরাই তো বিভিন্ন প্রদেশে পরে মহিলা সমিতির সংগঠিকা ও নেত্রী। শুধু তাই নয়, অনেক সময়ে ছাত্রী অবস্থাতেই এরা মহিলা সমিতি গঠন করতে শুরু করে দিয়েছিল। কারণ শহরে-গ্রামে এই মেয়েরাই স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারে। বলতে গেলে—এরাই নারী-সমাজের পুরবর্তিনী। বাঙলাদেশে তো এই নিয়ে টানাটানি লেগে যেত। একটি কর্মী মেয়ে পেলে সে 'ছাত্রী' করবে না 'মহিলা' করবে—এ একটা ভয়ানক দ্বন্দ্বের ব্যাপার হয়ে দাঁড়াত। শেষ পর্যন্ত ওদের একটু বয়স বাড়লে দুটোই করতে হতো।

ছাত্রীসম্মেলনটিকে আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়েছিল। এই প্রথম আমরা কমিউনিস্ট কর্মীরা সর্বভারতীয় কমিউনিস্ট কর্মী হিসাবে পরস্পরকে দেখলাম ও চিনলাম। এই চোখের দেখাই পরবর্তীকালে কত ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে পরিণত হয়েছিল। ছাত্রীমঞ্চ ছেড়ে এ. আই. ডব্লিউ. সি. মঞ্চে ও মহিলা ফেডারেশন মঞ্চে আমরা একই সংগঠনের কর্মী ছিলাম। সেসব দিনের কথা আজও মনের পর্দায় ভাসে।

সম্মেলনে কে কি বক্তৃতা দিয়েছিলেন সেসব আর মনে নেই। কিন্তু শ্রীযুক্ত সরোজিনী নাইডুকে এই মঞ্চে দেখে খুব অবাক হয়েছিলাম। তিনি প্রধান অতিথি ছিলেন। তাঁর ওজস্বিনী বক্তৃতা এই প্রথম শুনলাম। পরে তাঁর সম্পর্কে আমার অভিজ্ঞতার কথা আরও বলব।

আগেই বলেছি, আমাদেরও তখন সংগঠন গড়ে তোলার ইচ্ছা। ছাত্রীদের অনুষ্ঠান হয়ে যাবার পর রেণু বুদ্ধি করে আমাকে নিয়ে মিসেস্ নাইডুর সঙ্গে দেখা করল, আমাদের সংগঠন বিষয়ে পরামর্শ নিতে। উনি বললেন, তোমরা এ. আই. ডব্লিউ. সি-তে যোগ দাও। ওদের সংগঠন সব প্রদেশে আছে। তাতে কংগ্রেস মহিলারূপে আছেন শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু নিজে এবং শ্রীযুক্তা রামেশ্বরী নেহরু। মিসেস্ নাইডু বলেছিলেন, যদিও এই সংগঠনে বড় ঘরের মহিলারাই নেত্রী এবং এরা সমাজসেবামূলক কাজ করে থাকেন কিন্তু ওদের কর্মীর অভাব রয়েছে। তোমরা যোগ দিলে ভাল হবে। কিছুদিন পরে কংগ্রেস থেকেও মহিলা সমিতির আহ্বান জানানো হবে। তোমরা তাতেও যোগ দিও।

আমরা ফিরে এসে একে একে এ. আই. ডব্লিউ. সি-তে সদস্যা হয়ে গেলাম। কলকাতায় ওদের একটা জেনারেল বডি ছিল। তার সদস্যা ফি ছিল বার্ষিক ৩ টাকা করে। পরে এই নিয়ে আমাদের সঙ্গে ওদের মতবিরোধ ঘটেছিল। ঐ ৩ টাকা দিয়েই আমাদের চেষ্টায় বেশ কিছু সংখ্যক মহিলা সাধারণ সদস্যা হয়ে এতে যোগ দিলেন। কার্যকরী কমিটিতে আমি, রেণু, সুধা রায়, কল্যাণী দাস

(কারলেকর), ফুলরেণু দত্ত (গুহ), নলিনী দাস এবং আরও কয়েকজন যেতে পারলাম। রেণুর মা, আমাদের সকলের মাসীমা, ঐ কমিটিতে অন্যতমা নেত্রী ছিলেন। এই মাসীমা, শ্রীযুক্তা ব্রহ্মকুমারী রায়ের চেষ্টায় আমাদের কমিটিতে যেতে কোন অসুবিধা হলো না। শ্রীযুক্তা ব্রহ্মকুমারী রায়ের কর্মজীবন সম্পর্কে পরে আরও বলব।

এ. আই. ডব্লিউ. সি-র পরিচালনায় তখন কয়েকটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে। শিশুদের জন্য ছিল কয়েকটি বালমন্দির এবং গরীব মেয়েদের জন্য ছিল শিল্প-সমিতি। এ কাজের জন্য ওঁরা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতেন। পরবর্তী সময়ে কলকাতায় একটি ওয়ার্কিং উইমেন্‌স হোস্টেল খুলে তারা কলকাতার চাকরীজীবী মেয়েদের বিশেষ উপকার করেন। হোস্টেলটি ওদের পরিচালনায় আজও চলছে। বাস্তবিকই চাকুরে মেয়েদের জন্য সম্মানজনক বাসস্থান কলকাতায় খুব একটা ছিল না।

এ ছাড়া তখন পতিতালয়ে গিয়ে ইচ্ছুক মেয়েদের উদ্ধার করার জন্য সরকারী চেষ্টার সঙ্গেও এঁরা যুক্ত ছিলেন। পুলিসের সাহায্য নিয়ে একাজ করতে হতো। তৎকালীন সরকার একাজে ওদের সহায়তা চেয়েছিলেন। উদ্ধারপ্রাপ্ত মেয়েদের বাড়ির লোকেরা ফেরত না নিলে লিলুয়া হোমে পাঠানো হতো। রেণু চক্রবর্তী নেত্রীদের সঙ্গে থাকত।

এ. আই. ডব্লিউ. সি-তে দিল্লী, পাঞ্জাব, বম্বে, অন্ধ্র, উত্তরপ্রদেশসহ অন্যান্য জায়গার আমাদের মহিলা কর্মীরাও যোগ দিলেন। বম্বে, পাঞ্জাব এবং অন্ধ্রে আমাদের মেয়েদের কাজ করতে খুব সুবিধা ছিল। ঐসব জায়গার নেত্রীরা আমাদের কর্মীদের উপর খুবই নির্ভর করতেন। এমনকি পরে যখন আমাদের কর্মীরা বিভিন্নমুখী কাজের চাপে নিজেদের পৃথক মহিলা সংগঠন গড়ে তুললেন তখনও নারী-সমাজের অধিকার সম্পর্কিত আন্দোলনে স্থানীয় এ. আই. ডব্লিউ. সিও তাতে যোগ দিতেন। এতে ঐসব আন্দোলন শক্তিশালী হতো।

কিন্তু এখানে এটা করা যায়নি। সাধারণ সভ্যদের জন্য চার আনা ফি করা হোক—এখানে আমরা এই দাবীটি তোলা মাত্রই নেত্রীরা ভয় পেলেন। তাঁরা ভাবলেন, সংগঠনকে যদি আমরা সাধারণ মেয়েদের মধ্যে টেনে নিয়ে যাই তাহলে ওঁদের নেত্রীত্ব বিপন্ন হবে। আমাদের উপর ওঁদের সন্দেহ হলো যে হয়তো এই সংগঠনকে আমরা কমিউনিস্ট সংগঠনে পরিণত করব। এরকম কোন পরিকল্পনা অবশ্য আমাদের ছিল না, থাকতে পারেও না। আমরা চেয়েছিলাম সাধারণ মেয়েদের সঙ্গে উপর তলার মেয়েদের একটু যোগাযোগ ঘটাতে। এতে নারীসমাজের অধিকার সম্পর্কিত দাবীগুলি শুধু প্রস্তাবের মধ্যে আটকে না থেকে আন্দোলনের রূপ নিতে পারবে,

যেমন অন্যান্য প্রদেশে হচ্ছিল।* কিন্তু এখানকার নেত্রীরা সরোজিনী নাইডু বা রামেশ্বরী নেহরুর উদার ও মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন না। যে ক'জন কংগ্রেসের মহিলা এখানে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের ঘোরতর কমিউনিস্ট বিদ্বেষ বেশীর ভাগকেই প্রভাবিত করল। যাহোক, সাধারণ সভায় চার আনা সদস্য পদের প্রস্তাবটা পাশ হলো এবং আমাদের উত্থাপিত এই প্রস্তাবটি অকোলায় সারা ভারত সম্মেলনমঞ্চ থেকে প্রত্যাখ্যাত তো হোলই না বরং সেটি গ্রহণ বা বর্জনের দায়িত্ব বিভিন্ন প্রদেশের ইচ্ছার উপরেই তারা ছেড়ে দিলেন। পরের বছর প্রাদেশিক সম্মেলনে দেখা গেল ওরা ৩ টাকার সদস্যা সংখ্যা অনেক বাড়িয়েছেন এবং তারই জোরে নতুন কার্যকরী কমিটিতে আমরা সবাই ভোটে হেরে গেলাম। অবাক হয়ে দেখলাম, ফুলরেণু দত্ত সেক্রেটারী নির্বাচিতা হলেন এবং কালক্রমে হলেন কংগ্রেস কর্মী আরও পরে কংগ্রেসের আনুকূল্যে রাজ্যসভার সদস্যা ও মন্ত্রী। অথচ চিরকাল ওকে বামপন্থী বলে জানতাম এবং এ. আই. ডব্লিউ. সি-তে যোগ দেবার কথা আমিই ওকে প্রথম বলি।

এই কমিটির মধ্যে সকলেই কিন্তু এরকম কমিউনিস্ট ভীতিতে ভুগতেন না। কয়েকজনের সঙ্গে আমাদের বেশ ভাবও ছিল। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্তা মলিনা দত্তের কথা খুবই মনে পড়ে। তিনি বরাবর আমাদের স্নেহের চোখেই দেখেছেন এবং কিছু কিছু কাজেও আসতেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ

১৯৩৯ সনে রাজবন্দীরা মুক্ত হলেন। ওদিকে যুদ্ধের দামামাও বেজে উঠল। এ-যুদ্ধে জার্মানীর ফ্যাসিস্ট হিটলারই প্রথমে পোল্যাণ্ডকে আক্রমণ করে, তারপর ছড়িয়ে পড়ে যুদ্ধের আগুন। যুদ্ধটা যে এত ব্যাপক হবে একথা এতদূরে বসে আমরা ভারতবাসীরা প্রথমে বুঝতে পারিনি। বছরখানেক যুদ্ধের আগুন জ্বললেও তখনও তার আঁচ আমাদের গায়ে এসে পৌঁছায়নি। ১৯৪০ সনে হিটলার ফ্রান্সকে আক্রমণ করে এবং তারও কিছু বাদে ইংল্যাণ্ডের উপরে শুরু হয় প্রবল বোমাবর্ষণ। অর্থাৎ জার্মানীতে প্রস্তুত সমস্ত রকম আধুনিকতম যুদ্ধাস্ত্র ও যুদ্ধশাস্ত্রে সর্বাধিক পারদর্শী সেনাবাহিনীদের নিয়ে হিটলার ইউরোপে যুদ্ধের দাবানল জ্বালিয়ে দিলেন। হিটলারের সঙ্গে প্রথমে যোগ দিলেন ইটালীর মুসোলিনী।

এ-যুদ্ধ কেন, কি বৃত্তান্ত, কবে থেকে ধূমায়িত হচ্ছিল—আমি সে ইতিহাসে যাচ্ছি না। তবে আমাদের দুর্ভাগ্য যে, আমরা এতদূরে বসেও যুদ্ধের মধ্যে জড়িয়ে পড়লাম। অবশ্য সরাসরি 'জড়িয়ে পড়লাম' বলা চলে না। পরাধীন ভারতের মনিব আক্রান্ত, অতএব মনিবের ভাগ্যের সঙ্গে জড়িত ভারতও তার বাইরে থাকতে পারে না—এটাই ইংরেজের হুকুম। তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রসদ যোগানদারদের মধ্যে ভারতবর্ষ বৃহত্তম দেশ, সুতরাং ইংরেজদের আত্মরক্ষার দায়ভাগ ভারতবাসীকে কাঁধে নিতেই হবে।

ইংরেজদের এই আবদারে কংগ্রেস বেঁকে বসল। তার কথা, তোমরা রাজায় রাজায় লড়ছ—লড়, কিন্তু আমরা উলুখাগড়ারা তার মধ্যে যাব কেন? আমাদের তাতে কি স্বার্থ?

কিন্তু কে শোনে এসব কথা? ভারতকে জবরদস্তি ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের যুদ্ধসঙ্গী করে দেওয়া হলো। কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, সোশ্যালিস্ট পার্টি ইত্যাদি সকল দলই এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেন; যুদ্ধবিরোধীদের অন্যতম ছিলেন স্বয়ং সুভাষচন্দ্র বসু। সুভাষচন্দ্র এবং অন্যান্য নেতাদের নেতৃত্বে যুদ্ধবিরোধী মিটিং-মিছিল হতে লাগল। যেসব রাজ্যের মন্ত্রীসভায় কংগ্রেসের মন্ত্রীরা ছিলেন, যুদ্ধের প্রতিবাদে তাঁরা সঙ্গে সঙ্গেই পদত্যাগ করলেন।

সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস থেকে সাময়িকভাবে পদচ্যুত করে রাখা হয়েছিল ত্রিপুরী কংগ্রেসে তাঁর সঙ্গে নেতৃত্বের মতোবিরোধের জন্য। আগেই বলেছি, বাঙলায়

এই বিরোধের ফলে 'এ্যাড্ হক্ কংগ্রেস' নামে একটি কমিটি গঠিত হলো। এরই মারফত তখন কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কাজ চালাতেন। কিন্তু বাঙলার মূল কংগ্রেস কমিটির নেতৃত্ব ছিল সুভাষচন্দ্রের হাতে। এই কংগ্রেসেরই প্রবল প্রভাব তখন সারা বাঙলায়। কমিউনিস্ট পার্টি এ্যাডহক কংগ্রেসের সঙ্গে থাকাই সঠিক মনে করল, একথা আগেই বলেছি। এ্যাডহক কংগ্রেসের বাইরে বাঙলায় যে কংগ্রেস ছিল—সেটাই ফরোয়ার্ড ব্লক-এ রূপান্তরিত হয়েছিল পরবর্তীকালে।

তখন এই যুদ্ধের বিরুদ্ধে কংগ্রেসের মূল আওয়াজ সকলেই গ্রহণ করল। এ-যুদ্ধ সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, সুতরাং এতে আমাদের একটি পয়সা বা একটি লোকও প্রাণ দেবে না। কিন্তু কিভাবে এই বিরোধিতাকে রূপ দিতে হবে তা নিয়ে মতভেদ হলো। গান্ধীজী জোরালো রকমের কোন প্রোগ্রামে রাজী নন। যুদ্ধ-বিরোধী সভা, বক্তৃতা ইত্যাদি চললো বটে কিন্তু গান্ধীজী শ্লোগান দিলেন—'ব্যক্তিগত' সত্যাগ্রহের, গণসত্যাগ্রহের নয়। শ্রীবিনোবা ভাবে প্রথম সত্যাগ্রহী হিসাবে বন্দী হলেন এবং অতঃপর একে একে অন্যান্য নেতৃবৃন্দ নিক্ষিপ্ত হলেন কারাগারে।

কমিউনিস্ট পার্টি চাইছিল সমস্ত দলের সম্মিলিত নেতৃত্বে এই আন্দোলনকে গণ-আন্দোলনে পরিণত করতে, যুদ্ধ-বিরোধী মানুষের বিক্ষোভ প্রকাশের একটা পথ উন্মুক্ত করতে। যুদ্ধের বিরুদ্ধে হরতাল, ধর্মঘট ও গণসত্যাগ্রহ ছিল কমিউনিস্ট পার্টির সেই পথ। কংগ্রেসের ঐ ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে একমাত্র নেতাদের ধরা ছাড়া ইংরেজ সরকারকে আর কিছুই করতে হয়নি। এতে যুদ্ধের জন্য রসদ তৈরি করা কিংবা কারখানায় যুদ্ধের প্রয়োজনীয় মাল উৎপাদন ইত্যাদি কোন কিছুই ব্যাহত হয়নি।

কমিউনিস্ট পার্টি তার সামান্য শক্তি নিয়ে যুদ্ধবিরোধী প্রচারে নামল। এই প্রচারে আমিও আছি। মাঠে মাঠে বক্তৃতা দিচ্ছি—এ-যুদ্ধে একটি মানুষও নয়, একটি পয়সাও নয়। সুভাষচন্দ্রের মিটিংগুলোতে সুযোগ পেলে আমি যেতাম। খুব জোরালো বক্তৃতা হতো।

গান্ধীজী দাবী জানালেন—একমাত্র ভারতের স্বাধীনতার শর্তেই, অর্থাৎ স্বাধীন ভারত, স্বাধীন সরকার ও স্বাধীন নাগরিক হিসাবে এই যুদ্ধে আমরা সহায়তা করতে পারি, নতুবা নয়।

এই সময়ে হঠাৎ যুদ্ধের একটা বিরাট পটপরিবর্তন ঘটল। ১৯৪১ সনের জুন মাসে হিটলার সোভিয়েট রাশিয়া আক্রমণ করে বসল। ১৯৪১ সালের শেষের দিকে জাপান পার্লহারবার আক্রমণ করল ও খোলাখুলি যুদ্ধ ঘোষণা করল। এর পর ঝড়ের বেগে কয়েক সপ্তাহের মধ্যে তারা ব্রহ্মসীমান্তে পৌঁছে গেল। রোম, বার্লিন ও টোকিও—এই তিন অক্ষশক্তির কমিউনিস্ট-বিরোধী জোট পূর্বেই তৈরি ছিল।

ছনিয়া দখলই এদের প্রধান লক্ষ্য। অতঃপর যুদ্ধ আর দূরের ব্যাপার রইল না। ভারতের প্রায় মাথার উপরে এসে পড়ল।

কারামুক্ত কংগ্রেস নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় বসতে 'ক্রীপস মিশন' ভারতে এলেন। কিছু ফল হলো না। 'শর্তাধীন স্বাধীনতা' কংগ্রেস গ্রহণ করল না। পরবর্তী নীতি স্থির করার জন্য গান্ধীজীর নেতৃত্বে এ. আই. সি. সি.-র অধিবেশন বসল। অধিবেশন থেকে শ্লোগান বা নির্দেশ এলো—'ভারত ছাড়'। 'করেঙ্গে ইয়া মরেঙ্গে' হলো আন্দোলনের আহ্বান। সমস্ত রকম পথেই জাতীয় মুক্তি সম্ভব করার জন্য জনসাধারণকে আহ্বান জানালেন কংগ্রেস নেতৃত্ব। কিন্তু সে আন্দোলন সংগঠিত-ভাবে পরিচালনা করবার সুযোগ তারা পেলেন না। এ. আই. সি. সি. অধিবেশন চলাকালেই '৪২ সনের ৯ই আগস্ট বোম্বাইতে কংগ্রেসের প্রায় সমস্ত নেতাকেই সরকার আটক করল। জনতাকে নেতৃত্ব দেবার প্রায় কেউ রইলেন না। তথাপি দেশব্যাপী কংগ্রেস বেআইনী ঘোষিত হলো। প্রতিবাদে গণবিক্ষোভের উত্তাল তরঙ্গ বয়ে যেতে শুরু করল। নেতৃত্ববিহীন সেই বিক্ষোভের ফলে সরকারী দমন-নীতির তলায় জনসাধারণ পিষ্ট হতে লাগল। ওদিকে আমরা পড়লাম উভয় সঙ্কটে। সোভিয়েট তখন আক্রান্ত। যদি সে পরাস্ত হয় তবে পৃথিবীব্যাপী ফ্যাসিজম্ জেঁকে বসবে। স্বভাবতই যুদ্ধের দুটো পক্ষ হলো—একদিকে আক্রমণকারী হিটলারচক্র, অন্যদিকে সোভিয়েট রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি আক্রান্ত দেশগুলি।

'৪১ সনের শেষদিকে এল পার্টির নতুন লাইন। এ-যুদ্ধ জনতার যুদ্ধ, এ-যুদ্ধ ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে সমস্ত পৃথিবীর যুদ্ধ। সুতরাং এ-যুদ্ধে ইংরেজকে যেভাবে আমরা আক্রমণ করতাম—এখন আর তা করা চলবে না। 'স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও' নামক পুস্তিকায় আমাদের পার্টিলাইন প্রচারিত হলো। সে পুস্তিকায় যে লাইন ছিল তাতে আমরা মুস্কিলে পড়লাম। গান্ধীজীরা নেতৃত্ব দিলেন না কিন্তু আহ্বান দিয়ে গেলেন। ১৯৪২ সনে সে আহ্বানে স্বাধীনতাকামী ও ইংরেজ-বিরোধী জনতা ভয়হীন উন্মাদনায় উদ্বেলিত হয়ে উঠল। স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদে রেললাইন উপড়ানো থেকে জনতা যেখানে যেভাবে পারে আঘাত হানতে লাগল। জাতীয় পতাকার মর্যাদা রক্ষায় নির্ভয়ে পুলিসের গুলির সম্মুখীন হলো। সোশ্যালিস্ট পার্টির কিছু নেতা আত্মগোপন করেছিলেন এবং যেখানে যেভাবে সম্ভব এই কাজে নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন।

কলকাতা তখন জাপানী আক্রমণের ভয়ে ভীত। রাত্রের কলকাতায় নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। যুদ্ধের করাল ছায়া সর্বত্র।

ইতিমধ্যে সুভাষচন্দ্র গোপন পথে জার্মানীতে চলে গেছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল

ওখান থেকে সাহায্য নিয়ে ভারতীয় বাহিনী গড়ে তুলে ইংরেজের বর্মা ঘাটি ভেঙে ভারতে প্রবেশ এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করা। ভারত তো প্রস্তুত ছিলই।

সবচেয়ে মুস্কিলে পড়লাম আমরা। অন্তত আমি। পার্টি লাইনের পুরো আলোচনা-সমালোচনা করতে আমি সক্ষম নই কিন্তু নিজের মনের মধ্যে এ-লাইন আমি সর্বতোভাবে সঠিক মনে গ্রহণ করতে পারিনি। সুভাষচন্দ্রের জার্মানী যাওয়া এবং পরে ১৯৪২ সনে জাপান যাওয়া আমরা বিরূপ চোখে দেখলাম। ১৯৪২ সনে পার্টির নতুন লাইন বেরুল। ওদিকে ভারতে জাপানী আক্রমণ শুরু হলো। 'জনযুদ্ধ' কাগজে সুভাষকে কুইসলিং বলা হলো ও কার্টুন বের হলো। এর ফলে জনতার কাছ থেকে আমরা উপহার পেলাম ঘৃণা, বিতৃষ্ণা ও ধিক্কার। সুভাষচন্দ্র তখন বাঙলার জনমানসে যে কতবড় শ্রদ্ধার আসনে বসেছিলেন সেটা বোধহয় আমাদের জানা ছিল না। নয়তো সুভাষচন্দ্র কি করছেন জানবার আগেই আমরা তাঁকে কী অপমানই না করলাম এবং দেশের মানুষকে কী আঘাতই না দিলাম! সুভাষ বসুর প্রশংসা গান্ধীজীও করেননি, জওহরলালও করেননি। কিন্তু তাঁকে জাপানী দালালও বলেন নি। জাপানী বাহিনী নিয়ে এলে জওহরলাল নিজে গিয়ে তার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন—এও বলেছিলেন। কিন্তু এলে তবে তো! সুভাষচন্দ্র ঠিক তাই-ই করতে গিয়েছিলেন কিনা তাও আমরা জানতাম না। আমার বিশ্বাস পার্টি-নেতৃত্বও জানতেন না। কিন্তু আগ বাড়িয়ে যে কলঙ্ক তাঁকে আমরা দিলাম—তা তাঁর গায়ে লাগেনি। তাতে আমাদেরই ক্ষতি হয়েছে প্রচুর। সুভাষচন্দ্রের লাইন আদৌ কংগ্রেস সমর্থিত ছিল না। কিন্তু পরবর্তীকালে কংগ্রেসের চুনোপুটি থেকে নেতারা পর্যন্ত বাঙলাদেশে সুযোগ বুঝে পরম সুভাষভক্ত সেজে কি লম্ফ-ঝম্ফটাই না করল! সাধারণ সুভাষভক্ত মানুষদের কথা আমরা বুঝি। আমাদের প্রতি তাদের বিরক্তির কারণ সত্যিই ছিল। কিন্তু ঐ মেকী কংগ্রেসী সুভাষভক্তির আস্ফালনটা প্রতি নির্বাচনে আমাদের গায়ে যেন আগুন ধরিয়ে দিত। ভুল স্বীকার আমরা করতাম, কিন্তু ওদের উদ্দেশে নয়, সাধারণ মানুষের কাছেই। কারণ ত্রিপুরীর কথা তো আমরাও ভুলিনি। কংগ্রেস নেতৃত্বের ন্যক্কারজনক ভূমিকার জন্য কংগ্রেসকেও আমরা ক্ষমা করিনি। ইংরেজের 'দালাল' বলে কংগ্রেসীরা আমাদের গালাগাল দিত। কিন্তু পার্টির লাইনের বক্তব্যে তা ছিল না। বরং ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে যা বলা হতো তাতে তারা ক্রুদ্ধ হয়েও কিছু করার সাহস পায়নি আমাদের ফ্যাসিস্টচক্রের বিরোধিতার জন্য। এ বিরোধিতা তো কংগ্রেসকেও স্বীকার করতে হয়েছিল, আন্তর্জাতিক পটপরিবর্তন ও ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্ক মনে রেখেই। কিন্তু একথা তারা সরাসরি তাঁদের মঞ্চ থেকে প্রথমদিকে বলতে

পারলেন না এবং কংগ্রেসকর্মীদেরও শেখালেন না বোধহয় দুটো কথা মনে রেখে।
প্রথমত এতে ইংরেজ বিরোধিতার ধার কমে যাবে এই ভয় এবং দ্বিতীয়ত দেশদ্রোহী আখ্যা দিয়ে যদি কমিউনিস্টদের কিছুটা কাৎ করা যায় তো মন্দ কি? সুতরাং স্বাধীনতা যখন এলই না তখন কারান্তরালে চুপচাপ থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করলেন তারা।

কিন্তু আমাদের পক্ষেও এই নতুন লাইন নিয়ে প্রচারে নামা কম কঠিন কাজ ছিল না। সাধারণ লোককে এই আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের ঔচিত্য সম্পর্কে বোঝাতে আমরা সত্যিই হিমসিম খেতাম। কাল যেখানে বলেছি—'এ যুদ্ধে একটি মানুষ, কিংবা একটি পয়সা নয়', আজই আবার কি করে বোঝাই—'এ যুদ্ধ জনযুদ্ধ'! তাছাড়া ব্যক্তিগতভাবে আমি খুবই অসুবিধায় পড়েছিলাম। বিষয়বস্তু সম্পর্কে ধারণার অস্পষ্টতা প্রথমে তো খুবই ছিল। পার্টির নির্দেশ ছিল—'দেশপ্রেমিক ও পুলিসের মাঝখানে দাঁড়াও,' 'পঞ্চমবাহিনী ও দেশপ্রেমিকদের মাঝখানে দাঁড়াও,' কিন্তু কেমন করে এ নির্দেশ কার্যকর করব? কারা পঞ্চমবাহিনী? যারা আমাদের কথা মানে না তারাই কি? এখন মনে হয় ঐ কথাটা প্রয়োগ না করলে ভাল ছিল। 'দেশদ্রোহী' বললে যেমন আমাদের গায়ে জ্বালা ধরে, না জেনে কাউকে 'পঞ্চমবাহিনী' বলার অধিকারও তেমনি আমাদের নেই। কিন্তু এসব কথা আমাদের ভাবার সময় কোথায় তখন? ফলে, 'পঞ্চমবাহিনী' কথাটার হাস্যকর অপপ্রয়োগ ঘটতে লাগল। সামান্য একটা 'ভুখা মিছিল' নিয়ে যাচ্ছিল সোশ্যালিস্ট পার্টির লোকেরা। মিছিলে ছিল নিতান্তই ছোট ছোট ছাত্র ও ছেলেমেয়েরা, আর অল্প কিছু গরীব লোক। এই মিছিল বেশী এগোলেই পুলিস ওদের পেটাবে মনে করে আমরা কিছু কর্মী সেটা ঠেকাতে গেলাম। ওরা রেগে গিয়ে আমাদের একজন কর্মীকে মারধোর করল। আমরাও 'পঞ্চমবাহিনী' বলে ওদের গালাগাল দিলাম। পরে জেনেছিলাম—আমারই এক পরিচিত সোশ্যালিস্ট বন্ধুর নেতৃত্বে ঐ মিছিলটা যাত্রা শুরু করেছিল। তিনি আমাদের লাইন না মানতে পারেন কিন্তু পঞ্চমবাহিনী কখনই নন। পরে তিনি আমাকে অনুযোগ করেছিলেন, 'তুমি এই কাজ করলে?' এ ধরনের ভুল অনেক ঘটতে লাগল।

ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে সঙ্গত ঘৃণা ও বিতৃষ্ণার ফলে আমি নিজে অনেককে বলতে শুনেছি, 'জাপানীরা আসুক না, ক্ষতি কি? ইংরেজ ব্যাটারা তো যাবে। হিটলার বাহিনী সোভিয়েটের অভ্যন্তরে যত প্রবল বিক্রমে ঢুকছে ততই আহ্লাদে অট্টহাসি হেসে হাততালি দিতে আমি নিজে অনেককে দেখেছি। তখন একটা ছোট

স্কুলে আমি পড়াই। ঐ স্কুলের শিক্ষক ভদ্রলোকদের এই আচরণ আমার কাছে বর্বর মনে হতো। তারা জানতেন আমি কমিউনিস্ট। তাই প্রতিদিন স্কুলে এসে কাগজ খুলে আমাকে শুনিয়ে শুনিয়ে তারা বলতেন, 'এইবার লালফৌজরে হিটলার বাহিনী কলাগাছের মতন কাইট্যা ফালাইত্যাছে, এইবার চাঁন্দেরা যাইব কোথায়? গেছিলি ক্যান ব্যাটারা অগো লগে যুদ্ধ করতে?' আমি বলতাম, 'ওরা তো যায়নি, ওরা তো বিনা কারণে আক্রান্ত। তাছাড়া সোভিয়েট হেরে গেলে আপনাদের এত আনন্দ কেন বলুন তো?' যা বলতেন, তাতে বোঝা যেত—এটা অক্ষমের আস্ফালন ছাড়া কিছু নয়। এরা ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়ে না, হিটলারের বিরুদ্ধেও না।

কিন্তু এই তো আমাদের জনসাধারণ। কি ভাষায়, কি যুক্তিতে কথা বললে এরা বুঝবে তা তো নিজেও জানি না।

আমাদের নতুন পার্টি লাইন বেরুবার পর কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে সরকার নিষেধাজ্ঞা তুলে নিল। সব নেতা ও কর্মীরা ছাড়া পেলেন। দীর্ঘকাল তো এই পার্টিকেই পয়লা নম্বর শত্রু মনে করে সরকার নিষিদ্ধ করে রেখেছিল, কংগ্রেসকে নয়। কিন্তু নিষেধাজ্ঞা তোলার সঙ্গে সঙ্গেই কংগ্রেসকর্মীরা আমাদেরকে 'দালাল' বলতে শুরু করল। শত্রু চিনতে ইংরেজ ভুল করেনি। এই পার্টিকে না ছাড়লে এদেশে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না, এটা ধুরন্ধর ইংরেজের বুঝতে দেরি হয়নি। তাই এই উদারতা, অন্য কোন কারণে নয়।

পার্টি নেতারা ছাড়া পাবার পর পার্টি লাইন বোঝানোর জন্য তারা আমাদের নিয়ে আলোচনায় বসতে লাগলেন। প্রথমে একজন জিলা নেতা এলেন। আমরা অনেকেই তার কথা মানতে পারিনি। এরপর বঙ্কিমবাবু এলেন। প্রচারকদের মধ্যে আমি আছি। তাই আমাকে তো বোঝাতেই হবে। অনেক তর্ক করলাম, সোভিয়েট আক্রান্ত হয়েছে বলে আমরা ইংরেজদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে যাব না, কার্যত এ কথার মানে তো এই যে ইংরেজের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলনে এখন আর আমরা নেই। যুদ্ধ-প্রচেষ্টা বা সামরিক উৎপাদনে বাধা দেওয়া আমাদের চলবে না। তাছাড়া, কাল এক কথা বলেছি, আজই অন্য কথা বলি কি করে? এতে লোকে আমাদের দালাল বলবে না তো কি বলবে? এইটুকুই আমি বুঝেছিলাম।

প্রথম প্রথম একথা লোককে বোঝানো যে কঠিন কাজ, তার অভিজ্ঞতা আমাদের সব কর্মীদেরই ছিল।

বঙ্কিমবাবুর সঙ্গে প্রচারে বেরিয়েছি। প্রথম গেলাম ফরিদপুর জিলায়। উনি আমাকে বললেন, 'আমি কিভাবে বলি সেটা শুনুন, তাহলে আপনিও পারবেন।'

আমার মনে প্রচণ্ড ভয়। শহরে আমাদের বিরুদ্ধে পোস্টারে পোস্টারে দেওয়ালগুলো ছেয়ে গেছে। টাউন হলে সভা হবে। উপরে টিনের চালা। বঙ্কিমবাবু উঠে বলতে আরম্ভ করলেন ধীর-গম্ভীর কণ্ঠে। একটু পরেই দু'টো একটা ঢিল পড়তে শুরু করল। ক্রমশ বেশী। অবশেষে শিলাবৃষ্টির মতো। নিরুপায় বঙ্কিমবাবু থামলেন। আমার তখন রক্ত চড়ে গেছে মাথায়। একি অসভ্যতা? মানুষের বলার স্বাধীনতা থাকবে না কেন? গ্রহণ বা বর্জন যার যেমন ইচ্ছা করতে পারেন, কিন্তু বলতে দেবেন না কেন? মানুষের কণ্ঠরোধ করা তো ফ্যাসিজম। বলতে উঠলাম। এই রকমের তীব্র ভাষা ব্যবহার করলাম। উপস্থিত ভদ্রলোকদের কাছে আবেদন জানালাম—শহরের ভদ্রতা আতিথেয়তা বজায় রাখার জন্য। কিছু ভদ্রলোক উঠে বাইরে গিয়ে ছেলেদের সরিয়ে দিলেন। নিরুপদ্রবে বললাম এবং মনে হলো কিছুটা যেন বোঝাতে পারলাম। অথবা মেয়ে বলেই বোধহয় পার পেয়ে গেলাম।

বঙ্কিমবাবু চলে গেলেন। আমি রয়ে গেলাম মহিলা সমিতির পত্তন করতে।

পরদিন মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। ছেলেদের অভদ্রতার জন্য দুঃখও প্রকাশ করলেন। তাঁর বাড়িতে খাওয়ার নিমন্ত্রণ জানালেন। নানা আলোচনার মধ্যে উনি বললেন, 'আপনারা সুভাষবাবুর বিরুদ্ধে ওসব কথা বলেন কেন?' ভদ্রলোক সুভাষ বসুর প্রতি প্রকৃতই শ্রদ্ধাশীল। আমি অনেক নম্রভাবে ও ভাষায় তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করলাম তাঁর নীতির সঙ্গে আমাদের তফাত কোথায়। জাপানের সাহায্যে আমাদের প্রকৃত স্বাধীনতা আসতে পারে না, তাছাড়া ফ্যাসিস্টচক্রের বিরুদ্ধে আমাদের দেশের স্বার্থে ও বিশ্বের স্বার্থে এ সংগ্রাম আমাদের করতেই হবে। ভদ্রলোক শুনলেন, খুব যে মেনে নিলেন তা মনে হলো না। স্থানীয় পার্টি থেকে চেষ্টা চলছিল, উকিল লাইব্রেরীতে গিয়ে তাঁদের কাছেও কিছু বলার জন্য। চেয়ারম্যান ভদ্রলোকটি আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন। এইসব শহরে উকিলবাবুরা হলেন গণ্যমান্য ব্যক্তি। কিন্তু এসব আলোচনায় নষ্ট করার মতো সময় তাদের নেই। সামান্যই কথা হলো। কিন্তু কোন অভদ্র কথা কেউ বলেননি।

এরপর ওখানে মহিলাসভা হলো। চেয়ারম্যানবাবুর বাড়ির মেয়েরা এলেন। আশ্চর্যের বিষয় মহিলারা কিন্তু আমাদের সমিতির সদস্যা হতে আপত্তি করেননি। স্থানীয় নেত্রী হলেন অমিয়া সেন।

এরপর নিজের উপর কিছুটা আস্থা বাড়ল। জিলায় জিলায় কখনও একলা, কখনও কোন নেতার সঙ্গে ঘুরতে থাকলাম। পার্টি থেকে অনেক প্রচার-পুস্তিকা বেরুতে লাগল। তার সাহায্যে বলতে অনেক সুবিধা পেলাম। সর্বত্রই আমাকে জনসভার পর মহিলা সমিতি গঠনের জন্য ২/৪ দিন থেকে যেতে হতো। স্থানীয়

অল্পবয়সী মেয়ে-কর্মীদের সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে সভার আয়োজন করা, সভায় মেয়েদের বোঝানো এবং সমিতি স্থাপন করা—এসব কাজই সঙ্গে সঙ্গে চলত।

এমনি এক সভায় ঢাকার দয়াগঞ্জে গিয়ে উপস্থিত হলাম আমি ও বেলা লাহিড়ী। ওখানকার মহিলা নেত্রী ছিলেন শ্রীমতী নিবেদিতা। একটা কলেজে পড়াতেন। বাড়িটি ঘোর কমিউনিস্ট বিরোধী। নিবেদিতার মনের জোর, মিষ্টি ব্যবহার ও পার্টির প্রতি নিষ্ঠার ফলে তার বাবা একরকম বাধ্য হলেন বাড়িতে পার্টির লোকদের আসা যাওয়া করতে দিতে। নেপাল নাগের সঙ্গে ওখানেই দেখা। তিনি পার্টির নেতা। নিবেদিতা পরবর্তী সময়ে 'নিবেদিতা নাগ' হয়ে গেলেন। এ ব্যাপারে আমারও একটু ভূমিকা ছিল। সুরসিক নেপাল নাগ এই সুবাদে আমাকে শাশুড়ী বলে ঠাট্টা করতেন।

দয়াগঞ্জে পৌছেই দেখি সর্বত্র দেওয়ালে ইংরেজী,বাংলায় লেখা রয়েছে—'মণিকুন্তলা ফিরে যাও'। 'মণিকুন্তলার কুন্তল কেটে নেওয়া হবে।' তাছাড়া 'দালাল-ফালাল' কথাগুলো তো ছিলই। নিবেদিতাকে সভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'মার-টার লাগাবে নাকি'? নেপাল নাগ বললো, 'ঐসব চ্যাংড়া গুলানের কাম। ভয় পাইবেন না। পার্টি এখানে শক্ত'। কেনই বা হবে না? ঢাকা-ময়মনসিং-এর পার্টি তো গড়ে উঠেছে ওখানকার ভূতপূর্ব বিপ্লবী বীরযুবকদের হাতে, তাঁরা জনসাধারণের স্নেহ ও শ্রদ্ধার পাত্র। নেপাল নাগ তাঁদেরই একজন।

জনসভা হলো। বক্তৃতায় আমার যুক্তি ও ধার এসে গেছে। আর ভয় পাই না। কোন অপ্রিয় ঘটনা ঘটেনি। কুন্তলও অক্ষত রইল।

যথারীতি মহিলা সভা ও মহিলা সমিতি স্থাপন করা হলো। নিবেদিতা নেত্রী। সেও তখন নানা শহরে ও গ্রামে সমিতি স্থাপনের ভার নিল। শুধু ঢাকায় নয়, পরবর্তীকালে সারা বাঙলায়।

এরপর থেকে আমার জিলায় জিলায় ঘোরার কাজ ক্রমশ বাড়তে লাগল। পূর্ববঙ্গ-পশ্চিমবঙ্গ তখনও হয়নি। পরিধিটা বড়ই ছিল। প্রায় সব জিলা শহর ও বহু মহকুমা ও গ্রামে ঘুরতাম। কাজ ঐ একই। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রচার, বক্তৃতা ও মহিলা সমিতি স্থাপন। বরিশাল জিলায় আমাকে অবশ্য খুব যেতে হয়নি, কারণ সেখানে ছিলেন যুঁইফুল বসু ও মনোরমা বসু। অন্যান্য ছাত্রীমেয়েরাও অনেকে গেছে।

সবচেয়ে মুস্কিল লাগত কলকাতা শহরে। আমাদের হ্যাণ্ডবিল-পুস্তিকা ইত্যাদি নিয়ে বাড়ি বাড়ি স্কোয়াড করতাম। লোকেরা যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা। কিছুতেই গলানো যায় না। একবার এক বাড়ির দোতলা থেকে রেণু ও আমার মাথায়

তরকারির খোসা ফেলে দিল। দেখে, কি না দেখে, ঠিক জানি না। তবে তখন মনে হয়েছিল দেখেই। কারণ কড়া নাড়তে তারা দরজা খোলেননি। অনেক বাড়িতেই বলে দিত সময় নেই। ভদ্রলোকেরা আমাদের বলতেন, 'আপনারা খুব ভাল ভাল কথা বলতে পারেন, শুনতে বেশ লাগে, কিন্তু একেবারে মেশিনের মতো শেখানো কথা আউড়ে যাওয়া হচ্ছে না কি? আপনারা সবাই এত একই রকম কথা বলেন কি করে?'

কাজের শেষে সব কর্মীরা যখন একসঙ্গে আলোচনায় বসতাম তখন দেখা যেত প্রায় সকলেরই এক অবস্থা। মাঝে মাঝে হতাশ লাগত। ভাবতাম, আমাদের এইটুকু সাহায্য ছাড়া কি সোভিয়েটের মুক্তিযুদ্ধ সফল হতে পারবে না? এ যেন না ঘরকা, না ঘাটকা অবস্থা। কংগ্রেস নেতৃত্ব কারাগারে আটক থাকা সত্ত্বেও যেসব স্বাধীনতা সংগ্রামীরা লড়ছে, মার খাচ্ছে, তাদের পাশেও আমরা গেলাম না। তুলনাহীন অত্যাচার সত্ত্বেও 'স্বাধীন মেদিনীপুর', 'স্বাধীন সাঁতারা' তো হয়েছিল। আমাদের শক্তি সামান্য হলেও এর সঙ্গে থাকলে সেই শক্তি কিছু তো বৃদ্ধি হতো। অবশ্য আমাদের শক্তিই বা কতটুকু? আমাদের পার্টি-লাইন যা সেই অনুযায়ী আমরা কি সব করতে পেরেছি? দেশের বুর্জোয়া মালিকরা যখন কারখানা ছুটি দিয়ে 'স্ট্রাইক' ঘোষণা করিয়ে দিয়েছে, সে স্ট্রাইক বন্ধ করার শক্তি কি আমাদের তখনকার ট্রেড ইউনিয়নগুলির ছিল? রেল-লাইন উপড়ানো বন্ধ করতে পেরেছি কি আমরা? তার চেয়ে নেতৃত্বহীন এই সংগ্রামের পাশে দাঁড়ালে সোভিয়েটের কি খুব ক্ষতি হতো? এসব নানা ভাবনা মনে আসত। অবশ্য ইংরেজের মারের চোটে 'সাঁতারা', 'মেদিনীপুর' মরে গেল। কিন্তু আমাদের মনে অম্লান মহিমায় বেঁচে রইলেন সেখানকার বীর ও বীরাঙ্গনারা। বেঁচে রইলেন মাতঙ্গিনী দেবী।

এসব সংশয় ক্রমশ কাটতে লাগল। যুদ্ধের ভয়াল রূপের ও ফ্যাসিস্ট বাহিনীর নৃশংসতার সংবাদ যত আমাদের কাছে পৌঁছাতে লাগল তত যেন এসবের বিরুদ্ধে আমাদের মনগুলো ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় কঠিন হতে লাগল। এই ফ্যাসিস্ট-যুদ্ধের লক্ষ্য যদি পৃথিবী বিজয় হয়, তবে গোটা পৃথিবীতে নরকের আগুন জ্বলবে। কোথায় হারিয়ে যাবে আমার স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন!

এরপর কর্তব্য স্থির করতে কমিউনিস্ট কর্মীর মনে আর কোন সংশয় থাকে না। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, পার্টির প্রতি নিষ্ঠাই হলো কমিউনিস্ট কর্মীর জীবনের ভিত্তি। বিশ্বরাজনীতির নতুন পটভূমিকায় এ আমাদের জীবনের নতুন নির্দেশ; অমান্য করার সাধ্য নেই।

আমার আজও মনে আছে প্রতিটি ছোটবড় কর্মী'র সে কী সাহসী সংগ্রাম! কী নিরলস পরিশ্রম! দেখা গেল মানুষ ধীরে ধীরে আমাদের কথা শুনছেন, বুঝছেন। ছাত্র, মহিলা, শ্রমিক, প্রত্যেক সংস্থার কর্মী'রা এই প্রচারে মিলিত-হলেন। কলকাতার লেখক, সাংবাদিক এবং বুদ্ধিজীবীদের একটি বৃহৎ অংশ এই আন্দোলনে নিজেদের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী সংগ্রামের মঞ্চরূপে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ এবং পরে প্রগতি লেখক ও শিল্পী সংঘ গড়ে উঠল। লেখক, শিল্পী ও সাংবাদিকরা তার নেতৃত্ব দিতে দ্বিধা করলেন না। শুধু তাই নয়, সোভিয়েটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গেই তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায় প্রমুখ বহু সাহিত্যিক, সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীরা এর বিরুদ্ধে বিবৃতি দিলেন কঠোর ভাষায়। কমিউনিস্ট বিরোধিতার হীনমন্যতায় তাঁরা আক্রান্ত ছিলেন না। এই যুদ্ধের পরিণতি যে কি তা তাঁরা জানতেন। রোগশয্যায় শায়িত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ যুদ্ধের ব্যাপারে উদ্বিগ্ন। প্রতিদিন তাঁকে কাগজ পড়ে যুদ্ধের খবর জানাতে হচ্ছে। কামনা করছেন—সোভিয়েটের জয় ও নাৎসীদের পরাজয়। অজস্র ধারায় লেখকদের লেখনী, কবিদের কবিতা-গান যেন ফ্যাসিস্টদের বিরুদ্ধে অগ্নিবর্ষণ করতে লাগল। জওহরলাল নেহরু কংগ্রেস কর্মীদের কাছে নির্দেশ পাঠালেন ফ্যাসিস্ট আক্রমণ ঘটলে প্রতিরোধ করতে। কংগ্রেস কর্মী'রা কে কোথায় কি করেছিলেন আমাদের তা জানা নেই, কারণ প্রতিরোধের এই নতুন মঞ্চে তাদের আমরা কোথাও দেখিনি। আমাদের মহিলা কর্মীর সংখ্যা দিন দিন বাড়ছে। ওপর-তলার মহিলারাও অনেকে আমাদের সঙ্গে হাত মেলালেন। আর আমরা সাধারণ মেয়েরা জনতার মিছিলে পা মিলিয়ে হাঁটছি। মনে আর কোন দুঃখ নেই আমার। যারা একদিন ব্যঙ্গ করতেন, অবজ্ঞা আর উপহাসে ফিরিয়ে দিতেন, আজ তারা মুখর নন—আমরা মুখর। অটল বিশ্বাসে অপেক্ষা করছি কবে লালফৌজ জিতবে আর পৃথিবীটা মুক্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচবে।

কিন্তু এবার আমরাও যুদ্ধে আক্রান্ত হয়ে গেলাম। এর জন্য ঠিক প্রস্তুত ছিলাম না। তখন বিমান আক্রমণ-প্রতিরোধ মহড়ায় কলকাতায় অনেকবার করে সাইরেন বাজানো হচ্ছে। রাত্রিবেলা সমস্ত আলোগুলি নতমস্তকে কালোটুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে। অন্ধকারে পথচলা দায়। আক্রমণ ঘটলে আহতদের সেবাকার্যে সাহায্যের জন্য পাড়ায় পাড়ায় স্বেচ্ছাসেবকদের শিক্ষা-ব্যবস্থার আয়োজন করল সরকার থেকে। আমরা অনেক মেয়ে সেই শিক্ষা নিলাম। কার্যকালে অবশ্য কি করতে পারব জানা নেই। এই সময়ে হঠাৎ

একদিন দিনের আলোতেই খিদিরপুরে জাপানী বোমা বর্ষিত হলো। অনেক বস্তিবাসী মারা গেল। অর্থাৎ, আমরাও পৃথিবীতে আক্রান্তদের মধ্যে একজন।

তারপরে বোমা পড়ল ডালহৌসি স্কোয়ারে। সেদিন আমি আর রেণু সন্ধ্যারাতে পড়ে গেলাম হঠাৎ বোমা আক্রমণের মুখে। আমরা দু'জন মহিলা সমিতির অফিস থেকে যাচ্ছি ২৪৯ বৌবাজারে—পার্টি অফিসে। হঠাৎ সাইরেন। রিকশাওয়ালা আমাদের পথে নামিয়ে দিয়ে পালালো। আমরা কোথায় পালাই! জানা ছিল, জি. ই. সি.-র নীচের তলায় একটা আশ্রয়স্থল আছে। কিন্তু যাব কি করে? পথও চোখে দেখা যায় না। ওদিকে সাঁই সাঁই করে মিলিটারী গাড়িগুলো ছুটছে।

নির্দিষ্ট জায়গায় পৌছাতে না পেরে কোন একটা গ্যারেজের ভিতরে আমরা ঢুকেছি। মনে হলো অনেক পাঞ্জাবী সৈন্যও সেখানে আছে। মদের গন্ধ ভুর ভুর করছে। আমরা ভয়ে একেবারে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছি। হঠাৎ একটা ফ্ল্যাশ এবং দুম্। কানে প্রায় তালা লাগল। আমাদের গায়ে ফ্লাশের আলো। সঙ্গে সঙ্গে দু'টো পাঞ্জাবী সৈন্য আমাদের ভেতরে টেনে নিয়ে গেল। "কেয়া করতা হ্যায় আপ লোগ? অন্দর আ যাইয়ে।" একটু ভেতরে যেতেই দেখি ওরা আমাদের গা ঘেঁষে দাঁড়াতে চায়। বিপদ বুঝে ওখান থেকে বেরিয়ে পড়লাম। যা থাকে কপালে। ওরা অনেক মানা করল। কে শোনে সে কথা? আমরা প্রায় ছুটতে ছুটতে জি. ই. সি-র আশ্রয়ে পৌছালাম। সেখানে আলো আছে। দেখলাম, আশে-পাশের সব চীনে পরিবারগুলো বাচ্চা-কাচ্চা নিয়ে সেখানে আশ্রয় নিয়েছে। বাঙালী মেয়ে আর কেউ নেই। একজন মাত্র বাঙালী ভদ্রলোককে পেলাম। আমরা তিনজনে ঠিকানা বিনিময় করলাম। যে বেঁচে থাকবে অপর দু'বাড়িতে সে-ই খবর দেবে। আবারও বোমা পড়ল দু-একটা। কিন্তু এখানে বসে সামান্য শব্দ ছাড়া আর কিছু টের পাওয়া গেল না। অনেকক্ষণ বাদে অল্ ক্লিয়ার সাইরেন বাজল। আমরাও বেরিয়ে ট্রামে উঠলাম। দু'জনেই বাড়ি পৌছে দেখেছিলাম আমাদের প্রতীক্ষায় পাড়ার লোকেরা দাঁড়িয়ে।

এরপর চট্টগ্রামে বোমা পড়ল এবং অনেক লোক মারা গেল। চট্টগ্রাম ছিল ইংরেজ নৌবাহিনীর বড় ঘাঁটি।

জাপানীরা বোধহয় আমাদের একটু দাঁত খিঁচুনি দেখিয়ে গেল। কিন্তু কলকাতার লোকেরা এতেই পড়িমরি করে কলকাতার বাইরে ছুটল। সে ছোটা দেখে মনে হতো—ট্রেনে জায়গা না পেলে এরা বোধ হয় আত্মহত্যা

করেই বোমার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

কলকাতায় দিন দুই জাপানী বোমা পড়ল। তাতে খিদিরপুরের কিছু লোক ছাড়া আর কেউ আমরা মরলাম না। কিন্তু যুদ্ধের খোরাক যোগাতে গোটা দেশটা মরতে বসল। বিশেষ করে বাঙলাদেশ। একরকমে নয়, সর্ব-রকমে সমগ্র বাঙলাদেশকে যুদ্ধ যেন চিবিয়ে ছিবড়ে করে দিল। তখন একদিকে সৈন্যদের জন্য সরকার চাল মজুত করছে, অপরদিকে বাকী চাল ঢুকছে 'চোরাবাজারের' গর্ভে। খোলাবাজারে একদানা চাল নেই। অথচ পেছনের দরজা দিয়ে বহুমূল্যে যতখুশি চাল কিনছে পয়সাওয়ালা লোকেরা। এদেশে 'চোরাকারবার' নামটা ঐ সময়েই নতুন আমদানী হলো। অভিধানে নতুন সংযোজিত এই শব্দটি এদেশ থেকে আর গেল না। এখন বরং এই কার-বারীরা এ-বিদ্যায় পারদর্শিতার সর্বোচ্চ সম্মান পেতে পারে। এখন আর শুধু চাল নয়, নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিসই এদের মুঠোর মধ্যে। সরকারী কারখানার তৈরি স্টীল, সিমেণ্ট, রেলের সরঞ্জাম, বিদ্যুতের তার, হাসপাতালের ঔষধপত্র প্রভৃতি সমস্ত জিনিসই কারখানা থেকে চোরাবাজারে চলে যায়। দুনিয়ার সব জিনিস তো সেখানেই বেশী দামে পাওয়া যায়, খোলাবাজারে নয়। দুর্ভিক্ষের সঙ্গে আমরা পরিচিত কিন্তু এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ কে কবে দেখেছে? গ্রামে একদানা চাল নেই। এমন অবস্থায় গ্রামকে গ্রাম উজাড় করে মানুষগুলো শহরে ছুটল। এখানে এসে ওরা আস্তানা পাতল রাস্তায়। কলকাতা শহরে আরও একটি জিনিস ঐ সময় থেকে শুরু। সেই যে মানুষেরা ফুটপাথে বসতি স্থাপন করল তা আর উঠল না। বরং ফুটপাথের সংসার এখন আরও জমজমাট।

সেদিনের ফুটপাথে বসা গ্রামের চাষীজনতা ভিক্ষাপাত্র হাত নিয়ে আজ শহরবাসীদের দুয়ারে হাজির। এখন এসব সকলের গা-সওয়া হয়ে গেছে। কিন্তু তখন মানুষের এমন অপমান বোধহয় সকলকেই নাড়া দিয়েছিল। অন্নের জন্মদাতা কৃষকের কণ্ঠে 'ফেন দাও' কান্নাটা বড় বিসদৃশ লেগেছিল। শুধু এই নয়, ক্ষুধার অন্যতম বলি হলো ঐ কৃষক-মেয়েদের ইজ্জত। বিদেশী সৈন্যদের জন্য দালালদের মারফতে একখানা শাড়ি বা একদিনের খাবারের বিনিময়ে এইসব 'সস্তা' মেয়েদের বাজারও জমে উঠল। ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি বিশাল দেশের এমন নৈতিক অধঃপতন দেখলে মাথা আপনি হেঁট হয়ে যায়, নিজেকে অপরাধী মনে হয়। তাছাড়া কৃষকঘরের মেয়ে-বৌদের ইজ্জত বোধহয় আগে কখনও এমনভাবে রাস্তায় লুটিয়ে পড়েনি। দুর্ভিক্ষ-মহামারী নিয়ে আমাদের বাস। কৃষকেরা স্ত্রী-পুত্রের হাত ধরে শহরে এসেছে আবার ফিরেও গেছে, কিন্তু

এ কী বীভৎসতা!

এই সব মানুষদের বাঁচিয়ে গ্রামে ফিরিয়ে দেওয়াই এখন আমাদের কাজ। নেতৃত্ব আহ্বান দিলেন—দুর্গতজনের পাশে দাঁড়াও। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত নারী ও শিশুদের বাঁচাও। চোরাবাজারীর বিরুদ্ধে আন্দোলন কর। নিরন্নকে অন্ন দিতে সরকারকে বাধ্য কর।

আমি এসময়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে গেছি। তার আগে স্কুলে কাজ করতাম। পার্টির নির্দেশে ছেড়ে দিয়েছি। পার্টির ভাতা তখন মাসিক ২০ টাকা। এছাড়া একখানা ট্রামের মাসিক টিকিটও দেওয়া হতো। প্রথমে একটু আপত্তি করেছিলাম। ভয় হয়েছিল, পারব তো? একজন নেতা ধমক দিলেন, "কেন, কোন্ রাজকন্যা আপনি, যে পারবেন না?" আর আপত্তি মুখে এল না। ফার্ন রোডে আরও কয়েকজনের সঙ্গে একত্রে থাকতে শুরু করলাম। আমাদের সঙ্গের মেয়েরাও পার্টি-সদস্যা। কিন্তু তারা চাকরী বা টিউশনি করে যা পেতেন তা থেকে খরচ চালাতেন। মনোরমা গুহ তার দুটি মেয়ে নিয়ে সেখানে থাকত। সে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। বরিশালের অমৃত নাগের দিদি ছিল সে। কী নিষ্ঠার সঙ্গেই যে পার্টির কাজে সে অক্লান্ত পরিশ্রম করত! তখন থেকে বয়সের ভার ও ব্যাধিতে শুয়ে না পড়া পর্যন্ত একই ভাবে সে কাজ করে গেছে। আর একজন ছিল আমার দিদির ননদ। সবাই তাকে 'পিসী' বলে ডাকত। তার কাজের ক্ষমতাও ঐরকমই ছিল। দেশের গরীব মানুষের জন্য এদের মমতার অন্ত ছিল না। এরকম আরো অনেক কর্মী ছিল। এরা ছিল পার্টির প্রাণশক্তি। আর ছিল বেলা ব্যানার্জী, সেও পার্টিতে এল এবং আমাদের কাজের সহযোগী হলো।

আমরা অনেক মেয়ে জুটে গেলাম এই জনসেবার কাজে। কলকাতার সর্বত্র তখন আমাদের কর্মীদের নাওয়া-খাওয়ার সময় ছিল না। কলকাতার বাজারগুলোর সামনে তখন সর্বদা গ্রাম থেকে আসা মেয়েদের লম্বা লাইন দেখা যেত। তারা চাল নিতে আসত। আমাদের কর্মীরাও পালা করে তাদের পাশে থাকত। গড়িয়াহাট বাজারে একটি সস্তা চালের দোকান খোলানো হলো। ছেলেরা গড়ে তুললো 'জনরক্ষা সমিতি'। আমরা একসঙ্গেই চলি। রাত তিনটের গাড়িতে শত শত গ্রামের মেয়ে-পুরুষ বালিগঞ্জ স্টেশনে হুড়মুড় করে এসে যেত চাল নেবার জন্য। বাড়ি থেকে শব্দ শুনে আমরাও ঐ সময়ে উঠে এসে তাদের লাইনে দাঁড় করাতাম এবং সকালে দোকান খুললে এক এক করে চাল পাইয়ে দিতাম। দোকানীদের সঙ্গে হরদম ঝগড়া করতে হতো।

ডিউটি ভাগ করে লাইনের পাশে আমরা কেউ না কেউ থাকি। অল্পবয়সী মেয়েদের আশেপাশে দালাল ঘোরে। সেই মেয়েদের পাহারা দিতে হয় রাত্রিবেলা। কেউ-বা লাইনেই সন্তান প্রসব করেছে—তার ব্যবস্থা করা, কেউ বা মরা শিশু কোলে নিয়ে বসে আছে, লাইন ছাড়ছে না—তারও ব্যবস্থা করা, এই রকম হাজারো কাজ। দিনে রাতে আমাদের কর্মীদের সময় ছিল না।

এসবে কংগ্রেসের লোকদের খুব একটা আমরা পেতাম না। নাই বা পেলাম, সাধারণ মানুষেরা এগিয়ে এলেন। পার্টি কর্মীদের নিষ্ঠা ও নিরলস সেবা দেখে অনেক নামী-অনামী মানুষেরা আমাদের কাজে যোগ দিলেন। টাকা-পয়সা আসতে লাগল। ক্যানটিন খোলার জন্য এইসব ভদ্রলোকেরা আমাদের উৎসাহ ও সহায়তা দিলেন। পার্টির প্রতি সহানুভূতিশীল লোকদের সংখ্যা নিত্য বাড়তে লাগল। পাড়ায় পাড়ায় ক্যানটিন খোলা হলো। সাধারণ মানুষের দুয়ারে ঘুরে ঘুরে আমাদের সাহায্য-প্রার্থনার পাত্র পূর্ণ হতো। ধীরে ধীরে প্রবীণ ও উদারপন্থী কংগ্রেসসেবীরাও আমাদের এ কাজে আকৃষ্ট হতে লাগলেন। আমরা শ্রীক্ষিতীশ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে একজন পুরোধা রূপে পেলাম। তাঁর পত্নী মঞ্জুশ্রী দেবীও এলেন।

চালের দাম তখনকার দিনে মণ প্রতি ২৮ টাকায় উঠেছিল। যা আগে ছিল ৩/৫ টাকা মণ। আমাদের আস্তানাতে খাবার সংস্থান করা মুস্কিল হয়ে উঠল। অনেক দিনই রান্না হতো না। মনোরমার দুটি বাচ্চা মেয়ে আমাদের কাছে থাকত। তাদের জন্য আমাদের ভাবতে হতো। দু-একদিন ক্যানটিনে সকলের খাওয়া হয়ে গেলে সামান্য যেটুকু বাকী থাকত তাই নিয়ে এসে সকলে একটু একটু ভাগ করে ২/৪ দিন খেয়েছিলাম। কিন্তু কাজটা ভালো নয় মনে হলো সকলেরই। এর চেয়ে না খাওয়াও ভালো। মাস শেষে যে যার সামান্য পয়সা ব্যয়ে যাহোক একটু কিছু কিনে নিত। একদিন রাত দশটায় একটা রুটি কিনে হাতে করে বাড়ি ফিরেছি। দেখি, মনোরমার মেয়ে দুটি জেগে বসে আছে। ওদের মা তখনও ফেরেনি। ওরা জানতে চাইল, আমি কোন খাবার এনেছি কিনা। হাতের রুটিটা ওদের হাতে দিয়ে বললাম—'হ্যাঁ এনেছি, দুজনে ভাগ করে খাও।' ওরা ঐটুকু রুটি ভাগ করে খেল। পেট ভরে জল খেয়ে লক্ষ্মী মেয়ের মতন ঘুমোতে গেল। এরকম অভিজ্ঞতা আমাদের অনেক দিনই হতো।

পার্টি-জীবনে অনেক আন্দোলন, অনেক সংগ্রামে আমরা থেকেছি। কিন্তু এই সময়ের জনসেবার কাজের মধ্যে খেয়ে না খেয়ে যেমন আনন্দ পেয়েছিলাম তেমন বোধহয় আর কোনদিন পাইনি।

একটা উল্লেখযোগ্য কাজ আমরা এই সময়ে করেছিলাম। এই ভিক্ষার চাল আর ক্যান্টিনের খিচুড়ি খাইয়ে লোক বাঁচানো যাবে না। চালের দাম কমাতে হবে এবং রেশন দোকান খুলতে হবে। এজন্য আন্দোলনের পথে নামতেই হবে—এটা বুঝে আমরা সেই আয়োজনে লেগে গেলাম। তখন ফজলুল হকের মন্ত্রীত্ব ছিল। আমরা স্থির করলাম, এ্যাসেম্বলি চলাকালে একদিন হঠাৎ আইনসভা মেয়েদের মিছিলে ঘেরাও করে চালের দাবী জানাব।

ফজলুল হক সাহেব আমার দাদুর বন্ধু ছিলেন। বাবাকেও উনি স্নেহ করতেন। তাঁর সঙ্গে বাবা ও দাদুর পরিচয় দিয়ে দেখা করলাম। এ্যাসেম্বলি যাবার কার্ড চাইতে উনি খুশি হয়ে আমাকে খানকতক কার্ড দিলেন। রেণু, গীতা মল্লিক এবং এলাদি আরও কিছু কার্ড যোগাড় করলেন।

দুপুর থেকেই টাউন হলে একটা বিরাট মহিলা জনসভা জমায়েত হয়ে গেছে। কলকাতার সমস্ত পাড়া থেকে এরা এসেছে। সঙ্গে আমাদের নেত্রী ও কর্মীরা। ট্রাম গাড়ির শ্রমিকেরা আমাদের সেদিন সাহায্য না করলে মুশকিল হতো। সমস্ত পাড়া থেকে বিনা ভাড়ায় ট্রামে মেয়েরা সেদিন এসেছিল এবং আবার ফিরেও গেল। ট্রাম-শ্রমিকদের এই সহযোগিতা ভোলবার নয়।

যাহোক, কার্ডপ্রাপ্ত মহিলারা আইনসভা ঢুকতে চাইলে রক্ষীরা গেট খুলে দিল। আমাদের পেছনে পেছনে সেই প্রায় ৫ হাজারের নারী-মিছিল আইনসভা প্রাঙ্গণে ঢুকে পড়ল। দু'টো গেট দিয়ে আমরা ঢুকেছিলাম। রক্ষীরা কোন গেটেই বাধা দিল না, বরং গেট দুটো পুরোপুরি খুলে দিল। আমাদের একটা দল দরখাস্ত নিয়ে মন্ত্রীদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। আর অন্যরা মেয়েদেরকে বসিয়ে বোঝাতে লাগলেন—আমরা কোথায়, কার কাছে এসেছি এবং কী আমাদের চাই। জনাব হক সাহেবকে বলা হলো বাইরে এসে মেয়েদের কাছে কিছু বলতে। ওঁরা বাইরে এলেন, কিন্তু খানিকটা যেন হতবাক্। বলবেনই বা কি? আইনসভার প্রাঙ্গণে এমন কাণ্ড এই প্রথম। আজকাল কথায় কথায় আইনসভা ঘেরাও হয়। কিন্তু মেয়েরা একের পর এক দাঁড়িয়ে তাদের আঁচলের পয়সা দেখিয়ে বলতে লাগল—"আমরা ভিক্ষা চাইতে আসিনি। আমরা যে দামে চাল কিনতাম সেই দামে চাল দিন। আমরা কিনে নেব।" গীতা মল্লিক, এলাদি, রেণু, কমলা ওরা গিয়ে বললেন, "কিছু চাল আনিয়ে দিন এঁদের, নইলে আপনারা বেরোতে পারবেন না।" ওঁরা প্রথমে অক্ষমতা জানালেন। পরে বাধ্য হয়ে ইস্পাহানির কাছে ফোন করলেন। আধঘণ্টার মধ্যে কয়েক লরি বোঝাই চাল এসে গেল। প্রত্যেককে ২ সের করে চাল দেওয়া হলো। মেয়েদের

কাছ থেকে পয়সাটা আর নিলেন না, বোধহয় লজ্জা পেলেন।

সেদিনের মিছিলের সার্থকতা—আমাদের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি মতন কলকাতায় প্রথম ১৬টা ন্যায্য দরের চালের দোকান খোলা হলো এবং সরকার থেকে কয়েকটা বড় ক্যান্টিনও চালু হলো, যেখান থেকে পাড়ার ক্যান্টিনগুলোতে খিচুড়ি পাঠানো হতো। আমাদের কাজও অনেকটা হাল্কা হলো।

কিন্তু কি আশ্চর্য! কলকাতা শহরের উপর এই নতুন ধরনের একটি ঘটনার কোন সংবাদ বা ছবি পরের দিনের প্রভাতী কাগজগুলির একটিতেও দেখা গেল না। অথচ সংবাদদাতারা অনেক ছবি তুলেছিলেন ও বিবরণীও নিয়েছিলেন। কাগজ-মালিকেরা নিজেদের বুদ্ধিতে অথবা সরকারী নির্দেশে ঐ সংবাদ চাপা দেবার কর্মটি করেছিলেন কিনা—তা আমরা জানি না। সন্দেহ হয় কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে এই আন্দোলন তাদের পছন্দ হয়নি—সেই রাগে খবরটির কবর হয়ে গেল। কিন্তু খবরটি ছবিসহ বিদেশী কাগজে বেরিয়ে যেতে দেরি হলো না। আজ আরও একটা কথা মনে হয়। এখন আমরা রেশন দোকানের লাইনে দাঁড়াতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। মনে রাখা ভালো, এই দোকানগুলোর চাবিটি প্রথম খুলে দিয়েছিলেন এই গরীব কৃষক মেয়েরাই। কংগ্রেসী মেয়েরা সেদিন একাজে আসেননি। এলে হয়তো শক্তি আরও বাড়ত। এবং এতে তাদের কংগ্রেসী 'বিশুদ্ধতা' নষ্ট হতো বলে মনে করি না।

এরপরে প্রত্যেক পাড়াতেই ন্যায্যদরের দোকান খুলতে লাগল। এমনকি অগ্নিমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য কয়লারও ন্যায্যদরের দোকান খুলতে হলো। জনমত আমাদের পক্ষেই ছিল। কিন্তু উদ্যোগী হয়ে পার্টিকর্মীরা সেদিন যদি এই জনসেবার কাজে না আসতেন এবং বহু মানুষের সমর্থন ও সাহায্য টেনে আনতে না পারতেন তবে হয়তো সরকারকে দিয়ে এ কাজটি করাতে অনেক বিলম্ব ঘটে যেত। তবুও ঐ সর্বগ্রাসী দুর্ভিক্ষে আমরা আর কতটুকু করতে পারলাম! ৩৫ লক্ষ লোক মুখ বুজেই তো মরে গেল। কলকাতার কালো অন্ধকার রাস্তায় এরই একটি মৃতদেহ আমার পায়েও ঠেকেছিল। মনে পড়ে, সে রাতটায় ঘুমোতে পারিনি একটুও। এখন এসব দৃশ্য গা-সওয়া হয়ে গেছে। এতটা বিচলিত আর বোধ করি না। ক্ষুধা মানুষকে যে কী করে, চালের লাইনে দাঁড়ানো মেয়েদের মধ্যে তা প্রত্যক্ষ করতাম। এমন বিচিত্র দৃশ্যাবলী আর কোথায় মিলবে! আজ আর এসব দৃশ্য মানুষকে নাড়া দেয় না। নারীদেহ বেচা-কেনার মার্কেটটা আরও স্ফীত আকারে খোলাখুলি চলে। এটা এখন মামুলি ব্যাপার। আমরাও আর সে মানুষ নেই। এখন বোধহয় নিরুদ্বেগ, নিস্তরঙ্গ, অনুভূতিহীন মৌনতায়

সবাই আমরা স্থবির হয়ে গেছি!

সেবামূলক কাজে আমাদের পরিধি ও পরিচিতি দুই-ই বেড়েছে। বহু মেয়ে আমাদের পাশে। কিন্তু এ পর্যন্ত সারা বাঙলা জুড়ে আমাদের কোন সংগঠন হয়নি। ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রচারের সময়ে কলকাতার পাড়াগুলিতে এবং মফঃস্বল শহরে ও গ্রামে কিছু কিছু সংগঠন করা হয়েছিল। কিন্তু তারা কেউ কারো সঙ্গে যুক্ত ছিল না।

এইবার সারা বাঙলাব্যাপী সংগঠন করার প্রয়োজন অনুভূত হলো। কত কর্মী আমরা। আর আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে বিশাল এক নারী-সমাজ। এঁদের ঐক্যবদ্ধ করতে হবে। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে এঁরাও সংগ্রামী হবেন। তাছাড়া এঁদের শিক্ষা, কর্মসংস্থান প্রভৃতির জন্যও আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করতে হবে। সাধ্য আমাদের কম। এত বিশাল সমস্যার কতটুকু সমাধান আমরা করতে পারি? কিন্তু কিসের একটা প্রবল টান যেন কেবলই আমাদের সামনে টেনে নিয়ে যায়।

মিসেস্ এলা রীড আগেই আমাদের মধ্যে এসে গেছেন। ইনি স্বর্গত ডাঃ মৃগেন মিত্রের কন্যা। তার স্বামী স্টেট্‌সম্যান কাগজে বড় চাকরী করতেন। অফিসের তেতালাতে ওঁদের কোয়ার্টার ছিল। সেখানে আমরা সর্বদা যাই। স্বামী-স্ত্রী দু'জনেরই ধারণা ছিল আমরা হোলটাইমারগুলো সকলেই সর্বদাই বুভুক্ষু। তাই পেটপুরে না খাইয়ে কোনদিনও ছাড়েননি। মিঃ রীড মজা করে আমাকে ডাকতেন—মাংকিটলা বা মানিকতলা। কিছুতেই ঠিক নামটা বলতেন না।

এলাদি অঙ্গাঙ্গীভাবে আমাদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এখন তিনি লণ্ডনে থাকেন। মিঃ রীড বেঁচে নেই। খবর পাই, বড় একলা লাগে তাঁর। মন টেকে না। আদর করে তাঁর একটা শাড়ি আমায় সেদিন পাঠিয়েছেন। যে লোক যায় তাকেই বলে দেন, 'মণিকে চিঠি দিতে বলো।'

সেই এলাদির বাড়িতে বসেই আমাদের প্রথম মহিলা সমিতির প্রতিষ্ঠা। আমি, রেণু, এলাদি, কমলা, শান্তি সরকার এবং আরও কে কে আমরা ছিলাম। এ. আই. ডব্লিউ. সি-তে আর কাজ চলবে না। প্রধানত মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রমজীবী ও কৃষক মহিলাদের নিয়েই আমাদের সংগঠন হবে। উচ্চ কোটির মেয়েদেরও আমরা চেষ্টা করব পেতে, কারণ নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে তাঁরা কেনই বা আমাদের সঙ্গী হবেন না? ভোটদানের অধিকারে তো তাঁরাও বঞ্চিত। ধনবান স্বামীর স্ত্রী হয়েও এ অধিকারটি পেতে হলে সমস্ত

নারীসমাজের সঙ্গে এক সারিতেই দাঁড়াতে হবে। নারীসমাজের এরকম অন্যান্য অধিকারের ব্যাপারেও তাঁরাও তো সমভাবে সম্পর্কিত।

এলাদির বাড়িতে বসেই সমিতির উদ্দেশ্য ও ছোট একটি গঠনতন্ত্র লেখা হলো। সমিতির নাম কি হবে? রেণু বললো, ছেলেরা 'জনরক্ষা' করছেন, আমাদের সমিতি হবে মেয়েদের আত্মরক্ষার জন্য। জন্ম হলো 'মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি'র। এই সমিতির সভানেত্রী হিসাবে আমরা কয়েকজন খ্যাতিসম্পন্না মহিলাকে পেয়েছিলাম। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, শ্রীযুক্তা নেলী সেনগুপ্তা, জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী, মোহিনী দেবী, প্রভাবতী দেবীসরস্বতী, মোহিনী দেবীর কন্যা আর্যবালা দেবী, শ্রীযুক্তা রানী মহলানবীশ এবং আরও অনেকে এসেছিলেন। কিছুকাল পরে সমিতির মাসিকপত্র 'ঘরে-বাইরে' আত্মপ্রকাশ করল। লেখিকা হিসাবেও আমরা পেলাম অনেক নামকরা মহিলা সাহিত্যিককে। প্রভাবতী দেবীসরস্বতী তো ছিলেনই। আরো ছিলেন আশাপূর্ণা দেবী, আশা গাঙ্গুলী, উর্মা দেবী, মীরা দেবী, মৈত্রেয়ী দেবী এবং মাঝে মাঝে সীতা দেবী ও ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর লেখাও আমরা পেতাম। 'ঘরে-বাইরে'র প্রথম সম্পাদিকা ছিলেন মঞ্জুশ্রী দেবী এবং পরবর্তীকালে দীর্ঘদিন ধরে কনক মুখার্জী ছিলেন এই পদে। যুগ্ম সম্পাদিকা রূপেও 'ঘরে-বাইরে' গোষ্ঠীদের মধ্যে কেউ না কেউ থাকতেন—যেমন তিলোত্তমা ভট্টাচার্য, উমা গাঙ্গুলী, মুক্তি মিত্র, কমলা মুখার্জী প্রভৃতি। 'ঘরে-বাইরে গোষ্ঠী' বললাম এই জন্য যে, আমাদের কর্মীদের মধ্যেও অনেকে ধীরে ধীরে লেখকরূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন হুগলীর মায়াদি (চট্টোপাধ্যায়)। ভারি সুন্দর কবিতা লিখে পাঠাতেন তিনি। শান্ত-সৌম্য চেহারার ওই মহিলা এতটা বয়সেও ঘুরে ঘুরে সমিতি করা, মাসিকপত্র বিক্রয় করা এবং লেখা—একই সঙ্গে করতেন। কনক মুখার্জী, উমা, মুক্তি, তিলোত্তমা—এরা সবাই গল্প-প্রবন্ধ-কবিতা লিখতে লাগলেন।

একটি মাসিকপত্র চালানো তখন সহজ কাজ ছিল না। টাকা তোলা, বিক্রয় করা, লেখা সংগ্রহ করা, তার উপর নিজেদের লেখা তো ছিলই। আমাদের মধ্যে যিনিই যখন বাইরে যেতেন তাঁকেই একটি লেখা দিতে হতো—সেখানে তাঁর অভিজ্ঞতার কথা জানিয়ে। এই লেখাগুলো হলো পত্রিকার সঙ্গে দূর-দূরান্তের মহিলা সমিতিগুলির যোগসূত্র। তাঁরা তাঁদের এলাকার চিত্র, কাজকর্মের চিত্র এই লেখায় দেখতে পেতেন, উৎসাহী হতেন ও চিঠিপত্রে নানা পরামর্শ পাঠাতেন। 'মা ও শিশু'—এই বিভাগের লেখাগুলো মেয়েরা খুবই

পছন্দ করতেন। নিয়মিত লেখিকা ছিলেন ডাঃ রেণুকা রায় ও ডাঃ জ্যোৎস্না মজুমদার। রেণুকা রায়ের লেখাগুলোর খুব চাহিদা ছিল। উনি সাধারণ ঘরের মায়েদের দিকে লক্ষ্য রেখে লিখতেন। ওঁর লেখা অনেক দিন না বেরুলেই অনুযোগ জানিয়ে চিঠি দিতেন মেয়েরা।

এত সত্ত্বেও আমরা লেখার যোগাড় রাখতে মাঝে মাঝেই মুস্কিলে পড়ে যেতাম। এত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ কোথায়? কর্মীরা প্রায় সকলে স্কুলে বা অফিসে কাজ করতেন। ঘর-সংসার তো ছিলই। এর উপর পত্রিকা বিক্রয় ও বিজ্ঞাপন যোগাড় করতে হতো। লেখার আর সময় কোথায়? কাগজখানা পাঠিকারা ক্রমশ পছন্দ করতে লাগলেন। কিন্তু আরও ভালো গল্পের চাহিদায় আমরা বিব্রত হতাম। পত্রিকাকে আমরা চাইতাম আরো উন্নত করতে। কিন্তু মিটিং-এ এজন্য আলোচনায় বসলেই আমাদের সীমাবদ্ধতাগুলি যেন চোখের সামনে ভয় দেখাত। আমাদের বিক্রয়ের ক্ষমতা কম। গ্রামের সমিতিগুলি বেশী নিতে পারে না। কারণ পড়বে কে? শুধু শহর এবং তার আশপাশেই ছিল পত্রিকার চাহিদা, তাও আবার আমাদের সমিতির প্রভাবিত পরিধির মধ্যেই। আমাদের দুটি নিয়ম ছিল—যা আমরা মেনে চলতাম। কাগজে লিখবেন শুধু মেয়েরা, ছেলেদের লেখা নেওয়া হবে না। বিক্রয় করবেন কর্মীরাই, কোন কাগজের 'হকার' দিয়ে নয়। কারণ, নিজেরা বিক্রয় করলে পাঠিকাদের সঙ্গে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ থাকবে। ব্যবসায়ীবুদ্ধি এগুলো নয় জেনেও আমরা তা মেনে চলতাম। হয়তো-বা এরই জন্য আমরা বিক্রয় সংখ্যা কোনদিন তিন হাজারের বেশী বাড়াতে পারিনি। অনেক সময়ে কথা উঠেছে ছেলেদের লেখা নিলে দোষ কি? কিন্তু তখনই সকলে মিলে কথাটা চাপা দিয়ে দিতেন। বলতেন, "আমাদের কাগজের এটাই তো বিশেষত্ব—মেয়েরাই লেখেন, মেয়েরাই বিক্রি করেন, বিজ্ঞাপন আনেন, টাকার অভাব পড়লে 'শো' করে টাকা তোলেন, ছাপার কাজ দেখেন—এটাই তো আমাদের বৈশিষ্ট্য। এ আমরা ছাড়ব না।" আমার নিজেরও মনে হতো এ-গর্ব কর্মীরা করতে পারেন। লেখার মান খুব উঁচু না হলেও সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের পরিচালিত কাগজ তখনকার দিনে কংগ্রেসী মহিলাদের পরিচালিত 'মন্দিরা' এবং শ্রীসঙ্ঘের লীলা রায় পরিচালিত 'জয়শ্রী' ছাড়া আর কোন কাগজ ছিল না। 'মন্দিরা' কাগজের পরিচালনায় এক সময়ে আমাদের কমলা মুখার্জীও যুক্ত ছিলেন। তিনি আমাদের অন্যান্য কর্মীদেরও একাজে টানতেন। 'মন্দিরা' এবং 'জয়শ্রী' কাগজেও সবই মেয়েদের লেখা থাকত কিনা আমার ঠিক মনে নেই। আমার তো আমাদের কর্মীদের উপর রীতি-

মত শ্রদ্ধা হতো। বিশেষ করে কনকের উপর। বড় নিষ্ঠার সঙ্গে সে কাগজটির হাল ধরে ছিল। সে তখন একটা স্কুলে কাজ করে। কিন্তু বাকী সময়টার সবটুকু দিয়ে সে কাগজখানিকে আগলে রেখেছিল। ও না থাকলে 'ঘরে-বাইরে' হয়তো বাঁচতই না। মনে হতো কনক 'হোলটাইমার' না থেকে ভালোই করেছিল। আমরা যারা বাইরে ঘুরতাম তাদের তো সময়ই ছিল না।

ইতিমধ্যে কলকাতায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির একটি ছোট পরিচালিকা কমিটি তৈরি হয়েছে—এলা রীডকে সাধারণ সম্পাদিকা ও আমাকে সহ-সম্পাদিকা করে। এই কমিটি প্রাদেশিক সম্মেলনের আয়োজন করবে। কিন্তু তার আগে আমাদের আর একদফা জিলায় ঘোরার কাজ শুরু হলো। কাছেপিঠে অনেকেই যেতেন। কিন্তু দূরের হলে বেশীর ভাগ সময় আমাকে ঘুরতে হতো। বেলা লাহিড়ী, কনক ও আমি—এই ক'জনই তখন আমরা হোলটাইমার। রেণু হোলটাইমার ছিল না। কিন্তু আমরা সকলেই একই রকম ঘুরতাম। সর্বত্র আত্ম-রক্ষা সমিতির শাখা গড়ে উঠতে শুরু করল। হাজারে হাজারে বাড়তে লাগল সভ্যসংখ্যা। এইসব সমিতিগুলির একই কাজ, অর্থাৎ ক্ষুধার্তদের জন্য ক্যান্টিন খোলানো, নারী ও শিশুদের জন্য দুগ্ধকেন্দ্র ও স্কুল চালানো।

ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে আমাদের উপর দায়িত্ব এলো বন্দীমুক্তি আন্দোলনেরও। যুদ্ধ তখনও থামেনি। কংগ্রেস নেতারা জেলে রয়েছেন। তাঁদের মুক্তির দাবীতে জনসমাবেশ ঘটাতে আমরা মিটিং-মিছিলে নামতে লাগলাম। আমরা একলা নই। পার্টি-নেতৃত্বের নির্দেশে সমস্ত সংগঠনই একাজে নামল। বিশেষ করে ছাত্র-সংগঠন। দুঃখের কথা, একাজেও আমরা কংগ্রেস কর্মীদের তেমন করে পেলাম না। কিছু উদারপন্থী বিশিষ্ট ব্যক্তি ছাড়া আমাদের সঙ্গে একাজেও হাত মেলাতে তখন পর্যন্ত সাধারণ কংগ্রেস কর্মীরা রাজী নন।

আমাদের পার্টি বুঝেছিল—কংগ্রেস নেতারা বাইরে না এলে স্বাধীনতার আন্দোলন জোরদার হতে পারবে না। তাই এই দায়িত্ব আমাদের কাঁধেই ন্যস্ত হয়ে গেল। অবশ্য এর বিনিময়ে পরবর্তী সময়ে কংগ্রেস কর্মী ও নেতাদের কাছ থেকে কি 'পুরস্কার' পেয়েছিলাম সে কথা পরে বলব। বেশ বড় আকারেই আন্দোলন হয়েছিল এবং যতদিন নেতারা মুক্ত হননি ততদিন এ আন্দোলন চলতেই থাকল।

সুতরাং এখন থেকে বছর খানেক ধরে আমাদের সংগ্রামে নিম্নলিখিত তিনটি ধারা একই সঙ্গে চলতে লাগল :

১. ফ্যাসিস্ট-বিরোধী প্রচার ও জনমত গঠন করা।

২. বন্দীমুক্তি আন্দোলনে কংগ্রেস, অকংগ্রেস, হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলকে একই মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করা।

৩. দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের সেবা, নারী ও শিশুদের জন্য খাদ্য-বস্ত্র আদায় করা ছাড়াও আশ্রয়কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র খোলার সাধ্যমত চেষ্টা করা।

শহরে-গঞ্জে-গ্রামে : মেয়েরা ও আমরা

এখন থেকে কর্মীদের কাজ হলো জিলাগুলিতে ঘুরে ঘুরে সমিতি গঠন করতে সাহায্য করা। জিলাগুলিতে ছাত্রী-নেত্রীরাই ছিলেন মহিলা-নেত্রী। এরা ছাত্রী সমিতি, মহিলা সমিতি একই সঙ্গে করছে এবং গঠনমূলক কাজও করছে। তা ছাড়া যুদ্ধ তো তখনও চলছে। কাজেই ফ্যাসিস্ট-বিরোধী আন্দোলন, কংগ্রেস বন্দীদের মুক্তির দাবীতে আন্দোলন—এ সব তো আছেই।

একটা ঘটনা তখন লক্ষ্য করার মতন ছিল। নারীসমাজের প্রতি সাম্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গি বোধহয় অনেক ছাত্রীকে প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছিল। যার ফলে এরা পার্টির প্রতি আকৃষ্ট হয়। এই নিয়ে পরিবারের সঙ্গে সংঘাত বাধলে তারা দৃঢ়তার সঙ্গে ঘর ছেড়ে পার্টির সহায়তায় নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য চেষ্টা করে এবং পার্টির কাজকেই জীবনের ব্রত হিসাবে গ্রহণ করে। বেলা চ্যাটার্জী (লাহিড়ী), কনক দাশগুপ্ত (মুখার্জী) এদের মধ্যে প্রথম সারিতে ছিলেন। কনক ঐটুকু বয়সেই পুলিস কর্তৃক যশোর জিলার বাইরে অন্তরীণ হন এবং বরিশালের মাতৃমন্দিরে থেকে কলেজে পড়েন। পার্টিতে যোগ দিয়েই এরা সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে যান এবং পার্টির গোপন কাজ করতে থাকেন। এদেব সঙ্গে আমার পরিচয় '৪২ সনে পার্টি আইনী হবার সময় থেকে। কনককে তার আগে লক্ষ্ণৌ-এর ছাত্রী সম্মেলনে দেখেছিলাম। তারপর বরিশালে কিছুদিন। এরপরে আর দেখলাম না। পার্টি আইনী হবার পর আবার দেখা। বেলা লাহিড়ীকে গোপন আশ্রয়ে যেতে হয়েছিল গ্রেপ্তার এড়াতে। '৪২ থেকে '৪৩-এর মধ্যে আরও অনেকে এল। পঙ্কজ লাহিড়ী (আচার্য), শচী লাহিড়ী (বিশ্বাস), মুক্তি ঘোষ (মিত্র), বাণী দাশগুপ্ত—এরা ক'জন এল। এদের অনেককেই রাজনীতি এবং বিশেষ করে কমিউনিজম সম্পর্কে পরিবারের ঘোর আপত্তির জন্য বাড়ি ছাড়তে হয়েছিল এবং বহু কষ্ট স্বীকার করে নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব বজায় রাখতে হয়েছিল। কী কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে এরা যে সেরা কমিউনিস্ট কর্মী হতে পেরেছিল সেসব কাহিনী সত্যিই বিস্ময়কর। পার্টি এত মেয়ের খরচ দিতে সমর্থ হয়নি। তাই এই মেয়েরা টিউশনী ও ছোটখাটো কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করত। বেশ কিছু পরে পার্টির সারাক্ষণের কর্মীদের থাকার জন্য কয়েকটি কমিউনও হয়েছে। মেয়েরা সেখানে কেউ কেউ হোলটাইমার হয়ে থাকত।

বাণী এল আমার কাছে। সে বরিশালের মেয়ে। আমাদের সঙ্গে আত্মীয়তাও আছে। তাই ও যখন রাজনীতির টানে বাড়ি ছাড়লই তখন জ্যোতি দাশগুপ্ত ওকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিল। এই সব কর্মীদের সাহসের আমি প্রশংসা করতাম মনে মনে। বাণী এসেই দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের লাইনে দাঁড়ানোর কাজে লেগে গেল। তারপর কি আর নিঃশ্বাস ফেলার সময় পেয়েছে, বস্তিতে ঘুরে ঘুরে মহিলা সমিতি গঠন, বাচ্চাদের স্কুল, দুধের ক্যান্টিন খোলা—এ সব কত কাজ যে করতে হয়েছে! বাণীর দাদা দেখা করতে এলেই আমার ভয় হতো—এই বুঝি মেয়েটা চলে যায়। লেনিনের উপদেশ ছিল—"পার্টি কর্মীদের চোখের মণির মতন দেখবে।" ওর দাদাকে দেখলেই আমার ভয় হতো 'চোখের মণিটি' বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। এ রকম ঝাড়া হাত-পা সর্বক্ষণের কর্মী কি গণ্ডায় গণ্ডায় পাওয়া যায়? তাছাড়া বাণী আমাদের অনটনের সংসারকেও ভয় পায়নি। চালের অভাবে অরন্ধন, কয়লার অভাবে চেয়ার ভেঙ্গে আগুন জ্বালানো—এ সব ঘটনায় ঐটুকু মেয়ে ঘাবড়ায়নি। বাণী অতএব থেকে গেল। কিন্তু ওর ছাত্রীমন মহিলাদের নিয়ে কত আর থাকতে পারে? অতএব তাকে দুটোই করতে হতো। আমাদের ওখানে নীলিমা সেন নামে একজন অধ্যাপিকা ছিল। কলেজ করার পর বাকী সময়টা সে মহিলা সমিতির কাজে, বিশেষ করে বস্তির কাজে ব্যস্ত থাকত। এর কোন এক সময়ে গীতা রায়চৌধুরী (মুখার্জী) এসে গেল যশোর থেকে। কলকাতায় সে তার পরিবারের সঙ্গেই থাকত। সে আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ছাত্র ফ্রন্টের দুর্দান্ত কর্মী। বেলা ব্যানার্জীর কথা আগেই উল্লেখ করেছি। সে আমার কাছে গল্প করেছিল, কমলা চ্যাটার্জী তাকে বগলদাবা করে 'মন্দিরা'র কাজ করতে নিয়ে যেত। কিছুদিন পরে বেলা আমাদের বাড়ির কাছাকাছি আর একটা বাড়িতে চলে যায়; তখন ওর বিয়ে ঠিক হয় মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের পুত্র শঙ্কর ভট্টাচার্যের সঙ্গে। এই শুভকাজ ওরা নিজেরাই স্থির করেছিল। এই বিয়েটা আমার এখনও স্পষ্ট মনে আছে। রেজেষ্ট্রি পত্রে স্বাক্ষর করতে কন্যাপক্ষ রূপে আমি ও পাত্রপক্ষ রূপে নাট্যাচার্য মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য মহাশয় পাশাপাশি বসেছিলাম। কথাটা এখনও মনে পড়ে বলে উল্লেখ করলাম।

এখন আমাদের জিলায় জিলায় ঘোরার কাজ। প্রথমে বরিশাল গেলাম। মনোরমা মাসীমা, যুঁইফুল এবং আমার সেই ছাত্রীরা—সুহাসিনী, অমিয়া সেন, রাধারাণী, রেণু বসু সবাই সমিতি গঠন ও রিলিফের কাজে ব্যস্ত। ছাত্রীদের দেখে খুব ভালো লাগল। কত বড় হয়ে গেছে আর কত কাজ করে আমার সেই

প্রথম রাজনীতির ক্লাসের মেয়েরা। তাছাড়া যুঁইফুল বসু, শোভা সেন, বিভা দাস—এরা তো ছিলই। যুঁইফুল বরিশালের অন্যতমা নেত্রী। জিলায় এরা অনেকগুলি সমিতি গঠন করেছে। অনেক সদস্য হয়ে গেছে। এবার শহরে মনোরমা মাসীমার বাড়িতে একটি খিচুড়ি ক্যান্টিন খোলার প্রোগ্রাম নেওয়া হলো, শুধু মেয়েদের জন্য। মাসীমার সঙ্গে আমিও এই কাজে ঘুরছি। অন্যরাও আছেন। সরযূ সেন, কিরণ দাস প্রভৃতি বয়স্কা মহিলারাও খাটছেন। অমিয়া সেন (ছাত্রী নয়) ছিলেন একজন কবিরাজ মহাশয়ের গৃহিণী। বড় সংসার। আর্থিক অবস্থাও তেমন ভালো ছিল না। কবিরাজ মহাশয় কমিউনিস্ট পার্টিকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু অমিয়া সেন প্রতিবাদ না করে, হাসিমুখে সংসারের সব কাজ সেরে কি করে যে বেরিয়ে আসতেন তা তিনিই জানতেন। সব কাজেই তিনি উপস্থিত থাকতেন। পার্টির জন্য অর্থসংগ্রহ করতেও তাঁর কামাই ছিল না।

স্থির হলো, আমরা ক্যান্টিনের ব্যাপারে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করতে যাব। মাসীমা ও আমি গেলাম। তিন শত মেয়েদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করতে হবে। ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ১০০ টাকা দিতে রাজী হলেন। কিন্তু এ টাকায় এতজনের খাওয়া কি করে হয়? সুতরাং প্রাণপণে আমাদের অর্থ সংগ্রহ করতে হচ্ছে। মাসীমার সঙ্গে একদিন ব্যবসায়ী পাড়ায় সাহায্য তুলতে গেলাম। চাল-ডাল, টাকা ইত্যাদি যে যেমন পারেন দেবেন। এর মধ্যে এক ব্যবসায়ী বলে বসলেন, "আপনারা হিন্দু-মুসলমান মেয়েদের একসঙ্গে খাওয়াচ্ছেন, এখানে চাঁদা দেব না।" মাসীমা যেন জ্বলে উঠলেন, "কি বললেন আপনি? এ জিলায় শতকরা ৮০ জন মুসলমান তা জানেন? ক্ষুধার্ত মানুষের সেবায় হিন্দু-মুসলমান প্রভেদ করতে বলেন আপনি? চাই না সাহায্য। দিলেও নেব না।" বেরিয়ে এলেন মাসীমা। ভদ্রলোক নিরুত্তর বসে রইলেন। এরকম লোক অল্পই ছিল। অন্যরা দরাজ হাতে চাল-ডাল দিতেন। ক্যান্টিনে যারা আসত তারা বেশীর ভাগই মুসলমান, হিন্দুমেয়েরা তাদের সঙ্গে মিলে রান্না করে, একসঙ্গে বসে খায়। অন্য সময়ে অন্য রকম হতে পারে, কিন্তু দুর্ভিক্ষে কি জাতবিচার চলে!

একদিন দুপুরে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে ক্যান্টিন দেখতে এলেন। মেয়েরা একদল খেতে বসেছে। তিনি খিচুড়িটা একটুখানি খেয়ে দেখতে চাইলেন। খেয়ে বললেন, 'ইহা অতি উত্তম খাদ্য।' আমাকে ও মাসীমাকে তিনি অফিসে দেখা করতে বললেন এবং আমাদের কাছে মোট খরচের হিসাব জানতে চাইলেন।

দেখা হলে আরও টাকা দেবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং জানতে চাইলেন, জিলা-ব্যাপী এরকম ক'টা ক্যান্টিন মহিলা সমিতি চালাতে পারে। সব টাকা সরকার দেবে। শহরে রামকৃষ্ণ মিশন, ব্যাপটিস্ট মিশন ও শঙ্কর মঠ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সরকারী সাহায্য নিয়ে ক্যান্টিন চালাত। মিউনিসিপ্যালিটি থেকেও সাহায্য চাওয়া হয়েছিল। কিন্তু ম্যাজিস্ট্রেট মহিলা সমিতিকেই সব ভার দিতে চান। তখনই আমরা বলতে পারিনি কিছু। কিন্তু জিলাব্যাপী প্রায় ৪০টা ক্যান্টিন পার্টির ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে মিলে চালাতে পেরেছিল। পরে তারা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন মেয়েদের থাকবার জন্য একটি ভবনও চালাতেন। সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের স্কুল, মহিলাদের জন্য শিল্পকেন্দ্র—এসবও করা হয়েছিল। এছাড়া মাসীমার মাতৃমন্দিরে মেয়েদের স্কুল ও তাঁতকেন্দ্র আগে থেকেই ছিল। সারা বাঙলায় যে মহিলা সংগঠন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে কলকাতা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, মেদিনীপুর ও হুগলী প্রভৃতি জিলায় সংগঠন ছিল ব্যাপক ও বৃহৎ। এই সব জিলায় কৃষক মেয়েদের মধ্যে বহু শাখা ছিল। শহরের গরীব মেয়েরা ও গ্রামের হিন্দু-মুসলমান কৃষক মেয়েরা ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শক্ত ভিত্তি।

বরিশালের মহিলা সংগঠন ও আন্দোলনের কথা বলাই হয় না যদি সেখানকার নেত্রী মনোরমা বসু সম্পর্কে কিছু কথা না বলি।

বরিশাল জিলায় যুক্ত বাঙলা ও খণ্ডিত বাঙলায় ইনিই একমাত্র নেত্রী যাঁকে সকলে 'মাসীমা' বললেই চিনতে পারে। বরিশাল আজ ওপার বাঙলায়। কিন্তু সেখানকার ছেলেমেয়েরা এখনও তাঁকে মাথায় করে রাখে। শুধু মহিলা আন্দোলনে নয়, সমাজসেবা ও প্রগতিবাদী রাজনীতিতে এখনও তিনি সামনের সারিতে থাকেন। দেশভাগের পর থেকে কত মানুষই তো এপারে চলে এসেছে, কিন্তু মাসীমা ৮৬ বৎসর বয়সে আজও সেখানে বসে আছেন তাঁর পিছিয়ে পড়া মুসলিম নারীসমাজকে সামনে এগিয়ে নেবার সাধনায়। তাঁর সন্তান-সন্ততি সবই এপারে। কিন্তু মাসীমার গভীর দেশপ্রেম ও মানবপ্রেম তাঁকে ওখানেই শেষ দিনটির প্রতীক্ষায় বসিয়ে রেখেছে।

মনোরমা বসুর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয় সেই বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনের সময় থেকে। কতটুকুই বা বয়স ছিল! ১০/১১ বছরের একটি বালিকাবধূ। ছিলেন শহরেও নয়—মেদাকুল গ্রামে, শ্বশুর ঘরে। এদিকে অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে বঙ্গভঙ্গ-প্রতিরোধ আন্দোলনে বরিশালের গ্রাম-শহর তোলপাড়। প্রতিবাদ মিছিলে রাস্তায় বেরিয়ে এসেছিল সমস্ত ঘরের মেয়ে ও বধূরা। সংখ্যায় কত তার হিসাব ছিল কি? শুধু মিছিল নয়। সঙ্গে সঙ্গে

অশ্বিনীকুমারের নেতৃত্বে সারা বরিশালের হাটে-বাজারে বিলিতী দ্রব্য বয়কটের আন্দোলনও চলেছে। কিছু কিছু ব্যবসায়ীরাও নেতার নির্দেশে বিলিতী দ্রব্য বিক্রয় বন্ধ করেছেন এবং জাহাজে আসা মালও কেউ নামাচ্ছেন না। এই আন্দোলনেই মাসীমার রাজনৈতিক জীবনের হাতেখড়ি। আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গে সেদিন যে বিশাল নারীসমাজ মাথার ঘোমটা খুলে প্রতিবাদের নিশান হাতে জিলাব্যাপী বিক্ষুব্ধ জনসমুদ্রের মধ্যে নিজেদের ধারাটিকে যুক্ত করেছিলেন, সেই সংযুক্তির ধারাটি আন্দোলন-শেষেও শুকিয়ে যায়নি। বারবার সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী আন্দোলনে শুধু বরিশাল নয়, সারা ভারতের নারীসমাজ বিপুলতর সংখ্যায় যোগ দিয়ে তার পরিচয় দিয়েছে। বঙ্গভঙ্গের ব্রিটিশ পরিকল্পনা ব্যর্থ করে দিয়ে সেদিন বরিশাল জিলার মেয়েরা ঘরে ফিরেছিলেন। কিন্তু শুধু হাতে নয়। এই প্রথম নারীজীবনে তারা আত্মবিশ্বাস ও সাহস ফিরে পেলেন। জানলেন—তারা শুধু আর গৃহবধূ নন, সংগ্রামে তারাও সৈনিক। শুধু গৃহে নয়, বাইরেও তাদের জন্য পুরুষের সঙ্গে সমান মর্যাদার আসন পাতা। ভারতের নারী-আন্দোলনের ইতিহাসে এই মহিলারাই ছিলেন পথিকৃৎ এবং ভবিষ্যতের উৎসধারা।

এইসব আন্দোলন সে যুগে অনেক মেয়েদের ঘর-ব'ব একাকার করে দিয়েছিল। মনোরমা মাসীমা ছিলেন তাদেরই একজন। মেদাকুল গ্রামের সেই বালিকা বধূটি কালক্রমে হন স্বাধীনতা সংগ্রামে বরিশালের অন্যতমা নেত্রী। কারাবরণে ভয় পাননি তিনি। শুধু এটাই তাঁর পরিচয় নয়। আমি যখন তাঁর সঙ্গে পরিচিত হই, তখন দেখেছি—তিনি একটি সুবৃহৎ পরিবারে রন্ধনরতা গৃহিণী, অনেক সন্তানের জননী। আবার নিজের বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মাতৃ-মন্দিরের তিনি পরিচালিকা, শিশু বিদ্যালয় ও বয়স্কা বিদ্যালয়ের তিনি শিক্ষিকা এবং একই সঙ্গে মাতৃমন্দিরের আশ্রিতা, সংসার-পরিত্যক্তা, বিপথগামী মেয়েদের তিনি মা। এই দুঃসাহসী কাজ তিনি করেছিলেন অন্য কারো ভরসায় নয়, একান্ত নিজের মনের জোরে। শহরে এই নিয়ে চাঞ্চল্য। কিন্তু তাঁর ভয় ছিল না। প্রতিদিন চাঁদার খাতা হাতে নিয়ে হাসিমুখে তিনি বাড়ি বাড়ি হাজির হতেন। গৃহিণীদের বোঝাতেন, অল্পবয়সের একটা ভুলের মাশুল দিতে দিতে মেয়েটার জীবনটা যাবে, আর আমরা তাকে বাঁচাব না? ঐ মেয়েদের তিনি গৃহবন্দী করে রাখেন নি। বাড়িটি কাঁটাতারে বা উঁচু পাঁচিলে ঘেরা ছিল না। কোন দারোয়ান বা তালাচাবির ব্যাপারও ছিল না। মেয়েরা ইচ্ছে করলে যে কোন সময়ে ৫ মিনিটের পথ সদর রাস্তায় চলে যেতে পারত। কিন্তু কেউ যেত না।

মাসীমা তাদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করতেন এবং পারতেনও। তাঁর এই সাহসে মুগ্ধ হয়ে গার্লস স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা আজীবন ব্রহ্মচারিণী ব্রাহ্মিকা শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস মাতৃমন্দির কমিটির সভানেত্রী হলেন এবং তিনি অর্থ সাহায্য করতেন নিয়মিতভাবে।

মাসীমার কর্মজগৎ এইকুটুর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। বস্তিগুলিতে তিনি ঘুরে বেড়াতেন। কার ডাক্তার বা ওষুধ দরকার তার খোঁজ নেওয়া, নিজে রিক্শা করে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া, পথ্য না থাকলে ঘর থেকে নিয়ে দিয়ে আসা—এসব ছিল তাঁর দৈনন্দিন কাজ। মহামারী লাগলে মিউনিসিপ্যালিটির লোকদের সঙ্গে থেকে মেয়েদের ও বাচ্চাদের টিকা দেওয়ার জন্য মাসীমার ডাক পড়ত। মুসলিম মেয়েরা নিজেরাও বেরুবে না, বাচ্চাদেরও টিকা নিতে দেবে না। মাসীমা না গেলে তাদের টেনে বের করবে কে? তাই বাঙলাদেশের মুজিব জমানায় মাসীমার খেতাব মিলেছিল—'অনারারী সুপারভাইজার'। এছাড়া মাসীমা যে তাঁর কত গহনা বিক্রী করে গ্রামের দুস্থ ছেলের পড়ার ব্যবস্থা ব গরীব মেয়ের বিয়েব ব্যবস্থা করেছেন, তাব সংখ্যা তাঁর কাছ থেকে জানবাব উপায় নেই।

বাঙলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় মাসীমার বাড়িঘর, মাতৃমন্দির সব গুড়িয়ে দিয়েছিল পাকসেনারা। স্বাধীনতার পর মাসীমা মুজিবুর রহমানের সঙ্গে দেখা করে সব জানালে, উনি চেয়ার ছেড়ে উঠে বললেন, 'মাসীমা, আপনে ক্যান এহানে আইছেন, আমারে ডাইক্যা পাঠান নাই ক্যান? এহানে আপনি আইবেন না। ঐ যে লোকগুলোনরে দ্যাখছেন, এগুলান সব চোর।' তারপর শিক্ষামন্ত্রীকে ডেকে মাসীমার সব করে দিতে বললেন এবং ঐ 'চোর'দের পকেট হাতড়েই ৫ হাজার টাকা মাসীমার হাতে তুলে দিলেন।

'৭১ সনের যুদ্ধের সময় মাসীমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল ওপারের মুসলমান ছেলেমেয়েরাই। গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে লুকিয়ে রেখে রেখে অনেক পরে মুক্তিফৌজের ছেলেরা তাঁকে বর্ডার পার করে দেয়। পাকিস্তান হবার পরে তো তিনি শুধু জেলই খাটলেন কত বছর।

কংগ্রেসের সমস্ত স্বদেশী আন্দোলনের মহিলা নেত্রী এই মাসীমা অতঃপর কমিউনিস্ট হলেন। কংগ্রেসী মহিলাকর্মী তো কত দেখলাম। কিন্তু এমন মুক্তবুদ্ধি, উদারধর্মী মহিলা আমি আর কাউকে পাইনি। পার্টির জন্য অর্থ সংগ্রহ, সর্বক্ষণের কর্মীদের অন্নসংস্থানের জন্য বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষার ঘট বসাতে মনোরমা বসু আবার সকলের কাছে হাত পাতলেন কমিউনিস্ট পরিচিতি

নিয়ে। বক্তা তিনি বড় একটা ছিলেন না, কিন্তু মন জয় না করে হাত পে
কারো দানও তিনি গ্রহণ করেননি।

এই আমাদের মনোরমা মাসীমা। এঁর কথা এইটুকু না বললে বরিশাল ও
সেখানকার আন্দোলনগুলিকে ভালো চেনা যেত না। মাসীমার দীর্ঘ জীবনে
কতটুকু কথাই বা আমি জানি আর কতটুকুই বা এখানে লেখা সম্ভব!

* * * * *

এই সঙ্গে বরিশালের পার্টির কথাটা একটু বলে নিতে চাই। পরে হয়তে
মনে থাকবে না। কোন বিস্তৃত বিবরণী নয়। শুধু পার্টির সর্বক্ষণের কর্মীদের
জীবনযাত্রার একটু ছবি তুলে ধরব। পার্টি কর্মীদের নিষ্ঠা ও সততা কাকে
বলে সেটা আমি সেখানেই প্রত্যক্ষ করি। একথা আজ অনেকের কাছেই
হয়তো গল্প মনে হবে।

পার্টির একটি কমিউন ছিল। তাতে অমৃত নাগ, জ্যোতি দাশগুপ্ত এবং
আরো কয়েকজন সারাক্ষণের কর্মী ও নেতা থাকত। এরা কিন্তু পার্টির
কাছ থেকে কোন 'দশ-বিশ' টাকার বেতন পেত না। কেই-বা বেতন দেবে?
ওরা নিজেরাই তো জিলা নেতা। যে সামান্য পয়সাকড়ি পার্টির ভাণ্ডারে জমা
পড়ত তাতে পার্টির কাজের প্রয়োজন মিটিয়ে কিছু অবশিষ্ট থাকলে সে পয়সা
খাওয়ার জন্য ব্যয় করা হতো। আমি নিজেই তো কতদিন দেখেছি—দুপুরে
ভাত, সামান্য একটু ডাল আর লঙ্কাপোড়া দিয়ে ওরা খেয়ে নিল। ডালটা
অনেক সময়েই বাদ পড়ে যেত। তখন শুধু ভাত আর লঙ্কাপোড়াই খাদ্য
তালিকায় স্থান পেত। তাও আবার দু'বেলা জুটত না। একদিন রাত্রে ওরা যখন
দু'পয়সা দামের একটি করে খাস্তা বিস্কুট ও জল দিয়ে খাওয়া শেষ করছে তখন
ধীরেন্দ্রনারায়ণ রায়চৌধুরী, আমাদের এক বন্ধু ভদ্রলোক, সেখানে এসে
গেলেন। বরিশালে তিনি সকলের কাছে পরিচিত ছিলেন 'কালাভাই' নামে।
ছেলেদের ঐ আহারপর্বটি দেখে উনি বলে উঠলেন, তোমরা কি মানুষ?

মনোরমা মাসীমা এদের জন্য বাড়ি বাড়ি 'ঘট' পেতে সাপ্তাহিক চালটা
অনেক সময়েই জুটিয়ে দিতেন। দুর্ভিক্ষের সময়ে ওদের এই চরম অবস্থায় মাসীমা
তাই মনে স্বভাবতই কষ্ট পেতেন। একদিন মাসীমা তাঁর বাড়ির ক্যানটিন থেকে
এক হাঁড়ি উদ্বৃত্ত খিচুড়ি নিয়ে রাত্রে ওদের খাওয়ার সময় উপস্থিত হলেন। তিনি
খুশি মনেই নিয়ে এসেছিলেন এই খিচুড়ি কিন্তু ছেলেরা ফেরত দিল। ওদের
কথা, এর চেয়ে উপোস করা ভাল। মাসীমাকে চোখের জল ফেলে সেই খিচুড়ি
ফেরত নিয়ে যেতে হলো। তিনি শুধু বলেছিলেন, 'তোরা তো কোনদিন

মা হবি না, তাই মায়ের কষ্ট তোরা বুঝবি না।'

বরিশালের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব মহিলা সমিতিকে অনেকগুলি ক্যানটিন খোলার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেজন্য তিনি টাকা ও জিনিসপত্র দিলেন। ওসব নিয়ে গ্রামে যেতে হবে। মেয়েদের সঙ্গে নৌকোয় দু'একজন ছেলেকেও যেতে হবে। কিন্তু নৌকো খরচ কোথায়? ছেলেরা বললো, 'সরকারী টাকা থেকে দেওয়া হোক্, হিসাবে লেখা হবে।' কিন্তু মেয়েরা নারাজ। সরকারী রিলিফের টাকায় হাত দেওয়া চলবে না। ব্যস্। আবার কয়েকটা বাড়ি থেকে এর জন্য চাঁদা তোলার পর—তবে যাওয়া হলো।

শুধু বরিশালেই নয়, তখনকার দিনে পার্টির সারাক্ষণের কর্মী ও নেতাদের এটাই ছিল জীবন।

আরও একজন পার্টি-নেতাকে আমি দেখেছিলাম। নাম মনে পড়ছে না। তিনি শিক্ষিত মধ্যবয়সী এক ভদ্রলোক। গ্রামেই কাজ করতেন এবং পার্টি অফিসেই থাকতেন। তাঁকে খেতে হতো পালা করে—এ-বাড়ি, ও-বাড়ি ঘুরে। এখন মনে হচ্ছে এটা আরও কঠিন কাজ। যাঁরা খেতে দিতেন তারা অবশ্য শ্রদ্ধার সঙ্গেই দিতেন। কিন্তু যিনি এ ভাবে পার্টির কাজে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন, তিনি কি একেবারে নির্বিকার থাকতে পারতেন? কথাটা জিজ্ঞেস করতে পারিনি, সাহসে কুলোয়নি।

এই একই জীবনযাত্রা একটু রকমফের করে সব জিলাতেই দেখেছি এবং নিজেকে নীতি-নিষ্ঠার এই পর্যায়ে তুলতে চেষ্টা করেছি।

অবশ্য আদর্শের জন্য এই ত্যাগ স্বীকার একা কমিউনিস্ট পার্টি করেনি। এ দেশের কংগ্রেস আন্দোলনও এই নীরব আত্মদানের কাহিনীতে ভরা। সংখ্যায় তাঁরা কত হাজার বা কত লক্ষ হবেন, আমার জানা নেই। কিন্তু দুঃখ পাই যখন কাগজে পড়ি ঐ সব নাম-গোত্রহীন দেশপ্রাণ কর্মীরা আজ জীবন সায়াহ্নে ছিন্নবস্ত্র গায়ে উপস্থিত হন একখণ্ড 'তাম্রপত্র' গ্রহণ করতে। এই নাকি তাঁদের আজীবন স্বদেশপূজার স্বীকৃতি। দেশের স্বাধীনতার ভাগবাটোয়ারার সময় এই সব সর্বস্বান্ত দরিদ্র আত্মত্যাগীদের কথা কারো মনে পড়েনি। পড়লে হয়তো দেশের চেহারাটা আজকের মতন না হয়ে অন্য রকম হতে পারত।

আমার ভয়, কমিউনিস্ট পার্টিতেও এমন হবে না তো! ভাগ্যান্বেষীরাই প্রাধান্য পাবে না তো!

* * * * *

যতটা মনে পড়ে এরপর আমাকে পাঠানো হয় মেদিনীপুর জিলায়। 'করঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' আন্দোলনে বাঙলা দেশের মধ্যে মেদিনীপুর ছিল অগ্রণী। শ্রীঅজয় মুখার্জির নেতৃত্বে 'স্বাধীন বাঙলা'র ঝাণ্ডা উড়েছিল তমলুকে। কিন্তু সেটা যে 'ভারতছাড়' আন্দোলনের পরিণতি তা সবারই জানা। সেই আন্দোলন অবশ্য বাঁচেনি। ইংরেজ সরকার মেরে, পিটিয়ে, গ্রেপ্তার করে, অর্থাৎ প্রচণ্ড দমননীতি চালিয়ে জনসাধারণের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে দিয়েছিল। তার ঠিক পরে পরেই এক বিধ্বংসী ঝড় জিলার সমস্ত প্রাণশক্তিকে যেন আর একবার গুড়িয়ে দিল। তমলুকই হলো বেশী বিধ্বস্ত। কমলা চ্যাটার্জী সেখানে প্রথম গেলেন। পথঘাট নেই, চলাচল ব্যবস্থা ভগ্ন, দুর্ভিক্ষে ও মহামারীতে গ্রাম-শহর ছারখার হচ্ছে। আমার সঙ্গে কোন রিলিফ সামগ্রী ছিল না। ওখানে গিয়ে সরকারের সাহায্য নিয়ে রিলিফকেন্দ্র খোলানো আমার কাজ। যতগুলি জায়গায় পার্টির অস্তিত্ব আছে সেসব জায়গায় একাজে হাত দেওয়া সম্ভব ছিল। পার্টির ছেলেদের সাহায্য ছাড়া শুধু কয়েকটি গ্রামের বৌ-ঝি নিয়ে এ কাজ হতে পারে না। ওখানে গিয়ে স্থানীয় লোকজনদের দেখে আমার মনে হয়েছিল—মারের পর মার খেয়ে লোকগুলো যেন বোবা হয়ে গেছে। ইংরেজের মার, ঝড়ের মার এবং দুর্ভিক্ষের মার। কত মার আর খেতে পারে মানুষ ?

এই জিলায় আমাকে মাসখানেক থাকতে হয়েছিল। কলকাতায় আমাকে বলা হয়েছিল—মেচেদা স্টেশনে নামতে। ভোর বেলা নেমে দেখি কেউ নেই। যাত্রীরাও স্টেশন খালি করে চলে গেছে। একা আমি দাঁড়িয়ে। অনেকক্ষণ বাদে একটি লোক জিজ্ঞেস করল : 'আপনি কোথায় যাবেন ?' গ্রামের নামটা তখন মনে ছিল, এখন মনে নেই। বংশী সামন্তর বাড়ি যাব—তাও বললাম। ও বললো, 'সে তো ৪ ক্রোশ দূর হবে, আপনি যেতে পারবেন ?'···· 'পারব, যদি আমাকে কেউ চিনিয়ে দেয়।' লোকটি রাজী হলো। একটি ছোট টিনের সুটকেস্ ও চাদর জড়ানো একটি বালিশ হাতে আর বগলে নিয়ে চললাম। খানিক বাদে লোকটি আমার বাক্স নিজের হাতে নিয়ে নিল। অনেকক্ষণ হাঁটলাম। লোকটি বললো বংশী সামন্তর বাড়ি এখান থেকে কাছেই। হঠাৎ মাঠের দিকে আঙ্গুল উচিয়ে বললো, 'ঐ তো বংশী সামন্ত কাজ করছে ক্ষেতে।' তাকে সে ডাকতে লাগল। বংশী সামন্ত এসে বললো, 'আপনি একলা কেন ? আপনাকে আনতে তো মিছিল গেছে।' আমি অবাক। বললাম, 'আপনার বাড়িতেই চলুন যাই।' সে কাজ ফেলে আসতে পারল না। ঐ লোকটিই আমাকে পৌছে দিল। বাড়ির মেয়েরা জানত আমি আসব। তাদের ঘোমটা

খুলে দিতে এবার আর দেরি করিনি। জিজ্ঞেস করতে বললো, 'কর্তারা তো সবাই গেছে খোল-করতাল নিয়ে প্রভাত ফেরিতে। ঐ পথে স্টেশন থেকেও আপনাকে আনবার কথা।' কি হলো বুঝতে পারলাম না। পথেও তো কাউকে দেখিনি।

ঘণ্টাখানেক বাদে 'নগরকীর্তন-এর দলটি ফিরল—'হরেকৃষ্ণ হরেরাম' গাইতে গাইতে। নেত্রী না আসায় 'জিন্দাবাদ' আর করতে হয়নি। জিজ্ঞেস করলাম, 'স্টেশনে যাননি কেন?' বললো, 'গিয়েছি বই কি, তবে কোলাঘাটটাও হয়ে গেলাম কিনা, তাই একটু দেরি হলো। তবে প্রচারটা হয়েছে।' ঘটা করে এ গল্পটা করার দরকার ছিল না। তখনকার দিনে গ্রামের মানুষদের সময়-জ্ঞানের একটু পরিচয় দিয়ে রাখলাম। এ বিপত্তি পরেও দেখা যাবে।

স্থানীয় নেতা কে ছিল মনে নেই। আলোচনায় ঠিক হলো—প্রথমে আমরা যাদের কিছু নেই তাদের তালিকা নেব। পরে নেব অন্যদের, অর্থাৎ যারা কিছু সাহায্য পেলে বাড়িতে কোনরকমে খেতে পারবে। মহকুমা হাকিম ইতিমধ্যে ক, খ, গ, এই তিনভাগে তালিকা করার জন্য ফর্ম দিয়েছেন। পরদিন সকালেই তালিকা তৈরি করতে বেরুনো হলো। সঙ্গে সঙ্গে একটি জনসভার প্রচারও হলো, বিকেলের জন্য।

যে অভিজ্ঞতা এখানে গ্রাম ঘুরতে গিয়ে আমার হলো, তা কলকাতা-বরিশালের তুলনায় অনেক ভয়ঙ্কর। কথায় বলে দুর্ভিক্ষের আকাশে শকুন ওড়ে, আর মড়ার সদ্‌গতি করে শেয়াল-কুকুর এবং শকুন মিলে। ঠিক তাই ঘটতে দেখলাম। গ্রামের সরু চলার পথ ধরে আমরা যাচ্ছি। দুপাশে অল্প জঙ্গল। হঠাৎ একজন আমার হাত ধরে সরিয়ে এনে বললো, 'চলুন অন্য পথে যাই।' আমার চোখে পড়ল—কুকুর ও শকুনে একটি শবদেহ কাড়াকাড়ি করে খাচ্ছে। এ ঘটনা দেখতেই বাকি ছিল। সবাই সরে এলাম। কারো মুখে কোন কথা নেই। আমার কেবল মনে হচ্ছে—এই সেই অজয় মুখার্জীর দেশ, যিনি স্বাধীনতার পতাকা উড়িয়েছিলেন। এই সেই দেশ, যেখানে মাতঙ্গিনী হাজরা গুলিতে প্রাণ দিয়েও হাতের পতাকা ছাড়েন নি।

ঘুরে ঘুরে কিছু নাম ঠিকানা টোকা হলো। একখানা কুঁড়ে ঘরের সামনে ছেলেরা ডাকাডাকি করছে, কিন্তু কেউ বের হলো না। চালার দুয়ারটা ফাঁক হয়েই ছিল। উঁকি দিয়ে দেখা গেল, পড়ে আছে এক বৃদ্ধার মৃত দেহ। নাম নিতে আর হলো না। শুনলাম, এর যারা স্বজন-পরিজন ছিল তারা শহরে চলে গেছে। বৃদ্ধাটি যেতে পারেনি তাই এই অবস্থা। বললাম, 'শবদেহের কি

হবে ?' উত্তর শুনলাম, 'একটু আগে যা দেখলেন—তাই হবে।' বুঝলাম এসব মড়া সরাবার জন্য মিউনিসিপ্যালিটির লোক থাকে না। গ্রামের লোক যারা ছিল তারা এল। বুঝিয়ে বলা হলো, সরকারের সাহায্যে খিচুড়ি ক্যান্টিন খোলার কথা। তালিকা পড়ে শোনানো হলো, কারো নাম বাদ গেছে কি না তাও জিজ্ঞাসা করা হলো। উত্তর দেয় না কেউ, সব যেন পাথরের মতো দাঁড়িয়ে। চোখে অবিশ্বাস স্পষ্ট। বাচ্চাদের দেখে মনে হলো—কাউকেই বাঁচানো যাবে না। কবে খিঁচুড়ি পেটে পড়বে কে জানে ! হাকিমকে বলা হলো যদি এদের বাঁচাতে চান, দু'একদিনের মধ্যে খিঁচুড়ি ও দুধের ক্যান্টিন খুলতে হবে। সবই আপনাকে জোগাড় করতে হবে। এ গ্রামে চাঁদা তোলা যাবে না। কারোরই কিছু নেই। তাঁকে আমাদের সব অভিজ্ঞতার কথাই জানালাম। মৃতদেহ সৎকারের জন্য তাঁকে ডোমের ব্যবস্থা করতে বলা হলো। নয়তো অসুখ ছড়াবে, একথাও জানিয়ে দিলাম।

অবশেষে ক্যান্টিন খুললো ৩/৪ দিনের মধ্যে। খ ও গ তালিকার জন্য মাথাপিছু চাল ও টাকা সাহায্যের ব্যবস্থা হলো।

এসব কাজ চালাবার মতন মেয়ে এদের ঘরে নেই। তাই ছেলেদের মধ্যে থেকে কিছু স্বেচ্ছাসেবক যোগাড় করা হলো। ওরাও খাবে। কিন্তু রান্না ও পরিবেশনের কাজ ওদের করতে হবে। ক্যান্টিন চলতে লাগিল। বরিশালের খিচুড়ি নয়—এর নাম 'গ্রুয়েল'। এদের পেটে এখন পাতলা চাল-ডালের জলটাই হয়তো সইবে। এরপরেও দু'তিন দিন ছিলাম ওখানে। ঘুরেছি ঘরে ঘরে। তাকানো যায় না কারো দিকে, বিশেষ করে মেয়েদের দিকে। শিশুরা তো উলঙ্গই, মেয়েরাও প্রায়। তাই ঘরে গেলে মুখও তোলে না—তাকায়ও না। এদের আমি রাজনীতি, বন্দীমুক্তির কথা—এসব কি করে বলব ! আমার মুখেও কোন কথা আসে না।

এরপর আর একটা গ্রামে গেলাম। নাম মনে নেই। হরিবাবু নামে এক ডাক্তারের বাড়িতে আমি উঠলাম। গিয়ে দেখি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ও সেখানে। সেও ঘরে ঘুরে দেখছে ও সংবাদ সংগ্রহ করছে। এখানে আমরা থাকব দু' একদিন। ডাক্তারবাবু আমাকে খুব খাতির যত্ন করলেন। সকালবেলা চায়ের আয়োজন হচ্ছে। বৌদের উপর বিশ্বাস নেই, নিজেই করছেন। কিন্তু ছাঁকবার সময় ফট্ করে পকেট থেকে মুখ মোছা রুমাল বের করে তাতেই ছেঁকে কাপটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। ফেরত দিতে পারলাম না। আর এক বাড়ি দেখেছিলাম গামছার কোণায় চা ছাঁকতে। সেটাও খেতে হয়েছিল।

এরপর থেকে সাবধান হয়ে গেলাম। আগেই বলে দিতাম চা খাই না। এদের কোন দোষ নেই। চায়ের পাট এসব পরিবারে চালু হয়নি। শহর থেকে কোন অতিথি এলে তাদের আপ্যায়নের জন্যই এই অকারণ বিড়ম্বনাটা সইতে হতো।

যাক্ যা বলছিলাম। সুভাষ ও আমি পরদিন সকালে বেরিয়ে পড়লাম। আমরা যাব পাঁশকুড়া। সেখানে কলেরা-মহামারীর তাণ্ডব। ডাক্তারবাবু আমাদের টি. এ. বি. সি. দিয়ে দিলেন। একটা মোটা ছুঁচ এমন ফুটিয়ে দিলেন যে আমার হাত দিয়ে দর দর করে রক্ত পড়তে লাগল। একজন এসেছেন আমাদের নিয়ে যেতে। বেলা ১০টায় হাঁটতে শুরু করে বিকেল ৪ টায় পৌঁছালাম। দু' জনেরই জ্বর উঠে গেছে। আমার হাতটা ব্যথায় ছিঁড়ে পড়ছে। অনেক জলকাদা ভরা মাঠ ভেঙে আসতে হলো।

যে বাড়ি উঠলাম তাদের সঙ্গে কথা না বলেই মাদুর-পাতা বারান্দায় শুয়ে পড়লাম। একটুখানি রোদ ছিল। সুভাষ খেতে ডাকল। খেলাম না আর। কখন যে সুভাষ খেয়ে বেরিয়েছিল জানি না। আমার অবস্থা দেখে মেয়েরা বিছানা করে শুতে দিলেন। বোধহয় মধ্যরাত্রে ওরা আমাকে একটু বার্লি খেতে জাগালেন। লণ্ঠনের তাপে ওরা আমার হাতের ব্যথায় নুনের সেক দিচ্ছেন। ঘামে সারা গা ভেজা। আঁচল দিয়ে মুছে নিচ্ছেন এক বৃদ্ধা। খুব আরাম লাগল। মায়ের স্নেহাঞ্চল এমনিই বুঝি পাতা থাকে সর্বত্র। বার্লিটুকু খেয়ে বললাম, আমার জ্বর ছেড়ে গেছে। এবার আপনারাও বাতি নিভিয়ে শুয়ে ঘুমোন আমার কাছে।

বৃদ্ধার এক বিধবা মেয়ে ছিল আর তাঁর বৌ ছিল—অনুপমা। এখানে এই মেয়ে ও বৌ আমার সঙ্গী। এখানেও সেই একই কাজ। গ্রামে ঘুরে ঘুরে তালিকা তৈরি ও কিচেন খোলানো। ওরকম বীভৎস দৃশ্য এখানে দেখিনি। তবে না-খাওয়া পীড়িত মানুষই প্রায় সব। বেশীর ভাগই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে গেছে। কোথায় কে জানে! তমলুকে, মেদিনীপুরে, না কলকাতা শহরে, কে কার খোঁজ রাখে! গ্রামে কিচেন খোলানো বেশ মুশকিল। তালিকাগুলো নিয়ে শহরে যেতে হবে হাকিমের কাছে। সেখানে অনুমোদন করা হবে, জিনিসপত্র আসবে—তবে তো। এতে বেশ দেরি হতো। অথচ আমাদের হাতে কিছু নেই। রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম—এরা নিজেদের রসদে কিচেন খুলেছেন অনেক গ্রামে। মৃতপ্রায়দের তাঁরাই কিছুটা বাঁচাতে পেরেছেন। আমাদের কর্মীরা দুস্থদের সেখানে যুক্ত করার কাজ করত। ওখানে সমিতি একটা হলো—অনেক কষ্টে। সরোজিনী, অনুপমা ও আমি—এই তিনজন

কয়েকখানা ছোট গ্রাম ঘুরলাম। মজুর-চাষীদের ঘরগুলো প্রায় খালি। সবাই শহরে চলে গেছে। যারা আছে তাদের নিয়ে মিটিং করে সাহস যোগাতে হয়। আবার আমরা স্বাধীন হবার আন্দোলন করব, নিশ্চয় স্বাধীন হব, এসব কথা শোনাতে হয়। বলতে হয়—নেতারা সবাই জেলে। তাদের মুক্তির জন্য আবার আমাদের সভা-মিছিল করতে হবে, তারা ফিরে না এলে কি হবে? অজয়বাবুকে আনতে হবে তো। ঘরে ঘরে গিয়েও এ সব কথা বলা হতো। অনুপমা চেনে সবাইকে। আমার আসার আগেই সে ওদের কাছে কয়েকবার এসেছে। সেও এসব কথা বলত। এইভাবে প্রচারের ফলে ভয় যেন একটু কমল। অতঃপর কৃষক মেয়েদের সমিতির সভ্য করা শুরু হলো। কমিটিও করা হলো। কলকাতার সম্মেলনে যোগ দিতেও ওদের আহ্বান জানালাম। অনুপমা ও সরোজিনী ওদের আবার উঠে দাঁড়াতে সাহায্য করার দায়িত্ব নিল। আমাকে এখন অন্যত্র যেতে হবে।

এর পরের প্রোগ্রাম ময়না থানায়। এই থানার যে গ্রামে প্রথম গেলাম তার নাম যেন মনে পড়ে 'চরবসন্'। ওদিকে 'বসন' দিয়ে নামের বেশ কয়েকটি গ্রাম আছে। যে বাড়িতে উঠলাম তাদের আর কারো নাম মনে নেই। শুধু মনে আছে বিমলা নামে একটি মেয়ের নাম। বছর তেরো বয়স। ফুরফুরে পাতলা গড়ন, ফর্সা রং-এর একটি মেয়ে। 'বাতাসী' বলে সবাই ডাকে। নামটা ওর চেহারার সঙ্গে মেলে। বাতাসেই যেন উড়ে চলে। এখানে এই মেয়েটি আমার সঙ্গী। ও আমাকে জলপথে তালের ডিঙি বেয়ে নানান গ্রামে নিয়ে যেত। হাঁটা পথের চেয়ে জলপথে ঘুরতে হয় কম। ওকে দেখে আমার নিজের ঐ বয়সটা মনে পড়ত। কিন্তু আমি নৌকো বাইতে পারতাম না, এ মেয়ে ওস্তাদ। সাঁতার জানি, তাই ভয় পেতাম না। কিন্তু মজে যাওয়া জলে পড়ে যাওয়াটা খুব আনন্দের নয়। এটা বরিশালের খালের জল নয়। শক্ত করে দু'হাতে দু'দিক ধরে বসে থাকতাম। বাতাসী হাসতে হাসতে আমাকে নিয়ে যেত।

এখানে আমি এসেছি মেয়েদের মধ্যে সমিতি গঠনের জন্য চেষ্টা করতে। দুর্ভিক্ষের কাজ নয় ঠিক। এখানে কৃষক সমিতি গড়ে উঠেছে। মেয়েরাও তাই 'সমিতি' নামটার সঙ্গে পরিচিত। বিমলা দেখলাম সবাইকে চেনে। এ সব গ্রামে ওর খুব যাতায়াত আছে। একদিন ঘরে ঘরে মিটিং-এর কথা বলতে যেতাম, পরদিন হতো মিটিং। গ্রামগুলি গরীব কৃষকদের। কৃষকদের শ্রেণীভেদের কথা তখনও খুব একটা জানি না। শুধু জমিদার-কৃষক এই সম্পর্কের কথাই জানা ছিল। কৃষক সমিতির পাশাপাশি মেয়েদেরও সমিতি

কেন গড়তে হবে এইটুকুই আমার বলার কথা। ছেলেরা সমিতি করে, বৌ-মেয়েরা সেখানে যেতে পারে না। কিছু জানতেও পারে না। এটা কি ঠিক হচ্ছে? বাড়ির পুরুষরা যখন কৃষক তখন মেয়েরাও তো কৃষাণী। সব কথা তাই তাদেরও জানতে হবে, কাজকর্ম মজুরি এ সব বুঝতে হবে। দরকার হলে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়ে লড়তে হবে। কৃষক-বৌদের শুধু ঘোম্‌টা দিয়ে সংসার করলে চলবে না। এ সবও করতে হবে। গল্পসল্প হতো, যুদ্ধের কথা, স্বাধীনতার কথা শুনতে ওদের ভাল লাগত। বেশ কয়েকটি সমিতি হলো। যোগাযোগ রাখবে বাতাসী।

চলে আসবার ২/৩ দিন আগে 'বাতাসী'র মা আমাকে বললেন, 'আপনার সঙ্গে তো মেয়েটা খুব ঘুরছে। আমার বড় ভয়।' —'কেন?' —'ও-যে বিধবা।' শুনলাম অনেক আগেই বিধবা হয়েছে। বয়স তো মাত্র তেরো। এই সেই শিশু-বিধব—যা দেখিনি আগে। তবু ভাল, কৃষকদের ঘরে তত হিন্দুয়ানী নেই। বিমলাকে তার মা খেতে পরতে কষ্ট দেয় না। মনে মনে ভাবলাম —বিমল তো কর্মী হবে। এ তো চলতে পারে না। এই সংস্কার ভাঙতেই হবে। ভেঙেছিল, কমিউনিস্ট পার্টি ওকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার পথ দেখিয়েছিল। কে জানত সেদিনের সেই ছোট ফুরফুরে 'বাতাসী' একদিন কৃষকনেত্রী বিমলা মাজি হবে, আর স্বামী-পুত্র-সংসার পাবে?

চলে আসার আগে বিমলাকে কলকাতার সম্মেলনে আসতে নিমন্ত্রণ জানালাম। এর পরে গেলাম কানাই ভৌমিকদের গ্রামে। ওদের বাড়িতে থাকলাম। ওরা মধ্যবিত্ত কৃষক-পরিবার। কানাই ভৌমিক সবে বি. এ. পাশ করে বেরিয়েছে। ওর দাদা সংসার দেখেন। ওর বৌ কিছুটা লেখাপড়া জানা মেয়ে। বৃদ্ধা মা-ও খুব ভাল। সকলেই রাজনীতি করতেন। গ্রামে এরকম পরিবার প্রথম দেখলাম। কানাই ভৌমিক প্রথমে পার্টি-কর্মী, পরে নেতা, এখন এম. এল. এ. এবং মন্ত্রী। ওর স্ত্রীকে নিয়ে গ্রামে ঘুরতাম, সমিতিও তৈরি হলো। সমিতি রক্ষার দায়িত্ব নিতে হলো তাকে।

প্রায় মাসখানেক তমলুক মহকুমায় থেকে মেদিনীপুর শহরে এলাম। গোপেন দা[৪] (চক্রবর্তী) জিলা কমিটির নেতা। উনি আমাকে দেখেই বললেন, 'এ কি চেহারা করেছ? কাপড়-জামা ধুলোয় লাল, মাথার চুল কটা। শীগগির

৪. গোপেন চক্রবর্তী ১৯২৪ সনে সোভিয়েটে গোপনে চলে যান। পরে মীরাট-ষড়যন্ত্র-মামলার আগে ফিরে আসেন ও গ্রেপ্তার হন।

সাবান দিয়ে চান করে এসো।'

এমন অবস্থা হয়েছে তা ঠিক বুঝতে পারিনি। তবে সাবান দিয়ে স্নান করা ও দাঁত মাজতে পেস্ট-ব্রাশ ব্যবহার করা দু'চারদিন পরেই ছেড়ে দিয়েছিলাম। পুকুরঘাটে আমার ঐ বিলাসিতাগুলো ছোট ছেলেমেয়েরা বেশ নজর করে দেখত, আমি লজ্জা পেতাম। ওরা হয়তো আমাকে দূরের মানুষ ভাববে তাই ওসব ছেড়ে দিলাম। তাছাড়া কাপড় কাচার সাবানই বা কোথায় পাব? আমার ময়লা শাড়িও তো ওদের তুলনায় ফর্সা। কয়েকদিন পরে আর এ নিয়ে কিছু মনেও হতো না। এর অনেক পরে '৪৮ সনে চীন দেশের পার্টি মেয়েদের গল্প শুনেছিলাম একটি চীনা পার্টি মেয়ের কাছে। তার নাম—লুৎ-সুই। ওর স্বামী ছিলেন রেড্ আর্মির পলিটিক্যাল এ্যাডভাইসার।

ওখানে কলেজ থেকে বেরুবার পর ছাত্রছাত্রীদের মাও-সে তুং গ্রামে পাঠিয়ে দিতেন কৃষকদের সঙ্গে কাজ করার জন্য। যাবার আগে মাও ওদের বলতেন, 'তোমরা মশারি টাঙাবে না। তাহলে ওদের আর তোমাদের মধ্যে যে আড়াল সৃষ্টি হবে—সেটা আর ঘুচবে না। ওদের থেকে অন্যরকম আচার-ব্যবহার যেন তোমাদের না হয়।'

লুৎ-সুই গল্প করেছিল—একদিন বিকেলের রক্তরঙীন সূর্যাস্ত দেখে ও বলে উঠল—'বা! কি চমৎকার লাল সূর্য।' কৃষক মেয়েরা কোন সাড়া দিল না। একটু বাদে একজন বললো, 'কালও বৃষ্টি হবে না, ক্ষেত-খামার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিল।' লুৎ-সুই বুঝল, সৌন্দর্য উপভোগ করার সময় এদের নেই। ওদের দুশ্চিন্তার ভাগ সেও কেন নিতে পারল না সে কথা ভেবে খুব লজ্জা বোধ করল। তিন বছর পরে যখন বাড়ি ফিরল তখন ওকে দেখে ওর মা কেঁদে ফেলেছিলেন। উকুন ছাড়াতে ওর মাথাটা কামিয়ে ফেলতে হয়েছিল। আর গায়ের চর্মরোগ সারাতে লেগেছিল মাসখানেক।

আমাদের মধ্যবিত্ত কর্মী মেয়েরা যখন গ্রামে কাজ করেছেন এবং থেকেছেন তখন এ অভিজ্ঞতা তাদেরও হয়েছে। গীতা মুখার্জিকে তো সর্বদাই দেখতাম যখন একত্রে মেদিনীপুরে কাজ করেছি। মেদিনীপুর চষে বেড়াতে গিয়ে শরীরটা ওর আধখানা হয়ে গিয়েছিল।

গোপেনদা বললেন, 'দু'দিন তোমার বিশ্রাম। এরপর কেশপুর যাবে কৃষক সম্মেলনে 'সভানেত্রী' হয়ে।' বুঝলাম, উনিই আমাকে সভানেত্রী বানিয়ে নিলেন। ওখানে গিয়ে ঘোষণা করা হবে। আমার আর কি তাতে, সম্মেলনটা দেখবার ইচ্ছা আমারও তো ছিল।

যাবার দিন, আমি তৈরি হয়ে আছি। সন্ধ্যা প্রায় ৭টা বাজে। ট্রেনের সময় হলো। কিন্তু ওদের কারো পাত্তা নেই। প্রায় নটা যখন বাজে তখন একে একে সবাই এলেন। জিজ্ঞেস করলাম, 'ট্রেন পাব তো?' ওরা বললেন, 'সেজন্য কিছু চিন্তা নেই। একটা না পাই আর একটা ধরব।' ভাবলাম, বোধহয় লোক্যাল ট্রেনের মতন ব্যাপার। গড়িমসি করে আমরা যখন স্টেশনে পৌছালাম তখন কোন ট্রেন দাঁড়িয়ে নেই। আমরা অপেক্ষা করছি। স্টেশন মাস্টার বেরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কোথায় যাবেন?' — 'কেশপুর।' 'সে ট্রেন তো সাতটায় চলে গেছে।' 'আর কোন ট্রেন নেই?' 'আর কাল সন্ধ্যায় পাবেন'—বলে স্টেশন মাস্টার চলে গেলেন।

আমি জানতাম এরকম হবে। মেদিনীপুর জিলায় নেমেই তো জেনেছিলাম, এ জিলার লোকেরা ঘড়ি দেখেন না। জিজ্ঞেস করলাম, 'এখন কি হবে?' গোপেনদা বললেন, 'কি আর হবে? এইটুকু তো পথ, হেঁটে চলে যাব, তুমি পারবে না? ৩০/৩২ মাইল পথ, ভোরবেলা পৌছে যাব।' বললাম, 'আমি কলকাতা ফিরে যাই, এটা পারব বলে মনে হয় না'। তাই ঠিক হলো। আমাকে কলকাতার গাড়িতে তুলে দিয়ে ওঁরা চলে গেলেন। ভাগ্যিস সে গাড়িটা ছিল!

কলকাতায় ফিরে দেখলাম আমাদের কর্মী অনেক বেড়েছে। কলকাতার পাড়ায় পাড়ায় মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শাখা-প্রশাখা ছড়িয়ে যাচ্ছে। তা ছাড়া এবার সামনে রয়েছে আমাদের গঠনমূলক কাজেরও প্রোগ্রাম। স্থির হলো, প্রত্যেক শাখা সমিতিকে দু'একটি করে গঠনমূলক কাজের কেন্দ্র খুলতে হবে। শিশুদের জন্য দুগ্ধকেন্দ্র ও স্কুল, মেয়েদের জন্য শিল্পকেন্দ্র ও বয়স্কা শিক্ষাকেন্দ্র—এর কিছু না কিছু করতেই হবে। বেশীর ভাগ কাজ শুরু হলো বস্তি এলাকায়। চালের লাইন ক্রমশ ক্ষীণ হচ্ছে। গ্রামের লোক গ্রামে ফিরে গেল। যাদের গ্রামে কোন জীবিকার সন্ধান মেলেনি তারা ফুটপাথে সংসার পাতল। কলকাতার জীবনে কালে কালে এই 'ফুটপাথের সংসার' যে কি অভিশাপ হয়ে দেখা দিল ৩০/৩৫ বছর পরের কলকাতাবাসী তা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন। এ তো সংসার নয়, নরকবাস। জীবিকা—প্রধানত ভিক্ষা আর টুকিটাকি কাজ। গ্রামের স্বাভাবিক জীবনে এরা বোধহয় কোনকালেই আর ফিরে যাবে না। অথচ এই কলকাতাতেই রোজ সকালের ট্রেনগুলো থেকে মেয়েরা নামে তরিতরকারি বা চালের বোঝা মাথায় করে। বাজারে তা বিক্রি করে দুপুর বা বিকেলের গাড়িতে বাড়ি ফেরে। এ মেয়েরা কাজ করে। সংখ্যায় তারা

হাজার হাজার। গ্রামের সংসারের মর্যাদাটুকু এরা বজায় রেখেছে। নারী-শ্রমিকের দলে এরা নতুন সংযোজন। সংখ্যাটা ক্রমশ বাড়ছে। শ্রদ্ধা হয় যখন দেখি—বৃদ্ধারাও একটা কিছু জিনিসপত্র নিয়ে বিক্রি করতে বসে আছে। এরা ভিক্ষার অন্ন খায় না, শ্রমের অন্ন খায়। সংসার বাঁচায়। ফুটপাথের ঐ 'বারোয়ারী' সংসারগুলো ঐ পথে কোনকালেও কি ফিরে যাবে না? নারীর মান-মর্যাদা আবর্জনার স্তূপেই কি চাপা পড়ে থাকবে?

সমিতির ক্ষুদ্র শক্তি নিয়ে এদের কথা ভাববার মতো সামর্থ্য কোথায়? তাই আমাদের কাজ বস্তির অল্পরুজির সংসারের কল্যাণেই প্রধানত নিয়োজিত হতো। যিনি এই কাজে আমাদের প্রথম পথ দেখান তিনি হলেন তৎকালীন পার্টি নেতা পি· সি· যোশী। নারীর বিশেষ অধিকারের জন্য আন্দোলনে আমাদের চেষ্টা করতে হবে সমাজের একেবারে উপরতলা বাদ দিয়ে মোটামুটি অন্যসব শ্রেণীর মেয়েদের ঐক্যবদ্ধ করতে। স্বাধীনতার সংগ্রামে মেয়েরা সকলের সঙ্গেই সমান অংশ নেবে। শ্রেণীসংগ্রামের ক্ষেত্রে তারা অগ্রণী হবে। গঠনমূলক কাজের মধ্যে মেয়েদের সংগঠিত করতে হবে। নারী ও শিশুর কল্যাণ সাধনই হবে কর্মীদের ব্রত। এছাড়া ফ্যাসিবিরোধী প্রচার, বন্দীমুক্তি আন্দোলন—এ তো আছেই। এ সবই হলো পি· সি· যোশীর শিক্ষা।

এই শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করে আমরা দেখেছি, মেয়েদের মন জয় করতে আমাদের দেরি হয়নি। সংগঠনের মধ্যে তাদের আমরা ধরে রাখতেও পারি। পাঁচজনের সঙ্গে কথাবার্তা ও আলাপ-আলোচনায় তাদের জানার পরিধিটা বাড়ে, মন খোলে, রান্নাঘরের বাইরের জগৎটাকে দেখতে পায়। নিজের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক অধিকার ও কর্তব্য সম্পর্কে জ্ঞান জন্মায়। ক্লাসে শিশুপালন সম্পর্কে অভিজ্ঞদের আলোচনা মেয়েরা শুনতে পেত। তাই রান্না-খাওয়ার পর কখন দুটি ঘণ্টার ছুটি মিলবে, ক্লাসে চলে আসবে, এজন্য মেয়েরা উন্মুখ হয়ে থাকত। প্রথম প্রথম স্বামীরা আপত্তি করতেন, তাদের একচেটিয়া অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়ার জন্য। কিন্তু শিল্পকর্ম শেখার পর যখন ঘরে ঠেকার কাজ চালিয়ে দিতে স্ত্রীর সাহায্য পেতেন তখন স্বামীরা সময় থাকলে সঙ্গে করে পৌঁছে দিতেন, এটাও দেখেছি। কলকাতা শহরে নানা বিষয়ের মিটিং-মিছিলে এই মেয়েদেরই আমরা সঙ্গে পেতাম।

এ কাজে যেসব মা-মাসীমাদের সাহায্য পেয়েছি বা এই সব কাজে তাঁদের যে উৎসাহ দেখেছি তা উল্লেখযোগ্য। রেণু চক্রবর্তীর মা ছিলেন এরকম একজন। বস্তিতে আমাদের কাজ শুরুর কাজে তিনি এগিয়ে এলেন। বাচ্চাদের একটি

দুধের ক্যান্টিন ও পড়ার ক্লাস খোলা হলো ডোভার লেনের বস্তিতে। মাসীমা তার ভার নিলেন, বিশেষ করে পড়ার ক্লাসটির। রোজ সকালে চক আর স্লেট হাতে করে তিনি আসতেন, বসবার জন্য মাদুরটিও সঙ্গে আনতেন। কিছু সময়ের জন্য একটি ঘরও পাওয়া গেল। ঘরের লাল সিমেন্টের উপর চক দিয়ে মাসীমা ওদের অক্ষর শেখালেন। ছেলেরা রোজ সকালে স্নান করেই স্কুলে আসত এবং ঠিক সময়ে পৌঁছে যেত। মাসীমা ওদের পরিচ্ছন্নতা ও সময়জ্ঞান শেখালেন। বস্তির ঠিকা মালিক ঘরখানা বিনামূল্যে ব্যবহারের জন্য আমাদের দিয়েছিলেন। মাসীমা নিজে যেমন অর্থ দিয়ে সাহায্য করতেন তেমনি তা সংগ্রহ করতেন। ক্রমে প্রত্যেকের জন্য বই-স্লেট হলো। মাসীমা পরে চার আনা মাইনে স্থির করলেন। মা-বাবারা খুশি হয়েই দিতেন। কারণ এদের জন্য সে সময় কর্পোরেশন স্কুল পাড়ায় পাড়ায় ছিল না। শিক্ষার জন্য ঐ স্কুলটিই ছিল বস্তির ভরসা। সংগৃহীত অর্থে স্কুলের জন্য সরঞ্জাম কেনা হতো। মাসীমাকে সাহায্য করার জন্য একটি মেয়ে যোগ দিল। তার সামান্য হাত খরচ ঐ টাকা থেকে দেওয়া হতো। ক্যান্টিনের প্রতিও মাসীমা লক্ষ্য রাখতেন। বলতেন, না খেলে ওরা মন দিয়ে পড়বে কি করে? স্কুলটির কথা এখনও ছবির মতো মনে পড়ে। মাসীমার বাড়িতেও একখানা ঘর উনি ছেড়ে দিলেন সেলাই ক্লাসের জন্য। সেখানে কাশ্মীরী হাতের কাজ শেখাতেন সুরুচি সেন।

কিছু পরে বস্তির ঐ ঘরে একটি সেলাই ক্লাসও দুপুরে খোলা হলো। পরিচালনার জন্য নিযুক্ত হলো ঐ বস্তির বীণা নামে একটি মেয়ে। আমার সঙ্গে ফার্ন রোডে থাকতেন আমারই এক আত্মীয়া। নাম—সুষমা সেন। কিন্তু তাকে 'পিসী' বলেই ডাকত সবাই। মাসীমার সঙ্গে এবং বীণার সঙ্গে এই স্কুলটি সেও দেখত। বয়স্ক ক্লাসও ছিল। এটাই সে বেশি করে দেখত। নীলিমা সেন নামে একজন অধ্যাপিকাও আমাদের সঙ্গে থাকত। সেও কাজ করত এই বস্তিতে।

ফার্ন রোডের বাড়িতে আরও একজন মহিলা থাকতেন। আমার বাল্যবন্ধু, মনোরমা গুহ। পঞ্চাননতলা বস্তিতে তার পরিচালনায় শিশু-স্কুল, শিল্প-ক্লাস, বয়স্কা-ক্লাস সব খুলে গেল। ছেলেরাও চালাত একটি স্কুল। আজ শোনা যায়, এই বস্তিটা সমাজ-বিরোধীদের আড্ডা। খুন, ছিনতাই বোমাবাজি ওখানে এখন নিত্য দিনের ঘটনা। পাড়ার লোকেরা তটস্থ। কিন্তু সে সময়ে এমন ছিল না। এই গঠনমূলক কাজগুলিকে কেন্দ্র করে প্রতিটি ঘরের সঙ্গে কর্মীদের প্রাত্যহিক যোগাযোগ ছিল। এর ফলে সেখানকার ছেলেরা সমাজসেবার কাজে

যুক্ত থাকত। রাজনৈতিক চেতনাও তাদের কম ছিল না। বস্তিটিকে লোকে 'লালবস্তি' বলত। কলকাতার চেহারাই তো বদলে যাচ্ছে এখন। তাই এতদিনের কমিউনিস্ট কর্মীদের জনসেবার ক্ষেত্রটির ঐ চেহারায় আজ বিস্মিত হই না। কিন্তু এখনও আমি বিশ্বাস করি, সমাজসেবী মানুষদের সঙ্গে যদি এসব জায়গার ছেলেদের যোগাযোগ ছিন্ন না হতো তা হলে 'মস্তান' কথাটা বোধহয় এভাবে জন্ম নিতে পারত না।

বালিগঞ্জ স্টেশনের কাছে থাকতেন সুনীতকুমার ব্যানার্জী, প্রেসিডেন্সী কলেজের ইংরেজীর অধ্যাপক। তাঁর পুত্রবধূ করুণা ব্যানার্জী 'পথের পাচালী'র শিল্পী। বাড়ির সকলেই ছিলেন কমিউনিস্ট মনোভাবাপন্ন। অধ্যাপক মহাশয়ের স্ত্রী আমাদের আর একজন মাসীমা। তাঁর বাড়িতে তিনি বয়স্কা শিক্ষার ক্লাস খুললেন। পড়াবার কাজে সেই 'পিসী'ও এখানে ছিলেন। মাসীমার কাজ ছিল দেশের ও বিদেশের নানান গল্প বলে মেয়েদের সাধারণ জ্ঞান বাড়ানো। সোভিয়েট দেশের মেয়েদের উন্নতির কথাই বেশি বলতেন, বলতেন যুদ্ধের কথা, ছবিও দেখাতেন। মেয়েরা কেউ না এলে তাদের খোঁজ করতেন। এরকম আরও একটি সমিতি হলো ফার্ন রোডে শ্রীসুবোধ দাশগুপ্তদের বাড়িতে। বড় ভাই জয়ন্ত দাশগুপ্তের স্ত্রী সেলাই সমিতি চালাতেন। বোন অনু দাশগুপ্ত বয়স্কা শিক্ষার ট্রেনিং নিয়ে ক্লাস চালাত। দিন ভাগ করে চলত সেলাই ও পড়ার ক্লাস। ওদের বৃদ্ধা মা বসে থাকতেন ক্লাসে।

বস্তির কাজে যোগ দিল উমা চক্রবর্তী (সেহানবীশ ও সুচিত্রা মিত্র। উমা তখন 'সেহানবীশ' ছিল না, সুচিত্রাও ছিল না 'মিত্র'। সবে শিক্ষা সমাপ্ত করে ওরা এল। ছোট মেয়ে। ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনেই ওদের রাজনৈতিক জীবনের শুরু। ফ্যাসিবিরোধী মিছিলে সেই সময় গাওয়া জর্জ বিশ্বাস ও সুচিত্রার গান কে ভুলতে পারে? এই উমা ও সুচিত্রাকেও আমরা মহিলা সমিতির কাজে, বস্তির কাজে টানলাম। আমাদের তখন মাথার উপর পাহাড় প্রমাণ কাজ। সুতরাং আমাদের দাবী ছিল--মেয়ে হলেই তারা আমাদের কর্মী হবে। এ নিয়ে টানাটানি আমরা করতামই। অবশ্য কাজে কে-ই বা কম যেত? সোভিয়েট সুহৃদ সংঘে আমাদের মহিলা কর্মীদেরও ডাক পড়ত। সেই মঞ্চে মহিলাদের টেনে আনবার ভার আমাদের তো নিতেই হতো। ফ্যাসিস্ট-যুদ্ধ নারীর পক্ষে, জননীর পক্ষে যে কি ভয়ঙ্কর তা আমাদের জানাতে হবে। সোভিয়েট নারী-পুরুষ মিলে এ যুদ্ধ ঠেকাচ্ছে প্রাণের বিনিময়ে। তাঁদের সমর্থনে পৃথিবীর সমস্ত মেয়েদের সঙ্গে আমাদের মেয়েরাও যুক্ত হবে। মেয়েদের মধ্যে এটা প্রচারের

দায়িত্ব নিতাম আমরা। এইভাবে আমাদের যেমন মহিলাদের সমস্ত ফ্রন্টের কাজের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হতো তেমনি আমরা চাইতাম—ছাত্রীরাও মহিলা-ফ্রন্টের কাজে সহযোগী হোক। তাছাড়া ছাত্রীরা তো ছিল নারী-সমাজের সামনের সারিতে। তাই এই সমাজের অগ্রগতিতেও ছাত্রীরা নেতৃত্ব দেবে।

আমাদের গঠনমূলক কাজ সম্বন্ধে মাঝে মাঝে বিরূপ মন্তব্যও শোনা যেত। কেউ কেউ বলতেন—এ তো রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ। এতে কি বিপ্লব আসবে? কিন্তু আমাদের ভয় পাবার কোন কারণ ছিল না। আমাদের অভিজ্ঞতা অন্য রকম। টালিগঞ্জের মনতোষিণী মাসীমা এলাকার বস্তিগুলিতে কি করতেন? এই সবই তো! তাঁর সঙ্গে তাঁর নিজের তৈরি কর্মীমেয়েরা কাজ করত। এর উপরেও মাসীমা কি করতেন? কারো ঘরে অসুখ—সেখানে মাসীমা, কারো বৌ-এর হাসপাতালে যাওয়া দরকার—ছুটছেন মাসীমা, স্বামী-স্ত্রী বিবাদ করে মরছে—মাঝখানে মাসীমা। সমস্ত ঘরের প্রাত্যহিক আপদে-বিপদে কেন তারা মাসীমার কাছে ছুটে আসে? আর মাসীমা যখন মিছিল-মিটিং-এ যাওয়ার ডাক দেন তখন কেনই বা তাঁর পিছনে শ'দুই-তিন মেয়ে বেরিয়ে আসে? আজও বিছানায় শুয়ে শুয়ে মনতোষিণী মাসীমা সমিতির নানা কাজের জন্য টাকা তুলে দেন। এসব কি শুধুই রামকৃষ্ণ মিশনের কাজ বলে মনে হয়? ঐ সব মেয়েরা কমিউনিস্ট পার্টির বাহিনীভুক্ত তবে হলো কি করে?

আর একজন নীরব কর্মী পেয়েছিলাম আমরা। তিনি অধ্যাপক সুশোভন সরকারের স্ত্রী বাবলি সরকার। তিনি বলতেন, আমাকে ঘরে বসে করার মতো তোমরা যত কাজ দাও আমি করব। কিন্তু তোমাদের মতন বাইরে বেরিয়ে কাজ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি নিজে ছিলেন সূচীশিল্পে সুদক্ষ। ওর হাতের কাশ্মীরী কাজকরা ব্লাউজ পিস্ আমরা নিজেরাই না কিনে পারতাম না। এই শিল্পের একটি ক্লাস হতো ওর বাড়িতে। মেয়েদের হাতের কাজ ছিল বেশ উচ্চ মানের। ভাল দামে তা দোকানে বিক্রী হতো। ব্যবস্থা করত কেন্দ্রীয় সমিতি। মেয়েদের হাতে কিছু মজুরি আসত। মেয়েরা খুব ভালবাসত ওঁকে।

শ্রীযুক্তা লীলা মজুমদারকেও পেয়েছিলাম আমরা। তিনি আমাদের কাজে টাকা তুলে দিয়ে সাহায্য করতেন। 'ঘরে-বাইরে' কাগজেও লেখা দিতেন। আমি তাঁর কাছে প্রায়ই যেতাম—কিছু না কিছু কাজ উপলক্ষে। এ বাড়িতেও আমাদের প্রতি যে কতটা সহানুভূতি ছিল সেটা জেনেছিলাম প্রথম নির্বাচনের সময়। ডাঃ মজুমদারের কাছে দাঁত তুলতে যেতে হলো একদিন। উনি লীলাদিকে বললেন আমাকে খাইয়ে দিতে। কারণ দাঁত তুললে সেদিন আর

খাওয়া যাবে না। অবশ্য ও বাড়িতে আমার খাওয়া বাঁধাই ছিল। দাঁত তোলার পর ডাঃ মজুমদার আমার হাতে টাকাভর্তি একটা খাম তুলে দিলেন। খুব বিস্মিত হয়েছিলাম সেদিন। লীলাদি আমাদের ভালবাসেন জানি, কিন্তু ডাঃ মজুমদারের মন আমাদের প্রতি কতটা প্রীতিপূর্ণ সেদিন জানলাম তা। নির্বাচনে আমাকে সাহায্য করা তো পার্টিকেই সাহায্য করা।

যাহোক, পাড়ায় পাড়ায় কত যে কাজের কেন্দ্র খোলা হয়েছিল সে সময়, আজ তার সব বিবরণ মনে করে হয়তো দিতেও পারব না। কলকাতার অন্যান্য পাড়ার কথা পরে বলা যাবে।

বিদেশে কমিউনিস্ট মেয়েরা কিভাবে কাজ করে আমরা তা জানার চেষ্টা করতাম। ইটালির মেয়েদের কাজের পদ্ধতি সম্পর্কে ওদের একটা রিপোর্ট পড়েছিলাম, সম্ভবত 'উইমেন অব দি হোল ওয়ার্লড' কাগজে। প্রত্যেকটি কর্মীর জন্য একটি করে রাস্তা বা তার অংশবিশেষ নির্দিষ্ট থাকত। ঐ রাস্তার প্রতিটি বাড়ির নাম-ঠিকানা ও অন্যান্য বিবরণী সেই মহিলার ডেস্কে সাজানো থাকত। বাড়িগুলোর মহিলাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার ভার থাকত তারই উপর। প্রায় প্রতি ঘরের মেয়েরাই চাকরী করেন। সময় তাদের খুব কম। অতএব অফিসের টিফিন টাইমটা নির্দিষ্ট থাকত মেলামেশার জন্য। প্রতিদিন ১০/১৫ জন মহিলা নিজ নিজ টিফিন বাক্সটা নিয়ে কোন একটা কফির দোকানে বসতেন। ঐ সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে সংবাদ দেওয়া-নেওয়া হতো। পরিবারের খবর, পাড়ার খবর, কোন নির্দিষ্ট কাজ কাউকে দেওয়া থাকলে তার খবর, নতুন কোন কাজের কথা—এ সবই ঐ সময়ের মধ্যে সারতেন তারা।

এই রিপোর্টের কথা একদিন পার্টি অফিসে গল্প করেছিলাম। কোন গুরুত্বই দিলেন না কেউ। দিলে বোধহয় ক্ষতি হতো না। ইউরোপের মধ্যে ইটালির কমিউনিস্ট পার্টি যে বৃহত্তম সে কথা অস্বীকার করা যায় না। কলকাতায় যদি ছেলেকর্মীরা পাড়ায় পাড়ায় এ ধরনের যোগাযোগের ব্যবস্থা করতে পারতেন তাহলে অনেক উপকার হতো, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরবর্তী পার্টি-নেতা অজয় ঘোষ পার্টিকে জনসাধারণের মধ্যে স্থায়ীভাবে নিয়ে যাবার জন্য এ ধরনের এবং সেবামূলক কতকগুলি কাজের সুপারিশ করেছিলেন, মনে পড়ে। তাও করা সম্ভব হয়নি। মেয়েদের ফ্রন্টে ই. এম. এস. নাম্বুদ্রিপাদও এই ধরনের কাজ সমর্থন করতেন। ছেলেদের পরিচালিত এই রকম সংগঠন থাকলে সত্যি কাজ হতো। আমরা মেয়েদের শক্তি নিয়ে এর কতটুকই বা করতে পারি?

এর পরে আমার প্রোগ্রাম হলো বর্ধমান যাওয়া। ওখানকার নেতাদের সঙ্গে কলকাতাতেই পরিচয় হয়েছিল। শাহেদুল্লাহ্ সাহেব এবং বর্তমান আইন-মন্ত্রী মনসুর হবিবুল্লা সাহেবের সঙ্গেও পরিচয় ছিল। ওঁরাই ব্যবস্থা করলেন যাবার। ওঁদের বাড়িতেই আমার থাকার জায়গা। পরিবারটি ন্যাশনালিস্ট মুসলিম-পরিবার, কিন্তু এ যুগে বাড়ির এই ছেলেরা কমিউনিস্ট। হবিবুল্লা সাহেবদের বাড়িতে আমি যে আদর-যত্ন পেয়েছি তা বলারও নয়, ভোলারও নয়। অনেকবার যাতায়াত ও থাকার ফলে আমি ওদের বাড়ির মেয়েই হয়ে গিয়েছিলাম। শাহেদুল্লাহ্ সাহেব ও হবিবুল্লা সাহেব ওঁদের স্ত্রী রাবেয়া ও মাকসুদা এবং করিম সাহেবের স্ত্রী সামসুন নাহার—এই তিনটি গৃহবধূকে আমার সাথী হিসাবে দিতে পারলেন। দেখলাম, এদের মধ্যে সামসুন নাহার (বাদশা) রাস্তায় একলা কিছুটা বেরোতে পারে, অন্য দুজন নয়। বর্ধমান শহর এমনিতেই অত্যন্ত রক্ষণশীল। মেয়েরা সবাই পর্দানশীন। রাজার আমলের প্রথাগুলো চালু আছে এখনও। এ অবস্থায় একান্ত অল্পবয়সী তিনটি সুন্দরী মুসলমান মেয়েকে নিয়ে আমি কি যে করি! স্বামীদের অনুমতি থাকলেও ওরা বৃদ্ধা দাদীর ভয়ে অস্থির। দাদীই সংসারের কর্ত্রী। চোখে দেখেন না, কিন্তু নিত্য তাঁকে খবরের কাগজ পড়ে শোনাতে হয়। আমিও থাকলে শোনাতাম।

কয়েকদিন ঐ মেয়েদের নিয়ে মহিলা-সমিতির বিষয়ে আলাপ-আলোচনা করা হলো এবং কয়েকটা বাড়িতেও যাওয়া হলো। বাদশাই ওখানে অনেককে চেনে। ওদের ছাড়া আরও দুটি মেয়েকে পেলাম। একটি শেফালি (পরবর্তী দিনে বর্তমান সি. পি. এম. মন্ত্রী বিনয় চৌধুরীর স্ত্রী), আর একটি ভূতপূর্ব মন্ত্রী হরেকৃষ্ণ কোঙারের স্ত্রী। ওরা প্রথমে আমাকে নিয়ে গেল কবি সুফিয়া কামালের বাড়ি। এ. আই. ডব্লিউ সি-র সূত্রে উনি আমার পরিচিত। উনি বরিশালের সায়েস্তাবাদের নবাবের মেয়ে। আমিও বরিশালের মেয়ে জেনে বেশ ভাব হলো। তিনি সমিতির জন্য আমাদের সঙ্গে থাকতে রাজী হলেন। আর একজন ওখানকার অবস্থাপন্ন ঘরের মহিলা—শিবরাণী মুখার্জীও এলেন। এ রকম অনেক বাড়ি ঘুরে ঘুরে একটি সভার আয়োজন করা হলো। বেশ ভাল মিটিং হলো। কমিটিও করা গেল। প্রথম কাজ স্থির হলো—দুর্ভিক্ষপীড়িত পাড়াগুলির দু'একটিতে দুধের ক্যান্টিন খোলানো ও শহরে রেশন দোকান খোলানোর জন্য ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে মেয়েদের একটি মিছিল নিয়ে যাওয়া।

মুশকিল হলো দাদীকে নিয়ে। উনি আমাকে খুবই স্নেহ করেন কিন্তু বৌদের নিয়ে আমার এই ঘোরাফেরা পছন্দ করতেন না। একদিন আমাকে বলেই ফেললেন, 'যে-বাড়ির বৌদের পায়ের আঙ্গুল কেউ দেখতে পায় না, রাস্তার ঘুরে সবাইকে তুমি তাদের কপাল দেখিয়ে দিচ্ছ? এটা কি ভাল?' খুব ভয়ে ভয়ে বোঝাতে শুরু করলাম, 'দাদী, পর্দা কি সব মুসলমান মেয়েরা মানছে? মানতে পারছে? গ্রামে চাষীর ঘরের মুসলমান বৌদের মাঠে কাজ করতে হয় না? তারা কি বোরখা পরে কাজ করে? অবস্থার চাপেই তারা যে এটা মানতে পারছে না। কই, মুসলমান সমাজ তো তাদের বাধা দিচ্ছে না! যুগের পরিবর্তনেই এসব বদলায়। পর্দা হিন্দু-মুসলমান উভয়েই মানে। আমাদের পরিবারের পরিবর্তনটাই দেখুন না। আমার দিদিমা পাশের বাড়িতে পর্দাঘেরা পালকি চড়ে যেতেন। আমার মা যেতেন একগলা ঘোমটা টেনে। যখন রাস্তায় কেউ থাকত না—তখন এক দৌড়ে তিনি রাস্তা পার হতেন। সেই আমার মাকেই দেখেছি নানা জায়গায় যেতে, একগলা ঘোমটা আর দিতেন না। সহজ-ভাবে একলাই চলাফেরা করতেন। আর আমাকে তো আপনি দেখছেনই। তাছাড়া আপনাদের তো ন্যাশনালিস্ট পরিবার। এসব পরিবারের মেয়েরা পর্দা মানেন না।' অনেক মুসলমান মহিলাদের নাম শোনাতাম তাঁকে। বলতাম, 'সুফিয়া কামাল আপনাদের প্রতিবেশী। কৈ বোরখা তো পরেন না।' এসব যতই বোঝাই না কেন, দাদী তবু বিমর্ষই থাকতেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তিনি আর বাধা দিলেন না আমাকে। ধীরে ধীরে বাড়ির অবিবাহিত মেয়েরাও আমার সঙ্গে মিটিং-এ যেতে আরম্ভ করল।

বর্ধমানের গোঁড়া হিন্দু বাড়িও দেখেছি। গোঁড়ামিতে তাঁরা এঁদেরও হার মানান। এরকম একটি বাড়িতে একদিন গেলে এক ভদ্রলোক বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলেন, কি চাই? আমরা উঠোনেই দাঁড়ানো। বসতেও বললেন না। মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে চাই বলতেই বললেন, 'যা বলার আমাকেই বলুন।' ভদ্রলোকের সামনেই তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব, একথা বলায় রাগ করে বললেন, 'কোন দরকার নেই, আপনারা যা বলবেন তা আমার জানা আছে। আমি এম. এ. পাশ। এটা ভদ্রলোকের বাড়ি। আমার স্ত্রী আপনাদের সামনে বেরোবেন না।' দরজার ফাঁক দিয়ে একজোড়া চোখ দেখলাম। আমরা আর দাঁড়ালাম না। আমরা কে কোন ঘরের মেয়ে, সেকথা বলতে গেলে বোধহয় ভদ্রলোক মারতে আসতেন।

এরপর টাউনের মেয়েদের একটি বেশ বড়সড় মিছিল বের হলো। সুফিয়া

কামাল, শিবরাণী মুখার্জী—এরা সবাই সামনে। হিন্দু-মুসলমান, গরীব-মধ্যবিত্ত—সবরকম মেয়েদের নিয়ে মিছিলটা বেরুল। তাদের মুখে ফ্যাসি-বিরোধী, যুদ্ধবিরোধী শ্লোগান, বন্দীমুক্তির শ্লোগান, আর অন্ন-বস্ত্র-দুধ চাই শ্লোগান। মেয়েদের এরকম একটা মিছিল বর্ধমানে নতুন। লোকেরা উৎসুক হয়ে দেখলেন। মিছিলটির নেত্রীরা ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে দেখা করে দুগ্ধকেন্দ্র ও রেশন দোকান খোলার কথা বললেন। তখন ইউনিসেফ নামে একটি বিদেশী সংগঠন থেকে সরকার মারফত দুধের গুঁড়ো দেওয়া হতো। ঐ দুধে ক্যান্টিন খোলা হলো, খুললো কয়েকটি রেশনের দোকানও। এ নিয়ে দরবার করতে নেত্রীরা অনেকবার যাতায়াত করেছেন। সংকোচও কেটে গেছে। ধীরে ধীরে ঐ মেয়েরা গ্রামেও সমিতির শাখা স্থাপন করতে পেরেছিলেন। এক বছরের মধ্যে তাঁরা জিলা সম্মেলন করলেন। বর্ণাঢ্য মিছিল নিয়ে বর্ধমানের কয়েকটি রাস্তা পরিক্রমা করা হলো। এরকম ব্যানার ও ফেস্টুন সহ মেয়েদের মিছিল এখানে এর আগে কেউ দেখেনি। সব শাখা থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছিল। প্রকাশ্য অধিবেশনে বিপুল সংখ্যক মেয়ে যোগ দেওয়ায় শহরের টাউন হলটি ভরে গেল। রাজাশাহীর জরাগ্রস্ত জুজুটা এরপর বর্ধমানের মেয়েদের আর চোখ রাঙাতে সাহস পায় নি।

* * * *

কলকাতায় থাকলে হাওড়া ও হুগলী জিলার নানা জায়গায় ঘুরি। এই দুটি জিলাতেই ছিল পার্টির শক্ত ভিত্তি। এখানকার নেতারাও ছিলেন অভিজ্ঞ। মহিলা-কর্মীরাও নিজেদের শক্তিতে জিলার নানা জায়গায় রিলিফ কেন্দ্র এবং মেয়েদের সংগঠন গড়ে তুলছিলেন। হুগলীর সন্ধ্যা চ্যাটার্জী এই সময়কার একজন সুদক্ষ কর্মী। জীবিকার জন্য তার কোন কাজের দরকার ছিল না। সুতরাং সবটা সময়ই সে দিতে পারত। সন্ধ্যার বোন আরতি ছিল ছাত্রীনেত্রী। চন্দননগরকে কেন্দ্র করে অন্যান্য কর্মীদের সহায়তায় জিলার চুঁচুড়া, ভদ্রেশ্বর, শ্রীরামপুর, ভাটপাড়া, কোন্নগর, সিঙ্গুর প্রভৃতি অঞ্চল জুড়ে সমিতির পরিধি বিস্তৃত করতে পেরেছিল সন্ধ্যা চ্যাটার্জী। অবশ্য এই জিলার নেত্রীস্থানীয়া কর্মীরা ছিলেন শিক্ষিতা ও রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন। এদের মধ্যে ছাত্রী আর শিক্ষয়িত্রী কর্মীও ছিলেন। মায়াদির (চ্যাটার্জী) কথা আমার খুবই মনে পড়ে। প্রৌঢ়া বিধবা মহিলা। ঐ বয়সের তার সেই গৌরবর্ণ, নম্র, বিনয়ী ও গম্ভীর প্রকৃতির অথচ হাসিমাখা মুখ আমার এখনও চোখে ভাসে। উনি কবিতা ও অন্যান্য লেখা 'ঘরে-বাইরে' পত্রিকায় প্রায়ই দিতেন। উনি শুধু 'ঘরে-বাইরে'র লেখিকাই

ছিলেন না, নিয়মিত বিক্রেতাও ছিলেন। আমাদের কাগজ বিক্রয় করতেন কর্মীরা। কিন্তু যে ক'জন বয়স্ক মহিলা এ কাজ করতেন তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে প্রবীণা। সমিতির কাজে এরকম একনিষ্ঠ নিরলস কর্মী পাওয়া খুব কঠিন। বিশেষত ঐ বয়সের মহিলাকর্মী। ওঁর মেয়ে গৌরী চ্যাটার্জী ছিল একটা কলেজের অধ্যাপিকা। সেও মায়ের সঙ্গে কর্মী হিসাবে কাজ করত। দু'জনেই অত্যন্ত মিষ্টভাষী। আর একজন কর্মী ছিলেন মুক্তা কুমার। নিত্য কষ্টের সংসার, স্বামীও রুগ্ন। ছেলেমেয়ে নিয়ে কি করে যে উনি সংসার চালাতেন ভেবে পেতাম না। কিন্তু ইনিও নিরলস কর্মী। তিনি ছিলেন চুঁচুড়ার শাখা-সমিতির পরিচালিকা। কখনও রাগ করে কথা বলতে শুনিনি। সমিতির নানা কাজ, 'ঘরে-বাইরে' বিক্রয় প্রভৃতি কাজের মধ্যে সংসারের চাপের কথাটা তার মুখে আমি কোনদিনই শুনিনি। মনে পড়ে রেণুদির কথাও। সব কথা ঠিক মনে নেই। বোধহয় তিনি ছিলেন চন্দননগরের কর্মী। আরও একটি কর্মী ছিল। তার নাম শেফালি। ওর কাজের কেন্দ্র ছিল গ্রামের কৃষকদের মধ্যে। ও বড়ই একলা বোধ করত। কৃষক মেয়েদের মধ্যে কাজ করার আসল সমস্যাটা ওরও ছিল। মেয়েরা কেউ লেখাপড়া জানে না। বাচ্চা কোলে নিয়ে শেফালি অবিরত ঘুরে বেড়ায়, কিন্তু সমিতিটা দানা বাঁধে না। গরীব কৃষক ও ক্ষেত-মজুরদের মধ্যেই ওর কাজ। কিন্তু ঐ সব মেয়েরা ব্যস্ত থাকে কাজের সন্ধানে। কখন তাদের সঙ্গে একত্র বসে একটু কথা বলা যায়—এটাই সমস্যা। শেফালি এসব কথা বলত। ও তখনও জানে না—সব জায়গাতেই কৃষক মেয়েদের মধ্যে কাজ করার এটাই বড় সমস্যা।

কোন্নগরে সমিতির পরিচালিকা হলো আমার বরিশালের ছাত্রী ও কর্মী সুহাসিনী সেন আর অমিয়া সেন (এলু)। সুহাসিনী কোন্নগর স্কুলে অঙ্কের শিক্ষিকা। বরিশাল থেকেই অভিজ্ঞ কর্মী ছিল এরা দু'জন।

জিলাব্যাপী সংগঠন ও আন্দোলন শুরু হয় সেই '৪৩-এর দুর্ভিক্ষের সময় থেকে। ক্ষুধাপীড়িত মানুষের পাশে দাঁড়ানোই কমিউনিস্ট মেয়েদের প্রধান কাজ। পূর্ববর্ণিত কর্মীরা সমস্ত শক্তি নিয়ে এই কাজ শুরু করলেন। কিচেন খোলাবার ব্যাপারটা আদৌ সহজসাধ্য ছিল না। অনিচ্ছুক সরকারকে একমাত্র আন্দোলনের দ্বারা অতিষ্ঠ করতে পারলেই তবে কিছু আদায় করা যেত। তাদের ভাণ্ডারের মজুত খাদ্য ছিল শুধু সেনাবাহিনীর জন্য, মৃতকল্প জনসাধারণের জন্য নয়। মজুতদারদের গুদামজাত খাদ্য ছিল সরকারের আপৎকালীন ভাণ্ডার, সাধারণের কাছে তা অজ্ঞাত ও অপ্রাপ্য। অতএব একটা দুধের কেন্দ্র খুলতেও

দরকার হতো সমিতির প্রাণপণ চেষ্টায় রেডক্রশ, সেন্টজন্ এ্যাম্বুলেন্স, এফ. এ. ও. প্রভৃতি সংগঠনের কাছ থেকে দুধ যোগাড় করা, গরীব শিশুদের তালিকা সংগ্রহ করা এবং তাদের মধ্যে সেই দুধ বণ্টনের ব্যবস্থা করা। নিজেদের শক্তিতে সেবামূলক কাজ সে সময়ে শুরু করলে সাধারণ মানুষের কাছে পাওয়া যেত উৎসাহ, আশীর্বাদ ও অর্থসাহায্য। এরপর যখন সরকারের কাছ থেকে সাহায্য পাবার জন্য আন্দোলন করতে হতো—তখন এসব লোকেরা সমর্থন জানাতেন, কখনও বা মিছিলেও থাকতেন। এটা আমাদের সব জায়গার অভিজ্ঞতা। কোথাও 'জনরক্ষা' কোথাও 'খাদ্য কমিটি' প্রভৃতি সেবা প্রতিষ্ঠানে মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা অনেক সময়ে নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন। অথচ তাঁরা জানতেন—আমরা কমিউনিস্ট, জানতেন রাজনীতিও আমাদের কাজ। আমরা মিছিল করলেই তাতে ফ্যাসিস্ট যুদ্ধবিরোধী প্রচার থাকবে, আর থাকবে গান্ধীজী সহ সমস্ত কারারুদ্ধ কংগ্রেস নেতা ও কর্মীদের মুক্তির দাবী। দেশের স্বাধীনতা ও মঙ্গলের জন্য এই দুটি দাবীর অপরিহার্য প্রয়োজনীয়তা আমরা সম্ভবত সাধারণ মানুষকে কিছুটা বোঝাতে পেরেছিলাম। কোন কোন ক্ষেত্রে স্থানীয় কংগ্রেস কর্মী'দেরও আমাদের সঙ্গে পেতাম।

এ জিলার সমস্ত কেন্দ্রের কাজের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আমাকে যুক্ত থাকতে হলো এবং প্রায়ই কেন্দ্রগুলি থেকে আমার কাছে যাবার তাগাদা আসত।

হাওড়া জিলাতেও আমার এই ধরনের প্রাত্যহিক যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল। কলকাতা থেকে যাতায়াতের সুবিধা বলে মিটিং হলেই ডাক পড়ত। জিলার প্রয়োজনে সাধারণ জনসভা করতেও যেতে হতো। আশা সামন্তকে কেন্দ্র করে ডোমজুড়ের আন্দুল গ্রামে সমিতি গঠিত হয়। সালকিয়ায় স্বরুচি দেবী ও মীনা দেবীর পরিচালনায় একটি শিল্প-সমিতি ও একটি বড়গোছের প্রাইমারী স্কুল চলত। মীনাদি আজ আর নেই। কিন্তু স্কুলটি তার বহু পরিশ্রম ও যত্নের ফলে গড়ে উঠেছিল। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির চেষ্টায় যতগুলি শিশু-বিদ্যালয় খুলেছিল তার মধ্যে সব চেয়ে বড় ও ভাল স্কুল ছিল এটি এবং শ্যামবাজারের কমল বসুর বাড়িতে সমিতি পরিচালিত স্কুলটি। কমল বসুর স্ত্রী শান্তা বসু এটির দায়িত্বে ছিলেন। হাওড়া জিলায় সবচেয়ে বড় শাখা সমিতি তৈরি হয় বাগনানে—নিরুপমা চ্যাটার্জী'র নেত্রীত্বে। আমার সঙ্গে যখন ওর দেখা হয় তখন ও বোধহয় স্কুলে পড়ে অথবা স্কুলজীবন শেষ করেছে। ঐ বয়সেই বাগনানের সমস্ত গ্রামগুলো বলতে গেলে সে চষে বেড়াত। সব বাড়িতে ছিল ওর যাতায়াত এবং সে ছিল সবারই 'নিরুদি'। এই জনপ্রিয়তা বাগনানে

জনসেবার কাজে ওর সহায়ক হয়েছে এবং এরই জোরে সে বর্তমানে সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী।

এই সব জায়গাতে সমিতি গড়ে উঠেছে কৃষক, মধ্যবিত্ত, হিন্দু আর মুসলমান মেয়েদের নিয়ে। স্বভাবতই মুসলিম মেয়েরা সংখ্যায় কম। কিন্তু কর্মীদের সব সময়ের লক্ষ্য ছিল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য গড়ে তোলা।

* * * *

হাওড়ায় মোটামুটি সমিতি দাঁড়াবার পর আমাকে যেতে হয় বাঁকুড়ায়। বলা বাহুল্য, এই ঘোরাঘুরির উদ্দেশ্য ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে অন্তত বেশীর ভাগ জিলায় রিলিফের কাজ ত্বরান্বিত করা, রাজনৈতিক ও খাদ্য আন্দোলনের শক্তি বৃদ্ধি করা এবং যতটা সম্ভব ব্যাপক ভিত্তিতে শাখা সমিতিগুলি গঠন করা।

বাঁকুড়ায় ভক্তি সেন ও মুক্তি সেন—দুই বোন ওখানকার প্রথম দিকের কর্মী। ভক্তি শিক্ষিকা, মুক্তি ছাত্রী। বাঁকুড়ায় এদের চেষ্টায় ছাত্রী সংগঠন ইতিপূর্বে তৈরি হয়েছে। রিলিফের জন্য প্রচেষ্টাও তারা শুরু করেছে। এর সঙ্গে মহিলা সংগঠন এবং গণআন্দোলনও গড়ে তোলার প্রয়োজন হলো। ভক্তি আর মুক্তি দু'জনেই বিড়ি তৈরির মহিলা শ্রমিকদের মধ্যেও কাজ করত। ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের মজুরি কম দেওয়া হতো। স্বভাবতই দাবী করা হয় সমান মজুরি। মেয়েদের সংখ্যাও মন্দ ছিল না। যতদূর মনে পড়ে, প্রায় শ'তিনেক। ভক্তি ও মুক্তির চেষ্টা ছিল এদের দাবীর সমর্থনে শহরের ছাত্রী ও মহিলাদের টেনে আনা।

টাউন হলে একটি বড় সমাবেশ করার কাজ হাতে নেওয়া হয়। আমার যাওয়া এই উপলক্ষে। কতকগুলি ছোটবড় পাড়ায় মিটিং করা হয়। মিছিল করে যেতে সবাই বেশ রাজী। গ্রামের কৃষক মেয়েদের মধ্যেও অল্পসল্প যোগাযোগ স্থাপন করা হয়েছিল।

নির্দিষ্ট দিনে পোস্টার, ব্যানার, শ্লোগানে মুখরিত একটি সুবৃহৎ মিছিল টাউনের অনেক রাস্তা পরিক্রমা করে। ছাত্রীদের বৃহৎ সংখ্যায় যোগদান, স্কুলের শিক্ষিকাদের উপস্থিতি, বহু সংখ্যায় গরীব ও মধ্যবিত্ত মেয়ে, গ্রামের কৃষক মেয়ে ও কিছু মুসলিম মেয়ের যোগদানের ফলে মিছিলটি সর্বজনীন রূপ নেয়। কংগ্রেসের পক্ষ থেকে কোন বিরূপতা ছিল না বরং সহযোগিতা ছিল।

টাউন হলটি সেদিন পরিপূর্ণ। ছেলেদের জন্য বাইরে ছিল মাইকের ব্যবস্থা। সভানেত্রী কে হয়েছিলেন আজ মনে নেই। সভায় প্রস্তাব আকারে সমস্ত দাবী

রাখা হয়। মহিলা বিড়ি শ্রমিকদের সমান মজুরির দাবীতে প্রস্তাবও গৃহীত হয়। স্থির হলো সমাবেশের পক্ষ থেকে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে খাদ্যের দাবীতে একটি দরখাস্ত নিয়ে প্রতিনিধিরা দেখা করতে যাবেন। প্রস্তাব গ্রহণের পর গঠিত হয় একটি কার্যকরী কমিটি। মেয়েদের এই সভা ও মিছিল সেদিন শহরবাসীদের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

* * * *

কলকাতা ও তার দু'পাশে ২৪ পরগণা জিলার বিস্তৃত এলাকার কতকগুলি জায়গায় শাখা স্থাপনের জন্য এবং রিলিফের কাজ ও আন্দোলনের কাজ দেখাশোনার প্রয়োজনে তখন কর্মীরা যাতায়াত করতেন। এ কাজে থাকতেন বেলা লাহিড়ী, মায়া লাহিড়ী, প্রীতি লাহিড়ী, বাণী দাশগুপ্ত, পঙ্কজ লাহিড়ী, মুক্তি মিত্র প্রভৃতি কর্মীরা। মাধুরী দাশগুপ্ত, লাবণ্য মিত্র, অমিয়াদি তখন মধ্য ও উত্তর কলকাতায় ছোট-বড় কয়েকটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন। মাধুরীদের বাড়িতে একটি বড় 'সেলাই কেন্দ্র' চলত। চালাতেন মাধুরীর মা, অমিয়া দি ও মাধুরী নিজে।

যশোর-খুলনায় ছিলেন ভানুদি ও চারুলতা ঘোষ। দু'জনেই এককালে বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। পরে পার্টিতে আসেন। দু'জনেই বয়স্থা, অভিজ্ঞ, মানুষের সঙ্গে মেলামেশা ও কথাবার্তায় অভ্যস্ত। আমাকে ওখানে ডাকা হয়েছিল সমিতির প্রাথমিক সংগঠনের জন্য নয়। রিলিফের জন্য অনেক ছোট-বড় মিছিল নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও রিলিফের কাজ শুরু করা—এ সব এঁরা নিজেরাই করেছেন। এবার তাঁরা সমস্ত ছোট এলাকার শাখাগুলিকে গুছিয়ে একটা সমাবেশ ও জিলা কমিটি গঠন করতে সচেষ্ট হলেন। এই ব্যাপারেই আমি যাই। যশোর-খুলনা জিলা দুর্ভিক্ষ-বিধ্বস্ত। নেত্রীদের চারপাশে তাই অভাবী হিন্দু-মুসলমান মেয়েদের ভিড়। পূর্ববঙ্গ মুসলমান প্রধান। সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই এই ধরনের আন্দোলন হয় হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন। সম্মেলন উপলক্ষে বৃহৎ মিছিল হলো। গান্ধীজীর মুক্তি, কংগ্রেস নেতাদের মুক্তির দাবীর সঙ্গে শোনা গেল মিলিত কণ্ঠের যুদ্ধ-বিরোধী শ্লোগান এবং দুর্ভিক্ষ থেকে বাঁচার দাবীর আওয়াজ।

সমাবেশে এ সব নিয়ে আলোচনা হলো। নিজেদের অভিজ্ঞতাগুলো তুলে ধরলে নিরক্ষর মেয়েরাও তাদের করণীয় কি তা বুঝতে পারেন। শ্লোগানগুলো প্রস্তাব আকারেও গৃহীত হলো। ঘোষিত হলো মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষার সঙ্কল্প। কতকগুলি শিল্পকেন্দ্র এরপর থেকে ঐ জিলায় খোলা হয়। সভাশেষে একটি কমিটিও গঠিত হলো।

এরপর আমাকে যেতে হলো ময়মনসিং জিলার শেরপুরে। আমার সহযাত্রী একজনের জন্য ওখানকার দিনগুলির স্মৃতি এখনও আমার মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে। ইনি হলেন আমাদের পুঁটুদি। আসল নাম—সুহাসিনী গাঙ্গুলী। ওঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয় আমি যখন ইউনিভার্সিটি বোর্ডিং-এ থাকি সেই সময়। কি করে আলাপ হলো তা এখন মনে নেই। উনি চট্টগ্রাম বিপ্লবীদলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বহু বছর জেল খেটেছেন। বাইরে এসে কিছুদিনের জন্য উনি কংগ্রেসের সঙ্গে কাজ করেন। পরে যোগ দেন কমিউনিস্ট পার্টিতে। এই আর একজন উদারচেতা মহিলার সঙ্গে আমার আন্তরিক ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। তিনি তিনরকম রাজনৈতিক পথে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন কিন্তু কারো প্রতি কোনদিন বিদ্বেষের কটুবাক্য উচ্চারণ তাঁর মুখে আমি শুনিনি। কমিউনিস্ট পার্টিতে আসার পরেও তিনি তাঁর অতীতের সহকর্মীদের খোঁজখবর রাখতেন। তাদের দরকারে সাহায্য করেছেন, এমন কি গোপনে আশ্রয়ও দিয়েছেন। আমাদের পার্টিতে বোধহয় এই একজনই ছিলেন—রাজনৈতিক গোঁড়ামি যাঁর উদার মানবিকতাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

আমাদের মধ্যে এই তিন ধারার রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন কমলা চ্যাটার্জীও। ওঁর মধ্যেও কোন সঙ্কীর্ণতা বা গোঁড়ামি দেখিনি।

পুঁটুদি আমার কাছে কার্ল মার্কস্-এর বইপত্র পড়তে আসতেন বোর্ডিং-এ। আমি নিজেই তো বিদ্যার জাহাজ। আমি আবার কি পড়াব? কিন্তু ওসব চলবে না। পড়াতেও হবে আর বোঝাতে না পারলে প্রচণ্ড বকুনিও খেতে হবে। যখন থেকে ওঁদের বাড়ির সঙ্গে আমি পরিচিত তখন থেকে ওঁর মা-ও আমাকে মেয়ের মতো দেখতেন আর প্রাণপণে খাওয়াতেন। এ ব্যাপারে পুঁটুদির বোন অঞ্জলিও কম যেত না।

শেরপুরে এই পুঁটুদি আমার সঙ্গী। রেলগাড়ি থেকে শুরু করে রবি নিয়োগীদের বাড়িতে যে ক'দিন ছিলাম, সে ক'দিন পুঁটুদির সর্বদা আমার জন্য কী দুশ্চিন্তা—এই বুঝি আমার খাওয়া-শোওয়ার কোন কষ্ট হলো। তাঁর খুত-খুতনির জন্য আমি লজ্জা পেতাম। এটাই ওঁর স্বভাব। সহকর্মীর জন্য ওঁর ছিল অন্তহীন ভাবনা।

ওখানে পার্টি-বিরোধী প্রচারও ছিল। প্রথম প্রথম সভাগুলোতে ভয়ে ভয়ে বক্তৃতা দিতাম। পুঁটুদি সর্বত্র সভানেত্রী। আমাকে বক্তা হিসাবে নাম ঘোষণা করে একটি মাত্র বাক্য তিনি উচ্চারণ করতেন, তার বেশী নয়। অথচ আমি

রোজ বকুনি খাই তাঁকে আমি বক্তৃতা করা শেখাইনা কেন তার জন্য। কতক-গুলি জনসভার পর একদিন পুঁটুদি উচ্চহাস্য করে বললেন, 'বক্তৃতা আমি শিখে গেছি। রোজ তো একই কথা বলছ, একটা টেপরেকর্ড করে ফেললেই হয়ে যায়। সোজা মুখস্থ ঝেড়ে দেব।' সব সময় পুঁটুদির ছিল অট্টহাসি। মনটা দরাজ না থাকলে অমন হাসতে পারে কেউ? ঐ হাসির শব্দ এখনও যেন শুনতে পাই আমি।

জনসভাগুলোর পরে মনে হলো ঐ অঞ্চলের বিরোধী ভাবটা যেন আর তেমন নেই। তখন শুরু হলো বাড়ি বাড়ি যাওয়া, মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করা। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কথা বলা হতো। অনেকগুলো শাখাসমিতি সেখানেও গড়ে উঠল। রবি নিয়োগীর স্ত্রী—জ্যোৎস্না নিয়োগী, এই প্রথম ঘরের বাইরে এসে সমিতি পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন। শাশুড়িকে পক্ষে পেতে তার একটু মুশকিল হলো—এই আর কি। স্বামী তো সাহায্যই করতেন। তিনি বিপ্লবী নেতা ছিলেন পার্টিতে আসার আগেই।

ময়মনসিং শহরেও একটা শাখা খোলা হলো। লিলি বক্সী সেখানকার নেত্রী। খোকা রায়, পবিত্র রায় এবং আরও কয়েকজন অতীতের বিপ্লবী নেতা, যাঁরা তখন কমিউনিস্ট নেতাও বটে, তাঁদের সঙ্গে দেখা হলো সেখানে। ওঁরা আমাকে সাহায্য করতেন। কোন্ কোন্ পাড়ায় যাব তাও বলে দিতেন।

* * * *

যতদূর মনে পড়ে, এরপর শান্তি সরকার ও আমি গেলাম নোয়াখালি। ওদিকের পথঘাটে তখন অনবরত মিলিটারীর চলাচল। রাত্রে ব্ল্যাক আউটের নিশ্ছিদ্র অন্ধকার। আমরা কলকাতা থেকে রাত্রির অন্ধকারে আখাউড়া স্টেশনে নামলাম। রাত ২/৩টায় অন্য গাড়ি ধরতে হবে। বেশ কয়েক ঘণ্টার অপেক্ষা। আমরা একটা নতমুখী বোরখা ঢাকা ল্যাম্প পোস্টের নীচে বেঞ্চিতে গিয়ে বসলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখি কয়েকটা লালমুখো সৈন্য আমাদের চারপাশে ঘোরাঘুরি করছে। স্টেশনে তখন আমরা ছাড়া আর জনপ্রাণী নেই। কিন্তু আমরা বসেই আছি। শান্তি সরকার সুন্দরী মেয়ে। ওর জন্য আমার একটু ভয় হলো। গোরা সৈন্য ক'জন প্রায় আমাদের বেঞ্চির কাছে এসে সিগারেট ফুঁকছে আর আমাদের দেখছে। এমন সময় স্টেশন মাস্টার বাইরে বেরিয়ে এলেন। তিনি আগে লক্ষ্য করেন নি যে আমরা ওখানে বসে আছি। দেখতে পেয়ে কাছে এসে বললেন, 'কোথায় যাবেন আপনারা, সঙ্গের লোক কোথায়?' আমরা গন্তব্যস্থল বললাম। উনি তখন আমাদের রীতিমতো ধমকালেন: 'এই পথে

মেয়েরা এভাবে চলাফেরা করে ? আপনাদের সাহস তো কম নয় ! উঠে আসুন আমার সঙ্গে। আপনাদের কাছাকাছি গোরাগুলোকে দেখতে পাচ্ছেন না ?' আমাদের নিয়ে প্রথম শ্রেণীর একটা ওয়েটিং রুম খুলে দিয়ে তিনি বললেন, 'ভেতর থেকে দরজা বন্ধ করে থাকুন। আমি বাইরেও তালা দিয়ে দিচ্ছি। আপনাদের ট্রেন এলে ডেকে দেব, আমার গলা শুনতে না পেলে দরজা খুলবেন না।' তাই হলো। ট্রেনে উনি আমাদের একটা প্রথম শ্রেণীর কামরায় তুলে দিয়ে বললেন, 'দরজা বন্ধ রাখবেন, কেউ ধাক্কা দিলেও খুলবেন না।' ভদ্রলোককে আমরা অনেক ধন্যবাদ দিলাম। উনি আবার আমাদের এসব পথে এভাবে চলা-ফেরা করতে নিষেধ করে চলে গেলেন। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী আমরা, আমাদের প্রথম শ্রেণীতে ভ্রমণ কপালে ছিল, তাই নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু কাজটা খুবই দুঃসাহসের ছিল—তাই আজও ঘটনাটা ভুলিনি।

নোয়াখালিতে জোতির্ময়ী চক্রবর্তীর বাড়িতে আমরা উঠলাম। রান্না-ঘরে ওর সঙ্গে প্রথম দেখা। বেশ কয়েকটি ছেলেমেয়ের মা। বেশ বড় সংসারের গৃহিণী। ওখানে সুশীলা মজুমদার নামে আরও একজন গৃহিণীকে দেখলাম। এঁরা দু'জনেই কর্মী। এতবড় সংসার সেরে কি করে যে এঁরা বাইরের কাজের সময় পাবেন, তাই ভাবছি। দেখলাম, দুপুরের পর থেকে এঁরা দু'জনেই ফ্রি। দু'জনই পার্টিশনের পর কলকাতা আসেন। তখন জ্যোতির্ময়ী দেবীর কর্মক্ষমতা ও দক্ষতার সঙ্গে বিশেষভাবে পরিচিত হয়েছি। উনি কলকাতা এসে আমাদের সকলের কাকীমা হয়ে গেলেন। দীর্ঘকাল উনি সমিতির কলকাতা কমিটির সম্পাদিকা ও পরে সভানেত্রী হয়ে কাজ করেছেন। সমিতি স্থাপনে তিনি জিলাগুলিতেও যেতেন। সুশীলাদিও পাড়া-সমিতি দুটির শিল্প-ক্লাস চালাতেন।

দুর্ভিক্ষে নোয়াখালির অবস্থা হয় খুবই খারাপ। মেয়েরা গ্রাম ছেড়ে শহরের রাস্তায় বসেছে। এদের শুধু ক্যান্টিনে হবে না। আশ্রয় দরকার। ওখানে আর একটা মহিলা সমিতি ছিল। সেটা কংগ্রেসী মেয়েদের। যিনি সমিতির প্রেসিডেন্ট ছিলেন, যতদূর মনে পড়ে, তাঁর নাম ছিল পঙ্কজিনী দেবী। উনি এ. আই. ডব্লিউ. সি-র সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সুতরাং সমিতিটিও এ. আই, ডব্লিউ. সি-র শাখা হিসাবে ছিল। সমস্যা হলো আমরা কি করব। ঐ সমিতিতে যোগ দেব, না পৃথক সমিতি করব ? স্বভাবতই সিদ্ধান্ত হলো—আমাদের মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শাখা স্থাপন করতে হবে। কিন্তু আমরা পঙ্কজিনী দেবীর সঙ্গে দেখা করব এবং চেষ্টা করব যাতে একত্রে রিলিফের কাজ করা

যায়। উনি এতে রাজী হলেন। আমাদের মিটিং-এও এলেন। পরে এই দুই সমিতির প্রতিনিধিরা সরকারের সঙ্গে দেখা করে দুস্থ মেয়েদের কথা বলেন। সরকার থেকে এই সব দুস্থ নারী ও শিশুর জন্য আশ্রয়কেন্দ্র খোলাও হয়েছিল। পরিচালনা করতেন দুই সমিতির কর্মীরা। কলকাতা এলে পঙ্কজিনী দেবী আমার সঙ্গে সর্বদা দেখা করে যেতেন।

* * * *

এবার পাবনার কথা বলি। ওখানে যে বাড়িতে উঠেছিলাম তাদের আর কারো নাম মনে নেই, শুধু মনে পড়ে বাড়ির মেয়েটির নাম ছিল মায়া। ব্রাহ্মণ পরিবার। মায়া আমার সঙ্গে বেরুতো। কিন্তু বুঝতাম তার মায়ের অনিচ্ছা আছে। তখন ভেবেছি অল্পবয়সী কুমারী মেয়ে, তাই সম্ভবত মায়ের আপত্তি। কিন্তু খাবার সময়ে লক্ষ্য করি, মায়াকে খেতে বসতে বললে সে কিছুতেই বসে না। জোর করলে সামনের থেকে চলে যায়। মা-ও বলেন, ও পরে খাবে। ব্যাপারটা বুঝলাম একদিন বিকেলে ওদের ছাদে গিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'আমার সামনে খাও না কেন?' কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললো, 'আমি বিধবা কিনা!' বুঝলাম আমাকে মাছ খেতে দেওয়া হয়, ও তা খাবে না—তাই এই ব্যবস্থা। নিজে থেকে বললো, 'আপনি এসেছেন তাই একটু বেরোতে পাই, নয়তো কোথাও যাই না। এই ছাদে পর্যন্ত আমাকে মা আসতে দেন না। একদিন এমনি সময় ছাদে এসে সূর্যাস্তের দিকে তাকিয়েছিলাম, কখন মা উঠে এসেছেন জানতে পারি নি। আমার চুলের মুঠি ধরে এক চড় মারলেন। চুলটা খোলা ছিল তো! মা বললেন, 'উপরে রূপ দেখাতে এসেছ?' কথাগুলো যেন আমার মনে জ্বালা ধরালো। মনে মনে বললাম, 'হায় বিদ্যাসাগর, তুমি এখনও অচল!' মায়া তখন ১৬/১৭ বছরের মেয়ে, বাড়ন্ত গড়ন, সুন্দর দেখতে। এক পিঠ কালো চুল। যৌবনের রূপ সবে ফুটতে শুরু করেছে, তাই এই লাঞ্ছনা। জিজ্ঞেস করলাম, 'পার্টির যে ভদ্রলোক তোমাদের বাড়িতে আসেন, তিনি কি বলেন?' একটু ইঙ্গিত দিলাম। আমি জানি, একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টিই পারবে ওকে এই লাঞ্ছনা থেকে মুক্তি দিতে। মায়া সেদিন একটু লজ্জা পেয়েছিল। কিন্তু ভট্টাচার্যি পরিবারের ঐ মেয়ে যেদিন মায়া মৈত্র হয়ে কর্মীরূপে আত্মরক্ষা সমিতির অফিসে হাজির হলো মস্ত একটা সিঁদুরের টিপ পরে—সেদিন বড় ভাল লেগেছিল।

পাবনায় প্রতিমা ব্যানার্জীকেও প্রথম দেখলাম। বি. এ. পাশ করে গেছে। সে-ই মহিলা সমিতি চালায়। সারা বাঙলাতে দুর্ভিক্ষের দ্বিতীয় বছরে নতুন ফসল উঠলে দুস্থ মেয়েরা বিভিন্ন জোতদারের ঘরে এবং

ধানকলে ধান ভানার কাজ পেতে আরম্ভ করল। অন্যান্য সমস্ত জিলাতেও অনেক মেয়ের কাজ জুটল। মিল-মালিকদের সঙ্গে সমিতির কর্মীরা দুস্থ মেয়েদের যোগাযোগ করিয়ে দিত। মজুরি সম্পর্কে কথাবার্তা বলতে হতো। পরবর্তীকালে ধানকলের এই মেয়েদের ইউনিয়ন তৈরি করাও আমাদের কাজ হয়েছিল। পাবনায় দেখলাম মেয়েরা একাজ করছে। তাছাড়া ক্যান্টিন, শিল্পসমিতিও খোলা হয়েছে।

*　　*　　*　　*

রংপুরে এক সান্যাল বাড়িতে উঠেছিলাম। নাম মনে নেই। বেশ অবস্থাপন্ন ঘর। এই সমস্ত ঘরের শিক্ষিত ছেলেরা এখন কমিউনিস্ট পার্টিতে আসছে। তাছাড়া সুগায়ক বিনয় রায় ও তার বোন রেবা রায় এখানে সুপরিচিত। বিনয় রায় পরে বাঙলাদেশের আই. পি. টি. এ-র নেতারূপে এবং রেবা রায় নৃত্যশিল্পী হিসাবে সুপরিচিত হন। কিন্তু তখন তাদের উপরে ন্যস্ত ছিল রংপুরের রিলিফ ব্যবস্থার দায়িত্ব। জনসভার জন্য এবং মহিলা সমিতি তৈরির জন্য আমার এখানে আসা। জনসভা হলো এবং গঠিত হলো আত্মরক্ষা সমিতির শাখা। একদিন সন্ধ্যা বেলায় বসল ছেলে ও মেয়েদের একত্রিত কর্মীসভা। নানারকমের আলোচনা হলো। রিলিফের কাজ কেন করা দরকার, যুদ্ধের অবস্থা ও আমাদের কর্তব্য, জাতীয় রাজনীতি ও আমরা, এই সমস্ত বিষয় নিয়ে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করতে রাত প্রায় দশটা কাবার। শীতের রাতে খোলা উঠোনে মিটিং। কিন্তু উঠবার জন্য কেউ ব্যস্ত নয়। বরং কলকাতার খবর, আমরা জনসমর্থন কি রকম পাচ্ছি—এ সব জানবার জন্য সবাই উদগ্রীব।

যা হোক, রংপুর জিলাতেও সমিতির চেষ্টায় একটি শিশুকেন্দ্র খোলা হয়।

*　　*　　*　　*

জলপাইগুড়িতে বেলা লাহিড়ী ও আমি গিয়েছিলাম একসঙ্গে। এখানে আগেই একটা মহিলা সমিতি ও তাদের দ্বারা পরিচালিত একটি শিল্পকেন্দ্র ছিল। আমাদের কর্মী সংখ্যা বেশী নয়। যারা ছিলেন সংসার ফেলে তাদের পক্ষে বাইরের কাজ করার সময় বেশী ছিল না। তবুও একটি মহিলা সভা ডাকা হয়েছিল টাউন হলে। ঐ সভা হলো। মহিলারাও এলেন উল্লেখযোগ্য সংখ্যায়। কমিটি হলো। অন্য সমিতির নেত্রী ও কর্মীরাও আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন। দুই সমিতি পরস্পর মিলিতভাবে নারী ও শিশুসেবার কাজ করবেন—এই প্রস্তাব গৃহীত হলো। কিন্তু এ নিয়ে প্রায়ই মুশকিল হতো।

আর এই মুশকিল আসানের জন্য বেলা বা আমাকে প্রায়ই যেতে হতো জলপাইগুড়ি। বেলাই বেশী যেত।

ওখানে একটা মজার ব্যাপার হয়েছিল। একবার ছু'জনে আমরা একই বাড়িতে উঠেছি। একদিন বাড়ির মহিলারা আমাকে বলেন, 'বেলাদি-র খুব অসুবিধা। ছেলেকে রেখে আসতে হয়।' শুনে আমি যেন একটু থতমত খেলাম। বেলার মেয়ে পিক্‌লু তখনও জন্মায়নি। ওর কোন ছেলে তো নেই। তবে? বেলাকে জিজ্ঞেস করতে বললো, 'আর বলেন কেন মণিদি, মেয়েদের নিত্য জেরায় পড়ে সাম্‌লাতে না পেরে বলে দিয়েছি—একটি ছেলে আছে। আপনি আবার ভাঙ্গবেন না যেন কথাটা। ছেলেমেয়ে হয়নি শুনলে বলবে, কেন হয়নি। তার চেয়ে এই ভাল।' মফঃস্বলে মেয়েদের মধ্যে কাজ করা কতটা মুশকিল এ থেকে কিছুটা বোঝা যাবে। জলপাইগুড়ির সঙ্গে সঙ্গে শিলিগুড়িতেও সমিতি হলো। ওখানে সমিতি চালাতেন চারু মজুমদারের স্ত্রী লীলা মজুমদার এবং মনোরঞ্জন রায়ের স্ত্রী সাবিত্রী রায়। ওখানকার 'কালো ডাক্তারের' বাড়িটা আমাদের ঘাঁটি ছিল। আমি ওখানেই উঠতাম।

জলপাইগুড়িতে একবার বন্যার ধ্বংসলীলা দেখতে আমাকে যেতে হলো তৎকালীন পি· সি· নেতা মনোরঞ্জন রায়ের সঙ্গে। সেটা ১৯৫৬ সন। বন্যার এক প্রলয়ঙ্করী রূপ দেখলাম সেখানে।

আমরা ওদলাবাড়ি গেলাম। সেখানেই বন্যার প্রচণ্ডতা সব থেকে বেশী। বন্যার জলে বাঁধের রাস্তা মাঝে মাঝে ভেঙ্গে গিয়ে গ্রাম-জনপদ সব ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল। ওখানকার কমরেডদের সঙ্গে ঐ বাঁধের পথ ধরে আমরা হেঁটেছিলাম। যেখানে বাঁধ ভেঙ্গেছিল সেখানে দেখেছিলাম টেলিগ্রাফের তারগুলোর উপর খড়কুটো ঝুলে আছে। বন্যার জল পাহাড়ের উপর থেকে নেমে বাঁধ এবং পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটা শাখা নদীতে জমা হতে থাকে। স্থানীয় লোকদের কাছে শুনলাম—দিন তিনেক ঢেউ খেলানো জল ফুলতে থাকল। বাঁধের রাস্তার এ-পারের লোকেরা অপেক্ষা করেছে জল নেমে যাওয়ার জন্য। কিন্তু জল নেমে আর গেল না। তিন দিন পরে রাত ছুপুরে বাঁধের রাস্তা নানা জায়গায় ধ্বসিয়ে দিয়ে নদীর জল জলপ্রপাতের মতো ছুটে চললো। বাঁধের বাধা পেয়ে সেই সময়ে জল লাফিয়ে উঠেছিল টেলিগ্রাফের তার পর্যন্ত। খড়কুটো তারই চিহ্ন। শুনলাম বাঁধের অপর পারটা ছিল প্রকাণ্ড ধান-ক্ষেত। আমরা দেখলাম সেটা এখন বালুর চর। ধান কাটা কেবল নাকি শুরু হয়েছিল। এখন সেগুলি হাত ছুই শক্ত বালুর নীচে। এরকম কয়েকটা ক্ষেতে

আমরা নেমে ঘুরেছিলাম। ঐ বালুর মধ্যেই গরু-মহিষ প্রভৃতির কঙ্কালগুলো পড়ে রয়েছে দেখলাম। মানুষের কঙ্কালও নাকি প্রচুর পাওয়া গেছে। আরও দেখলাম, চাষীরা দু'হাতে বালু খুঁড়ে ধানের গোছাগুলি বের করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু বৃথা চেষ্টা। সেই ধানের মধ্যে খাদ্যবস্তু আর অবশিষ্ট ছিল না। কত গ্রাম এবং কত ধানক্ষেত যে এভাবে বালুর তলায় চলে গেছে তখনও তার হিসাব হয়নি।

আমার সঙ্গে কিছু নতুন পুরনো রিলিফের কাপড় ছিল। প্রয়োজনের তুলনায় কিছুই নয়। তাই-ই দেওয়া হলো কতকগুলো গ্রামে।

এই বন্যা দেখতে গিয়ে আমার দারুণ অভিজ্ঞতা হয়েছিল। আমাদের জলঢাকা নদী পার হতে হয়েছিল একটা ভাঙ্গা রেল-সেতুর উপর দিয়ে। তার অনেক জায়গায় চলাচলের দুধারের কতকগুলো অংশের রেলিং দুমড়ে মুচড়ে গিয়েছিল। তা ধরে পার হওয়া যায় না। নীচের দিকে তাকালে মাথা ঘুরে যায়। গেরুয়া রঙ-এর ঘোলা জলের উথাল-পাতাল চলার ভঙ্গি দেখে ভয় হয়। পার হতে সত্যি খুব ভয় করতে লাগল। যেখানে রেলিং ছিল না সে জায়গাগুলোতে দুটো লাইনের উপর দুই পা রেখে, দু'হাতে দুটো লাইন ধরেই বসে বসে একটু একটু করে পার হয়েছিলাম। মনোরঞ্জন রায় বললেন, নীচের দিকে তাকাবেন না। আমাদের দিকে তাকান। প্রতিমুহূর্তে মনে হচ্ছিল—এই বুঝি পড়ে যাচ্ছি। এরকম অভিজ্ঞতা এর আগে আমার আর হয়নি। এমন 'রোলিং ওয়াটারার'ও আর দেখিনি।

মনোরঞ্জন রায় হিসাব করে বলেছিলেন, আমরা নাকি ১০০ মাইল দুর্গম পথ সেবার হেঁটে ঘুরেছিলাম। ঐ জলঢাকা নদী পার হবার কথাটা বলবার জন্য এ ঘটনার উল্লেখ করলাম। এবার অন্য প্রসঙ্গে কিছু কথা বলি।

নব সংস্কৃতির আন্দোলন

রিলিফের কাজে সহায়তা করার জন্য এই সময়ে কলকাতায় নতুন এক শিল্পী-গোষ্ঠীর সৃষ্টি হয়। এঁরা নানা জায়গায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে রিলিফের জন্য অর্থ সংগ্রহ করতে আরম্ভ করেন। বাঙলাদেশে শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তখন এক নবজাগরণ ঘটে। বিনয় রায়, জর্জ বিশ্বাস, সুচিত্রা মিত্র, হেমন্ত মুখার্জী এবং আরও অনেক গায়কের দেশাত্মবোধক গান, প্রীতি সরকারের কণ্ঠে 'আজ বাঙলার বুকে দারুণ হাহাকার, সোনার বাঙলা হইল রে ছারখার' গান, সাধন গুহ-র কণ্ঠে 'ভুখা হ্যায় বাঙ্গাল', জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের কণ্ঠে 'নবজীবনের গান,' পানু পালের 'ভুখানৃত্য,' শম্ভু মিত্রের কণ্ঠে 'মধু বংশীর গলি' আবৃত্তি, সব মিলে এক নতুন ধারার সাংস্কৃতিক আন্দোলন সে সময় মানুষকে মাতিয়ে তুললো। উদ্বুদ্ধ করল 'ভুখা বাঙ্গালকে' নতুন প্রাণবন্যায় সঞ্জীবিত হতে। রবীন্দ্রনাথ ও ডি. এল. রায় থেকে আরম্ভ করে নতুন কবি সুকান্তের গান ও কবিতা জর্জ বিশ্বাস সহ বহু নতুন শিল্পীর কণ্ঠে ধ্বনিত হতে লাগল। রবীন্দ্রনাথের 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বী' গানটি তখন কণ্ঠে কণ্ঠে। এই নতুন সঙ্গীতালেখ্য নিয়ে শিল্পীরা কলকাতার নানা হলে ও জিলায় জিলায় অনুষ্ঠান করতে লাগলেন। অর্থও সংগ্রহ হতে লাগল প্রচুর। খরচ বাদে সমস্ত অর্থই রিলিফের কাজে ব্যয় করা হতো। শুধু এখানে নয়, শিল্পীরা বাঙলার বাইরে অন্য প্রদেশেও এই নতুন সংস্কৃতির সম্ভার নিয়ে যেতে লাগলেন এবং রিলিফের কাজে অর্থ সংগ্রহ করতে লাগলেন। বিনয় রায় একটি দল নিয়ে পাঞ্জাব ঘুরলেন এবং লক্ষাধিক টাকা ও প্রচুর গহনা নিয়ে ফিরে এলেন। ছোট্ট মেয়ে সাধনা ছিল এই দলে। শুনেছি, ও যখন 'ভুখা হ্যায় বাঙ্গাল' গানটি গাইত এবং মঞ্চে ঘুরে ঘুরে হাত পাততো তখন মেয়েরা কাঁদতে কাঁদতে টাকা ও গহনা মঞ্চের উপর ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিতেন। তাছাড়া মেয়েরা সাধনাকে প্রায় টেনেই নিয়ে যেতেন লোটা ভর্তি দুধ খাওয়াতে। তাঁরা সবাইকেই খাওয়াতেন কিন্তু ছোট্ট রোগা পটকা সাধনা তাঁদের চোখে ছিল যেন পীড়িত বাঙলার প্রতীক। এই ধরনের উচ্ছ্বাস মনে করিয়ে দেয় সেই স্বদেশী যুগের মুকুন্দ দাসের আসরের কথা। এভাবে বম্বে, দিল্লী থেকেও সাহায্য এলো। শুধু তাই নয়, পার্টির কেন্দ্রীয় পরিচালনায় নতুন ধরনের নৃত্যনাট্য 'স্পিরিট অব ইণ্ডিয়া' পরিবেশিত হলো কলকাতার দর্শকমণ্ডলীর সামনে। স্বাধীনতা-সংগ্রামে

জাতি-ধর্ম-ভাষা-নির্বিশেষে সর্বভারতীয় মঞ্চেই এ নাট্যের মূল আবেদন ছিল সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী সংগ্রামে বিভেদের মূলোৎপাটন ও ঐক্যের গ্রন্থিবন্ধন। কলকাতার দর্শকেরা বিভিন্ন হলে বার বার এই নৃত্যনাট্যটি দেখেছেন এবং এর আবেদন ও শিল্প-সৌকর্যে মুগ্ধ হয়েছেন।

এই নাট্যপ্রদর্শনের দ্বারা অর্জিত অর্থ খরচ বাদে সমস্তই ব্যয়িত হয়েছে দুর্ভিক্ষ-পীড়িতের সেবায়।

একদিকে যখন গণ-সঙ্গীতের নতুন জোয়ার, অপরদিকে তখন বাঙলার নাট্যমঞ্চে জন্মলাভ করল নবজীবনের রসধারায় পুষ্ট নতুন নাটক। মহা দুঃখই যে মহৎ শিল্পের ধাত্রী, তা পুনর্বার প্রমাণিত হলো। দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধে বাঙালীর মরণযন্ত্রণা শুধু যন্ত্রণাতেই শেষ হয়নি। যে উচ্ছন্নে যাওয়া গ্রাম ও চাষী-পরিবারের কথা আগেই বলা হয়েছে, তারই একটি আশ্চর্য নিখুঁত ছবি তুলে ধরলেন বিজন ভট্টাচার্য, আর তার সফল রূপ মঞ্চে পরিবেশন করলেন লেখক নিজে ও শম্ভু মিত্র প্রমুখ বর্তমানের অনেক খ্যাতনামা শিল্পীরা। অবশ্য তখন ঐ শিল্পীদের বেশীর ভাগই ছিলেন অনামা ও অজানা। গর্বের বিষয়, যেসব মহিলা শিল্পীরা সেদিন মঞ্চে প্রথম পদার্পণ করেন এবং আজ যারা বিখ্যাত হয়েছেন, তাদের বেশীর ভাগই ছিলেন নারী-আন্দোলনের কর্মী। আন্দোলনের সঙ্গে ঐ সব শিল্পীদের প্রত্যক্ষ যোগ ছিল এবং ঘটনাগুলো চোখের উপরে ঘটতে দেখেছিলেন বলেই তাঁরা অমন জীবন্ত অভিনয় করতে পেরেছিলেন। সম্ভবত এই কারণেই গোপাল হালদারের মতো পণ্ডিত লোককেও সেদিন মঞ্চে দেখা গিয়েছিল। জীবননাট্যের ঐ মঞ্চে ছেঁড়া কানি পরা, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে এক কোণে বসা বৃদ্ধবেশী গোপালদার সেই ভগ্নকণ্ঠের আকুল কান্না—'তোরা সব গ্রামে ফিরে যা'—এ তো আর ভুলবার নয়! এই নাটকে আমাকেও একটুখানি অংশ নিতে হয়েছিল। বিজন ও সুধী প্রধানের অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না। ওরা যখন বললো, বৃদ্ধা পঞ্চাননীর চরিত্রে দুটি সিনে মাতঙ্গিনী হাজরাকে ফোটানোর চেষ্টা হয়েছে, এ পার্ট আপনি ছাড়া হবে না, আমার তখন হাতে সময় নেই একটুও। কিন্তু মাতঙ্গিনীর নাম শুনে কিছুটা উৎসুক হলাম। পার্টটা পড়ে রাজীও হয়ে গেলাম। আরম্ভেই কয়েক মিনিটের দুটো সিন। তারপরেই শেষ। কথাও বেশী নয়। আমাকে পক্ককেশ, দন্তহীন, ন্যুব্জদেহ বৃদ্ধা বানিয়ে দিতেন শম্ভু মিত্র। মলিন ছিন্নশাড়ি জড়িয়ে লাঠি ভর দিয়ে এই বৃদ্ধার প্রথম সিনেই প্রবেশ। বৃদ্ধ প্রধান (বিজন) এর স্বামী। কুঞ্জ (সুধী প্রধান) প্রধানের ভ্রাতুষ্পুত্র। প্রবেশের পর বৃদ্ধার এই দু'জনের সঙ্গে

একটি সংক্ষিপ্ত বিক্ষুব্ধ সংলাপ : 'উপোস অনাহার সয়, কিন্তু মেয়েদের ইজ্জত ? তা রক্ষার দায়ও ওরা নেবে না ?' ওদের নীরব, নিরুপায় প্রত্যাখানে ক্রুদ্ধ বৃদ্ধা ঘৃণার দৃষ্টি ফেলে মনের জ্বালায় লাঠি ঠক্‌ঠক্ করে চলে যায়। পরের দৃশ্যে পতাকা হাতে জনতার মিছিলে নেত্রী রূপে উপস্থিত ঐ বৃদ্ধার মৃত্যুবরণ। আলো-আঁধারী পশ্চাৎপট দর্শকের মনে শঙ্কা জাগায়। বৃদ্ধার মৃত্যু মনটাকে ভারী করে তোলে।

এরকম একটি চরিত্রে অভিনয় করতে আমার খুবই ভাল লাগত। ভাল লাগার কারণ বোধহয় 'মাতঙ্গিনী'র ভূমিকায় নিজেকে ভাবতে পারা। অবশ্য আমার পক্ষে নাটকের সঙ্গে যুক্ত থাকা অল্পদিনই সম্ভব হয়েছিল।

এর কিছুকাল পরে জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায় ও নিবেদিতা দাসের অনবদ্য অভিনয়ে 'রাহুমুক্ত' যাত্রা দর্শকের আসরে উপস্থিত হলো। যাত্রাটি দেখতে দেখতে আমার মনে হতো আমাদের যুদ্ধবিরোধী শত বক্তৃতাও বোধহয় মানুষের মনে এমন দাগ কাটতে পারেনি। 'নবান্ন' ও 'রাহুমুক্ত' গ্রামেগঞ্জে অভিনীত হয়ে জনসাধারণের শুধু উপকার করেছে তাই নয়, নাটক ও মঞ্চশিল্পের অবাস্তবতা ও গতানুগতিক ধারারও খানিকটা মোড় ঘুরিয়ে দিতে পেরেছে। পরবর্তী কালে মঞ্চে ও পর্দায় জীবনধর্মী আলেখ্য সৃষ্টির সাফল্যে বাঙলার শিল্পীরা বিশ্ব-বিচারে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত—এটা বাঙলার গর্ব।

পিপলস রিলিফ কমিটি ও নারীসেবা সংঘের অবদান

দুর্ভিক্ষ কখনও একলা আসে না, সঙ্গে আসে মহামারী। 'দুর্ভিক্ষ আর মহামারী, এই নিয়ে ঘর করি।' এ তো বাঙলার ফি বছরের চিত্র। কিন্তু '৪৩-এর দুর্ভিক্ষে না খেয়ে ৩৫ লক্ষ মানুষই তো শেষ হয়ে গেল। আর ঐ সর্বনাশা 'মারী'-তে কত প্রাণ গেছে তার পুরো হিসাব হয়তো কোনদিনই মিলবে না। ইংরেজ সরকারের খাতায় খাদ্যাভাবে মৃত্যু কথাটা থাকে না, মহামারী কথাটাও থাকে না, থাকে অপুষ্টিজনিত মৃত্যুর খবর। তাও ধামাচাপা দেওয়ার পর সংখ্যাটা কত দাঁড়িয়েছিল কে জানে? তবে গ্রাম-শহরে আমাদের কর্মীদের যাতায়াত ছিল বলে তারা কলেরা, আমাশয়, ম্যালেরিয়া প্রভৃতিতে অসংখ্য মানুষের অসহায় মৃত্যু প্রত্যক্ষ করেছিলেন। রিলিফের কাজে যেতে গেলেই রোগ-প্রতিষেধক ঔষধ ও চিকিৎসার ঔষধ সঙ্গে নিতে হয়। কর্মীদের এই অভিজ্ঞতার ফলে পার্টিতে যারা চিকিৎসক-সদস্য ছিলেন তাঁরা পিপলস রিলিফ কমিটি খুললেন। এর ভার নিলেন কমরেড সতীশ পাকড়াশী। আমাদের চিকিৎসক-বন্ধুর সংখ্যা কম ছিল না। ঔষধপত্রের জন্য আবেদন জানিয়ে সাড়াও পাওয়া গেল অনেক। অনেকগুলি দল তৈরি হলো। দলে একজন করে ডাক্তার থাকতেন, বাকীরা সহায়ক। এঁরা গ্রামে গ্রামে ঘুরে সাধ্যমত দায়িত্ব পালন করতেন। তখন এরকম আরও অনেক প্রতিষ্ঠান মেডিক্যাল সাহায্য নিয়ে গ্রামে যেতেন। সরকার থেকেও কাজ আরম্ভ হলো। পিপলস রিলিফ কমিটিতে বহু লোক অর্থ ও ঔষধপত্র দান করতেন। পুটুদি আর কমলা মুখার্জী—এই প্রতিষ্ঠানে অনেক অর্থ সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন।

মনে আছে, আমরা একটা শো করে রিলিফের টাকা তুলেছিলাম। আগেই বলেছি, সংগৃহীত সমস্ত অর্থই রিলিফের কাজে ব্যয় করা হতো। কিন্তু সারা বাঙলার ক্ষুধা ও ব্যাধি একমাত্র আমাদের চেষ্টায় দূর হবার নয়। তাই আরও বড় এবং ব্যাপক সংস্থা গড়ার প্রয়োজন হলো। এবার সামনে এগিয়ে এলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। তিনি কংগ্রেসের নেতা। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, তিনি চিকিৎসা জগতের একজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। চিকিৎসক হিসাবে তাঁর মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে কে কংগ্রেস বা কে কমিউনিস্ট—এই বিচারের প্রশ্ন ওঠে না। যে সমস্ত প্রতিষ্ঠান এই কাজ করত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সভা-

পতিত্বে তারা সকলেই এক কো-অর্ডিনেশন কমিটিতে মিলিত হলেন। সংক্ষেপে এর নাম বি. এম. আর. সি. সি.। এর ফলে চিকিৎসক পাঠানো, ঔষধপত্র সংগ্রহ ইত্যাদি ব্যাপারে সুশৃংখল কাজের ব্যবস্থা চালু হলো। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি সর্বত্রই ছিল এই কাজের সঙ্গী।

এর কিছুকাল পরে আরও একটি সংগঠন গড়ে উঠল। নাম হলো নারী-সেবা সংঘ। এই সংগঠনের তখন জরুরী প্রয়োজন ছিল। রাস্তায় বেরিয়ে আসা মেয়েরা ক্রমশ গ্রামে ফিরতে লাগল। কিন্তু কিছু অল্পবয়সী মেয়েদের প্রয়োজন ছিল অন্য আশ্রয়। কারণ, তাদের গ্রামে ফিরে আশ্রয় বা সংসার পাওয়ার আশা প্রায় ছিল না। নিকট আত্মীয়রা হয় নিখোঁজ, না হয় তারা ছিল এদের ভরণপোষণে অক্ষম।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি অন্যান্য সমিতির সঙ্গে একত্রিত চেষ্টায় 'নারীসেবা সংঘ' নামে একটি আশ্রয় ও শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে। ঐ সময়ে নারীসেবা-মূলক কাজের উদ্দেশ্যে অনেক প্রতিষ্ঠান ছিল। উইমেনস্ ইউনিয়ন নামে একটি প্রতিষ্ঠান এইরকম দুস্থ মেয়েদের আশ্রয় ও শিক্ষার জন্য আগেই খোলা হয়েছিল। ইলিয়ট রোডে প্রতিষ্ঠানটি আজও আছে। এর পরিচালনায় ছিলেন লেডী রমলা সিন্‌হা। কেন্দ্রটি এখনও নাকি ভালোভাবে চলছে। নারীসেবা সংঘ প্রতিষ্ঠার কাজে এরা এবং আরও অনেক প্রতিষ্ঠান হাত মেলালেন। আর কমিটিতে উপদেষ্টা হিসাবে এলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ক্ষিতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। শ্রীমতী সীতা চৌধুরী সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ. আই. ডব্লিউ. সি-র মলিনা দত্তও এলেন এই কমিটিতে।

প্রথম দিকে এটি গড়ে ওঠে দানের অর্থে। পরের দিকে মেয়েদের মাথাপিছু ১৮ টাকা করে খরচ সরকার সাহায্য হিসাবে দিতেন। পরবর্তীকালে এটা নিশ্চয় আরো বেড়েছিল। কমলা মুখার্জী ও রেণু চক্রবর্তী এই প্রতিষ্ঠানের কাজে আত্মরক্ষা সমিতির তরফ থেকে যুক্ত ছিলেন। যতদূর মনে পড়ে, ওরা কমিটিতেও ছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের গোড়া পত্তনে কমলা ও রেণুর অবদান ছিল অনেকখানি। ব্রহ্মকুমারী রায় (রেণুর মা) প্রতিষ্ঠানের প্রাণস্বরূপা ছিলেন। শেষ জীবন পর্যন্ত ইনি এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং প্রত্যহ সকালের দিকে ওখানে যেতেন। সীতা চৌধুরী ছিলেন যোগ্য সম্পাদিকা। ওখানে নানাবিধ শিল্পশিক্ষার ব্যবস্থা করা হতো। তাঁতের কাজ ছিল খুব উন্নত ধরনের। চাদর, বেড কভার, ঝাড়ন প্রভৃতি তৈরি করা হতো। শাড়ি ছাপানো, তাঁতে বোনার সুতোয় রঙ করা, কাঁচা সিল্কের সুতোয় রঙ করে

নানা রঙে গায়ের চাদর বোনা, খেস তৈরি করা—এই সব বহু রকমের কাজ হতো ওখানে। এ ছাড়া, কাটিং, জামা তৈরি ও এমব্রয়ডারী—এ সব কাজ তো ছিলই।

হোমের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা রক্ষার ও শিল্পশিক্ষার কাজের জন্য ভারপ্রাপ্ত ছিলেন ইন্দুসুধা ঘোষ। তাঁর মতো একজন গুণী মহিলা ওখানে ছিলেন বলেই ওখানকার শিল্পকর্মের এত নামডাক ছিল। সমস্ত ডিজাইন তিনিই তৈরি করতেন। ইন্দুদি ও তার অন্য সরকারী কর্মীদের শিক্ষায় গ্রামের অদক্ষ মেয়েদের হাতেও দক্ষতার সঙ্গে সুন্দর সব শিল্পসম্ভার তৈরি হতো।

প্রতি বছর বড় আকারে করা হতো নারীসেবা সংঘের প্রদর্শনী। নানা সৌখিন জিনিসপত্র বিক্রী হতো এই প্রদর্শনীর মাধ্যমে। মেয়েদের মজুরীর টাকা জমা রাখা হতো, তারপর চলে যাবার সময়ে সেই টাকা তুলে দেওয়া হতো মেয়েদের হাতে।

এ ছাড়া ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার ব্যবস্থাও চালু ছিল ওখানে। ভাল ফল যারা দেখাত তাদের অন্য স্কুলে কিম্বা নার্সিং শিক্ষার জন্য পাঠানো হতো। বয়স্কা-শিক্ষার ক্লাসও চলত।

এইসব শিক্ষা পেয়ে মেয়েরা নানারকম চাকরিতে চলে যেত। এই চাকরি-পাওয়া মেয়ের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না। অনেক হবে। আর ভাল পাত্রের সন্ধান পেলে মেয়েদের বিয়েও হয়ে যেত।

একটি ভাড়া বাড়িতেই এই সংস্থার জন্ম। এখন সরকারী সহায়তায় জায়গা পেয়ে বাড়ি করে সংস্থাটি সেখানে সুনামের সঙ্গে চলছে। ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় এর স্থায়ীত্বের ব্যাপারে অনেক সাহায্য করেছিলেন। নতুন বাড়ির জন্য কমিটির সদস্যারাও প্রচুর অর্থসংগ্রহ করেছেন। এরকম বহুমুখী কাজকর্ম নিয়ে চালু একটি প্রতিষ্ঠান কলকাতায় এখনও বোধহয় কমই আছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির শিল্পসংস্থাগুলিতে যেসব কর্মীরা নিযুক্ত ছিলেন তারাও এখানে এসে ট্রেনিং নিতেন। এই সংগঠনটির বিস্তারের দায়িত্বভারও নিলেন সমিতির কর্মীরা।

* * * *

নারীসেবা সংঘ ও আত্মরক্ষা সমিতি উভয়েই তাদের নানা শিল্পকর্ম নিয়ে এবার উপস্থিত হলো বড় রকমের একটা প্রদর্শনীতে। শুধু এরাই নয়, বাঙলাদেশে যতগুলি মহিলাদের সংগঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠান পাওয়া গেল সবাইকে নিয়েই এটা করা হলো। এ. আই. ডব্লিউ. সি-ও এই প্রদর্শনীতে যোগ দিলেন। প্রেসিডেন্সি

কলেজের অনেকগুলি ঘর নিয়ে এটা করা হয়েছিল। একটা ঘর পুরো ভর্তি ছিল নারীসেবা সংঘের কাজের নিদর্শনে। আত্মরক্ষা সমিতির জন্যও নির্দিষ্ট ছিল একটি ঘর। জিলাগুলো থেকে মেয়েরা এসেছিলেন তাদের কাজ নিয়ে। মেদিনীপুরের মেয়েরা তাদের তৈরি মাদুর ও নানারকম ফুল ও অলঙ্কারের প্যাটার্নে তৈরি বড়ি নিয়ে এসেছিল, সেকথা এখনও মনে পড়ে। একটি ঘরে আমাদের সমিতির স্থান সঙ্কুলান হতে মুশকিল হয়েছিল।

এই উপলক্ষে বাঙলার দুর্ভিক্ষের উপর অঙ্কিত চিত্রের একটি সিরিজ তৈরি করে দিয়েছিলেন বিখ্যাত শিল্পী জনাব জয়নাল আবেদিন। দেশ ভাগের পরে এখন তিনি ওপার বাঙলার একজন শ্রেষ্ঠ শিল্পী। গোলাম কুদ্দুস নামে আমাদের এক পার্টি-কর্মী ঐ শিল্পীর সঙ্গে আমাকে পরিচয় করিয়ে দেন। আমি কয়েক দিন বসে বসে আমার অভিজ্ঞতার কথা তাঁকে শোনাই। চিত্রে তিনি তা ফুটিয়ে তোলেন তাঁর নিজের কল্পনাশক্তি মিশিয়ে।

প্রদর্শনী উদ্বোধনে এসেছিলেন শ্রীযুক্তা নাইডু। সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে দেয়ালে বাঁধানো ছবিগুলো তিনি বিশেষ ঔৎসুক্য নিয়ে দেখেন। কয়েকটা ছবির নীচে নাম সই করে শিল্পীকে উনি এগুলোর কপি পাঠাতে বলেন। শিল্প-প্রদর্শনীটি দেখে তিনি অত্যন্ত খুশি হন। আত্মরক্ষা ও আত্মনির্ভরতার জন্য মেয়েদের এই কর্মপ্রচেষ্টার তিনি উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন।

এদিকে মহিলা কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে বাঙলাদেশের প্রায় সব জিলাতেই শাখা-সমিতি গড়ে উঠেছিল। প্রত্যেক শাখা-সমিতির পরিচালনায় তিন-চারটি থেকে কুড়ি-বাইশটি করে প্রাইমারী কমিটি হয়ে গেল। আমাদের সদস্য ফি ছিল এক আনা। এইটুকু দিতেও কৃষক মেয়েদের কষ্ট হতো। কিন্তু বেশী ফি নিয়ে তাদের সমিতিতে আসার পথ বন্ধ করা আমাদের নীতি নয়। শহরের মেয়েরা বেশী দিতে পারতেন এবং দিতেনও। কিন্তু সেটা সাহায্য হিসাবে গৃহীত হতো। এইবার শুরু হলো আমাদের সম্মেলনের প্রস্তুতি। জিলা-সংগঠন গড়ার কাজে ৩/৪টি জিলা বাদে সর্বত্র আমাকে একাধিকবার করে যেতে হয়েছে।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ আর সম্মেলন

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির প্রথম সম্মেলনের প্রাক্কালে সমিতির সদস্যা সংখ্যা ২০/২২ হাজার হবে। তাদের মধ্যে কৃষক আছেন, শ্রমিক মেয়েরা আছেন, আছেন শহরের বস্তি-অঞ্চলের ও মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়েরা। কিছু উচ্চবিত্ত পরিবারের মেয়েরাও ছিলেন। ছাত্রীরা অনেকেই সদস্যা, আবার অনেকে সঙ্গী হয়ে যোগ দেবেন। সদস্যা ছাত্রীরা মহিলা সংগঠনের কর্মীও বটে। এ ছাড়া আছেন আরও অনেক মহিলা, যাঁরা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ দেখে খুশি, তাই তাঁরা অর্থ দিয়ে, পরিশ্রম দিয়ে সাহায্য করেন এবং আন্তরিকভাবে শুভ কামনা করেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বেশ কিছু কংগ্রেসী মহিলা ও এ. আই. ডব্লিউ. সি-র কিছু নেত্রীস্থানীয়া মহিলা, যাঁরা কমিউনিস্ট বিরোধিতাকে তেমন গুরুত্ব দেন না। সর্বোপরি সমিতির ঘোষিত অসাম্প্রদায়িক নীতির ফলে আত্মরক্ষা সমিতি হিন্দু-মুসলমান নারীদের যৌথ প্রতিষ্ঠান রূপেও স্বীকৃত।

কলকাতার ওভারটুন হলে অধিবেশন হয়; কিন্তু সম্মেলনের হলটি ছিল ছোট। নানা ছবিতে সাজানো হয়েছিল এই হল। অঙ্কিত ছবিতে যুদ্ধ-বিধ্বস্ত ইউরোপ ও রাশিয়ার অবস্থা দেখানো হয়। বাঙলার দুর্ভিক্ষের ছবির পাশাপাশি নারী-জাগরণের নানা ছবিও সেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল। সমস্ত জিলা থেকে এলেন প্রতিনিধিরা। দর্শক ও প্রতিনিধিতে ভরে গেল হলটি।

আমরা সভানেত্রী রূপে পেলাম ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারে কোন গোঁড়ামির স্থান ছিল না। রবীন্দ্রনাথ নিজে সোভিয়েট রাশিয়া পরিভ্রমণ করে 'রাশিয়ার চিঠি' লেখেন। সোভিয়েটের নতুন সমাজ-ব্যবস্থাকে তিনি কি চোখে দেখেছিলেন ঐ বইতে তা বর্ণিত আছে। তাঁর বই পড়ে আমরা সোভিয়েট দেশ সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ তথ্যচিত্র পেয়ে উপকৃত হই। সে যুগে রবীন্দ্রনাথ ছাড়া অন্য কেউ এ বই লিখতে সাহসী হতেন কিনা সন্দেহ। সেই ঠাকুর-পরিবারের প্রখ্যাতা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীকে সভানেত্রী রূপে পেয়ে আমাদের খুশির অন্ত ছিল না।

সম্মেলনে অনেক শুভেচ্ছা বাণী এলো। হাজরা বেগম—যিনি পরবর্তীকালে আমাদের সারা ভারত মহিলা ফেডারেশনের নেত্রী হয়েছিলেন, তিনিও শুভেচ্ছা পাঠালেন। প্রতিনিধিরা এলেন অনেক জিলা থেকে। বরিশালের মনোরমা

বসু, যুঁইফুল বসু (রায়) এলেন। বর্ধমানের সেই মুসলমান মেয়েরা এবং সুফিয়া কামালও এলেন। যেসব জিলায় সমিতি গঠিত হয়েছে তার সব জায়গা থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছিলেন। বর্ধমানের বাদশা, রাবেয়া ও মাকুসুদাকে দেখে মনে হয়েছিল ওরা আমাদের নারী-আন্দোলনের সাফল্যের প্রতীক।

সম্মেলনের আলোচ্য বিষয় স্বভাবতই এতদিন ধরে যে সব কাজ আমরা করেছি এবং যে সব প্রচার-আন্দোলন করেছি সেগুলিকে কেন্দ্র করেই স্থির হলো। বাঙলাদেশে এই বোধ হয় প্রথম একটি মহিলা সম্মেলন তাদের মঞ্চ থেকে সরকার-সৃষ্ট দুর্ভিক্ষের প্রতিবাদে তীব্র ধিক্কার-ধ্বনি উচ্চারণ করল। গ্রামের দারিদ্র্য ও ক্ষুধার সুযোগ নিয়ে অসংখ্য মেয়ের লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে এই প্রথম নারীকণ্ঠে অগ্নিবর্ষী প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো। এই পীড়িত নারী ও শিশুরা যাতে সম্মানের সঙ্গে অন্ন-বস্ত্র পেতে পারে তার দায়িত্ব গ্রহণে সম্মেলন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। কিন্তু এই দুর্ভোগের প্রধান দায়ভাগ সরকারকেই বহন করতে হবে সে সম্বন্ধেও সম্মেলন সচেতন। অতএব সরকারকে দায়িত্ব পালনে বাধ্য করার জন্য কর্মীরা সর্বদা সচেতন থাকবেন। এই দুর্ভিক্ষ ও লাঞ্ছনার প্রত্যক্ষদর্শী কর্মীদের দেহ-মনে ছিল আগুনের জ্বালা। তাদের বক্তৃতাতেও তাই প্রকাশ পেল। আমাদের সম্পাদিকা এলা রীড্ এক বছরের রিপোর্টে প্রদেশব্যাপী মেয়েদের আন্দোলন ও সংগঠনের পরিপূর্ণ বিবরণ দিলেন। বিবরণে তুলে ধরলেন, কি করে সমিতির কর্মীরা সামান্য সাধ্য নিয়ে অসামান্য এক বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে নির্ভীক সংগ্রামে তাদের রাজনৈতিক ও মানবিকতাবোধের উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখেছে, সেইসব কাহিনী।

এ সব কথা ছাড়াও যুদ্ধের বিরুদ্ধে, ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে সম্মেলনের প্রতিবাদ ঘোষিত হলো এবং অকারণে আক্রান্ত দেশগুলির স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন জানানো হলো। আর, আমাদের দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বার্থে দাবী করা হলো কংগ্রেস নেতৃত্বের বিনাশর্তে মুক্তি।

সম্মেলনে ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীকে সভানেত্রী ও এলা রীড্‌কে সম্পাদিকা করে পূর্ণাঙ্গ প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হওয়ার পর সম্মেলন সমাপ্ত হলো।

কলকাতায় আমাদের প্রথম সম্মেলন এইভাবে শেষ হলো। আমাদের কাজ যেন আরও বেড়ে গেল। দ্বিতীয় সম্মেলন আবার এক বছর পরে হবে, এটাই স্থির হয়েছিল প্রথম সম্মেলনে। বরিশালের কর্মীরা দ্বিতীয় সম্মেলনটি বরিশালে করবেন বলে ঘোষণা করলেন। কিন্তু এই এক বছরে অনেক কাজ করতে হবে। এখনও পর্যন্ত সমস্ত জিলায় সমিতি ভালোভাবে গঠিত হয়নি। যেসব জিলায় হয়েছে, সেখানে জিলা সম্মেলন করা এখনও বাকী। তাছাড়া

গঠনমূলক কাজের জন্য আরও একটু বড় গোছের পরিকল্পনা নিতে হবে। বৌবাজারে সমিতির কেন্দ্রীয় দপ্তরটিও পালটানো হলো প্রয়োজনবোধে। শিল্প-কর্মের জন্য একটু বড় জায়গা চাই। একটি কো-অপারেটিভ খুলতে হবে। পাড়ায় পাড়ায় অনেকগুলো কেন্দ্র ইতিমধ্যেই খোলা হয়েছিল। এবার কো-অপারেটিভ করে সমস্ত পাড়াকেন্দ্রে কাজ শেখানো, অর্ডার যোগাড় করা, জিনিসপত্র সাপ্লাই দেওয়া এবং সব কেন্দ্রের তৈরী মাল কেন্দ্রীয়ভাবে বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা, শিল্পীদের মজুরী দেওয়া—এই সব কাজ করতে হবে কো-অপারেটিভ থেকে।

আইন-মাফিক বিধিনিয়ম অনুযায়ী কো-অপারেটিভ রেজেস্ট্রী হয়ে গেল। শেয়ার কিনলেন সবাই। যাঁরা এককালীন বেশী টাকা দিতে পারেন তাঁরাই কিনলেন বেশী শেয়ার। এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে সরকারী সাহায্য পাওয়া যায়। তাছাড়া সমিতির মেয়েরা 'শো' করে প্রথম মূলধনের টাকা তুললেন। একাজে আমরা বিশেষভাবে দু'জনকে পেলাম, যাঁদের অক্লান্ত চেষ্টায় প্রতিষ্ঠানটি গড়ে উঠল। একজন অপর্ণা ব্যানার্জী ও অন্যজন গীতা মল্লিক। অপর্ণা সম্পাদিকা হলেন। পাড়াগুলোতে অর্ডার বণ্টন ও প্রয়োজন অনুযায়ী মালপত্র দেওয়া এবং পরে আবার কাজ বুঝে নেওয়া—এ সমস্তই তিনি করতেন। নিপুণ-ভাবে হিসাবপত্র রাখা হতো। গীতা মল্লিকের কাজ ছিল অর্ডার সংগ্রহ ও বিক্রয়ের ব্যবস্থা করা। বেঙ্গল হোম ইন্‌ডাস্ট্রিজ ও গুড কম্‌প্যানিয়ন্‌স্‌ নামে দুটি হস্তশিল্প বিক্রয়ের দোকানের সঙ্গে তিনি ছিলেন খুবই পরিচিত। তাই প্রধানত ঐ দুটি দোকানেই তিনি সমিতির হাতে তৈরি জিনিস বিক্রয় করতেন। হাতের কাজ খুব নিপুণ না হলে ওসব দোকানে চলত না। তাই সেটাও তাঁকে দেখতে হতো। কলকাতার সমস্ত পাড়াকেন্দ্রগুলো কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হলো। শ্যামবাজারের কেন্দ্রটি বেশ বড় হয়ে উঠল। প্রায় ৫০ / ৬০ জন মেয়ে কাজ করত সেখানে। দু'জন কর্মী এদের দিয়ে কাজ করাতেন। একজন হলেন লীলা বসু অন্যজন সুধা পাল। বাবলি সরকার, সুরুচি সেন ও মাধুরী দাশগুপ্ত পরিচালিত কেন্দ্রগুলি থেকেই সব চেয়ে নিপুণ হাতের কাজ আসত। বাচ্চাদের জামা ও মেয়েদের ব্লাউজ এসবও তৈরি হতো। ধীরে ধীরে কো-অপারেটিভটি বেশ বড় আকার ধারণ করল। কাজের ভিড়ে সারা দুপুর এটা থাকত জমজমাট।

প্রায় একই সঙ্গে কেন্দ্রীয় অফিসের বাঁধানো উঠোনে বসল হাতে কাগজ তৈরির সাজ-সরঞ্জাম। এটি সম্পূর্ণ সরকারী সাহায্যে হয়েছিল। ওরাই মেশিন দিলেন, যাবতীয় প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র দিলেন এবং মেয়েদের শেখালেনও। কাগজ যা তৈরি হতো তাও সরকার কিনে নিতেন। কেন্দ্রটি অনেকে দেখতে

আসতেন এবং সখ করে কাগজও কিনে নিতেন। মেয়েদের মজুরির টাকা সরকার থেকে আসত। কলকাতায় একটা শিল্প-প্রদর্শনী হয়েছিল অনেকগুলি মহিলা সমিতির তৈরী শিল্পকর্ম নিয়ে। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু এসেছিলেন এর দ্বারোদ্‌ঘাটন করতে। ঐ সময় তিনি আমাদের এই কাগজ তৈরির কেন্দ্রটি দেখে উচ্চ প্রশংসা করেন।

একটি তাঁত কেন্দ্রও খোলা হয়েছিল বৌবাজারের কাছাকাছি। সেটির পরিচালিকা ছিলেন পঙ্কজ আচার্য, বেলা লাহিড়ী ও অনিমা রায় (নৃত্যশিল্পী পলি রায়ের মা)। কেন্দ্রটি খুব ভাল চললো। ছোট-বড় চাদর ও ঝাড়ন তৈরি হতো ওখানে। কত মেয়ে কাজ করত তা ঠিক মনে নেই। সরকারী দপ্তর থেকে প্রস্তাব এলো—'আপনারা আরও কেন্দ্র খুলুন, আমরা খরচ দেবো। যতগুলি পারেন খুলুন। আপনাদের মতন এরকম নির্ভরযোগ্য পরিচালক আমরা পাই না—তাই বরাদ্দ টাকা খরচ করতে আমাদের পক্ষে মুশকিল হয়। অনেক কেন্দ্রই টাকা নষ্ট করে, উড়িয়ে দেয়, তাই আপনাদের বলছি।' কিন্তু আমরা এই প্রস্তাবে সাড়া দিতে পারলাম না উপযুক্ত কর্মীর অভাবে।

সমিতির প্রচেষ্টায় উত্তর কলকাতায় একটি চিকিৎসাকেন্দ্র স্থাপিত হয়েছিল নারী ও শিশু রুগীদের জন্য। প্রতি সপ্তাহে দু'জন মহিলা ডাক্তার পৃথকভাবে বসতেন এখানে। লাবণ্যদি (মিত্র) কেন্দ্রটির পরিচালিকা ছিলেন। প্রত্যহ যত রোগী আসত তাদের নাম-ঠিকানা-বয়স সবই লিখে রাখতে হতো। কি অসুখ, কি ওষুধ দেওয়া হলো—তাও। খুব ঝামেলার কাজ ছিল। সরকারী অর্থ সাহায্য কিছুটা পাওয়া যেত। তা ছাড়া ঔষধ ও টাকা নিজেদেরই যোগাড় করে নিতে হতো।

টালিগঞ্জের প্রতাপাদিত্য রোডেও দুটি কেন্দ্র ছিল। একটি চালাতেন বাদলরাণী রায়, অপরটি মীনা দাশগুপ্ত। সব পাড়ায় এরকম ছোট-বড় কত যে কর্মকেন্দ্র, বয়স্কা-শিক্ষাকেন্দ্র ও শিশুকেন্দ্র চলতো তার সংখ্যা আজ আর মনে করে বলতে পারব না।

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির বাইরে অন্য সমিতিও হলো পৃথক নাম নিয়ে। একটি পার্ক সার্কাস মহিলা সমিতি। প্রধান পরিচালিকা ৭০ বছরের বৃদ্ধা লীলা বসু। অসীম তাঁর কর্মশক্তি ও উৎসাহ। থাকেন বালিগঞ্জের প্রান্তে। কিন্তু টুক্ টুক্ করে সমিতির কাজের দিনে এসে উপস্থিত হন। বাড়ি বাড়ি ঘোরেন, অর্ডার নেন, তৈরী মাল পৌঁছে দেন। বিক্রীর পর দাম সংগ্রহ করে মেয়েদের মজুরীর ব্যবস্থা করেন। সব কর্মী-মেয়েদের বাড়ি যান, খবর নেন। তাঁর কাজের

কোন অন্ত নেই। কেন্দ্রের মেয়েরা লীলা মাসীমার ৭০ বৎসরের জন্মোৎসব করেছিল ঘটা করে। আরও একজন বৃদ্ধা পরিচালিকা ছিলেন ওখানে—সুধাংশু মাসীমা। আজ আর তিনি নেই। অনুপমা বাগচী ছিল এই কেন্দ্রের অন্যতম পরিচালিকা। অনুপমা দক্ষ কর্মী। রাজশাহীতে ওকে প্রথম দেখি। তখন ছাত্রী ছিল। ওখানে মহিলা সম্মেলনে যাই। সেই সময় ওকে আর সুগায়িকা ছাত্রী প্রীতি সরকারকে (ব্যানার্জী) দেখি। রাজশাহীতে ওরা দুর্ভিক্ষের শুরু থেকে ছাত্র সংগঠন ও মহিলা সংগঠনের হয়ে রিলিফের কাজ আরম্ভ করে। প্রথম থেকেই ওরা স্থানীয় কংগ্রেসী ছাত্রীদের কাছ থেকে বাধা পায়। ওদের বিরুদ্ধে দেওয়ালে পোস্টার লাগানো, মিটিং ভেঙ্গে দেওয়া, বাড়ি বাড়ি প্রচারে বেরোলে তাতে বাধা দেওয়া—এসব কাজ প্রায় প্রতিদিনই করতেন কংগ্রেসী ছাত্রীরা। কিন্তু সাহসের সঙ্গে কাজ করতে করতে ওরা এসব বাধা পেরিয়ে যেত। রিলিফের কাজেও ওরা শহরের প্রশংসা পায়। ওদের প্রথম জিলা সম্মেলনে আমি যাই। সম্মেলন নিয়ে ওরা খানিকটা উদ্বেগেই ছিল। পরিস্থিতি দেখে আমার ফরিদপুরের প্রথম ফ্যাসিবিরোধী সভাটির কথা মনে হচ্ছিল। এখানেও তো ফ্যাসিবিরোধী প্রচার চালাবার জন্য ওরা বাধার সম্মুখীন হয়। টাউন হলে প্রকাশ্য অধিবেশনের আগে ওদের সঙ্গে কয়েকটা বাড়িতে আমিও দেখা-সাক্ষাৎ করি। শহরের প্রাচীনরা আশ্বাস দিলেন। তা ছাড়া ওদের নিষ্ঠা ও কাজের জন্য সাধারণ মানুষের সহানুভূতি ওদের দিকে ছিল। প্রকাশ্য সম্মেলন খুব ভাল হলো। হলটি ভর্তি হয়ে গেল। ফ্যাসিস্ট-যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, রিলিফের কাজ, সব কথাই আলোচিত হলো। শেষ পর্যন্ত কোন গোলমাল হয়নি।

যতদূর মনে পড়ে '৪১ সনে রাজশাহীতে অনুষ্ঠিত ছাত্র-সম্মেলনেও আমি গিয়েছিলাম। সেই অনুপমা বাগচী কলকাতা এসে নেত্রীস্থানীয়া কর্মীদের অন্যতমা হলো। হাসিখুশি মিষ্টি স্বভাবের গুণে সকলের মন জয় করতে পারে। মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির কাজ করে, 'ঘরে-বাইরে' বিক্রয় করে। আবার পার্ক সার্কাসে তার বাড়ির কাছের মেয়েরা যখন চাইলেন—তাদের আলাদা সমিতি হোক, তখন সেটার ভারও তাকেই নিতে হলো। অনুপমাই ছিল দুটো সমিতির মধ্যে যোগসূত্র। অনুপমা নারী সেবাসংঘ পরিচালিত ট্রেনিং ক্লাসে শিক্ষা নিয়েছিল। এই সমিতির নেত্রীস্থানীয়া আরও দুজন ছিলেন—স্নেহকণা সেন ও নীলিমা সেন। এঁরাও আত্মরক্ষা সমিতির অভিজ্ঞ কর্মী।

এরকম আরও একটি সমিতি গড়ে ওঠে বালিগঞ্জ এলাকায় সাহিত্যিক

মনোজ বসুর স্ত্রী উষসী বসুর নেতৃত্বে। সমিতির নাম 'বলাকা'। বালিগঞ্জ পাড়ার অভিজাত পরিবারের মেয়ে ও গৃহিণীদের নিয়ে এটা ছিল একটা ক্লাবের মতন। নানারকম সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এঁরা করতেন। উষসী বসুর এই কাজের একটা নতুনত্ব আছে। সকলকেই একপথে নিজের দিকে আনা যায় না। অনেককে ঘনিষ্ঠ করে তোলা যায় তাদের রুচি মতো কাজের মধ্য দিয়ে। 'বলাকা'র মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত নাটক ও থিয়েটার দর্শকদের অকুণ্ঠ প্রশংসা পেত। যদিও অভিনয়ে শুধুমাত্র মেয়েরাই থাকতেন, এমন কি পুরুষের ভূমিকাতেও।

উষসী এদের সঙ্গে শুধু নাটকই করেনি। এদের কাছেও 'ঘরে-বাইরে' বিক্রয়, আত্মরক্ষা সমিতির সাহায্যে চাঁদা তোলা, এসবও করত। এমনকি পার্টির জন্য টাকাও তুলত। উষসীর অনেক কাজ। ভোর বেলা লেকের ধারে বেড়াতে গেলে দেখা যেত উষসী পার্টির কাগজ ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছে। বেড়ানোও হলো, পার্টির কাজটাও হলো। মহিলাটি যে এরকম কত কাজ করে বেড়ায় তার ঠিক নেই। পুত্রবধূ সংসারের ভার না নেওয়া পর্যন্ত একটি সংসারের দুবেলা হাঁড়ি ঠেলার কাজও ওকেই করতে হতো।

কলকাতার বিভিন্ন পাড়ায় কত ধরনের কাজ যে তখন আমাদের মেয়েরা করতেন তার পুরো খবর এতকাল পরে মনে করে বলা সম্ভব নয়।

এবারে জেলা সম্মেলনগুলোর কথা বলতে হবে। এ পর্বেও আমি অনেক জিলা ঘুরে অনেক মেয়েকে কাছে থেকে দেখার সুযোগ পেয়েছি। কলকাতার বাইরে গ্রামের মেয়েদের জগৎটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শহরের সঙ্গে মিল নেই কোন। এবারেও আবার মেদিনীপুরের গ্রামাঞ্চলে সমিতি করতে গেলাম। বারে বারে যেতে হয়েছে—জিলা সম্মেলনটির আয়োজনের জন্য। এবার আমি একলা নই। সঙ্গে থাকত বিশ্বনাথ মুখার্জীর স্ত্রী গীতা মুখার্জী। মেদিনীপুরের তমলুকে বিশ্বনাথ মুখার্জীর পৈত্রিক বাড়ি। গীতা মুখার্জীও তাই তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্র হিসাবে মেদিনীপুরকেই বেছে নিয়েছে। এই সময়ে সে ছাত্রীনেত্রী থেকে মহিলা-নেত্রীত্বে রূপান্তরের পথে। তখনও দুটোই করছে। মেদিনীপুরে এবারের কাজে অনেক জায়গায় গীতা আমার সঙ্গী। পরবর্তী সময়ে মহিলা আন্দোলন ও সংগঠনের কাজে সম্ভবত গীতাই ছিল আমার সব থেকে ঘনিষ্ঠ সহকর্মী। তাই বোধহয় পার্টি ছেড়ে আমার চলে যাওয়ার সময়ে ওর খুবই কষ্ট হয়েছিল এবং কলকাতার মায়া কাটিয়ে একাকী যখন দিল্লী চলে যাই তখন ট্রেনে তুলে দেওয়া পর্যন্ত কয়েকটা দিন সে-ই ছিল আমার সঙ্গে।

মেদিনীপুরের গড়বেতায় এলাম এবার। ওখানে সমিতি করতে হবে। একটি মেয়েকে আমরা পেলাম। নাম—সাধনা পাত্র। গীতা আমার সঙ্গে ছিল। এ জিলায় প্রথম যখন এসেছিলাম তখন রিলিফের কাজে প্রধানত ব্যস্ত থাকায় গ্রামের কৃষক মেয়েদের সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ তেমন পাইনি। এবার সেটা হলো। কয়েক দিন আমরা ঘরে ঘরে খুব ঘুরলাম। বৌদের সকাল থেকে রাত অবধি সময়টা কেমন করে যে কেটে যায় সেটাই দেখতাম। ওদের সঙ্গে কথা বলার ভাল সময় ছিল ঢেঁকি ঘরে, ওরা যখন কাজ করত তখন। হাত-পা ওদের মেশিনের মতন চলে। কথা শোনার জন্য কানটা সজাগ রাখতে ওদের তেমন অসুবিধা হতো না। কথা তো বেশি নয়। একটা মিটিং-এ বসে সকলের সঙ্গে গল্পগাছা করা যাবে—এই আর কি, তার জন্য নিমন্ত্রণ রইল।

মিটিংটা বসানো গেল একদিন। অনেক শাশুড়ী-বৌয়েরা এলো। দেখলাম বিধবার সংখ্যাই বেশী। পরে এর কারণ অনেকটা বুঝে গেলাম ওদের কথা থেকে। এসব গ্রামে কন্যাপণ চালু। বিবাহের পাত্রটির খেটেখুটে কন্যাপণ যোগাড় করতে বয়স বেড়ে যায়। ফলে, ২৫/৩০ বছরের বরকে বিয়ে করতে হতো ১০/১২ বছরের বালিকা পাত্রীকে। সংসারের মানুষটা গণ্ডা দুই সন্তানের বাপ হতেই বুড়িয়ে যেত। এতগুলি মুখে ভাত জোটাতে নিজে অনাহারে, অর্ধাহারে থেকে হাড়ভাঙ্গা খাটুনি খাটতে খাটতে এক সময় সে চোখ বুজত। এরপর ৩০/৩৫ বছরের বিধবার কাঁধে চাপত দিন-মজুরী করে সন্তানদের বাঁচানোর ভার। কন্যাপণে কন্যার সর্বনাশটা এভাবেই আসে। আবার বরপণেও হয় কন্যার সর্বনাশ। বরপণ যোগাড় করতে না পেরে সামান্য দু'একটা জিনিস দিয়ে জমিহীন, রুজিহীন একটি ছেলের সঙ্গে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে বাপ-মা একটি দুঃখের সংসার পেতে দিলেন। অথবা চুক্তি অনুযায়ী বরপণ না দিতে পারায় কত মেয়েকে 'স্নেহলতা' হতে হয় বা স্বামী-শাশুড়ীর হাতে খুন হতে হয়—সে কাহিনী তো আজ বেড়েই চলেছে।

মিটিং-এ বসে কোন্ দিক থেকে আলাপ শুরু করব তাই নিয়ে সমস্যা হতো। নিজেদের গ্রাম আর মেদিনীপুরের নাম জানার মধ্যেই ওদের জ্ঞানের পরিধি সীমাবদ্ধ। অতএব কার ক'টি ছেলেপুলে, কার কার সতীন আছে, কে কে স্বামীর হাতে মার খায়, কতজনের নিজেদের জমি আছে, আর কারা দিনমজুর—এই নিয়েই গল্পের শুরু হতো।

সতীনের কথায় হাসাহাসি শুরু হয়ে যেত। কিন্তু দু'চার জোড়া সতীন সব

মিটিং-এ হাজির থাকত। ওরা সব সুখে সহাবস্থান করে, না আর কিছু—সেকথাটা নিজে ধরতে না পারলে জানার কোন উপায় ছিল না।

মারধোরের কথা উঠলে দু'টি ভাগ দেখা যেত। বয়স্কারা মারের পক্ষে, অল্প বয়স্কারা এর বিপক্ষে। এটা বোধহয় মনস্তাত্ত্বিক ব্যাপার। আমি মার খেয়েছি আর তুই খাবি না? —ভাবখানা এইরকম। মারের বহরটা একজনের মুখে শোনা গেল। মহিলাটি বয়সকালে গর্ভবতী অবস্থায় স্বামী-দেবতার এমন একটি পদাঘাত খেলেন যে ঘরের দাওয়া থেকে উঠোনে ছিটকে পড়লেন। কয়েকদিন বাদে একটা মৃত সন্তানের জন্ম হলো। আশ্চর্য, গল্পটা মহিলাটি হাসতে হাসতে বলছিলেন এবং আরও আশ্চর্য অন্য বয়স্কাদের সঙ্গে মিলে ইনিও বলছিলেন—'মারের কথা বাদ দাও, 'যুব যুব' মেয়েরা মার না খেলে ঠিক থাকবে কেন? তুমি অন্য কথা বলো!' হায় ঈশ্বর, 'মেয়েরাই মেয়েদের শত্রু'—কথাটা এমনভাবে জানতে হলো! মনে হচ্ছিল ওদের হাতের থাপ্পড়টা বুঝি আমারই গালে লাগল। অল্পবয়সী বৌরা এদের ভয়ে মুখ খুলত না। আড়ালে বলত, 'মারবে কেন?'

একটি ব্যাপারে সব মেয়ে একমত। গ্রামের ঘরে ঘরে 'চোলাই' খাওয়া পুরুষদের নিত্যকার ব্যাপার। পেটে ভাত না পড়লেও চলে, কিন্তু 'চোলাই' তাদের চাই-ই চাই। কোন মেয়েই এটা পছন্দ করে না। ঐ সব খায় বলেই তো স্বামীরা মারে।'

আমরা তখন মুখ খুলবার সুযোগ পেতাম—আচ্ছা, দেশে যদি একটা আইন হয়, কেউ বউকে মারতে পারবে না তাহলে কেমন হয়? মেয়েরা হাসত। কিন্তু দুটো বিয়েও কেউ করতে পারবে না, এমন আইন হলে? এতে সবাই খুশি। খুব ভাল হবে তাহলে। আর যদি ছেলে-মেয়ে-বৌ, বয়স্ক-বয়স্কা সবাইকার জন্য স্কুল হয় লেখাপড়া শেখার জন্য? কথাটা কারো বিশ্বাস হতো না। ফাঁকা কথা মনে হতো। শহরে মেয়েরা কেমন লেখাপড়া শেখে, স্কুলে যায়। মেদিনীপুর শহরে, আরো কত শহরে এসব হচ্ছে। যখন বলতাম, 'আসুন না, এই গাঁয়ে মেয়েদের একটা স্কুল খুলে দিতে সরকারকে একটা চিঠি দি-ই।' তাও বিশ্বাস করত না। বলতাম, 'সবাই একজোট হলে কেন হবে না?' তারপর দরখাস্ত লেখা হতো। টিপ নেওয়া হতো মেয়েদের আঙুলের। সমিতির কথাটা তখনই উঠত। সমিতি না হলে এসব কে করবে? কেই বা সবাইকে খবর দেবে?

যা হোক, সাধনা পাত্র নেত্রী হলো। কিন্তু সে-ও টিপসইওয়ালা। রসিদ

বই দিয়ে পাঠানো হলো বাড়ি বাড়ি গিয়ে সভ্য করে আনতে। একছুটে সে বেরিয়ে গেল। আধ ঘণ্টার মধ্যে আবার ছুটতে ছুটতেই ফিরল। 'শীগগির নাম-ঠিকানা লিখে নাও, নয়তো ভুলে যাব। এই নাও পয়সা।' এমনি ছোটাছুটি করে সে রসিদ বইটি ভরিয়ে দিল। কৃষক মেয়েরা বলেছিল—'আমরা চোখ থাকতেও অন্ধ।' বিপদ হলো, তাদের নেত্রীটিও যে তাই।

যে করে হোক স্কুল বসাতেই হবে, গীতা আর আমি বলে গেলাম। কিন্তু একটা ছেলেকে ধরতেই হচ্ছে—যে ওদের অক্ষর পরিচয় করাতে পারবে, সামান্য লেখাপড়া শেখাতে পারবে। ওদের ঘরেরই কাউকে ধরতে হবে, যার কাছে যেতে ওরা লজ্জা পাবে না বা কোন আপত্তিও কেউ করবে না। কৃষক সমিতির ছেলেদের বলতাম, আপনাদের নিজেদের স্বার্থেই বয়স্ক-স্কুল বসানো উচিত। মজুর-চাষীরা কি গুণতে জানে? দিনের হিসাব মালিক একটা দড়িতে গেরো বেঁধে রেখে দেয়। মজুরকে একটি একটি করে গেরো গুণে হিসাব করতে হয়—তার কত পাওনা হলো। মালিক যদি একটা গেরো খুলে রেখে দেয় তবে সে ধরতেও পারে না—তাকে ফাঁকি দেওয়া হচ্ছে।

কিন্তু আমাদের এই পরামর্শ বিশেষ কাজে লাগত না। কে করে এসব? আমি শ্রমিক এলাকাতেও দেখেছি, সপ্তাহের মাইনেটা খামে করে নিয়ে এসে ইউনিয়ন অফিসে যেত গোণাতে। সেখানে হামেশা ধরা পড়ত ওদের পয়সা কম দেওয়া হয়েছে। তবু শ্রমিকদের লেখাপড়া শেখানোর চেষ্টা কখনও কখনও ইউনিয়ন করে থাকে। কিন্তু গ্রাম থাকে একেবারেই অন্ধকারে।

আজ নিশ্চয়ই গ্রামের অবস্থা এমন নেই। প্রাইমারী লেখাপড়া জানা মেয়ে-বৌ প্রায় সব গ্রামেই এখন দু'চারটি অন্তত পাওয়া যাবে বলে আশা করি। যাঁরা মেয়েদের নিয়ে সমিতি করেন তাঁরা এদের সাহায্য পেতে পারেন। তাঁরা হয়তো চোখ থাকতেও অন্ধ নারীকে নিয়ে আমাদের মতন আর অতটা বিপদে পড়ছেন না।

পাড়াগাঁয়ে আমরা এইসব মেয়েদের নিয়ে মিছিল করতাম। জমি ও মজুরীর দাবীতে কৃষক মেয়েদের মুখ খুলত বেশী। ওদের দুটো অস্তিত্ব—নারী হিসাবে একটা এবং কৃষক হিসাবে আর একটা।

একবার এরকম একটা মিছিলে গ্রামের মেয়েদের অন্য একটা দিক চোখে পড়ল। মিছিলে ন্যাড়া মাথায় সিঁদুর পরা ছোট্ট একটি মেয়ে। কপালেও সিঁদুরের মস্তবড় একটা গোল টিপ। আট-হাতি শাড়িখানা গাছকোমর বেঁধে পরা। একটুখানি ঘোমটা টানা। হাতে ছোট একটি নিশান। ওটি পার্টিরই।

কত আর বয়স হবে? বড় জোর বছর ছয়-সাত। কি বলব--বালিকাবধূ, না শিশুবধূ? ঘোমটার মধ্য দিয়ে শিশুকণ্ঠে শ্লোগান বেরুচ্ছে—'খেয়ে-পরে বাঁচতে চাই, শিশুদের দুধ চাই'—ইত্যাদি। চলতে চলতে হঠাৎ কে ওর ঘোমটাটা একগলা টেনে দিল। একটু পরেই মেয়েটি কাপড়ের পুঁটলির মতো পড়ে গেল। পেছন থেকে ধরে তুলে দিলাম। কি ব্যাপার? শুনলাম, আমরা ওর শ্বশুর বাড়ির গ্রামের পথে চলছি। এখানে মুখ দেখাতে নেই, খুলতেও নেই। পতাকাটা আর কেউ নিল। আমার হাত ধরে ও হাঁটতে লাগল। ঘোমটার ঠেলায় পিঠ তার খোলা। পিঠ খোলা চলতে পারে কিন্তু মুখ খোলা চলতে পারে না। মনে মনে ভাবি, মেয়েটির বরের বয়স কত? অবস্থা কেমন? আবার একটি দুস্থ পরিবারের শুরু নয় তো! আর ভাবছিলাম—গ্রামীণ মেয়েদের জীবনের এই অভিশাপ পারব কি আমরা মোচন করতে? পেরেছিলাম বইকি! স্বাধীন সরকার বিল এনেছিলেন। তার সমর্থনে আমরা সারা ভারতের সমস্ত নারী সংগঠনের সঙ্গে একযোগে মিলিত হয়ে আন্দোলন করেছিলাম। হিন্দু কোড বিল পাস হয়েছিল। সে অনেক পরের কথা, পরে বলব। কিন্তু আইনের পাতায় চোদ্দ বছরের কন্যাই বিবাহযোগ্যা, একথা লেখা থাকলেই কি আজও তা সবাই মানছে? মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার না হওয়া পর্যন্ত কি মেয়েরা মুখ খুলতে সাহস পাবে?

* * * *

এবারে মেদিনীপুরের তমলুকে জিলা সম্মেলন হবে। অন্তত একটি করে প্রাইমারী কমিটি স্থাপন করার জন্য আমরা তমলুক, গড়বেতা ছাড়াও জিলার কেশপুর, দাসপুর, শালবনী, ঘাটাল প্রভৃতি আরও কয়েকটি মহকুমা ঘুরলাম। গীতা মুখার্জী, উষা চক্রবর্তী, সাধনা পাত্র, আমি আর সেই 'বাতাসী'—এই ক'জন মিলে সমিতি বিস্তারের চেষ্টা করলাম।

তমলুকের সম্মেলনে সব থেকে বড় সাহায্য পেয়েছিলাম সেখানকার মেয়েদের হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষয়িত্রী সুচরিতা দাস ও অন্যান্য শিক্ষিকাদের কাছ থেকে। সুচরিতা বরিশালের মেয়ে। কবি জীবনানন্দের সহোদরা। আমারও যথেষ্ট পরিচিত। আর আমার বোন বীণা সেনও ছিল ওখানকার শিক্ষিকা এবং সুচরিতাদের সঙ্গে একই বোর্ডিং-এ থাকত। সে আগে থেকেই সম্মেলনের জন্য স্থানীয় মেয়েদের নিয়ে কাজ করছিল। আমি বাতাসীকে নিয়ে ওদের কাছেই উঠলাম। সে এখন বেশ বড় হয়েছে। এখন বিমলা বলে ডাকি। গ্রামের বিমলাকে এবার শহরের মধ্যবিত্তদের মধ্যে কাজ করতে হবে। তাই ওকে

এখানে আনা। আমার শাড়ি ওকে শহুরে মেয়েদের মতো করে পরিয়ে দিতাম। বীণার সঙ্গে সে বেরুতো। ওদের কথাবার্তা শুনে অল্প দিনেই ওর ভয় ভাঙল। তারপর অন্য মেয়েদের নিয়ে নিজেই সে সম্মেলনের প্রচার ও চাঁদা তোলার কাজে নামল। বোর্ডিং-এ সকলের সঙ্গে টেবিলে বসে খাওয়া, চালচলন কোনটাতেই তার আটকাচ্ছে না। দেখে খুব আনন্দ হলো। এই তো সেই বিমলা, যে লিখতে জানত না। সমিতির রিপোর্ট ছেলেদের দিয়ে লিখিয়ে কলকাতায় পাঠাত। একবার রাগ করে ওকে লিখলাম—'নিজে লিখতে শেখো। নিজে লিখে রিপোর্ট পাঠাও—তবে পড়ব।' কয়েক মাস পরে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা আমার কাছে একটি চিঠি ও রিপোর্ট এলো। আমাদের সকলের সে কী আনন্দ! তখনকার পার্টি-কাগজে ঐ চিঠি ও রিপোর্টটি সুমন্তব্য সহ প্রকাশ করা হলো—যাতে ওর অধ্যবসায় দেখে সকলে উৎসাহিত হয়।

সুচরিতা দাসের সাহস দেখে আমার অবাক লাগল। কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নিজেদের বোর্ডিং এ কমিউনিস্ট মেয়েদের স্থান দিতে সাহস করে—এটাই আশ্চর্য। এরকম ঘটনা আগে দেখিনি বা শুনিনি শুধু তাই নয়, বোর্ডিং-এর উঠোন আর বারান্দা মিলিয়ে প্রতিবেশী মহিলাদের নিয়ে একটা মিটিং পর্যন্ত হলো। সুচরিতা নিজে এবং অন্যান্য শিক্ষিকারা সবাই পাড়ার মেয়েদের মধ্যে খুবই জনপ্রিয়। বিশেষ করে সুচরিতা। মফঃস্বল স্কুলগুলিতে এটা দেখা যায়। কিন্তু দেখা যায় না প্রধান শিক্ষিকার এতটা সাহস।

যতদূর মনে পড়ে, বিশ্বনাথ মুখার্জীর পিতা ছিলেন স্কুলের প্রেসিডেণ্ট। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করে সম্মেলনে আশীর্বাদ জানাবার জন্য তাঁকে উপস্থিত হতে অনুরোধ জানাই। রাজনীতিতে উনি কি ছিলেন বা কোন পক্ষে ছিলেন তা আমার জানা ছিল না। তবে তাঁর পুত্র আর পুত্রবধূ কমিউনিস্ট, শুধু শ্রীঅজয় মুখার্জী ছাড়া পরিবারস্থ সকলেই ছিলেন পার্টির প্রতি অনুরক্ত।

সম্মেলনটি বেশ বড় আকারে হলো। জিলার প্রায় সব মহকুমা থেকেই এলো প্রতিনিধিরা। মেদিনীপুর শহর থেকেও এলো প্রতিমা ব্যানার্জি। সে কলেজের ছাত্রী কিন্তু ওখানে মহিলা সমিতি করছে। ওর সঙ্গে সমিতির আরও কিছু প্রতিনিধি সম্মেলনে উপস্থিত হলো। নির্মলা সান্যালও এলেন। তিনি সুবক্তা, কংগ্রেসের কাজ করেছেন আজীবন। এখন এই জিলায় আমাদের সঙ্গে আছেন। বেশির ভাগ সময় থাকেন গ্রামের কৃষক মেয়েদের মধ্যেই।

টাউন হলের সম্মেলনকে আশীর্বাদ জানাতে এলেন শহরের গণ্যমান্যরা। সুচরিতা দাস অভ্যর্থনা সমিতির প্রধান হিসাবে সকলকে সাদর অভিনন্দন

জানালেন। সমিতি আরও বড় হোক, নারীসমাজের সেবায় আত্মনিয়োগ করুক, নারীশিক্ষার বিস্তার হোক—এসব কামনা তাঁর বক্তৃতায় ব্যক্ত হলো। আরও অনেক মহিলা-প্রতিনিধি তাঁদের বক্তব্য বললেন, আজ আর সকলের নাম আমার মনে নেই।

তমলুকেই স্থাপিত হলো জিলা কমিটি। কারণ, সমিতির প্রধান সংগঠনগুলি তমলুকেই গড়ে উঠেছে, মেদিনীপুর শহরে নয়। সুচরিতাও চাইছিলেন এটা। জিলা কমিটিতেও তিনি থাকলেন। নানা আন্দোলনের অংশীদার তমলুকের মানুষ যে জিলার মধ্যে সর্বাপেক্ষা রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন, একথা বলা চলে। যে-তমলুক 'ভারত-ছাড়ো' আন্দোলনে জিলার নেতৃত্ব দিয়েছিল, সেই তমলুকেই আবার পটপরিবর্তন ঘটল। অধিকাংশ কৃষক-নারী ও মধ্যবিত্তের একাংশ নিয়ে নতুন ধারায় নারী-আন্দোলনের সূচনা হলো সেইখানে।

* * * *

দ্বিতীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের আগে অনেক জিলাতেই জিলা সম্মেলন হলো। ঢাকার নারায়ণগঞ্জে মহকুমা সম্মেলনে গেলাম এবার। কথা মতো স্টীমার ঘাটে কেউ এলো না। প্রফুল্ল চৌধুরী মহাশয়ের নামটা জানা ছিল। রিকৃশাওয়ালাকে বলতেই চিনল এবং সেখানে পৌছে দিল। এবার আর পথের পাশে মণিকুন্তলাব 'কুন্তল কাটা যাবে' 'নাক কাটা যাবে'—এসব অভ্যর্থনাবাণী ছিল না। তাই নির্ভয়ে পৌছে গেলাম। নেপাল নাগ বললেন, 'এখন আর চ্যাংড়াগুলান্ ফাইজ্লামি করার সাহস পায় না।'

আমাদের জীবনের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানভিত্তিক নানা দাবীর পোস্টারে ছোট শহরটিকে সাজিয়ে তোলা হয়েছে। নিবেদিতা নাগ সম্মেলনের নেত্রী, উদ্যোক্তা, বক্তা—সবই। নারায়ণগঞ্জের বিভিন্ন জায়গা থেকে এসেছেন প্রতিনিধিরা। ছোট শহরটির উপর সম্মেলনের একটা প্রভাব দেখা গেল।

কিছুদিন পরেই ঢাকাতে হলো জিলা সম্মেলন। ঢাকার চেহারাই বদলে গেছে। 'চ্যাংড়াগুলান্রে' দেখা গেল না। নিবেদিতা এবং ওর সঙ্গীরা শহরটি চষে বেড়িয়েছে। আমি ভাবতেই পারিনি এত মহিলা সমাগম হবে সম্মেলনে। সত্যি সত্যি হলটি ভরে গেল। দুর্ভিক্ষের গ্লানিময় জীবনের ছাপ রাস্তায়-বসা গ্রামের মেয়েদের উপরেই পড়ে বেশী। কলকাতার সেই দৃশ্যটাই ঢাকা, বরিশাল প্রভৃতি বড় শহরগুলিতে কিছুটা ছোট আকারে দেখা গিয়েছিল। তাই সমিতির সম্মেলনে যেমন উচ্চারিত হয়েছিল কংগ্রেস নেতাদের

মুক্তির দাবী, তেমনি উচ্চারিত হয়েছিল মেয়েদের জন্য খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের দাবী। অধ্যাপিকা নিবেদিতার সাহস ও পরিশ্রমের ফসল সম্মেলনে বেশ ভালভাবেই চোখে পড়ল। এরপর থেকে নিবেদিতা শুধু জিলা নেত্রী নয়—প্রাদেশিক নেত্রীও বটে।

হুগলীর চন্দননগরে, হাওড়ার শালকিয়ায়, বর্ধমান, যশোর, খুলনা, মালদা, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া, বীরভূম এবং অন্যান্য জিলাতেও জিলা সম্মেলন হলো। কলকাতাও বাদ পড়ল না। কিন্তু ২৪-পরগণায় জিলা সম্মেলন আমরা কখনও করতে পারিনি—যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য। তবু বহু এলাকায় বড় বড় সম্মেলন হলো। এইসব কাজে সহায়তা করার জন্য আমাদের একটি টিম ছিল। তাতে কলকাতার বেলা লাহিড়ী, পঙ্কজ আচার্য, শান্তি সরকার, প্রীতি লাহিড়ী, বাণী দাশগুপ্তা, মায়া লাহিড়ী, মাধুরী দাশগুপ্ত, রেণু চক্রবর্তী, কমলা মুখার্জী, কনক মুখার্জী, গীতা মুখার্জী প্রভৃতি ছিলেন। এদের সঙ্গে আমিও ছিলাম। এদের কেউ কেউ জীবিকার্জনে ব্যস্ত থাকতেন। সকলের পক্ষে কলকাতার বাইরে যাওয়া সব সময় সম্ভব হতো না। কিন্তু প্রত্যেকেই ছুটি পেলে বাইরে যেতেন—সমিতির সাংগঠনিক ও আন্দোলনমূলক কাজে। আমাকে প্রাদেশিক কমিটিতে সাংগঠনিক সম্পাদিকা করা হয়েছিল, কারণ বাইরে যেতে আমার অসুবিধা ছিল না। এই টিমের সঙ্গে বরিশালের যুঁইফুল বসু (রায়), ঢাকার নিবেদিতা নাগ ও হুগলীর সন্ধ্যা চ্যাটার্জিও ক্রমশ যুক্ত হয়েছিলেন। এত কর্মী থাকার ফলে বছর খানেকের মধ্যে যুক্ত বাঙলার সমস্ত জিলায় সংগঠন গড়ে উঠল। চট্টগ্রামে আমাদের যাওয়ার দরকার হতো না। কারণ ওখানে কল্পনা দত্ত ও জ্যোতি দেবীই প্রধানত জিলার 'নারী সমিতি' গঠন করেন ও পরিচালনা করেন। সমিতির আরও অনেক সক্রিয় কর্মী তৈরি হয়েছিলেন। সম্ভবত আগেই উল্লেখ করা হয়েছে—চট্টগ্রাম, বরিশাল ও মেদিনীপুর এই তিনটি জিলাতেই কমিউনিস্ট মহিলা-কর্মীদের নেত্রীত্বে মহিলা সমিতির ব্যাপ্তি ছিল সর্বাধিক। তিনটি জিলাই দুর্ভিক্ষে প্রচণ্ড ধাক্কা খায়। চট্টগ্রাম জিলা ব্রিটিশদের যুদ্ধের অন্যতম ঘাঁটি হওয়ায় আরও বেশি পর্যুদস্ত হয়। তাই এ জিলার 'নারী সমিতি'কে নারী ও শিশুদের বাঁচানোর এবং বিশেষভাবে মেয়েদের ইজ্জত বাঁচানোর জন্য কঠিন সংগ্রাম করতে হয়েছে। ফলও তাঁরা পেয়েছেন। নারী ও শিশুদের আশ্রয়কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র প্রভৃতি খুলে তার জন্য সরকারী সাহায্য আদায় করে তারা গঠনমূলক কাজের আদর্শস্থানীয় নেত্রী হয়ে উঠেছিলেন। এই তিনটি জিলাতেই মহিলা সমিতি প্রসারিত হয়েছিল গ্রামে—কৃষক মেয়েদের মধ্যে।

বরিশাল ও চট্টগ্রামের সমিতিতে স্বভাবতই মুসলমান মেয়েদের সংখ্যা ছিল উল্লেখযোগ্য।

*   *   *   *

বছর খানেক ধরে চেষ্টার ফলে আত্মরক্ষা সমিতির দ্বিতীয় সম্মেলন বরিশালে অনুষ্ঠিত হবার উপযুক্ত অবস্থায় পৌছায়। সারা বাঙলার প্রায় সব জিলায় সংগঠন গড়ে উঠেছে। অধিকাংশ জিলাগুলিতে সম্মেলন করে বরিশাল সম্মেলনে অংশ গ্রহণের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়েছেন। সদস্য সংখ্যা তখন ৮০ কিংবা ৫০ হাজার হবে, ঠিক মনে নেই সংখ্যাটা। এতটা ব্যাপক গণভিত্তি বাঙলাদেশে আর কোন মহিলা সমিতির ছিল না। কংগ্রেস থেকেও মহিলা সমিতি গড়া হয়েছিল। কিন্তু তা এভাবে সংগঠিত রূপ নেয়নি।

বরিশালের সদস্যা সংখ্যাও তখন প্রায় বিশ হাজার। সব মহকুমাতেই সমিতির শাখা হয়েছে।

আমি যখন বরিশালে গেলাম তখন মনোরমা মাসীমা, যুঁইফুল, কিরণ দাস, সরযু সেন, অমিয়ানিভা সেন—এইসব বয়স্কারা সবাই গ্রামে গ্রামে ঘুরছেন। আর সেই ছাত্রীদল এখন কলেজে পড়ছে ও সমিতির কাজ করছে। সেই সুহাসিনী, অমিয়া, বীণা দাস, শোভা সেন, বিভা দাশগুপ্ত, রেণু বসু, যুঁইফুলের বোন মিনু—এরা শহরময় ঘুরছে ও প্রয়োজনে গ্রামে যাচ্ছে। এরা ছাড়াও আরও অনেক নতুন কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবিকা দলে এসে প্যারেড শিখেছ এবং সম্মেলন পরিচালনায় নিজ নিজ কাজের ভার বুঝে নিচ্ছে।

শহরে এক জমিদারের একটি বিরাট বাড়ি খালি ছিল। মাঠ আর বড় একটি ঘাট-বাঁধানো পুকুরসহ ঐ বাড়িটি পাওয়া গেল প্রতিনিধিদের থাকার জন্য। মস্তবড় রান্নাবাড়ি, অনেকগুলো শোয়ার ঘর ও প্রতিনিধি অধিবেশনের জন্য একটি বড় হলঘর ছিল বাড়িতে। সুতরাং তিনশোর বেশি প্রতিনিধিদের ওখানে একসঙ্গে থাকায় কোন অসুবিধা হয়নি। বরং সকলের সঙ্গে চেনা-পরিচয়ের সুযোগ পাওয়া গেল অনেক বেশী।

এখন আমরা চাইছি শহরের গণ্যমান্যদের সমর্থন ও উপস্থিতি। ওখানকার কংগ্রেস-নেতৃত্ব আর মিউনিসিপ্যাল কমিটি একই লোকজনের পৃথক সত্তা মাত্র। ওদের কাছে যাওয়া হলো। শহরে এতবড় একটা জিনিস ঘটতে যাচ্ছে, বাইরে থেকে অনেক সম্মানিতা মহিলারা আসছেন, তাঁদের অভ্যর্থনার ভার শহরের নেতৃবৃন্দের হাতেই আমরা তুলে দিতে চাই। এ কথাই বলা হলো চেয়ারম্যান শ্রীপ্যারীচরণ রায় মহাশয়কে। অভ্যর্থনা কমিটিতেও তাঁকে আমরা চাই। ইনি

ছিলেন অত্যন্ত গোঁড়া কংগ্রেস নেতা। ভদ্রলোক ওকালতি করেন। উকিলের মতোই তর্ক জুড়লেন : 'এটা কমিউনিস্টদের ব্যাপার, আমি কেন থাকব ?' তাঁকে অনেক করে বোঝাতে চাইলাম—আমাদের নীতি দলমতের উর্ধ্বে। বললাম—জনসেবা, নারী ও শিশুকল্যাণের কাজে তাঁকেও আমরা চাই। কিছুতেই তিনি রাজী হন না, আমরাও ছাড়ছি না। বললাম, 'বেশ তো আপনারা এই ভার যদি না নেন তবে আমরা যে কোন মাঠে তাঁবু খাটিয়ে অতিথিদের তুলব। কিন্তু আসছেন কারা জানেন ? কংগ্রেসের শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা দেবী, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের ভাতুস্পুত্রী ও তার শ্বশ্রূমাতা, ইউ. পি-র রামপুর স্টেটের নবাব-কন্যা শ্রীমতী হাজরা বেগম। কোথায় এঁদের তোলা হবে আর কি খেতে দেওয়া হবে, শহর-প্রধান হিসাবে সে দায়িত্বের কথা আপনাকে ভাবতে তো হবে। আপনাদের অসহযোগিতায় যদি কোন বিভ্রাট ঘটে ও তাঁদের অসম্মান হয় তাহলে আপনার সম্মানে সেটা লাগবে না কি ?' ভদ্রলোক আর কথা বাড়ালেন না। বললেন, 'আচ্ছা আমি ভেবে দেখব।'

শেষ পর্যন্ত মিউনিসিপ্যালিটির সমস্তরকম সাহায্যই পাওয়া গেল। চেয়ারম্যান প্রতিদিন এসে ক্যাম্পে কি প্রয়োজন তা জেনে যেতেন এবং একদিন নিজে অতিথিদের প্রচুর মাছ খাওয়ালেন। আর একজন খাওয়ালেন পায়েস। সংগৃহীত অর্থ এবং চাল-ডালের বেশ বড় গোছের একটি ভাঁড়ার গড়ে ওঠায় আমাদের কোন অসুবিধায় পড়তে হয়নি। সম্ভবত মফঃস্বল শহর বলেই সকলের কাছে এত সাহায্য ও খাতির আমরা পেয়েছিলাম। ডেলিগেটদের থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থার ভার নিলেন স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে বেলা, পঙ্কজ ও কমলা। বর্ধমানের মেয়েরা এখানেও এলো। পর্দা ভাঙার লড়াইতে ওরা জিতে গেছে।

অভ্যর্থনা সমিতির সভানেত্রী হিসেবে আমরা স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাসকে চাইলাম। আমি তাঁর পুরানো ছাত্রী এবং ওঁর কাছে খুবই যাই। মনোরমা মাসীমার প্রতিষ্ঠানে উনি আছেন। কিন্তু সম্মেলনের ব্যাপারে নিজেকে জড়াতে তাঁর খুব আপত্তি। 'তোমরা কমিউনিস্ট', তিনি বললেন, 'তোমাদের সঙ্গে আমি নেই।' ফলে ওঁর সঙ্গে আমাদের প্রচারপুস্তিকা, হ্যাণ্ডবিল, কাজের রিপোর্ট নিয়ে বসলাম। বললাম, 'আমরা কমিউনিস্ট হতে পারি, কিন্তু এসব কাজের কোনটা কোনটা আপনার আপত্তিকর মনে হয় ?' অনেক আলোচনার পর তিনি রাজী হলেন। কমিটি তৈরি হলো শিক্ষিকা ও শহরের অন্যান্য বিশিষ্ট মহিলাদের নিয়ে। আমরাও কয়েকজন থাকলাম। রিপোর্ট উনি নিজেই তৈরি করলেন।

বাইরে থেকে আসা অতিথিদের মধ্যে হেমপ্রভা দেবী, সুধা রায় এবং রেণু চক্রবর্তীর শ্বশ্রুমাতা আমাদের বাড়িতে উঠলেন। হাজরা বেগমকে আমরা চাইলাম কোন মুসলমান বাড়িতে অতিথি হিসাবে রাখতে। জনাব ইস্‌মাইল চৌধুরী শহরের খ্যাতনামা ব্যক্তি, জমিদারও বটে। আমার বাবার সঙ্গে ওঁর বন্ধুত্ব ছিল। সেই সুবাদে তাঁর কাছে গেলাম। প্রথমে কমিউনিস্ট বলে কিছু আপত্তি করলেন, পরে রামপুর নবাব-পরিবারের কন্যা জেনে আর আপত্তি করলেন না।

কলকাতা থেকে পশ্চিমবঙ্গের সব জিলার প্রতিনিধিরা একসঙ্গে এলেন। যশোর-খুলনা থেকেও মহিলারা এলেন এদের সঙ্গে। আমরা বরিশাল জিলার প্রতিনিধিরা, প্রায় দু'তিনশো মেয়ে, সুসজ্জিত মিছিল নিয়ে স্টীমার ঘাটে সকাল বেলা অতিথিদের অভ্যর্থনা করতে গেলাম। ফেরার সময় বড় রাস্তাগুলো ঘুরে শ'চারেক মেয়ের মিছিল এগিয়ে চললো। রাস্তার দু'পাশে দর্শকদের ভিড়। এমন দৃশ্য এ শহরে নতুন। আমাদের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী, যুদ্ধ-বিরোধী শ্লোগান, বন্দীমুক্তি আর নারী ও শিশুর মানপ্রাণ রক্ষার দাবীতে শ্লোগান শুনে সবাই অনেকটা বুঝতে পারলেন সম্মেলনে আমরা কি করতে যাচ্ছি। বরিশাল রাজনৈতিক চেতনায় অগ্রণী জিলা—একথা বলা যায়। তাই কোন প্রতিকূল ব্যবহার আমরা পাই নি।

অশ্বিনীকুমার টাউন হলটি সাজানো হলো। হলের উপরের বারান্দায়, নীচের হল ঘরে এবং তারও চারপাশের বারান্দায় মেয়েদের ভিড় উপচে পড়ছে, সামাল দেওয়াই মুশকিল। স্বেচ্ছাসেবিকারা প্রাণপণ চেষ্টা করছে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে। যেসব আমন্ত্রিত ভদ্রলোকদের আমরা হলে বসিয়েছিলাম তাঁরা উঠে গিয়ে রাস্তায় দাঁড়াতে বাধ্য হলেন। কলেজের কিছু অধ্যাপক ও মিউনিসি-প্যালিটির সদস্যরা ছিলেন এঁদের মধ্যে।

সভানেত্রী হলেন জিলার বর্ষীয়সী একজন কংগ্রেসী মহিলা। আমাদের বিদায়ী সভানেত্রী ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর প্রেরিত শুভেচ্ছা বাণী পড়ে শোনানো হলো। এ আই. ডব্লিউ. সি-র কয়েকজন সদস্যার প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণীও পড়া হলো। সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলের হাজরা বেগম। শ্রীযুক্তা স্নেহলতা দাস অভ্যর্থনা জানালেন প্রতিনিধি, অভ্যাগতা ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে। প্রধান অতিথির ভাষণের পর বক্তৃতা করলেন হেমপ্রভা দেবী ও সুধা রায়। আমাদের সাধারণ সম্পাদিকা এলা রীডের রিপোর্ট পড়া হলো। তিনি আসতে পারেন নি। এরপর বিভিন্ন প্রস্তাবের উপর স্থানীয় প্রতিনিধিরা তাঁদের বক্তব্য বললেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন মনোরমা বসু, যুঁইফুল বসু এবং

আরো অনেক নেতৃস্থানীয়া মহিলাকর্মী।

আগামী বছরের কার্যকরী কমিটির সদস্যাদের নাম ঘোষণা করা হলো। প্রখ্যাত কংগ্রেসনেত্রী নেলী সেনগুপ্তা আগামী বছরের জন্য সভানেত্রী নির্বাচিতা হলেন। তিনি উপস্থিত ছিলেন না কিন্তু তাঁর সম্মতিপত্র পাঠিয়েছিলেন। সম্পাদিকা থাকলেন এলা রীড।

হলের বাইরে মাইকের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। সামনের উঠোন ও বড় রাস্তা ছিল লোকে ঠাসা।

সম্মেলনের পর আগামী বৎসরের কর্মসূচী আলোচনার জন্য আমাদের বাড়ির ভেতরের উঠোনে প্রায় শ'দুই-তিন কর্মীর একটা মিটিং হলো। এবার আমাদের সংগঠনে শ্রমিক মেয়েদের যুক্ত করতে হবে, কৃষক মেয়েদের মধ্যে আরও সংগঠন বাড়াতে হবে। আশ্রয়কেন্দ্র, কর্মকেন্দ্র, শিক্ষাকেন্দ্র (বিশেষত বয়স্কা) ও দুগ্ধকেন্দ্র খোলা প্রভৃতি আরও গঠনমূলক কাজ করতে হবে। এখন থেকে শ্রমিক ও কৃষক মেয়েদের বিশেষ বিশেষ দাবীর সমর্থনে আত্মরক্ষা সমিতি প্রচার করবে ও আন্দোলনে সহায়তা করবে—এটাও স্থির হলো।

এইসব কর্মীদের সেদিন আমার ছোট ভাই তার রেস্টুরেণ্ট থেকে চা, সিঙ্গাড়া ও মিষ্টি খাইয়েছিল—তাও আমার মনে পড়ে। পরিবেশন করেছিল আমার ভ্রাতৃবধূরা। যাঁরা আমাদের বাড়িতে অতিথি ছিলেন তাঁদের সেবা-যত্নের ভার ছিল আমার ছোড়দি ও এই তিন বৌ-এর উপর। মফঃস্বল শহরে এমন একটি সুন্দর সম্মেলন, প্রতিনিধিদের থাকার ক্যাম্প হিসাবে সেই মস্তবড় বাড়ি, বরিশালের নদী, স্টীমার ঘাট ইত্যাদি সব কিছুই প্রতিনিধিদের খুব আকৃষ্ট করেছিল। আমাদের বাড়িতে যাঁরা ছিলেন তাঁরা ফিরে এসেও সেই বাড়ির আত্মীয়তা ভুলতে পারেন নি। দেখা হলেই আমাকে বলতেন এসব কথা। জিলাগুলো ঘুরে ঘুরে যাদের আমি সঙ্গে পেয়েছিলাম তারা প্রায় সবাই এসেছিল, আর কলকাতার কর্মীরা তো ছিলেনই।

সম্মেলনের শেষপর্বের একটি অনুষ্ঠানের কথা বলতে এখনও বাকী। একটি ছোট নাটিকা ওখানকার একজন কেউ লিখে দিয়েছিলেন। মেয়েরা সেটি অভিনয় করবে। কিন্তু স্নেহলতা দাসের অনুমতি ছাড়া তো তা করা যাবে না। উনি শুনেই আঁতকে উঠলেন: 'ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে নাটক করবে টাউন হলে? সকলের সামনে? কি বলছ তুমি? এ কখনও হতে পারে না।' ওঁর প্রথম ভুলটা শুধরে দিলাম। ছেলেরা না, শুধু মেয়েরাই করবে। দর্শক থাকবে শুধু মেয়েরা—ছেলেরা নয়। নাটকের গল্পটাও বললাম—একটি গরীব

ঘরের বালবিধবার দুঃখের কাহিনী। সব শুনে চুপ করে রইলেন। পরে বললেন, 'আচ্ছা, তুমি যখন বলছ খারাপ হবে না, তখন করো।'

এরপরে আমাদের অনুরোধে নিজেও গেলেন। সারাক্ষণ বসে বসে চোখ মুছলেন। বেরিয়ে এসে ওদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। বললেন, 'ওরা এত সব পারে জানতাম না তো!' ব্রাহ্মসমাজের আচার্য, জীবনে বোধহয় এই একটি নাটকই উনি দেখলেন। আমাদের প্রতি স্নেহের টানে এবং আমাদের কাজকর্মের প্রতি সপ্রশংস আকর্ষণে আমাদের সঙ্গে উনি এক সারিতে এসে দাঁড়ালেন, একথা যখনই ভাবি তখনই মনে মনে ওঁকে শ্রদ্ধা জানাই।

*   *   *   *

বরিশাল থেকে ফিরে এসে আবার জিলা ঘুরতে বেরুলাম। এবার ডাক এলো সিলেট জিলার করিমগঞ্জ থেকে, যাব জ্যোতি বসুর সঙ্গে। ওখানে একটা জনসভা হবে। জ্যোতিবাবু প্রধান বক্তা, আমাকেও বলতে হবে।

একটি মধ্যবিত্ত পরিবারে উঠলাম। তাদের সম্পর্কে বেশী কিছু মনে নেই, শুধু গৃহিণীর খাবার পরিবেশনটি ছাড়া। আমাদের দু'জনকে পাশাপাশি খেতে বসানো হতো। ভদ্রমহিলা ভাতের থালাটি প্রায় আধসের চালের ভাতে পূর্ণ করে আনতেন। চেপে চেপে ভাতের উপরিভাগটি চূড়ার মতো উঁচু। থালা ঘিরে নানারকম রান্নার বাটি সাজানো। আমরা সভয়ে বলতাম, 'ভাত কমিয়ে দিন।' মধ্যবয়স্কা মহিলাটি মাথা নেড়ে বলতেন, 'এই ক'টি ভাত দিয়েছি, তুলব কি? ধীরে ধীরে খান।' গ্রামীণ পরিবারের এই রীতি আমার জানা। অতিথির যদি আর একটু ভাত চেয়ে খেতে হয় তবে গৃহস্থের অকল্যাণ, গৃহিণীর লজ্জা। ভাত পাতে পড়ে থাকলে ফেলা যাবে না। ঘরের ছেলেপুলেদের, এমন কি গৃহিণীদেরও ঐ ভাত খেতে আপত্তি হবে না। জ্যোতিবাবুকে আমি আস্তে করে বললাম সেকথা। কিন্তু উনি পাতে ফেলে রেখে উঠতে পারছিলেন না। অথচ অত তো খাওয়া যায় না, ফেলতেই হলো কিছু। রাত্রেও ঐ ব্যাপার। পরদিন জ্যোতিবাবু সারা সকাল লেবুর জল খেয়ে কাটালেন। এখনকার গ্রামের সম্পন্ন গৃহস্থঘরে এসব রীতিনীতি চালু আছে কিনা জানি না।

যাহোক, জনসভার পর জ্যোতিবাবু চলে গেলেন। আমাকে সিলেটের পাঁচটা মহকুমায় ঘুরতে হবে জনসভা ও মহিলা-সভার জন্য। করিমগঞ্জে মহিলা-সভার জন্য স্থানীয় দু'একটি মেয়ে পেলাম। ওদের কাছে শুনলাম—ওখানকার স্কুলের হেডমিস্ট্রেস্ আমাকে চেনেন। গেলাম সেখানে এবং দেখলাম আমার পূর্বপরিচিত ননীবালা সেনই হেডমিস্ট্রেস। কলকাতায় ইউনিভার্সিটি বোর্ডিং-এ

একসঙ্গে থেকেছি। এখন বিবাহিতা। ভদ্রলোকটিও শিক্ষক। কতকাল পরে দেখা, খুব ভাল লাগল।

মহিলা-সভা ওর বাড়ির উঠোনে হলো। অনেককে আসবার জন্য নিজেই খবর দিল। অল্প সময়ের মধ্যে ডাকা মহিলা-সভায় উপস্থিতি খারাপ ছিল না। ননী সভানেত্রী হতে আপত্তি করল না। সিলেট জিলায় আর আমার যাওয়া হয়নি। জানি না সমিতিগুলির শেষপর্যন্ত কি অবস্থা ঘটেছিল।

সুনামগঞ্জেও একই ব্যাপার। আমাকে ওঠানো হলো স্কুলের প্রধান শিক্ষিকার বাড়ি। ইনিও আমার পূর্বপরিচিতা সুনীলাদি। আমি আসব শুনে নিজেই তাঁর বাড়িতে নিয়ে যেতে বলেছিলেন। এঁর স্বামী ওখানে কি করতেন মনে নেই। সুনীলাদি কলকাতা থাকতেই জানতেন আমি কমিউনিস্ট। নিজে কিছুটা কংগ্রেসের দিকে ছিলেন। ওঁর স্বামীরও কোন অস্বস্তি দেখলাম না। বেশ ভালই লাগল ওখানে। এখানকার মহিলা সমিতিরও সভানেত্রী হলেন সুনীলাদি। জনসভাও হলো।

তারপর তুফানগঞ্জে গেলাম কিন্তু সেখানে এরকম পরিচিত কেউ ছিল না। কাদের সাহায্যে সমিতি হলো তাও ঠিক মনে নেই।

জনসভার প্রারম্ভে একটি ছোট ছেলে আমার হাতে একটুকরো কাগজ গুঁজে দিল; বললো—মা'র চিঠি। আপনাকে যেতে বলেছেন সভার পরে। সভা শেষ হতে বেশ রাত হলো। ছেলেটির সঙ্গে ওদের বাড়ি গেলাম। সঙ্গে অন্য ছেলেরাও ছিল, আমাকে আবার নিয়ে আসার জন্য। ঠিক গ্রামপথ নয়। রাস্তা সংক্ষেপের জন্য একটা জঙ্গল মতন জায়গার সরুপথে যাচ্ছিলাম বলে মনে হলো। সঙ্গের লণ্ঠনটি ছাড়া সব অন্ধকার। অনেকটা পথ পেরিয়ে ওদের বাড়ি পৌঁছলাম। ঘরের মধ্যে আধা-অন্ধকারে দেখলাম একটি ভদ্রলোক বিছানায় শুয়ে, আর একটি মেয়ে মাথায় কাপড় দিয়ে পাশে দাঁড়ানো। ছোট ঘরটির ভেতর একপলকেই জীর্ণ দশা চোখে পড়ে। রোগীর বস্ত্র-বিছানা এবং মেয়েটির শাড়িও মলিন। ও এসে আমাকে প্রণাম করে বললো, 'চিনতে পারছেন না? আমি আপনার ছাত্রী, মেট্রোপলিটানে ক্লাশ এইট পর্যন্ত পড়েছি আপনার কাছে।' রুগ্ন স্বামীকে দেখিয়ে বললো, 'এঁকে ফেলে মিটিং-এ যেতে পারিনি, তাই ডেকে আনলাম। বড় দেখতে ইচ্ছা হচ্ছিল আপনাকে।' আমার মুখে কথা আসছে না। কি জিজ্ঞেস করি? অবস্থা তো দেখতেই পাচ্ছি। রোগীর রোগ কঠিন। আমার একটি ভাল ছাত্রীকে এতদূরে এইখানে এসে এইভাবে দেখতে হলো? ওর জন্য আমি কি করতে পারি? ওরা অবশ্য কিছু আশাও করেননি।

ভদ্রলোকটি হাত তুলে নমস্কার করে বললেন, 'আপনার কথা ওর কাছে বিয়ের পর থেকেই শুনছি।'

পার্টির ছেলেদের অনুরোধ জানালাম—পরিবারটির একটু খোঁজ-খবর নিতে। মেয়েটিকেও বলে এলাম—যখনই দরকার হবে এদের কাছে যেন ছেলেকে পাঠায়। ফিরে এলাম, কিন্তু খুব অস্বস্তি নিয়ে। মেট্রোপলিটান স্কুলে আমার একটি ছাত্রী-গ্রুপ ছিল, যাদের নিয়ে আমি সমাজতন্ত্রের আলোচনায় বসতাম। বছর কয়েক আগে ওদের একজনের সঙ্গে দেখা। নাতি-নাতনীসহ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। আমি চিনতে না পারায় রাগে-দুঃখে ওর চোখে জল এসে গিয়েছিল। আমাকে জড়িয়ে ধরে বলেছিল, 'মনিদি, আপনি বেনা বনে মুক্তো ছড়াতেন।'

সিলেট শহরে মহিলা সমিতি আগের থেকেই ছিল। হেনা দত্ত এবং ডাঃ সুন্দরীমোহন দাসের দুই নাতনী—ডাঃ কল্যাণী দাস ও ছাত্রী অঞ্জলি দাস ওখানে সমিতি করেন। আমাকে নিয়ে মিটিং হলো। এরপর অঞ্জলি ও হেনা আমাকে শিলং নিয়ে গেল। অঞ্জলি ওখানকার কলেজের ছাত্রী, তাই কলেজের ছাত্রী-মিটিং-এ বক্তৃতা করতে হবে। ছাত্রী সংঘের প্রচারেই যাওয়া। অঞ্জলি আমার সঙ্গে কতকগুলো এলাকায় ঘুরল। ওর খুব ইচ্ছা ছিল পড়া ছেড়ে পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হবে। আমি ওকে অনেক বোঝাতাম। এখন নয়, পড়া শেষ হোক। আমাদের সঙ্গে জ্যোতির্ময় নন্দী ছিলেন। তিনি ওকে ঠাট্টা করেই চুপ করাতেন। তবে শেষপর্যন্ত অঞ্জলি পড়া শেষ করে হোলটাইমার হয়ে গিয়েছিল।

এরপর জ্যোতির্ময় নন্দীর সঙ্গে মণিপুরে ইরাবৎ সিং-এর এলাকায় যাওয়া হলো। সেটা তখন লাল এলাকা হিসাবে পরিচিত।

যে বাড়িতে উঠলাম তারা বৈষ্ণব। সম্ভবত মণিপুরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবই বেশী। আগেও বৈষ্ণব দেখেছি, কিন্তু এমন ঘোরতর বৈষ্ণব দেখিনি। আমাকে বলা হলো হাতমুখ ধুতে। একটি ঘটি দিল ও একটি ডোবা মতন জলাশয় দেখিয়ে দিল। বলে দিল, ঘটিতে জল নিয়ে উপরে এসে হাত-পা-মুখ ধুতে হবে। নেমে দেখি ডোবার জলটা সাদা দেখাচ্ছে। লক্ষ্য করে দেখলাম একরকম ছোট ছোট সাদা পোকায় জলটুকু ভর্তি। কখনও ঐ ক্ষুদে পোকারা ডেলা পাকিয়ে উপরে ভেসে ওঠে, তারপর ভেঙে ছড়িয়ে যায়। পোকা বাদ দিয়ে হাতে করে একটুখানি জলও তোলা যায় না। ঘটিতে জল তুলে পা ধুলাম, শুকনো গামছায় হাতমুখ মুছে ফেললাম। ঐ জলে ওদের ঠাকুর পুজো

হয়। ওতে পা ছোঁয়ালে নাকি ডোবাটি নষ্ট হবে।

খেতে বসে পড়লাম মুশকিলে। অনেকগুলো ভাতের উপরে কি একটু জিনিস রাখা আছে। তা থেকে বিকট পচাগন্ধ আসছে। পাশে ছোট একটা আলুসেদ্ধর বড়ি। জ্যোতির্ময় নন্দী বললো, 'ঐ উপরের জিনিসটা ওরা লাট-সাহেবের মতো কোন মানুষ এলে তাঁকে দেয়। আপনাকে খাতির করে দিয়েছে, সেটা আপনার সৌভাগ্য। নাক কোঁচকাবেন না। খেয়ে ফেলুন।' আমি নিঃশব্দে ওটা নন্দীর পাতে তুলে দিলাম, গৃহস্থদের চোখের আড়ালে। তারপর নুন, জল আর ঐ আলুটুকু দিয়ে পেট ভরে ভাত খেলাম। অনেকটা হেঁটেছি, তাই খিদে ছিল খুব। পরে নন্দীর কাছে বস্তুটির পরিচয় জানলাম। ছোট ছোট গুগলির খোসা ছাড়িয়ে নুন-মশলা মেখে কাঁচা বাঁশের গর্তের মধ্যে পুরে দিয়ে মুখ বন্ধ করে ঝুলিয়ে রাখে। বাঁশের মধ্যে পচেগলে যাবার পরে বস্তুটি তৈরি হয় খাবারের জন্য।

খাওয়া শেষ হলে আধ মাইল দূরে নদীতে আমরা থালা ধুতে গেলাম। নদী বুজে গেছে। বালির বুকে কোথাও কোথাও তির্ তির্ করে জলের ধারা বইছে। ঐ জল খেলাম, মুখ ধুলাম, মাথায় দিলাম।

সন্ধ্যের পর জনসভা। সভার কিছুক্ষণ পরে আমার হাতে একটা স্লিপ এলো, 'তাড়াতাড়ি শেষ করুন, পুলিস এসেছে।' অবাক হলাম। এখন আবার পুলিস কিসের? পুলিস তো আমাদের ধরে না। যাহোক করে মিটিং শেষ হলো। ইরাবৎ সিং আমাদের কয়েকজনকে একটা ভিন্ন পথ দেখিয়ে নিয়ে চললো। অন্ধকার পথ। ইরাবতের হাতে একটা টর্চ। ছোট একটা সাঁকো পার হলাম। সবশেষে আসছিলেন আশুবাবু। ওঁরই জন্য এই সতর্কতা। উনি নাকি তখনও আণ্ডারগ্রাউণ্ডে। হঠাৎ ঝপ করে শব্দ। সবাই ফিরে দেখি সাঁকো ভেঙে উনি জলকাদার মধ্যে পড়ে গেছেন। বেশ একটু ভারি গোছের মানুষ ছিলেন। কয়েকজনের সাহায্যে কাদামাখা কাপড়ে উঠে এলেন। চেহারা দেখে হাসি পাচ্ছিল, নন্দীর ভয়ে মুখ চেপে অন্য দিকে তাকিয়ে থাকলাম। পরদিন শুনলাম—আমাদের ওভাবে পালিয়ে আসার কোন দরকারই ছিল না। যাকে ওরা পুলিস ভেবেছিল, সে ছিল গ্রামের চৌকিদার। একটা লাঠি ও লণ্ঠন হাতে প্রথম থেকে আমার পেছনেই বসেছিল। সে রাউণ্ডে বেরিয়ে পথে মিটিং দেখে শুনতে এসেছিল।

রাত্রে সেই বাড়িতে ফিরলাম। খাওয়ার পর আমাকে শুতে দিল বারান্দায়। খুব সুন্দর একখানা মণিপুরী চাদর বিছানো। বাড়ির মেয়েরাই নাকি করেছে।

ওটাও নাকি লাটসাহেবদের মতো লোকেদের জন্য তোলা থাকে। ঘরের ভেতর থেকে দরজা বন্ধ। বারান্দায় খান দুই হোগলা টাঙানো। রাত্রে ফোঁস ফোঁস শব্দে ঘুম ভাঙল। ওদের উঠোনে একটি মোষ দেখেছিলাম, তারই নাসিকা গর্জন। মহিষটা মাঝে মাঝে আমার পাশের হোগলার উপরে গা ঘষছে। মোষের পায়ে পিষ্ট হবার ভয়ে মাদুর-চাদর টেনে নিয়ে 'সম্মানজনক দূরত্বে' বসে রইলাম। কি জানি, মহেশ-বাহনটি যদি বারান্দায় উঠে আসে তবে আমাকে তো উঠোনে নামতেই হবে।

কয়েক দিন থাকলাম ওখানে। জনসভা করতেই গিয়েছিলাম তাই মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা বেশী হলো না। শিল্পকর্ম আরো কিছু দেখলাম। কিন্তু নাচ না দেখেই ফিরতে হলো।

নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলন

১৯৪৪-এর এপ্রিলে ময়মনসিং-এর নেত্রকোণায় অনুষ্ঠিত সারাভারত কৃষক সম্মেলনের প্রস্তুতির কাজে অংশ গ্রহণ করার ডাক এলো। কমরেড মণি সিং আমাকে নিয়ে হাজং এলাকায় ছেড়ে দিয়ে এলেন। এছাড়া যুঁইফুল সারা জিলাটা তখন চষে বেড়াচ্ছে প্রস্তুতির কাজে। কলকাতা থেকে আরও অনেক মেয়েরা এসে গ্রামে গ্রামে ঘুরছে। ময়মনসিং-এর মেয়েরাও জিলার নানা জায়গায় কাজ করছেন।

হাজং এলাকা ঘুরতে আমার এত ভাল লেগেছিল যে এখনও সেকথা মনে পড়ে। সুসং-এর পাহাড়ী অঞ্চল এটা। এখানকার লোকেরা পাহাড়ী সবুজ শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে যেন গা ঢেকে আছে। শুনলাম, শহরের সভ্যতা থেকে বহুদূরে অবস্থিত এই পাহাড়ী এলাকাটি মণি সিং নাকি 'লাল' করে দিয়েছেন। অর্থাৎ, ওরা কমিউনিস্ট পার্টির ভক্ত হয়েছে। লালঝাণ্ডার জন্য প্রাণ দিতে জানে। পার্টি যখন বেআইনী ছিল হাজং এলাকা ছিল পার্টি-কর্মীদের আশ্রয়-স্থল। ওখানে পুলিসও যেতে সাহস করত না। আত্মগোপনকারী কর্মীরা একবার ঐ লাল এলাকায় পৌছালে পুলিসের সাধ্য ছিল না তাদের খুঁজে বের করার। ওদের 'টেক্‌ ব্যবস্থা', অর্থাৎ গোপন খবর সরবরাহ ও চলাচল ব্যবস্থা এত পাকা ছিল যে ওদের সঙ্গে বসবাস করেও আমি কিছু বুঝতে পারতাম না।

হাজংদের মতন সরল, সাদাসিধে মানুষ আমি বেশী দেখিনি। সাঁওতাল-দের সঙ্গেও থেকেছি কিন্তু তাদের চেয়েও যেন এদেরকে আমার আরও বেশী প্রকৃতির সন্তান বলে মনে হতো। আমি গিয়ে দেখি—আমার জন্য স্নানের ব্যবস্থা হয়েছে ঘরের বাইরে এক কোণে, দু'টুকরো কাপড় টাঙিয়ে। ভেতরে জলভরা একটা মাটির গামলা। প্রথম দিন ওখানেই স্নান করলাম। ওখানে জলকষ্ট আছে শুনলাম। বললাম, 'জল আনতে হবে না। আমি তোমাদের সঙ্গে চানে যাব।' ওরা হাসাহাসি করতে লাগল। বললো, 'সে তুমি পারবে না।' ওদের ভাষা খানিকটা রপ্ত করতে একটু সময় লেগেছিল। পরদিন জোর করেই ওদের সঙ্গে স্নানে গেলাম। ওরা আমার সামনে হাসাহাসি করছে আর কি যেন বলছে। জিজ্ঞেস করায় বললো, 'তোমাকে নদীর পাড়ে জল তুলে দিই, এখানেই স্নান করো।' নদী মানে বালুর চরা। মাঝে মাঝে

পরিষ্কার জলের সরু ধারা বয়ে যাচ্ছে। জল বলতে ওটাই ওদের সর্বস্ব। কোথাও কোথাও ঘটিও ডোবে না। ওরা স্নান করতে নামার আগে কাপড়-খানা খুলে বালুচরায় রেখে ঐ জলই বাটি করে তুলে তুলে গায়ে মাথায় ঢালে। কাপড় ধোওয়ার বিলাসিতা ওদের পোষায় না। আমার সামনে ওভাবে স্নান করতে ওদের একটু লজ্জা করছিল—তাই হাসাহাসি, ঠেলাঠেলি হচ্ছিল বুঝলাম। আমিও ওদের সঙ্গে নদীর সরু একটা ফালির পাশে বসে গেলাম। শাড়িটা গায়ে জড়িয়ে বাটি দিয়ে জল ঢাললাম। লজ্জা তখন আর আমারও তেমন নেই। অদূরে পুরুষরাও স্নান করছে বা অন্য কিছু করছে। কিন্তু কেউ এদিকে ফিরেও তাকায় না। প্রকৃতির সন্তান হয়েও মেয়েদের তারা এ সম্ভ্রমটুকু দিতে জানে। স্নানের ঘাটে মেয়েদের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা বেড়ে গেল। লজ্জার আড়াল ইতিমধ্যে উড়ে গেছে। পোশাকের আড়ম্বর তো এমনিতেই ওদের নেই। হাঁটুর উপরে ওঠা শাড়িটুকু তুভাঁজ করে ওরা বুকের ওপর গিঁট দিয়ে বেঁধে নেয়। বাচ্চাদের পিঠে বেঁধে চলে।

ভরপেট ভাত খেতে দেখেছি—সঙ্গে লাগে সামান্য একটু শাকঘণ্ট। বাহুল্য নেই, চাহিদাও নেই। লোভ আর উগ্র আকাঙ্ক্ষায় পীড়িত নয়। এখন মাঝে মাঝে মনে হয় ঐ পাহাড়-অরণ্যের সরল অনাড়ম্বর জীবনটা মন্দ কি?

সকালে উঠে একধামা মুড়ি খাই ওদের সঙ্গে—তারপর পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি। সব বাড়িতেই থালায় সাজিয়ে হাতে তুলে দিত পান-গুয়া। আস্ত পান ও তার উপরে খোসা ছাড়ানো কাঁচা সুপারি। আমি তো পান খাই না। তাছাড়া ঐ কাঁচা সুপুরি খেলে তো আর রক্ষে নেই! কিন্তু ওসব না নিলে ওদের মুখ-খানা আবার ব্যাজার হয়ে যেত। পরে মণি সিং বুঝিয়ে দিলেন, 'খাও না খাও—ওটা হাতে করে নেবে। ওটা তোমাকে ওরা অতিথির মান্য সম্মান হিসাবে দেয়। না নিলে ওদেরকে অমান্য করা হয়।

নেত্রকোণায় যে কৃষক সম্মেলন হবে তাতে দেশ-বিদেশ থেকে লোক আসবে, সব জায়গা থেকে কৃষক-মেয়েরাও আসবে। তাদের সঙ্গে দেখা হবে—কৃষকদের জমি ও চাষবাস নিয়েও কথা হবে। তাই এখানকার সব মেয়েদের সেখানে মিছিল করে যাওয়া উচিত—এই ছিল আমার প্রচারের মোট বক্তব্য। এই প্রচারের জন্য মেয়েদের নিয়ে মিটিং করতাম প্রায় রোজই।

কতদিন ওদের সঙ্গে ছিলাম মনে নেই। 'সম্মেলনে দেখা হবে' বলে বিদায় নিয়েছিলাম। সম্মেলনে দেখাও হয়েছিল। ললিত হাজং তার দুই বৌ নিয়ে এসেছিল। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল—শুধু এখানে নয় আবার সুসং এলাকায়

গিয়ে ওঁদের দেখব, সেই শাল-পিয়ালের কোমল ছায়াঘেরা উঠোনে আবার মুড়ির ধামা নিয়ে বসব, হাসি গল্প করব—আবার সেই বালুচরা নদীতে স্নান করতে যাব। সেই পরিবেশ ছাড়া ওদের অন্য কোথাও মানায় না।

কিন্তু সেই ইচ্ছা আর সফল হয়নি। দেশ ভাগ হয়ে গেল। ললিত হাজংকে দেখলাম কলকাতায় উদ্বাস্তু রূপে। যেন শালপ্রাংশ দেহটা তার দুমড়ে-মুচড়ে গেছে। মুখে ক্ষুধার চেহারা স্পষ্ট। নেত্রকোণার পরে আর হাজং মেয়েদের চোখে পড়েনি। ওরা যে কোথায় সব হারিয়ে গেল!

যাহোক, নেত্রকোণায় আমি কিন্তু নতুন নই। এর আগে জনযুদ্ধের প্রচার করতে এসে শেরপুরে রবি নিয়োগীর বাড়িতে অনেকদিন থেকেছি এবং এই এলাকা ঘুরেছি। সুতরাং খুব একটা অপরিচিত পরিবেশ নয়। সারাভারত কৃষক সম্মেলন এখানে বসবে, এটা সকলেরই একটা গর্বের বিষয়। ময়মনসিং-এর ছেলে ও মেয়েকর্মীরা সেই গর্ববোধ মনে রেখেই সমস্ত আয়োজনটি করেছিলেন। গোটা বাঙলা দেশের সারা জিলা থেকেই এসেছিলেন অগণিত কৃষক প্রতিনিধি। আর মধ্যবিত্ত পার্টিকর্মী মেয়েরাও আসতে কেউ বাকী ছিল না। সুদূর বরিশাল থেকে মনোরমা মাসীমা এসেছিলেন তাঁর দলবল নিয়ে। মেদিনীপুর থেকে এসেছিলেন নির্মলা সান্যাল এবং আরো কত মেয়ে। কলকাতার মেয়েরা, আমরাও প্রায় সবাই সেখানে হাজির।

সম্মেলনের ময়দানটি যখন প্রথম চোখে পড়ল—খুবই ভাল লাগল। শ্বেত কপোতের মতো দেখাচ্ছিল নেতাদের থাকার জন্য ছোট ছোট তাঁবুগুলোকে। আর কী বিরাট ছিল প্রকাশ্য সম্মেলনের মঞ্চটি! অতবড় মঞ্চ আমাদের আগের কোন সম্মেলনে আমি দেখিনি।

হাজরা বেগম এসেছেন দিল্লী থেকে। তিনিই আমাদের ভাগ করে দিয়েছেন নানা কাজের দায়িত্ব। মনোরমা মাসীমা আর নির্মলা মাসীমা—এঁরা রয়েছেন 'কিচেন' সামলাতে। হাজার হাজার লোকের খাবারের ব্যবস্থা হচ্ছে সেখানে। স্থানীয় মেয়ে-বৌ-রা দলে দলে আসা মিছিলের মেয়েদের থাকবার ও খাবারের বন্দোবস্ত করতে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় পাচ্ছেন না। যেন একটা বিরাট যজ্ঞশালা।

সম্মেলন হচ্ছে, প্রতিনিধি সম্মেলনে আমরা গিয়ে বসছি, আলোচনা বুঝতেও চেষ্টা করছি। কৃষক মেয়েদের সঙ্গে আমি ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত কিন্তু কৃষক আন্দোলন ও সংগঠনে আমি প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলাম না। তাই নেতাদের আলোচনা থেকে জানতে চাইছি সংগঠনগত অবস্থা। কিন্তু আমার মনে হলো

কৃষক মেয়েরা না বুঝেই নেতাদের মুখের দিকে তাকিয়ে আছেন। এখন আমার মনে হয়, আমাদের সম্মেলনগুলোর এটা একটা ত্রুটি। মঞ্চে যা বলা হয় তা বুঝতে পারেন না তারাই—যাদের নিয়ে এত কথা। একে তো ভাষার জটিলতা আছে, তারপর ওদের বোঝাবার মতো করে যদি সেকথা না বলা হয় তবে তাদের ভাল লাগবে কি করে? অবশেষে হাই তুলতেই হয়। তবু তাদের কথা নিয়ে, তাদের স্বার্থ নিয়ে সম্মেলন হচ্ছে—এই চেতনাটাই তাদের মনকে খুশি করত।

প্রতিনিধি সম্মেলন শেষ হলো। প্রকাশ্য সম্মেলন শুরু হলো দুপুর থেকে। ময়দান যেন উপচে পড়ছে। ময়দানটি, যতদূর মনে পড়ে, বিশাল একটি ধান কেটে নেওয়া মাঠ ছিল। বাদ্যভাণ্ড বাজিয়ে পতাকার রঙ-এ দিগন্ত লালে লাল করে দিয়ে মিছিলের পর মিছিল এসে ভরিয়ে দিল মাঠ।

বিশাল জনতার জমায়েত। অখণ্ড বাঙলার সব জিলা থেকে দলে দলে লোক এসেছে। ঢাকা, ময়মনসিং-এর কৃষকরা বিশাল সেই মাঠটিকে ভরিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু বাদ সাধল হঠাৎ উড়ে আসা উত্তুরে মেঘের মাতলামি। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টিতে সমস্ত আয়োজন পণ্ড। মঞ্চের চালাও কিছু কিছু উড়ে গেল। আমরা হোগলা-মাদুর যে-যা হাতে পাচ্ছি চারদিক থেকে তাই মেয়েদের মাথার উপর ধরে রাখছি। তাতে আর কতটুকু সামলানো যায়? এখন সমস্যা হলো ক্যাম্পে ফেরা। আমরা উদগ্রীব, কেউ যাতে পথ হারিয়ে না ফেলে। সন্ধ্যা উৎরে গেলেই বিপদ।

সেদিন দেখেছিলাম স্বেচ্ছাসেবকদের দায়িত্ববোধ ও কঠোর পরিশ্রমের ক্ষমতা। যেদিক দিয়ে আমরা মাঠে ঢুকেছি সেদিকে একটা নালার উপর দিয়ে নতুন সাঁকো তৈরি হয়েছিল। গাছের খুঁটি, বাঁশ, চাটাই ও মাটি দিয়ে সদ্য তৈরি সেই সাঁকোটি প্রবল বৃষ্টিতে ডুবু ডুবু। উপরের মাটি ধুয়ে গেছে। তারই উপর দিয়ে আমাদের পার হতে হবে। আমরা থমকে দাঁড়িয়ে গেছি। দেখলাম, ছেলেরা ঝপাঝপ সাঁকোর দুপাশে বুক জলে নেমে পড়ল এবং হাত আর বুক দিয়ে সাঁকোর দু'পাশ চেপে ধরল। আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম। দেরি করার সময় নেই। মেয়েদের দল পার হতে লাগল।

সারারাত ধরে উৎসব হবে, অনেক জায়গার নাচগান হবে—এ সব প্রোগ্রাম আগের থেকেই ঠিক ছিল। কিন্তু দুর্বিপাকে পড়ে আমরা সবাই ক্ষুণ্ণ মনে ফিরে এলাম।

সম্মেলনের আয়োজন, প্রস্তুতি ও অনুষ্ঠান যতটা হয়েছিল তাতে আমি

উৎফুল্লই ছিলাম। ঝড়ে অবশ্য অনেকটা চাপা দিয়ে দিল। কিন্তু তার চেয়েও একটা বড় ঝড় আমাদের মেয়েকর্মীদের উপর দিয়ে প্রকাশ্য সম্মেলনের আগের দিন সকাল বেলা বয়ে গিয়েছিল, নিতান্তই অপ্রত্যাশিতভাবে।

সেদিন সকাল বেলা জি. বি. মিটিং ডাকা হয়েছিল। জেনারল্ বডি মিটিংকে আমরা জি. বি. বলতাম। সাধারণত পার্টি-সদস্যদের নিয়েই এই ধরনের মিটিং হয়। কদাচিৎ কখনও পার্টির খুব ঘনিষ্ঠদেরও এতে ডাকা হতো—যদি বিষয়টি সর্বসাধারণের কাছে বলার মতো থাকত। কোন একটা প্রোগ্রাম নিয়ে প্রচারের আগে এ রকম করা হতো।

কিন্তু এই জি. বি. ছিল প্রায় একটি জনসভা গোছের ব্যাপার। পার্টিনেতা পি. সি. যোশী নির্দেশ দিলেন টাউনের সমস্ত ভদ্রলোকদের ডাকার জন্য, অর্থাৎ যারাই এই সম্মেলনে সাহায্য করেছেন তারাই আসবেন। প্রায় হাজার দুই লোকের একটি প্রকাশ্য জনসভায় মাইক দিয়ে বলা শুরু হলো। যাঁদের ঘরে ঢুকবার মতো জায়গা হয়নি, তাঁরাও ঘরের বাইরে জমায়েত হয়ে মিটিং শুনলেন।

আমরা ভেবেছিলাম সম্মেলনের আয়োজন ও সাফল্যের জন্যই এই মিটিং ডাকা হয়েছে এবং শহরবাসীকে কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানানোই এর উদ্দেশ্য। শ্রী যোশীও ঠিক সেইসব কথাই প্রথমে বললেন। কিন্তু একটু পরেই তিনি পার্টির মহিলা সদস্যদের কাজের তীব্র সমালোচনা শুরু করে দিলেন। আমরা সবাই হতবাক। আমরা তো সেই কবে থেকে সম্মেলনের জন্য খেটে আসছি। কি এমন অপরাধ আমাদের এর মধ্যে হয়ে গেল? আর হয়ে গেলেও উনি না হয় আমাদের ডেকে বলতেন, নেত্রকোণাসুদ্ধ লোকের সামনে কেন এই সমালোচনা? কমরেড যোশী ইংরেজীতে বললেন এবং প্রয়াত বঙ্কিম মুখার্জীকে দিয়ে সঙ্গে সঙ্গে অনুবাদ করালেন। কখনও কখনও তিনি বঙ্কিম বাবুর অনুবাদে সন্তুষ্ট না হয়ে নিজেই বাংলায় বলে দিতে লাগলেন।

মোটামুটি অভিযোগটা ছিল—আমরা যারা মধ্যবিত্ত মেয়েরা ওখানে উপস্থিত ছিলাম, তাদের বিরুদ্ধে। কৃষক মেয়েদের সঙ্গে যেভাবে মেলামেশা করা উচিত ছিল, সেভাবে নাকি আমরা মেলামেশা করিনি, এটাই আমাদের অন্যায়। হয়তো কিছু অন্যায় হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু আরও এমন অনেক অভিযোগ করলেন, যা আর বলতে চাই না। ঘণ্টাখানেক ধরে এই রূঢ় সমালোচনা আমরা নতমস্তকে শুনলাম। আমার পিছনে মনোরমা মাসীমা এবং আরও অনেক প্রবীণ মহিলাকর্মীরা বসেছিলেন—যাঁরা বিশেষভাবে কৃষক এলাকায় কাজ করেন। এই ধরনের সমালোচনা তাঁদের খারাপ লেগেছিল। বারে বারে আমাকে তাই

প্রতিবাদ জানাবার জন্য বলতে লাগলেন। কিন্তু আমি প্রতিবাদ করতে উঠিনি। কারণ, পার্টি-নেতা যা বলবেন তা মেনে চলাই আমার শিক্ষা, প্রতিবাদ করার নয়।

তাছাড়া কমরেড পি. সি. যোশীর প্রতি তখন আমাদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অন্ত ছিল না। আমরা মহিলা ফ্রণ্টের কর্মীরা তাঁর কাছেই এই ফ্রণ্টের কাজ-কর্ম শিখেছি। যে সাফল্য আমাদের এসেছে সে সব তাঁরই কৃতিত্ব বলে আমরা গর্ব বোধ করি। সুতরাং তাঁর কাছ থেকে এই ধরনের সমালোচনা আমার কাছে অত্যন্ত বেদনাদায়ক মনে হলেও প্রতিবাদ করতে ইচ্ছা হয়নি।

বেশী আঘাত লাগল ঐ ধরনের একটা জনসভার সামনে আমাদেরকে হেয় করায়। উনি যদি আমাদের নিয়ে আলাদা করে বলতেন বা পার্টি-সভায় বলতেন তাহলে আমাদের এতটা খারাপ লাগত না। পার্টি-সভায় নেতারা সমালোচনা করবেন, সেটাই তো নিয়ম। কিন্তু এ যে জনসভা। জানিনা, কেন তিনি আমাদেরকে এত ছোট করে দিলেন।

ক্যাম্পে ফিরে এসে সকলেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে লাগলেন। কলকাতায় ফিরে পার্টির বর্ধিত প্রাদেশিক কমিটির মিটিং-এও তিনি ঐ একই সমালোচনা করলেন। এতে আমরা খুবই বিভ্রান্ত বোধ করছিলাম। এরপর যে কাজ করছিলাম—তাই করব, না অন্য কিছু করব, কিছুই বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

এই ঘটনার ফলে কনক মুখার্জী পার্টির সারাক্ষণের কর্মীপদে ইস্তফা দিল। ছাত্রীজীবন থেকেই সে নেতাদের সঙ্গে পার্টির গোপন আস্তানায় থেকে কাজ করত। ওর মনটা একেবারে ভেঙ্গে পড়ল। অতঃপর আবার সে পড়াশুনা শুরু এবং শেষ করে স্কুলে কাজ নিয়েছিল। পার্টির সাধারণ সদস্য রূপেই সাধ্য ও সময় অনুযায়ী কাজ করত। পরে মনে হতো, কনক ভালই করেছিল। পরবর্তী সময়ে 'ঘরে-বাইরে'-র সম্পাদিকা হয়ে দীর্ঘদিন কাগজটির পরিচালনা করেছে সে।

নেত্রকোণার এসব কথা প্রকাশ্যে দূরে থাক, পার্টিতে থাকা পর্যন্ত পার্টির কারো সঙ্গে কোনদিন আলোচনা করিনি। কিন্তু আজ মনে হচ্ছে বিষয়টা আমার লেখা উচিত। শুধু একটাই আমার দ্বিধা। পি. সি. যোশী আজ জীবিত নেই। সেই অবস্থায় এ-প্রসঙ্গ তোলা ঠিক নয় জেনেও তুলতে হচ্ছে। কারণ, এখন মনে হয়—পার্টির সর্বোচ্চ নেতা যতটা অবাধ ক্ষমতার অধিকারী হন, ততটা হওয়া হয়তো ঠিক নয়। এর পরিণতি সব সময়ে ভাল নাও হতে পারে। অধিকারের অপব্যবহার কতদূর ক্ষতিসাধন করতে পারে, গভীর মর্মবেদনার সঙ্গে সোভিয়েত ও চীনের ঘটনা থেকে তাও আমাদের জানতে হয়েছে।

নেত্রকোণার ঘটনার পর নিজের প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনতে আমার অনেক দিন সময় লাগল। সর্বদা একটা লজ্জাবোধ পীড়া দিত। কাজের মধ্যে ফিরে আসতে সংকোচ হতো। শেষপর্যন্ত কমরেড ভবানী সেনের সহায়তায় এই মনোভাব কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম।

এভাবে কয়েকদিন কাটাবার পর সেই নেত্রকোণা সম্মেলনের সাফল্য বর্ণনা করে ছোট ছোট মিটিং করতে শুরু করলাম। এমনি একটা ঘরোয়া মিটিং হয়েছিল অধ্যাপক সুশোভন সরকারের বাড়িতে। আগে আমার কাছ থেকে কিছু কিছু শুনে সুশোভনবাবু ও তাঁর স্ত্রীর ভাল লাগে। তাই ওঁদের বাড়িতে ওঁরাই ঐ মিটিংটা ডাকেন। সেখানে ওঁদের আত্মীয় ও কিছু বন্ধুবান্ধবকে ডাকা হয়। আমি কনফারেন্সের আনুপূর্বিক বিবরণ দিই। অবশ্যই আমাদের অংশটা বাদ দিয়ে। সকলেরই ভাল লাগল নেত্রকোণা সম্মেলন সম্পর্কে আমার প্রতিবেদন। দু'জন নতুন মানুষকে বন্ধু হিসাবে পেলাম আমি এখানে। এঁরা হলেন শ্রী বিমল মুখার্জী ও শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জী। আজ আমি পার্টিতে নেই। পার্টির বন্ধুরা আজ স্বভাবতই কিছুটা আমার কাছে দূরের মানুষ; কিন্তু বিমলদা ও অঞ্জলি আজও আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুই রয়ে গেছেন।

ওঁরা কোনদিন পার্টিতে আসেননি কিন্তু দু'জনেই মনেপ্রাণে আমাদের সমর্থক ছিলেন। অঞ্জলিকে আমরা মহিলা সংগঠনের মধ্যে পেয়েছি। ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের প্রাদেশিক কমিটিতে বহুদিন আমি ও অঞ্জলি যুগ্ম-সম্পাদিকা হিসাবে কাজ করেছি। আমাদের দু'জনের মধ্যে এমন একটা অন্তরঙ্গতা ছিল যার ফলে কেউ কাউকে ভুল বুঝতাম না।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে

১৯৪৫ সনটা ছিল আমাদের কাছে অত্যন্ত কর্মব্যস্ততায় ভরা বছর। যুদ্ধের অবসান, নেতাদের মুক্তি, আমাদের উপর কংগ্রেসের আক্রমণ, আত্মরক্ষা সমিতির তৃতীয় সম্মেলন, নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলন, সারা বাঙলা জুড়ে তেভাগা আন্দোলনের প্রস্তুতি ইত্যাদি—এ বছরেরই কথা। ১৯৪৫-এর মে মাসে বার্লিন-বিজয়ের পর যুদ্ধ থেমে গেল। পৃথিবীসুদ্ধ লোক যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। দেশরক্ষার যুদ্ধে সোভিয়েটের নারী-পুরুষের আত্মদান, স্বার্থত্যাগ, বীরত্ব ও চরম দুঃখ বরণের ঘটনাবলী অভূতপূর্ব দেশপ্রেমের চিরন্তনী গাথারূপে মানুষের মনে আজও ভাস্বর হয়ে আছে।

বার্লিন-বিজয়ের পর কলকাতায় মাত্র দু'চার দিনের প্রস্তুতিতে পার্টি থেকে একটা বিজয় মিছিল বের করা হলো। দেশবন্ধু পার্ক থেকে দেশপ্রিয় পার্ক পর্যন্ত এক সুসজ্জিত সুবিশাল মিছিল পথপরিক্রমা করল। নিদারুণ অভিশাপ থেকে পৃথিবী যেন মুক্তি পেল। তাই এই মিছিল ছিল আনন্দ ও গৌরবের। আজ ভাবছি, সত্যিই কি মুক্তি পেয়েছিল পৃথিবীটা?

বার্লিন-বিজয়ের অনেক পরে সেপ্টেম্বর মাসে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ জাপানের নাগাসাকি ও হিরোসিমার উপরে আণবিক বোমা ফেলে। ঘন লোকবসতিপূর্ণ শহর দুটি প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। এই বোমার ভয়ঙ্কর ধ্বংস ক্ষমতা দেখে বিশ্বের লোক তখন স্তম্ভিত। বার্লিন-বিজয়ের পরেও জাপানে আমেরিকার এই মারণাস্ত্র প্রয়োগের একটাই কারণ থাকতে পারে। সম্ভবত আণবিক বোমার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করা। নয়তো হিটলারের পতনের পর তোজোকে শায়েস্তা করার জন্য এই অস্ত্রের প্রয়োজন ছিল না। তাছাড়া যারা ধ্বংস হলো এবং যারা বংশানুক্রমে এই বিস্ফোরণের বিষক্রিয়ার যন্ত্রণা ভুগবার জন্য বেঁচে রইল, তারা ছিল নিরীহ নগরবাসী। এখানেও শেষ হয়নি এই ধ্বংস যজ্ঞের ছলকলা। আজকের দুনিয়া জানে, বর্তমান বিস্ফোরক অস্ত্রের কাছে সেদিনের আণবিক বোমা ছিল খেলনা মাত্র। এখনকার অস্ত্র প্রয়োগ করা হলে দু'চার দিনেই দুনিয়াটা নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে পারে। আমাদের সেই ভয়টা দেখাচ্ছে এই অস্ত্রের প্রধান অধিকারী আমেরিকা। বিগত যুদ্ধে আমেরিকা অস্ত্রের ব্যবসায়ে স্ফীত হয়েছে। হিরোসিমা, নাগাসাকি এই ব্যবসায়ের সামান্য

শিকার। ভবিষ্যতে আর কেউ এ-অস্ত্রের শিকার হবে কিনা সেটা নির্ভর করছে এর বিরুদ্ধে পৃথিবীর মানবগোষ্ঠী কত বড় শান্তি-সংগ্রাম করতে পারবে—তার উপর। মানুষের মনে একটাই প্রশ্ন: দ্বিতীয় যুদ্ধের শেষ—মানে তৃতীয় যুদ্ধের প্রস্তুতি নয় তো?

তবু যুদ্ধটা থামার পরে আমরা খুশি হয়েছিলাম। এ যুদ্ধের মার তো আমরাও খেলাম। কিভাবে খেয়েছি, কতটা খেয়েছি, সে প্রসঙ্গ ভিন্ন।

এখন আমরা জাতীয় নেতাদের মুক্তির প্রতীক্ষায় আছি। তাঁরা মুক্ত হলেনও। আশা ছিল, এবার কালোবাজার জব্দ হবে। চাল, তেল, কয়লা সস্তা হবে। হায়রে কপাল, কালোবাজারীরা যে উল্টে নেতাদেরই জব্দ করবে, কে তা ভেবেছিল? জেলের বাইরে এসে বহু লোকের অনাহারে মৃত্যুসংবাদ ও কালোবাজারীর সংবাদ শুনে জওহরলাল নিশ্চয়ই ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। তাই বলেছিলেন, 'ওদের ল্যাম্পপোস্টে লটকানো হবে।'

পোড়া কপাল, জওহরলালই কি বুঝেছিলেন তাঁর অমন দামী জনদরদী কথাটা এমন মাঠে মারা যাবে! তখন কে কার পকেটে ঢুকে পড়েছিল আমার জানা নেই। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বোঝা গেল কালোবাজারীরা এদেশে 'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত' পেয়ে গেল। 'জনতা কেড়ে খাইনি কেন?'—এই তো ছিল পণ্ডিতজীর ক্ষুব্ধ প্রশ্ন। তখন তো তিনি স্বয়ং বাইরে। কেন নেতৃত্ব দিলেন না তিনি চোরাবাজারীদের গুদাম দখল করার? লোকেরা তো তখনও ক্ষুধার্ত।

এ যে হবার নয় তা তাঁর নিজেরই জানা ছিল। খামোখা তিনি লোক হাসালেন। তখনকার কথা বাদই দিলাম। স্বাধীন দেশের প্রধানমন্ত্রী হবার পর তো তিনি আরও বেশী অবগত ছিলেন কালোবাজারের কীর্তিকলাপ। কোন দিন কি মানুষদের তিনি হুকুম দিয়েছেন, কালোবাজারীদের টেনে বের করো, পুলিস তোমাদের সাহায্য করবে?

তবু নেহরুজীর কাছে আমাদের কত আশাই না ছিল! জেল থেকে বেরিয়ে দেশময় তিনি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। জনসভায় লক্ষ লক্ষ লোক তাঁকে দেখতে আসছে।

দেশপ্রিয় পার্কে এমনি একটা মিটিং-এ আমাদের সমিতির বিভিন্ন কেন্দ্র-গুলির মেয়েরা আমাদের বললো—তারা নেহরুকে দেখতে যাবে। অত ভিড়ে এত মেয়েদের নিয়ে আসতে আমাদের একটু ভয় ছিল। কে কোন দিক দিয়ে হারিয়ে যায়—এই ভয়।

তবুও আমরা প্রায় শ'তিনেক মেয়ে নিয়ে মিটিং-এ এলাম। মঞ্চ থেকে অল্প

দূরে মেয়েদের জায়গায় বসলাম। নেহরুজী তখনও আসেননি। ইতিমধ্যে কংগ্রেসের স্বেচ্ছাসেবকেরা হিড় হিড় করে একটা লোককে কান ধরে মঞ্চের উপর মারতে মারতে ওঠালো এবং ঘোষণা করল এই লোকটা কমিউনিস্ট। মিটিং নষ্ট করবার জন্য লোকটা মাইকের তার কাটবার চেষ্টা করছিল। গোটা ময়দান জুড়ে চিৎকার চেঁচামেচি হতে লাগল। ইতিমধ্যে পর পর আরও দুটি লোককে মারতে মারতে মঞ্চে তুললেন উদ্যোক্তারা। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তখন মঞ্চে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

এই ঘটনায় মেয়েরা চঞ্চল হয়ে উঠল। নেহরুকে দেখা মাথায় থাক্, এখন সেখান থেকে নিরাপদে বেরুনোই দায়। আমার ধারণা ছিল না যে, মানুষের মনে তখন কমিউনিস্টরা এমন প্রচণ্ড ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মেয়েদের দিকে বসা সমস্ত মেয়েরা পার্ক থেকে বেরুবার জন্য উতলা হয়ে উঠেছে এবং বলাবলি করছে কোন দিক দিয়ে বেরুবে, যদি কমিউনিস্টরা ধরে? অল্পবয়স্কা মেয়েরা কাঁদতেই শুরু করে দিল। সে এক দৃশ্য বটে! যেন রাক্ষস-খোক্কস ঢুকে পড়েছে মাঠে। তখন ভাবনা হলো আমাদের আবার কেউ চিনে ফেলে নাকি? বালিগঞ্জ পাড়াতেই তো ঘুরিফিরি! তাড়াতাড়ি মেয়েদের নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লাম এবং যারা যেদিকে যাবে সেই দিককার বাসে তুলে দিলাম। দুঃখের বিষয় এমন নোংরা ঘটনা ঘটা সত্ত্বেও নেহরুজী কোন প্রতিবাদ করলেন না। ভাবছিলাম, এই নেতাদের কারামুক্তির জন্য আমরাই না রাস্তায় প্রথম নেমেছিলাম? সোশ্যালিস্ট (?) নেহরুজীরও এত কমিউনিস্ট-ভীতি? সরোজিনী নাইডু যা পারলেন, উনি তা পারলেন না? বন্দীমুক্তি আন্দোলনের ফল পেতে শুরু করলাম আমরা। রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে একলা হাঁটছি আর বিভিন্ন লোকের মুখে আমাদের নামে অশ্রাব্য গালাগাল শুনছি। শুনলাম, কালীঘাটে আমাদের অফিস আক্রান্ত হয়েছে এবং কয়েকজন নেতা আহত হয়েছেন দুর্বৃত্তদের হাতে। মাথার কাপড়টা তুলে দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে অফিসের সামনে গিয়ে পৌঁছলাম। তখনও এখানে-ওখানে জটলা চলছে। জটলার মধ্য থেকে একজনের মুখে শুনলাম কমরেড নৃপেন চক্রবর্তী দৌড়ে গিয়ে বাসে উঠেছিলেন, কিন্তু সেখান থেকে তাঁকে টেনে নামিয়ে মেরে অজ্ঞান করে রাস্তায় ফেলে রেখে যায়। রাস্তার লোকেরাই পরে তাঁকে হাসপাতালে পাঠিয়ে দেয়। পাড়ার লোকেরা দুর্বৃত্তদের অনেকটা আটকে রেখেছিল, নইলে পরিস্থিতি অনেক গুরুতর হতো। ঐখান থেকে আবার একলা হাঁটতে হাঁটতে ফার্ন রোডে পৌঁছালাম। মনের মধ্যে দুশ্চিন্তা চলছে—এই বুঝি আমরা '৪২-এর ফল ভুগতে

শুরু করলাম! মেকি সুভাষভক্তের কদর্যতায় হাওয়া সত্যিই গরম হয়ে উঠল।

আমার দুশ্চিন্তাটা সত্য ব'লে প্রমাণিত হলো। ১৯৪৬-এর ডিসেম্বরে হলো নির্বাচন। ১৯৩৭-এর নির্বাচনের পর যুদ্ধের জন্য দীর্ঘদিন স্থগিত রেখে এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই সময় পশ্চিম বাঙলায় আমরা পার্টি থেকে কয়েকটা এলাকায় নির্বাচনে লড়েছিলাম। নির্বাচনটা তখনকার আইনে সীমাবদ্ধ ভোটাধিকারের ভিত্তিতে হতো। অর্থাৎ, কলকাতায় শ্রমিকদের জন্য ছিল একটা নির্বাচনী এলাকা। তাও সব শ্রমিকের ভোটাধিকার ছিল না। যারা ইউনিয়নের মেম্বার, তারাই শুধু ভোট দিতে পারতেন। এই সিটে দাঁড়ালেন সোমনাথ লাহিড়ী। বজবজের চটকল শ্রমিকদের আসনে দাঁড়ালেন বঙ্কিমবাবু। আর জ্যোতি বসু দাঁড়ালেন রেলওয়ে শ্রমিকদের নির্বাচনী কেন্দ্র থেকে। রতনলাল ব্রাহ্মণ দাঁড়ালেন দার্জিলিং-এর চা শ্রমিকদের জন্য নির্দিষ্ট আসনটিতে। আর রূপনারায়ণ রায় দাঁড়িয়েছিলেন দিনাজপুরের কৃষক এলাকায়। দার্জিলিং-এ রতনলালের জন্য এবং দিনাজপুরে রূপনারায়ণের জন্য আমি প্রচারে গিয়েছিলাম কিন্তু আমাকে বিশেষভাবে দায়িত্ব দেওয়া হলো বজবজ চটকল এলাকায়। নির্বাচনের অভিজ্ঞতা একটু পরে বলছি। তার আগে এই এলাকায় আমার জানা কিছু ঘটনার কথা একটু বলি।

শ্রমিক এলাকা বজবজ। বজবজে শ্রমিক মেয়েদের মধ্যে সমিতি গড়তে অনেক দিন থেকেই আমি আসছি এবং ওদের জীবনের সঙ্গে পরিচিতও হয়েছি। এবারে গেলাম বঙ্কিমবাবুর নির্বাচনী প্রচারে। শ্রমিক মেয়েদের মধ্যে শুধু মহিলা সমিতি করাই আমার কাজ ছিল না। ওদের কতকগুলো নিজস্ব দাবী আছে শ্রমিক হিসাবে। ওরা সে সম্পর্কে আদৌ সচেতন ছিল না এবং ট্রেড ইউনিয়নের মঞ্চ থেকেও তখন এ দাবী রাখা হতো না। এই দাবীগুলো ছিল: ১) সমান কাজে সমান মজুরী, ২) প্রসূতি-ভাতা, ৩) ক্রেশ ও শিশু বিদ্যালয়। এগুলো মালিকরা কিভাবে ফাঁকি দিত—সে এক মজার ব্যাপার। মেয়েরা ছেলেদের মতো ৮ ঘণ্টাই খাটুক আর ১০ ঘণ্টাই খাটুক, ওদের কাজ নাকি কিছুতেই ছেলেদের কাজের সমান হয় না। কাজের মূল্য নির্ণয়ে কোন পদ্ধতিই তখনকার দিনে মালিকের কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। প্রসূতি-ভাতার ব্যাপারটা নিয়ে শুধু কলকারখানাতেই নয়, সরকারী অফিস, হাসপাতাল প্রভৃতিতে রীতিমতো হাস্যকর ব্যাপার চলত। কারখানাতে মেয়েরা যত বছরই কাজ করুক, তাদের চাকুরীটা কখনও পাকা বলে ধরা হতো না। প্রসূতি-ভাতার একটা নড়বড়ে আইন ছিল। সেটাকেও ফাঁকি দেবার জন্য ওরা

কখনও ডাক্তারের সার্টিফিকেট পেত না—পাকা চাকরী নয় এই অজুহাতে। সরকারী দপ্তর, স্কুল ও হাসপাতালে নিয়ম ছিল বিবাহিতা হলে চাকরী হবে না। এটাও চালু ছিল সেই প্রসূতি-ভাতা ও ছুটি ফাঁকি দেবার জন্য। রেজিস্ট্রীকৃত বিবাহিতা মেয়েদেরও 'মিস্' বলে নাম লিখতে হতো ও সিঁদুর পরা চলত না। আর বাচ্চাদের রাখবার জন্য 'ক্রেশ' বলে যে বস্তুটা খোলা থাকত—তাতে মায়েরা কেউ ছেলেমেয়ে রাখতে যেত না। কারণ বাচ্চাগুলো ওখানে শুধু মারই খেতো। তাই মায়েরা বাচ্চাগুলোকে শুইয়ে রাখত কারখানার ভেতরে চট পেতে। আর চট পেঁজার ধুলো-ময়লায় বাচ্চারা ভূত হয়ে যেত। এই ধুলো-ময়লা মাখা বাচ্চা কোলে নিয়ে মায়েদের আমি ফিরতে দেখেছি।

কর্মক্ষেত্রে মেয়েদের অধিকার নিয়ে সংগ্রামী মনোভাব গড়ে তুলতে দীর্ঘ সময় লেগেছে। মেয়েদের একক লড়াইতেও দাবী আদায় হওয়া সহজ ছিল না। ট্রেড ইউনিয়নের মঞ্চে এ দাবী শেষ পর্যন্ত সংযুক্ত হলো। দাবীর সমর্থনে দাঁড়াল মহিলা সমিতিগুলি।

কল-কারখানায়, অফিসে-দপ্তরে, স্কুলে-হাসপাতালে এখন সমান মজুরি ও প্রসূতি-ভাতার সুযোগগুলো যেসব মেয়েরা পেয়ে থাকেন, তাদের স্মরণ করা দরকার কত দীর্ঘ ও কঠোর সংগ্রামের মধ্য দিয়ে এসব দাবী তাদের জীবনে আজ কত সহজলভ্য হয়ে গেছে।

ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে আমাদের মেয়েরা শ্রমিক মেয়েদের সঙ্গে থেকে এসব দাবী নিয়ে সংগ্রাম করেছেন। চটকলের মেয়েদেরও এইসব দাবী সম্পর্কে সচেতন করাই ছিল আমার একটা বড় কাজ।

এই শ্রমিক মেয়েদের সঙ্গে মিশে এবং কাজ করে আমি নারীসমাজের অন্য আর এক জগতের চিত্র দেখতে পেয়েছিলাম। মেয়েদের বেশির ভাগই চটপেঁজা ও চটের থলে সেলাইয়ের কাজ করত। কিন্তু ওদের এই ডিপার্টমেণ্টের নাম ছিল 'মাগীকল'। একটা ডিপার্টমেণ্টের নাম এমন অপমানকর ভাষায় কেন দেওয়া হলো তা জিজ্ঞেস করায় জেনেছিলাম—ওটা ইংরেজের দেওয়া নাম। তা বটে! ইংরেজ ছাড়া আমাদের দেশের মেয়েদের এমন অপমানকর নাম আর কেউ কি দিতে পারত? কিন্তু আমার খারাপ লাগত এই ভেবে যে এসব আমরা সয়ে যাচ্ছি কেন? নামটা কি বদলানো যায় না?

থাক সে কথা। আমার কাছে তো ওরা আমারই মতো মেয়ে। সমিতি করতে আমি ওদের ঘরেই যেতাম। বিশেষত যেখানে বাঙালী মেয়েরা থাকত। কতকগুলো ঘরে দেখেছি—শুধু একটি নারী ও একটি পুরুষ। দু'জনেই কলে

ডিউটি দিতে যায়। মেয়েটি ফিরে এসে রান্নাবান্না এবং সংসারের নানা কাজ করে। ঘরদোর ফিট্‌ফাট্‌ পরিষ্কার। মাটির ভিত ও মেঝে এমন সুন্দর করে নিকানো থাকত যে পা ফেলতে সংকোচ হতো। চা আর খাবার দিয়ে ওরা খুব অতিথি আপ্যায়ন করত।

তাদের কপালে দেখতাম একটা সিঁদুরের টিপ কিন্তু সিঁথিতে সিঁদুর নেই। কিছুটা ঘনিষ্ঠ হবার পর জেনেছিলাম—এরা কেউ বিয়ে করা বউ নয়। ঐ পুরুষটিকে নিয়ে ঘর করে মাত্র। দেশে হয়তো পুরুষটির স্ত্রীপুত্র পরিবার রয়েছে। সেখানে নিয়মিত টাকাও পাঠাতে হয়। ছুটিছাটায় দেশে যায়। আর চটকলের সংসারটি হলো বাড়তি। সুবিধা ছিল—বিয়ে না করা বৌকে খাওয়াতে হতো না। সে নিজের পয়সাতেই খেত। মেয়েটির সুবিধা ছিল—একলা অরক্ষিত থাকার চেয়ে কারো অভিভাবকত্বে থাকতে পেত। মেয়েটি নিজেই তো ঘরছাড়া, গ্রামছাড়া, আত্মীয়স্বজন ছাড়া। জীবনের ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে ঘুরতে একদিন চটকলে এসে নৌকো ভিড়িয়েছে। কিন্তু স্বাধীনতা হারায়নি। বনিবনা না হলে অন্য পুরুষের সঙ্গেও থাকতে পারত। সাতপাকে বাঁধা বৌ তো নয়! কিন্তু বিচ্ছেদ বড় একটা হতে দেখিনি। উভয়ের স্বার্থই উভয়কেই বেঁধে রাখত।

এমনি ঘুরতে ঘুরতে একদিন একটা পরিবারে গিয়ে উঠলাম। মহিলাটি মধ্যবয়সী। ঘরে ছেলেপুলে, একটি বয়স্কা মেয়েও আছে, যা ঐসব ঘরে সাধারণত দেখা যায় না। ভদ্রলোকটি ও মহিলাটি উভয়েই কলে কাজ করেন। ঐ বয়সে কলেখাটা মহিলাটির রূপ দেখে আমি একটু থমকে গেলাম। এ তো অন্য পাঁচজনের মতন নয়। একদিন চেপে ধরলাম, তাঁকে বলতেই হবে—আপনি কে, কোথা থেকে এসেছেন। মহিলাটি চোখের জলে তাঁর কাহিনী শোনালেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণটি যজমানী করে সংসার চালাতেন। তাতে যখন আর কুলোয়নি ঘটি-বাটিও গেছে—তখন এঁরা কলকাতায় আসেন। কালীঘাটে কিছুদিন পড়ে ছিলেন—পাণ্ডাগিরি করে যদি কিছু হয়। এই সময়ে কে একজন তাঁদের এই চটকলের কথা বলে। ব্রাহ্মণটি ব্রাহ্মণীর হাত ধরে সেই থেকে এখানে আছেন। সংসার মোটামুটি চলে। কিন্তু লজ্জায় ঘেন্নায় মরে যাচ্ছেন। ব্রাহ্মণ হয়ে এই সমাজে পাশাপাশি বসে কাজ করছেন এবং জায়গাটারও নাম তো 'মাগীকল'। নামটা বলতেও যেন ঘেন্না পাচ্ছেন। আমাকে পরে বললেন—আপনি যেন কাউকে বলবেন না আমি ব্রাহ্মণ। কারণ একসঙ্গে থাকি, ছোঁয়ালেপা তো লাগেই। জাত তো আর রাখতে পারিনি!

মহিলাটির কষ্ট দেখে আমারও মন খারাপ হয়ে গেল। কিন্তু তাঁকে বোঝালাম—আপনার মতো সাহসী স্ত্রী ও মা আমি খুব কমই দেখেছি। উপার্জনের জন্য অফিসেই হোক আর কলেই হোক—খাটলে মানুষের সম্মান বাড়ে, মোটেই কমে না। ভিক্ষার অন্নের চেয়ে নিজের শ্রমের অন্নে ছেলে-মেয়েদের মানুষ করছেন—এর চেয়ে বড় সম্মান আর কি আছে? জাতের জন্য দুঃখ করেন কেন, মানুষ তো সবই এক। মহিলাটির সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেল। সামাজিক বিবাহবিধি ও পরিবারবিধি আমরা কমিউনিস্ট হলেও মেনে চলি। প্রথম প্রথম চটকল এলাকায় এই বিধিবহির্ভূত সংসারযাত্রা আমার একটু কেমন কেমন ঠেকত। কিন্তু তারপরে মন ঠিক হয়ে গেল। নিজের রোজগারে নিজের পায়ে দাঁড়ানো চটকলের মেয়েদের আমি কোনদিন অশ্রদ্ধা করিনি। পুরনো জীবনের জের টেনে তাদের ছোট করে দেখার মতো ছোট প্রবৃত্তি কোনদিন আমার হয়নি। শ্রমিক মেয়ের পরিচয়েই তারা আমার কাছে ছিল অনেক উঁচুতে।

নির্বাচনের প্রচারে যখন এলাম তখন আমার এইসব পুরনো পরিচিত বন্ধুরাই সবরকমে আমাকে সহায়তা করেছে। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুঝলাম, এখানে কংগ্রেসেরও যাতায়াত শুরু হয়েছে। আগে এখানে লাল ঝাণ্ডাই ছিল একমাত্র ঝাণ্ডা, অন্য কোন ঝাণ্ডা তো উড়তে দেখিনি কিন্তু এখন দেখছি দু'চারটে কংগ্রেসী ঝাণ্ডাও উড়ছে। ছত্তিশগড়ি শ্রমিক বস্তিতেও যেন একটা ভয় ভয় ভাব। আমি রোজই যাই আর বুঝতে পারি—মেয়েদের কাছে যেন আমি ক্রমশ অবাঞ্ছিত হয়ে উঠছি। নির্বাচন যত এগোয় ততই আমার সঙ্গে মেয়েরা ঘুরতে আপত্তি জানায়। অথচ এরা আমার কতদিনের পরিচিত মেয়ে। ভোটের আগের দিন সন্ধ্যায় আমার বিশ্বস্ত মেয়েরা আমাকে বলেই দিল—এখানে কিছু হবে না। সবার মন ঘুরে গেছে। কংগ্রেস থেকে এসে টাকা ও শাড়ি দিয়ে গেছে। তুমি আর এসো না, তোমার বিপদ হতে পারে। এসব বিশ্বাস করতে পারছি না কিছুতে। কারণ, আমি ছাড়া এখানে আর কাউকে আসতেও দেখিনি। শুনলাম, আমি কাজ সেরে চলে যাওয়ার পর রাত্রে ওরা আসে।

ভোটের দিন সকালবেলা একটা ক্যাম্প গিয়ে আমি বসে আছি। হঠাৎ বেলা ৮টা নাগাদ দেখলাম গাড়ি গাড়ি সাদা টুপি পরা ছেলেরা লরি থেকে ধুপধাপ নামছে ও বন্দেমাতরম ধ্বনি দিতে দিতে সমস্ত বস্তি এলাকা ঘিরে ফেলছে। আমি অবাক হয়ে গেলাম। এদের তো কাউকেই আগে কখনো দেখিনি।

ভোটের সময় দেখি আমার ক্যাম্পের বয়স্ক ছেলেরা মাথার লাল টুপি ও বুকের লাল ব্যাজ খুলে ফেলেছে। কেউ আর ক্যাম্পে বসতে সাহস করছে না। আমি কতকগুলো বাচ্চা ছেলে নিয়ে প্রায় একলাই বসে আছি। বাচ্চারাই লাল টুপি পরে লাল ঝাণ্ডার জয়ধ্বনি দিচ্ছে। বুঝলাম অবস্থা শোচনীয়। তবুও ৩টা পর্যন্ত বসে থাকলাম। হঠাৎ দেখি পাঞ্জাবী ছেলেরা পাগড়ি মাথায় ও বেল্‌চা হাতে নিয়ে আমার ক্যাম্পের সামনে দিয়ে ছুটে যাচ্ছে। আমাকেও বেল্‌চা উঁচিয়ে ভয় দেখিয়ে গাল দিতে দিতে গেল। যেদিক যাচ্ছে সেদিকের ক্যাম্পে রয়েছে অমৃত নাগ। ভয় হলো—ওকে মারে যদি। আমি ক্যাম্প ছেড়ে যাচ্ছি এমন সময় নীলিমা সেনও তার ক্যাম্প ছেড়ে চলে এসেছে। আমরা দু'জনেই ফার্ন রোডে থাকি। সামনের দিকের রাস্তায় এগুতেই শুনলাম—অমৃতদের ক্যাম্প জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং ওদেরকে মারধোরও করেছে। আমাদের কিন্তু কেউ আর কিছু বললো না। রেল স্টেশনে এসে শুনি—আগের গাড়িটায় প্রখ্যাত অধ্যাপক কমরেড নীরেন রায় ছিলেন। তাঁকে দুর্বৃত্তেরা টেনে নামিয়ে প্রচণ্ড মার দিয়েছে। অন্যদের সাহায্যে অতি কষ্টে তিনি গাড়িতে উঠে চলে আসতে পেরেছেন। পরের গাড়িতে আমরা এলাম। কোন গোলমাল ছিল না। বালিগঞ্জে যখন পৌঁছেছি তখন রাত প্রায় ৮টা। ফার্ন রোডের বাড়িতে এসে শুনলাম আর এক মহাভারত।

কিছু মারামারি হবে এটা অনুমান করেই আমাদের বাড়িটাকে একটা ফার্স্ট এইড্ কেন্দ্র করে রাখা হয়েছিল। আমাদের এক বন্ধু ডাঃ বিশ্বনাথ দাস এর দায়িত্বভার গ্রহণ করেছিলেন। আর ছিল আমার ভাই দেবু ও মনোরমার ছোট মেয়েটি।

আমরা ঘরে ঢুকে দেখি সব অন্ধকার করে ওরা বসে আছে। আর ভার্তিয়া কারখানার প্রায় ২০/২২ জন আহত শ্রমিক সেখানে শায়িত। আমরা যেতেই ওরা বললো—জগবন্ধু স্কুলে ভার্তিয়া কারখানার বুথ হয়েছিল। পার্টি থেকে যে ক্যাম্প খোলা হয় সেখানে শ্রমিকদের আসতে দেখে কংগ্রেসী ছেলেরা চটে যায়। ওরা ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দেয় ও শ্রমিকদের বেধড়ক পেটায়। পাড়াটা ওদের চেনা নয়। তাই বেপাড়ায় বিপদে পড়ে পালাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কম বাড়িতেই আশ্রয় পায়। আমাদের বাড়িতে কিছু শ্রমিক ঢুকলে ডাঃ বিশ্বনাথ ও আমার ভাইয়ের সাহসের জোরে ওরা বেঁচে যায়। ওরা দু'জনে সেদিন বুক দিয়ে দরজা চেপে না দাঁড়ালে বোধহয় অতজন শ্রমিক মারাই পড়ত।

এখন মুশকিল হলো এদের পার করি কি করে এবং কোথায়? কর্নফিলড্

রোডে রেণুরা থাকত। আমি ও মনোরমা ওখানে গিয়ে ঘটনাটা বলি। শুনলাম, সারা কলকাতাতেই এই অবস্থা। বৌবাজারে ট্রেড ইউনিয়ন অফিসটা হাসপাতাল হয়ে গেছে। শ্রী নিখিল চক্রবর্তীর ভাই বাদল প্রায় রাত ১২টায় গাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়ি এলো। তখন আর পাড়ায় কেউ নেই। সব নিস্তব্ধ। বাদল কয়েকবার ওদেরকে নিয়ে দূরে দূরে যেখানে ওরা নামতে চাইল সেখানে গিয়ে ছেড়ে দিয়ে এলো।

নির্বাচনে বঙ্কিমবাবু ও সোমনাথ লাহিড়ী হারলেন। জিতলেন জ্যোতিবাবু, রতনলাল ব্রাহ্মণ ও দিনাজপুরের রূপনারায়ণ রায়।

আইন সভায় জ্যোতিবাবুর এই প্রথম প্রবেশ এবং এঁরা ৩ জন এলেন বলেই সোমনাথ লাহিড়ী কন্‌স্টিটিউয়েন্ট এসেম্‌ব্লির সদস্য হলেন।

কিন্তু কমিউনিস্টদের উপরে রাগের ঝাল ঝাড়বার চেষ্টা আজ এখানে কাল সেখানে চলতেই লাগল। আমাদের মহিলা সমিতিও এই হামলার হাত থেকে বাদ গেল না। বৌবাজারের একটা গলিতে সমিতির একটা স্কুল চলত। অল্পবয়সী দুটি মেয়ে পড়াতে আসত সেখানে। একদিন তাদের উপরেও চললো আক্রমণ, অশ্রাব্য গালাগালি, আর ঢিল ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুণ্ডারা হুকুম দিচ্ছে ওখান থেকে স্কুল সরাতে হবে। ইতিমধ্যে বেলা ও পঙ্কজ ওখানে হাজির হওয়ায় ব্যাপারটা আর বেশীদূর গড়ায়নি। বেলা ও পঙ্কজের পাল্টা ধমকে ওরা পালিয়ে যায়। ভোটের দিন বৌবাজারে অবস্থিত আমাদের পার্টির হাসপাতাল পর্যন্ত ওদের হাত থেকে রেহাই পায়নি। ডাক্তার ও রোগীদের মিলিত প্রতিরোধে ওরা উপরে উঠতে পারেনি। অর্ধমৃত অবস্থায় রোগীরা কোনমতে বেঁচে গিয়েছিলেন।

এই সময়ে কি কারণে শ্রীযুক্তা নাইডু এলেন কলকাতায়। উঠলেন ডাঃ বিধানচন্দ্রের বাড়িতে। আমরা কয়েকজন রেণুর সাহায্যে তাঁর কাছে গিয়ে সমস্ত অবস্থাটা বুঝিয়ে বললাম। উনি তো চটে লাল।

শ্রদ্ধানন্দ পার্কে কংগ্রেস থেকে ওঁর জন্য একটা মিটিং ডাকা হয়েছিল। সেই মিটিং-এ আমাদের যেতে বললেন। আমরা সবাই গেলাম। শ্রীযুক্তা নাইডু উঠেই আগে লাঠিধারী ভলান্টিয়ারদের হয় লাঠি ফেলে দিতে, না হয় মিটিং ছেড়ে চলে যেতে হুকুম দিলেন। ভলান্টিয়াররা তাঁর সম্মান রক্ষার অজুহাত দেখালে উনি যেভাবে তীব্র ভাষায় ওদের গালাগালি করেছিলেন তাতে ওদের কংগ্রেসী সত্তা ধরেই টান পড়ল। সবটা এখন আমার মনে নেই। তবে অনেকটাই আছে। শ্রীযুক্তা নাইডু বলেছিলেন, 'কংগ্রেসী স্বেচ্ছাসেবক হয়ে কে তোমাদের লাঠি ধরতে হুকুম দিয়েছে ? কে তোমাদের বলেছে কমিউনিস্ট দেখলেই তাকে

মারতে হবে ? তোমরা এতদূর নীচে নেমেছ যে মেয়েদের অফিস পর্যন্ত আক্রমণ করছ। একাজ গুণ্ডাদের—একাজ গান্ধীজীর কংগ্রেসসেবীর নয়। আমাকে রক্ষা করতে এসেছ তোমরা ? ঐ লাঠি দিয়ে ? এতে আমাকেই তোমরা অপমান করছ।' এই ধরনের তীব্র ভাষায় তিনি ওদের ধিক্কার দিয়েছিলেন মনে পড়ে। এরপর থেকে সমিতির কাজে আমরা আর বিশেষ বাধা পাইনি।

যখন কংগ্রেসের মধ্যে কমিউনিস্টদের সম্বন্ধে মার মার কাট্ কাট্ মনোভাব সেই অবস্থায় শ্রীযুক্তা নাইডুর এই উদার দৃষ্টিভঙ্গিতে, পরমতসহিষ্ণুতার এই উদাত্ত আহ্বানে আমরা মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। মনে হলো—শুধু ওদের নয়, আমাদেরও তিনি অনেক কিছু শিখিয়ে গেলেন।

কংগ্রেসের এই উৎকট রূপটা পাড়ার লোকেরা ভাল চোখে দেখেন নি। আমাদের বাড়িটা তাঁরা রাত জেগে পাহারা দিতেন। কোন শব্দ হলেই বাড়ির কর্তারা ছাদে উঠে আসতেন, হাঁকডাক করতেন এবং 'কিছু নয়' এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হলেই তবে শুতে যেতেন। ওঁরাই আমাদের বলতেন, 'আপনাদের কোন ভয় নেই, আমরা আছি।' সাধারণ মানুষের শুভবুদ্ধি সেদিন আমাদের রক্ষা করেছে।

আত্মরক্ষা সমিতির তৃতীয় সম্মেলন

মহিলা আত্মরক্ষা সমিতির তৃতীয় সম্মেলন কলকাতায় অনুষ্ঠিত হলো। সমিতির সদস্যা সংখ্যা তখন প্রায় ৫০ হাজারের কাছাকাছি। সমিতির কর্মকেন্দ্র ও শিক্ষাকেন্দ্র আরও প্রসারিত হয়েছে। 'ঘরে-বাইরে' পত্রিকা হিসাবে সেই সময় বেশ প্রতিষ্ঠিত।

ইউনিভারসিটি ইনস্টিটিউট হল এবার ভাড়া নেওয়া হলো। 'ওভারটুন হলে' এখন আর চলে না। কাছাকাছি আর একটা স্কুলে ডেলিগেটদের থাকা ও সমিতির শিল্প-প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হয়েছিল।

এবার আমরা সভানেত্রী পেলাম শ্রদ্ধেয়া জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলীকে। উনি কংগ্রেসের একজন সক্রিয় নেত্রী। কিন্তু তাঁর মনে কোন সংস্কার ছিল না। যে সময়ে কংগ্রেসের কমিউনিস্ট বিরোধিতা তুঙ্গে সেই সময়ে শ্রীযুক্তা গাঙ্গুলীর মতো একজন সাহসী ও উদার মনের নেত্রী লাভ করে আমরা বিস্মিত হয়েছিলাম। কেমন করে উনি আমদের মধ্যে এলেন সেটা এখন আমার ঠিক মনে নেই।

সম্মেলনটি খুব জমজমাট হলো। হলটিতে মেয়েরা উপচে পড়ছে। এবারে চটকল ও কেশোরাম কটন মিলস্ থেকে শ্রমিক মেয়েদের এবং গ্রামের কৃষক মেয়েদের উপস্থিতিও লক্ষণীয় ছিল। কোশোরাম সুতাকলের মেয়েদের মধ্যে কাজ করত দীপালি গাঙ্গুলী নামে আমাদের একটি কর্মী।

সভানেত্রী জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী ছিলেন খুব সক্রিয়। তিনি কমিটি মিটিংগুলিতে নিয়মিত উপস্থিত থাকতেন ও অংশ নিতেন। আমাদের আশা ছিল আমদের প্রতি কংগ্রেসের বিদ্বেষভাব ওঁর সাহায্যে কিছুটা কমানো যাবে। কিন্তু সে আশা আর পূর্ণ হলো না। জ্যোতির্ময়ী দেবী মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেলেন।

সে সময়টা ছিল আই. এন. এ. বন্দীদের মুক্তির দাবীতে ছাত্রদের বিরাট বিক্ষোভ আন্দোলনের সময়। ইংরেজ সরকার আই. এন. এ-র নেতাদের বিচার শুরু করে লালকেল্লায়। এর বিরুদ্ধে দেশব্যাপী আন্দোলন ও প্রচণ্ড বিক্ষোভ শুরু হয়। কলকাতায় 'রসিদআলী দিবস' পালনের আহ্বানে প্রধানত ছাত্র-ছাত্রীরা ও সাধারণ মানুষেরা বিশাল মিছিল বের করে। আমরাও

তাতে ছিলাম। মিছিলের পুরোভাগে ছিলেন হিন্দু-মুসলিম নেতারা। জনতার মধ্যেই ঘটেছিল হিন্দু-মুসলমানের রাখীবন্ধন। কিন্তু মিছিলের উপর পুলিসের আক্রমণ হয়। যেখানে মিছিল আটকানো হয় সেখানেই ছাত্ররা বসে পড়ে। সারারাত ধরে চলে এই সংগ্রাম। আমাদের মহিলাদেরকে বলা হয়েছিল অবস্থান ধর্মঘটে না থাকতে। তাই অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা উঠে আসি। কিন্তু অনেক ছাত্রী সেখানে থেকে যায়। হিন্দু-মুসলমান ছাত্র-ছাত্রীর মিলিত রক্তে রাস্তা লাল হয়। শ্রীযুক্তা গাঙ্গুলী এই ছাত্রদের পাশে সারারাত ছিলেন। সেই রাত্রিভোরেই দুর্ঘটনায় তিনি নিহত হন।

রসিদ আলী দিবসের ছাত্র-অভ্যুত্থান ছিল বাঙলাদেশে যুদ্ধাবসানের পর সর্ববৃহৎ ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভ্যুত্থান। ছাত্রদের উপর অত্যাচারের প্রতিবাদে হরতাল হলো। প্রগতিশীল লেখকেরা মুখর হলেন। আন্দোলনে অনেক কংগ্রেস কর্মীও ছিলেন। কিন্তু কমিউনিস্ট নেতৃত্বে পরিচালিত আন্দোলনে খোলা মন নিয়ে কংগ্রেস সংগঠন হিসাবে তাঁরা আসেন নি।

আমাদের সমিতির এমন একজন বলিষ্ঠ নেত্রীকে হারিয়ে আমরা বেশ অসহায় বোধ করছিলাম। সেই দুর্দিনে আমাদের মধ্যে এলেন বিখ্যাত প্রশান্ত মহলানবীশের পত্নী, রবীন্দ্র-স্নেহধন্যা, শ্রীযুক্তা রানী মহলানবীশ। ইনি ব্যক্তিত্বসম্পন্না তেজস্বিনী মহিলা। আমাদের কাজকর্মে তিনি নানাভাবে সাহায্য করতে লাগলেন। সমিতির কর্মীদের উপর এখানে-ওখানে কংগ্রেসী ছেলে-দের দুর্ব্যবহার তখনও চলছে। বাধ্য হয়ে রানী মহলানবীশ যুগান্তরে এর বিরুদ্ধে একটি জোরালো প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। উনি কোন পার্টি বা দলের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন না। সমাজ-কল্যাণের কাজেই তাঁর আগ্রহ ছিল। আমাদের প্রতি তাঁর সহানুভূতিও সেই কারণে। ওঁর বাড়িতে উনি নিজেই একটি শিল্পসমিতি চালাতেন।

সমিতির সম্মেলন—এর পর থেকেই ২ বছর পরে পরে অনুষ্ঠিত হতো। সভানেত্রী হিসাবে মোহিনী দেবী, প্রভাবতী দেবীসরস্বতী, আর্যবালা দেবী প্রমুখ বহু বিশিষ্টাদের আমরা পেয়েছিলাম।

তেভাগা আন্দোলনের পাশে

বাঙলাদেশে ভূস্বামীদের সঙ্গে কৃষকদের জমির সম্পর্ক নানা ধরনের এবং তা বহু স্তরে বিভক্ত। জমিদারী প্রথাটা পুরুষানুক্রমে ভাঙতে ভাঙতে এই নানারকম সম্পর্কের সৃষ্টি হয়েছে। জমিদাররা কালে কালে শহরবাসী হওয়ায় জমিভিত্তিক সম্পর্ক আর প্রত্যক্ষভাবে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে থাকল না। বহু মধ্যবর্তী স্বত্বভোগীর সৃষ্টি হলো। এদের সুবিধা অনুযায়ী এরাও কৃষকদের সঙ্গে জমির নানারকম বন্দোবস্ত করে থাকে। এই সম্পর্কের একটি হচ্ছে 'আধিয়ার' বা 'ভাগচাষ' সম্পর্ক। এসব সম্পর্ক জমিদার বা জোতদাররা বরাবর মুখে মুখেই চালু রাখে। জমিদারের সেরেস্তাই হলো কৃষকের 'হাইকোর্ট'। ওখানে যা লেখা হবে, কৃষকের টিপসই দেওয়া থাকলে সেটাই বন্দোবস্ত হয়ে গেল। বন্দোবস্তের একপক্ষ চিরদিন ভয়ে ভয়ে থাকে। কারণ, কর্তৃপক্ষের ইচ্ছা হলে টিপসই দিয়ে অন্য কৃষককে বসিয়ে দেওয়া যায়। উচ্ছেদ হওয়া কৃষকটির না থাকে কোন পাকা দলিল, না থাকে পয়সার জোর, তাই সে কোর্টে মামলা করতেও পারে না। 'আধিয়ার' বন্দোবস্তের মানে হলো—মালিকের জমি কৃষক চাষ করলে ফসল ওঠার পর তা দু'ভাগ হবে। এর একভাগ মালিকের, অন্যভাগ কৃষকের। বাইরের থেকে দেখলে সুবিচারই মনে হবে। কিন্তু হিসেব কষলে ফাঁকিটা ধরা পড়ে। চাষের খরচটা সম্পূর্ণ কৃষকের উপর চাপানো হয়। চাষ করার সময় এই অর্থ কৃষককে কর্জ করতে হয়। কোন কারণে ফসল যদি মার খায় তবে কৃষকের মাথায় হাত। যতটা ফসল উঠবে মালিক তো তার অর্ধেক নেবেই, বাকী অর্ধেক থেকে সুদ সমেত কর্জ শোধ দিয়ে কৃষকের ঘরে আর কিছুই ওঠে না। তার উপরে সেই মালিকের কাছ থেকে খোরাকির জন্য কর্জ না নিলে কৃষকের পরিবার বাঁচে না। পরের বছর খোরাকির কর্জ, চাষের কর্জ, সব শোধ করতে না পারলে কৃষকের ভিটেটুকু নীলাম হবে এবং তার জায়গায় অন্য ভাগচাষী বসবে। ইংরেজ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চক্রাকারে বাঙলার কৃষকদের এই হাল করে ছেড়েছে।

এই আধি-প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের ন্যায়সঙ্গত বিক্ষোভ বহুদিন ধরে ধূমায়িত হচ্ছিল। সেটা ফেটে পড়ল ১৯৪৬ সনের শেষের দিকে। যেসব জিলায় এই প্রথা চালু ছিল সেসব জিলায় কৃষকের আন্দোলন শুরু হলো। দাবী হলো—

জমিতে আইনমাফিক অধিকার দিতে হবে। আর ফসল উঠলে তা তিন ভাগ করতে হবে। এক ভাগ চাষীর, একভাগ মালিকের এবং তৃতীয় ভাগটা চাষী পাবে খরচ-খরচা বাবদ। মোটামুটি এই হলো 'তেভাগা'র বৃত্তান্ত।

ময়মনসিং, মালদা, দিনাজপুর, রংপুর, ২৪-পরগণার কাকদ্বীপ, যশোর, খুলনা এবং মেদিনীপুরের কিছুটা জায়গায় লড়াইটা হয়েছিল। কৃষকদের দাবী হলো—ফসলের সবটা তোলা হবে কৃষকের গোলায়। সেখানে ফসল তিন ভাগ করা হবে। জমিদার তার একভাগ নেবে। নইলে জমিদারের গোলায় তুললে জমিদার ভাগ করার আগেই ধান সরিয়ে ফেলবে। জমিদাররা এই কর্মটি এমনিতেই করে, তেভাগা হলে তো করবেই। কৃষকের রণধ্বনি হলো—'জান দেবো তবু ধান দেবো না।' কাজটা মোটেই সহজ ছিল না। জমির মালিক-দের সাহায্যের জন্য গ্রামে গ্রামে লাঠি আর বন্দুকধারী পুলিস ছেড়ে দেওয়া হলো। তখন সুরাবর্দি সাহেবের সরকার বাঙলাদেশে অধিষ্ঠিত। প্রথম পর্বে শুরু হলো ধান কাটা নিয়ে লড়াই। পুলিস সঙ্গে করে মালিকপক্ষ গুণ্ডা দিয়ে ফসল তোলা শুরু করল। ভাগচাষী মাঠে নামলে লাঠি-গুলি চলতে লাগল। প্রত্যেক গ্রামে জমিদার বাড়িতে বসল পুলিস-ক্যাম্প। লড়াইয়ের একদিকে ছিল পুলিস ও মালিকের গুণ্ডা বাহিনী, অন্য পক্ষে ভাগচাষী। স্বভাবতই ভাগ-চাষীদের রক্তে মাঠ হতো লাল। দ্বিতীয় পর্বের লড়াই হলো—যে-কৃষক নিজের গোলায় ধান তুলতে পেরেছে তার ধান গোলা থেকে লাঠি ও গুলির সাহায্যে কেড়ে নেওয়া, সেটা না পারলে ধানের গোলায় আগুন জ্বালিয়ে দেওয়া। শুধু গোলা নয়, কৃষকের ঘরও তার সঙ্গে জ্বলত। মাঠের ধান কাটতে গিয়ে এবং গোলার ধান বাঁচাতে গিয়ে বহু কৃষক মারা যায়। কৃষক-বধূদের মৃত্যুবরণের সংখ্যাও কম নয়।

এই ধানের লড়াইতে প্রথম থেকেই কৃষক মেয়েরা দল বেঁধে পুরুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে। একদিকে লাঠি-বন্দুক নিয়ে পুলিস ও ভাড়াটে গুণ্ডার দল, অন্য দিকে খালি হাতে কৃষক জনতা। এই অসম লড়াইতে কৃষকদের বেশিক্ষণ টিকে থাকা সম্ভব নয়। গ্রামে গ্রামে কৃষকদের নিশ্চিহ্ন করার একটা বন্য উন্মত্ততা পুলিসদের যেন পেয়ে বসেছিল। বিপদ বুঝে এবার মেয়েদের সামনের সারিতে দাঁড়াতে হলো তাদের আদিম অস্ত্র দা-বটি-ঝাঁটা, লঙ্কার গুঁড়ো প্রভৃতি নিয়ে। 'পুলিস আসছে' টের পেলে মেয়েরাই শঙ্খধ্বনি করে গ্রামবাসীদের কাছে সংকেত পৌঁছে দিত। ছেলেরা তখন জঙ্গলে চলে যেত। আন্দোলনের নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটাও করত ঐ মেয়েরাই। মেয়েদের

সঙ্গে পুলিসের মুখোমুখি লড়াই হয়েছে। ধানের গোলায় আগুন দিলে মেয়েরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে নেভাতে যেত। তারা মার খেত, অত্যাচারে জর্জরিত হতো, আবার যা পেত তাই দিয়ে মারত—তবু পুরুষদের সামনে আসতে দিত না।

দিনাজপুরের খাঁপুর এলাকায় আমি গিয়েছিলাম। ওখানে মাত্রাছাড়া অত্যাচার চলেছিল। ওখানে পৌঁছে দেখলাম, একটা থমথমে ভাব। রানী মিত্রের কাছে শুনলাম সব কথা। রানী ওখানে ওদের সঙ্গেই ছিল। আমার সঙ্গেও এই প্রথম আলাপ। মধ্যবিত্ত ঘরের শিক্ষিত মেয়ে। আমার জানা ছিল না—এরকম মেয়ে ওসব লড়াইয়ের এলাকায় আছে। রানী অমাকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘটনার জায়গাগুলো সব দেখায়। একদিন রাতে রানী দেখাল গ্রামের কৃষকেরা তিনটি মৃতদেহ বয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একটি মাত্র লণ্ঠন সঙ্গে। অন্ধকারে শহীদদের মাটি চাপা দিতে নিয়ে যাচ্ছে। লড়াইটা হয়েছিল আগের দিন। আরও কয়েকজন নিহত হয় এই লড়াইয়ে। মাত্র তিনটি দেহ এরা লুকিয়ে ফেলতে পেরেছিল। অন্ধকারে দাঁড়িয়ে ঐ নিদারুণ দৃশ্যটা সেদিন আমরা দেখেছিলাম।

দিনের বেলায় দেখলাম গ্রামটা খা খা করছে। পথে কেউ বেরোয় না। ওখানেই পুকুর পাড়ের লড়াইতে পুলিসের গুলিতে একটি মেয়ে খুন হয়। গ্রামের মেয়েরা ঐ রক্তমাখা জায়গাটুকু একটা ঝুড়ি দিয়ে ঢেকে রেখেছিল। সেখানে সকালে মেয়েরা ফুল ছড়িয়ে দেয়, বিকালে প্রদীপ দেয়। যে বাড়িতে আমি ছিলাস সেখানে একদিন সকালবেলা ছেলেদের খোঁজে পুলিস এলো। মেয়েরা শঙ্খের আওয়াজ পেয়ে আমাকে ওদের একটা শাড়ি পরিয়ে উঠোনে চুলোর পাশে বসিয়ে দিল। চুলোতে তখন ধান সেদ্ধ হচ্ছিল আর আমি সেই চুলোতে ঠেলে দিচ্ছিলাম শুকনো পাতা। আমার একগলা ঘোমটা দেখে পুলিস আর কিছু খোঁজ করল না। ঘরে এবং এদিক-ওদিক ছেলেরা আছে কিনা দেখেশুনে চলে গেল।

এইভাবে কয়েকদিন থেকে আমি চলে এলাম। কলকাতায় পার্টি তখন চেষ্টা করছে তেভাগার কথা খবরের কাগজে প্রকাশ করতে এবং কিছু কিছু জনসভায় এদের কথা বলতে। সুরাবর্দি সাহেবের সঙ্গেও দেখা করার চেষ্টা হলো। এই একই ধরনের লড়াই রংপুরে, কাকদ্বীপে এবং অন্যান্য তেভাগা এলাকায় চলতে থাকল প্রায় বছর খানেক ধরে। কৃষকদের খুনে হাত রাঙিয়ে এবং তাদের উপর নির্মম অত্যাচার চালিয়ে পুলিস হয়েতো ক্লান্ত হলো কিন্তু কৃষকরা হার মানে নি। ছেলেদের সামনাসামনি পাওয়া যায় না, তাই মেয়েদের উপর

যতদূর সম্ভব লাঠালাঠি করেছে, খুনও করেছে। কিন্তু তারও একটা সীমা আছে। সামনে চাষের কাজ। পুলিসের পাহারায় একাজ হবে না, এক থা মালিকরাও বুঝল। একটা ফসল বরবাদ হয়েছে। আর বাড়াবাড়ি করলে সামনেরটাও নষ্ট হবে। কলকাতা থেকে কয়েকটি জায়গায় সংবাদপত্রের লোকেরা গেলেন, কিছু ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাকেও নিয়ে যাওয়া হলো। ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী মঞ্জুশ্রী দেবীকে রানী দাশগুপ্ত নিয়ে গেল দিনাজপুরে। আরও অনেকে গিয়েছিলেন। এই যাতায়াত, জনসভা ও সংবাদপত্রে ঘটনা প্রকাশের ফলে কৃষকদের সমর্থনে জনমত গড়ে উঠল। সুরাবর্দি সাহেব বুঝলেন, এই লড়াইতে তিনি পরাস্ত হয়েছেন। অগত্যা তিনি কৃষক নেতাদের সঙ্গে মীমাংসায় বসতে রাজী হলেন। ময়দানে তেভাগা এলাকা ও অন্য এলাকা থেকে আসা কৃষকদের নিয়ে প্রকাণ্ড জমায়েত হলো। এদের সমর্থনে এগিয়ে এলো শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত মানুষ। মীমাংসার টেবিলে সুরাবর্দি সাহেবের সামনে কৃষক নেতাদের সঙ্গে উপস্থিত থাকল বিমলা মাজি। মেদিনীপুরের তেভাগা আন্দোলনে বিমলা ছিল নেত্রী। কৃষকদের সংগ্রামে তাদের ঘরের মেয়েরাও যে সমান অংশীদার—এ তারই স্বীকৃতি।

মীমাংসায় কৃষকদের দাবীর ন্যায্যতা সুরাবর্দি মানলেন কিন্তু এ নিয়ে আইন পাস হলো স্বাধীনতার পরে ডঃ বিধানচন্দ্র রায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বের আমলে। সেই আইন ভূমি-সংস্কার আইন নামে পরিচিত। সেই আইনের আরো পরিবর্তন করে বর্তমান বামফ্রন্ট সরকার গ্রামে গ্রামে তা রূপায়িত করার চেষ্টা করছেন। এতে সংঘাত ও সংঘর্ষ যে হচ্ছে কাগজে তার খবর বেরোয়। এবং এই সংঘাতও অনিবার্য।

সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভ্যুত্থানের জোয়ার

পূর্ববর্ণিত রসিদ আলী দিবসের ছাত্রঅভ্যুত্থান ছিল বাঙলাদেশে যুদ্ধাবসানের পর সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী অভ্যুত্থান। সুভাষচন্দ্রের বিখ্যাত বাহিনী ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি বিজয়ীর বেশে ভারতে প্রবেশ করতে পারেনি। বর্মাতে ইংরেজের হাতে তাদের আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। ইংরেজ সরকারের হুকুম ছিল বাহিনীর নেতৃবর্গের কোর্ট মার্শাল বিচার হবে। রসিদ আলী ছিলেন আই. এন. এ-র সর্বোচ্চ নেতা। তাঁর বিচারের হুকুমের বিরুদ্ধেই সেদিন ছাত্র ফেডারেশনের নেতৃত্বে কলকাতা উত্তাল হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলন সহজে হার মানেনি। রসিদ আলীর বিচারের স্থগিতাদেশ আদায় করে তবে এই আন্দোলন থেমেছিল। তুঃখের বিষয় এই আন্দোলনে কংগ্রেস সংগঠন হিসাবে যোগ দিল না —ব্যক্তিগতভাবে অনেকেই অবশ্য ছিলেন। যে সুভাষচন্দ্রের বিরোধিতা করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টিকে কংগ্রেসের উৎপীড়ন সহ্য করতে হয়েছে, সেই সুভাষচন্দ্রের বাহিনীকে কংগ্রেস হাত বাড়িয়ে ইংরেজের প্রতিহিংসা থেকে রক্ষা করবেন, এটাই ছিল স্বাভাবিক প্রত্যাশা কিন্তু তা হয়নি। কেন হয়নি তা তাঁরাই বলতে পারেন।

এরপর থেকেই আমরা আশায় ছিলাম—এবার আমাদের স্বাধীনতা আসবে। কিন্তু কোন পথে? কংগ্রেস-নেতৃত্ব কোন বড় আন্দোলনের ডাক দেবেন কি? জনসাধারণের মধ্যে ছিল একটা অস্থিরতার ভাব। কিন্তু কোন আন্দোলনের লক্ষণ দেখা যাচ্ছিল না। উচ্চমহলে ইংরেজ প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠকের পর বৈঠকের খবর বেরোয়। আর চলছিল কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে তীব্র মতানৈক্য।

এর মধ্যেই ১৯৪৬ সনের ২১শে ফেব্রুয়ারি হঠাৎ বোম্বাইতে ঘটল নৌ-বিদ্রোহ। নৌ-ঘাটির সেনাবাহিনীর মধ্যে কতকগুলি দাবীদাওয়া নিয়ে বিক্ষোভ ধূমায়িত হচ্ছিল। ঐ দিন ইংরেজ সেনাবাহিনীর সঙ্গে তাদের গুলি বিনিময় হয়। নৌ-ঘাটির ভারতীয় বাহিনী ও সমস্ত কর্মীরা একত্রিত হয়ে সশস্ত্র অবরোধ চালায়। নৌ-ঘাটিতে কংগ্রেস ও লীগের পতাকার সঙ্গে লালঝাণ্ডাও ওড়ানো হয়। লড়াইটা ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতার রূপ নেয়।

অপর দিকে বোম্বাই-এর সমস্ত শ্রমিক একযোগে ধর্মঘটের ডাকে নৌ-

বাহিনীর সমর্থনে রাজপথে নেমে আসে। কমিউনিস্ট পার্টি এই বিদ্রোহকে সমর্থন করে এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চরম আঘাত হানার জন্য শ্রমিকদের কাছে আহ্বান জানায়। বোম্বাইতে নরনারী নির্বিশেষে সমস্ত পার্টি-কর্মীই নৌ-বিদ্রোহীদের সাহায্যের জন্য প্রাণ হাতে করে রাস্তায় নামে। ইংরেজ সরকার নৌ-ঘাটিতে যখন খাদ্য সরবরাহ বন্ধ করে দিল তখন পার্টি-কর্মীরা দুঃসাহসিকভাবে তাদের খাদ্য যোগান দিতে লাগল। ইংরেজ ফৌজ শেষ পর্যন্ত এদের উপর লাঠি ও গুলি চালাতে আরম্ভ করল। এর ফলে প্রায় দুই শত শ্রমিক নিহত হলো। মহিলা কর্মীরাও লাঠির ঘায়ে আহত হলেন।

ইংরেজ ফৌজের জঙ্গী লাট ঘোষণা করল—এই নৌ-বিদ্রোহ সহ্য করা হবে না। শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করা হবে। নৌ-ঘাটি নিশ্চিহ্ন হলেও ক্ষতি নেই কিছু।

এই পরিস্থিতিতে বিদ্রোহীরা কংগ্রেস নেতৃত্বের কাছে সাহায্য ও সমর্থনের আশায় আবেদন পাঠায়। কিন্তু সেই আবেদনের উত্তরে নেতারা যেসব উক্তি করলেন তা বেদনাদায়ক। গান্ধীজী ওদের হিন্দু-মুসলিম ঐক্যকে অশুভ আঁতাত (আনহোলি এ্যালায়েন্স) বলে আখ্যা দিলেন এবং বিদ্রোহ সম্পর্কে বললেন—'এই যদি আমাকে দেখতে হয় তবে আমি ১২৫ বছর বাঁচতে চাই না বরং আগুনে আত্মবিসর্জন শ্রেয় মনে করব।' জঙ্গী লাটের অনুকরণে প্যাটেলও শৃঙ্খলা রক্ষা করতে উপদেশ দিলেন। আজাদ সাহেব বললেন—ধর্মঘট, হরতাল, কর্তৃপক্ষের অবাধ্যতা এখন অচল। এইসব উপদেশ বর্ষণ করার পর নেতারা বিদ্রোহীদের বললেন—তাঁদের কাছে বিনা শর্তে আত্মসমর্পণ করতে। অতঃপর বিদ্রোহীরা নিরুপায় হয়ে তাই করতে বাধ্য হলেন। মাথা হেঁট করেই তাদের ওড়ানো তিনটি পতাকা সমর্পণ করে এলেন নেতাদের কাছে। এই আত্ম-সমর্পণের ঘটনাটি ভারতের ইতিহাসে অসম্মানজনক আত্মসমর্পণ (ডিস-অনারেবল্ সারেণ্ডার) রূপে চিরকাল আখ্যাত হবে।

এর কিছু পরেই ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বে শ্রমিকদের একটি শক্তিশালী ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। এখনও মনে পড়ে, সেই ধর্মঘটে লালবাজার ও লালমুখো ইংরেজদের প্রায় ইঁদুরের গর্তে ঢোকার মতো অবস্থা হয়েছিল। সারা ভারত ডাক ও তার-কর্মীরা তাদের দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট করেন। তারই সমর্থনে সারা ভারত ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস থেকে দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের আহ্বান দেওয়া হয়। দিনটা ছিল '৪৬ সনের ২৯শে জুলাই। শ্রমিক ধর্মঘট যে সরকারের প্রায় সমস্ত যন্ত্রই বিকল করে দিতে পারে পার্টি-জীবনে এই প্রথম সেটা প্রত্যক্ষ

করলাম। কমিউনিস্ট আন্দোলনের প্রতি শ্রদ্ধা অনেক বেড়ে গেল। ধর্মঘট ছিল মূলত ডাক-তার এবং টেলিফোন অফিসের কর্মচারীদের। কিন্তু সমর্থনে বেরিয়ে এলো স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীসহ রাইটার্স বিল্ডিংস-এর সমস্ত সরকারী কর্মচারী। বেসরকারী অফিস-দপ্তর, পরিবহণ, কলকাতা বন্দর, রেল এবং রেডিও অফিস সমস্তই সেদিন ডাক ও তার বিভাগের সমর্থনে অচল হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজদের প্রচার কেন্দ্র রেডিও স্টেশন আগলে বসেছিল কিছু সাহেব ও পুলিস বাহিনী। কারণ, রেডিও স্টেশনে তারা ধর্মঘট করতে দেবে না। কিন্তু কলকাতার সংগ্রামী ছাত্রছাত্রীরা তাদের সেই অপচেষ্টা ব্যর্থ করে দেয়। সাহেবদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের হাতাহাতি হয়, মাথা ফাটে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধর্মঘটে অচল হয় রেডিও স্টেশন। রেডিও স্টেশনে ইংরেজ কর্তাদের মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে দেখে কলকাতার খ্যাতনামা ব্যক্তিরা ধিক্‌কার জানিয়েছিলেন।

সেদিন চৌরঙ্গীর সব সাহেবী অফিস, দোকান-বাজার, এমন কি হোটেল-গুলো পর্যন্ত বন্ধ ছিল। সাহেবদের বাড়িতেও শুনেছিলাম সেদিন ছিল অরন্ধন। কারণ বয়-বাবুর্চি, বেয়ারা সবাই অনুপস্থিত। সেদিন সকালে পায়ে হেঁটে সারা চৌরঙ্গী ঘুরেছিলাম। দেখেছিলাম, সাহেবদের ৩/৪ তলা বাড়িগুলো সবই বন্ধ, জানালা পর্যন্ত খোলা নেই। হঠাৎ হঠাৎ কেউ খিড়কি ফাঁক করে রাস্তা দেখে আবার বন্ধ করে দিচ্ছিল। একটা গোরা সৈনিক চৌরঙ্গীকে নিরাপদ মনে করে মোটর সাইকেলে যাচ্ছিল। রাস্তায় হৈ হৈ রব শুনে সে লোকটাও নাকি পড়িমরি করে ছুটে পালায়। সেদিন মনে হয়েছিল শ্রমিকশ্রেণী শক্ত হয়ে দাঁড়ালে দেশী-বিদেশী মালিকেরা কত ভয় পায়। মনে হয়েছিল, আমাদের স্বাধীনতা আর বেশী দূরে নয়।

দুপুরে ময়দান থেকে বেরুল মিছিল। বিশাল মিছিল। সমস্ত কারখানার শ্রমিক, অফিস-দপ্তরের কর্মচারী, ডাক ও তার শ্রমিক-কর্মচারী, টেলিফোনের মেয়ে, এমন কি অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান মেয়ে, বিশাল সংখ্যায় ছাত্র-ছাত্রী সেই মিছিলে সামিল হলো। ট্রাম-বাসের শ্রমিকেরা এসেছিল ইউনিফর্ম পরে। আমরা মহিলা সমিতির কর্মীরা যে যেখানে ছিলাম সবাই প্রায় যোগ দিয়াছিলাম ঐ মিছিলে। কলকাতার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী, হোটেলের বয়-বেয়ারা—আর কলকাতার বাইরের অসংখ্য মানুষ একই সঙ্গে সেদিন পথে হেঁটেছিলেন।

চলতে চলতে মিছিলটা যখন লালবাজারের সামনে দিয়ে যাচ্ছিল—দেখলাম গেটটা ভেতর থেকে তালাবন্ধ। অনেকে রসিকতা করে গেটের লোহার শিকে ছেঁড়া চটি টাঙিয়ে দিল। লালবাজারে লাল-কালো একটা মুখও দেখা গেল না।

আমরা মিছিলের বিশালতায়, জনতার জাগরণে বিস্মিত। মনে মনে ভাবছি—স্বাধীনতা আর কতদূর?

কিন্তু বুদ্ধি থাকলে আমাদের নজরে পড়ত, আই. এন. এ. কিংবা নৌ-বিদ্রোহে অথবা এই বিশাল ধর্মঘটের জনস্রোতেও কংগ্রেসকে আমরা পাইনি। লালঝাণ্ডায় দিগন্ত লাল হলেও ত্রিবর্ণ পতাকা একটিও ছিল না। এই অনুপস্থিতি শুধু অর্থবহ নয়, বিপদের সংকেত—এটা আমাদের বোঝা উচিত ছিল।

দাঙ্গা, দেশভাগ আর স্বাধীনতা

২৯শে জুলাই-এর পর বেশীদিন অপেক্ষা করতে হয়নি। দেশভাগের কথা সুনিশ্চিত বলে শুনছি। ইংরেজের সাম্রাজ্য ত্যাগের আগে শেষ পদাঘাতটা হানবার জন্য বড় লাট ওয়াভেল সাহেব দিল্লীতে উপস্থিত। স্বাধীনতা হস্তান্তরিত হবে। কিন্তু কার হাতে? কংগ্রেস, না লীগ—কে পাবে দায়িত্বভার? ইংরেজ কর্তাদের সুপারিশ হলো—দেশ ভাগ হবে, কারণ হিন্দু-মুসলমান দুই জাতি। আমরা একপ্রাণ ভারতবাসী নই, দুই জাতি হয়ে গেছি। কী সাংঘাতিক কথা! ভাবতেই ভয় পাচ্ছি।

গান্ধীজী রাজী হচ্ছেন না। তিনি বলে দিলেন, দেশভাগ হলে আমার মৃত দেহের উপর দিয়ে হবে। আমার মনেও শান্তি ছিল না একটুও। আমার বরিশালে হিন্দু-মুসলমানকে দুই জাতি হয়ে বসবাস করতে দেখে আসিনি। সেই বরিশাল যদি আজ এই নতুন তত্ত্বের ঠেলায় পাকিস্তান হয়ে যায় তবে আমারও তো গান্ধীজীর মতোই অবস্থা। আমার বুকের উপর দিয়েই আমার জন্মস্থানটি অন্য দেশ হয়ে যাবে! আর আমি জানি—আমার মা, ভাই-বোন এবং পরিবারবর্গ কখনও দেশত্যাগ করে কলকাতায় উদ্বাস্তু হতে আসবেন না। কাজেই এই দ্বিজাতিতত্ত্বে কখনও আমার সায় ছিল না। সব চেয়ে দুঃখ পেলাম যখন জানলাম আমার পার্টিও এই তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগে সায় দিয়েছে।

স্বাধীনতা হস্তান্তরের পূর্বে ভাইসরয়ের একজিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করলেন স্বয়ং ওয়াভেল সাহেব। তিনি নিজেই হলেন তার প্রেসিডেন্ট। নেহরু হলেন ভাইস প্রেসিডেন্ট। এই কাউন্সিলে যোগ দিতে মুসলিম লীগকেও ডাকা হলো। মুসলিম লীগ সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করল। কাউন্সিলে বসে ভাগাভাগির আলোচনা অপেক্ষা তারা পছন্দ করল সম্মুখ-সমর। জিন্না সাহেব ভারতব্যাপী ডাইরেক্ট এ্যাকশনের ডাক দিলেন। বাঙলায় তখনও চলছে সুরাবর্দির নেতৃত্বে পরিচালিত সরকার।

কলকাতায় '৪৬-এর ১৬ আগস্ট সুরাবর্দি সরকার ছুটি ঘোষণা করল এবং মুসলীম লীগ একটা মিছিলে যোগ দিতে আহ্বান জানাল মুসলিম জনতাকে। এই মিছিল থেকে কিছু একটা যে অঘটন ঘটবে এটা সবাই অনুমান করেছিল।

সুতরাং হিন্দুরাও বিভিন্ন পাড়ায় তৈরি হলো। আমাদের পার্টি ঐ মিছিলের সঙ্গে থাকার সিদ্ধান্ত নিল। উদ্দেশ্য, যদি কিছু গোলমালের চেষ্টা হয় তবে পার্টি তা থামাবার চেষ্টা করবে। কিন্তু এটা তো প্ল্যান করেই করা হচ্ছে, প্রতিরোধ করা পার্টির সাধ্য ছিল না। মিছিলটা ধর্মতলায় এলে গোলমাল শুরু হয়ে যায়। ছোরাছুরিতে হতাহত হয় বেশ কিছু লোক। তারপর চলে দোকানে লুঠপাট। মিছিল যত এগোয় মারামারি ও লুঠপাট ততই চলতে থাকে। দু'পক্ষের তৈরি লোকেরাই রাস্তায় নেমেছিল। সাজানো মিছিল শেষ পর্যন্ত উধাও হলো, সারা কলকাতায় জ্বললো দাঙ্গার আগুন। 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান' ও 'আল্লা হো আকবর' ধ্বনিতে হৃদকম্প উপস্থিত হলো কলকাতার নিরীহ নাগরিকদের মনে।

হিন্দু-মুসলমান সাধারণ মানুষ দাঙ্গা চায় না। সংকীর্ণ রাজনীতির খেলার পাল্লায় যারা পড়ে তাদের কথা অবশ্য আলাদা। মুসলিম লীগের লড়াইয়ের ডাকে ৩/৪ দিন ধরে কলকাতায় নিরীহ মানুষ খুন হলো, শান্তিপ্রিয় মানুষদের বস্তি পুড়ল, বিনা অপরাধে পাশাপাশি বাস করা হিন্দু-মুসলমান দুই পাড়ায় আলাদা হয়ে বাস করতে চলে গেল।

ভাগ হওয়া মানুষেরা তাদের ঘর-দুয়ার হারিয়েছে, স্বামী-পুত্র হারিয়েছে বহু মেয়ে। সেই বিবরণে আমি যাচ্ছি না। ১৯৪৬-এর আগস্টে যাঁরা কলকাতায় ছিলেন, তাঁরা এর দর্শক ও ভুক্তভোগী। ভ্রাতৃহত্যার উন্মত্ততায় ভাগ হওয়া হিন্দু-মুসলমান যে মূল্যবান জিনিস হারিয়েছে তা হচ্ছে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও মানুষের প্রতি মানুষের ভালোবাসা ও দায়বোধ।

মাত্র ১৭/১৮ দিনের ব্যবধানেই ঐতিহাসিক ২৯শে জুলাই-এর ধর্মঘট ও তার আগের রসিদ আলী দিবসে হিন্দু-মুসলমানের রাখীবন্ধন, নৌ-বিদ্রোহে ওড়ানো কংগ্রেস-লীগ ও কমিউনিস্ট পার্টির পতাকার গ্রন্থিবন্ধন, একে একে সবই মুখ থুবড়ে ধুলোয় লুটালো। বছরের পর বছর ধরে মহিলা সমিতি হিন্দু-মুসলমান নারীর যে মিলন-প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তা এইভাবে খান্ খান্ হয়ে গেল।

আর যে-চৌরঙ্গী পাড়ায় ২৯শে জুলাই সাহেবরা ঘরের খিড়কি খুলতে সাহস পায়নি, সেখানে দাঙ্গার ক'দিন আমোদ-প্রমোদের জমজমাট আসর বসল। ইংরেজদের শেষ পদাঘাতটা এইভাবেই বুঝি আমাদের প্রাপ্য ছিল।

দাঙ্গায় সবচেয়ে মুশকিল হয় কমিউনিস্ট পার্টির। বহু যত্নে গড়া শ্রমিক ঐক্য, জনতার ঐক্য ভেঙ্গে যায়। তবু সেই অন্ধকার দিনে কিছু আলোর রশ্মি জ্বালিয়ে রেখেছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা এবং বেশ কিছু সংখ্যক শুভবুদ্ধি সম্পন্ন

হিন্দু-মুসলমান পরিবার। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্কের কথা মনে রেখেই সেদিনের দাঙ্গায় মধ্যেও যে রুপোলি রেখাটুকু আমার চোখে পড়েছিল আজ আমি বেশী করে সেটা তুলে ধরতে চাই।

১৬ই আগস্ট রাতে কমিউনিস্ট পার্টির বহু কর্মী ও সদস্য নানা পাড়ায় আটকে পড়েন। ডোভার লেনের ট্রাম-কর্মীদের মেস বাড়িতেও বেশ কিছু মুসলমান শ্রমিক আটকে পড়েন। কি কৌশল আর কী আশ্চর্য সাহসের সঙ্গে হিন্দু শ্রমিকেরা তাদের যে পার্ক সার্কাস এলাকায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন সেটা আমি সে সময়েই জেনেছিলাম। কলাবাগানের বস্তিতে আটকে পড়েন কমরেড বীরেন রায়। রাত দুপুরে ওখানকার মুসলমান শ্রমিকরা তাঁকে নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দেন। সেদিনের শান্তি-মিছিলে জলি ক'ল ও অন্য কয়েকজন ছিলেন। কিন্তু গণ্ডগোল যখন ঠেকানো গেল না তখন তাঁরা তাঁদের খিদিরপুরের পার্টি কমিউনে চলে যান। তাঁরা ধারণাই করতে পারেননি যে ওপাড়াতে দাঙ্গা চলছে। সেদিনই দুপুর রাত্রে মুসলমান কমরেডরা তাঁদেরকে নিরাপদ এলাকায় সরিয়ে দেন। প্রকাশ্য রাস্তা দিয়ে যাবার মতো অবস্থা ছিল না। সুতরাং এঁদেরকে নিয়ে আসা হয় অনেকগুলো মুসলিম বস্তির অন্দর মহলের গলি-পথে।

কমরেড অজিত রায়, গীতা মুখার্জী, অন্নদাশংকর ভট্টাচার্য, সুকুমার গুপ্ত প্রমুখ আরও কয়েকজন ছিলেন এক গুজরাটী চর্মব্যবসায়ী মুসলিম ভদ্রলোকের বাড়ির একটি ফ্ল্যাটে ভাড়াটে হিসাবে। তিনি ওদের ৩ দিন বহু ঝুঁকি নিয়ে রক্ষা করেন অথচ তিনি পার্টির কেউ ছিলেন না। ঐ বাড়ির কিছুটা ব্যবধানে কমরেড বঙ্কিম মুখার্জী ও প্রমোদ দাশগুপ্ত তাঁদের কমিউনে ছিলেন। এক'দিন সেখান থেকে বিপদ বুঝে পাশেই কমরেড আবদুল মোমিনের বাড়িতে আশ্রয় নেন। দুটো বাড়িই ছিল সেণ্ট্রাল এভেনিউতে। বাড়ির অন্য ভাড়াটেরা ক্রমশ সন্দেহ করতে লাগল—ওখানে হিন্দু আছে এবং তারা ঘরে ঢুকে দেখতে চাইল। মোমিন সাহেবের স্ত্রী হাসিনা পর্দানশীন, একথা জানিয়ে তিনি অতিকষ্টে তাদের ঠেকিয়ে রাখেন ২ দিন। তৃতীয় দিন তাদের ঠেকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল। ওরা বিকেলে শাসিয়ে গেল এই বলে যে, ওরা বাইরে যাচ্ছে রোজা ভঙ্গ করতে, কিন্তু ফিরে এলে মোমিন সাহেব তাঁর স্ত্রীকে বোরখা পরিয়ে ঘরের বাইরে আনবেন, তখন ওরা ঘরে ঢুকবে। ওরা মাত্র এক ঘণ্টা টাইম দিয়ে গেল।

ওদিকে অজিত রায়দের ওখানেও একই ব্যাপার। গুজরাটী ভদ্রলোককে পাড়ার মস্তানরা অনবরত চাপ দিচ্ছে হিন্দুদের বের করে দেবার জন্য। তাদের বক্তব্য, হিন্দুরা দেখছে আমরা এখানে কি করছি। ওদের মারতেই হবে,

নয়তো ওরা ছাড়া পেলে আমাদের নাম-ধাম প্রকাশ করে দেবে। ওরা ঐ রকমই শাসিয়ে গেল, অর্থাৎ রোজা ভেঙ্গে এসে ব্যবস্থা নেবে। অজিত রায়রা স্থির করল, অসুস্থ গীতা মুখার্জীকে শুধু ঐ ভদ্রলোকের বাড়িতে রেখে রোজা ভাঙ্গার সময়ে বাকীরা বেরিয়ে পড়বে। যে মস্তানরা ওঁদের বাড়ির সামনে জটলা করত তারাও ঐ সময়ে ছত্রভঙ্গ হতো। যদি কোনরকমে মেডিক্যাল কলেজের গেট টপকাতে পারে তবে ওরা বেঁচে যাবে—নয়তো এই শেষ। এই দুই বাড়ির কথা পার্টি-কেন্দ্র জানবার পর থেকেই প্রাণপণে চেষ্টা করছিল উদ্ধারকারী সশস্ত্র মিলিটারী সহ ট্রাক পাঠাতে। দু'বাড়ির লোকেরাই এ খবর জানতেন। তাই প্রতিমুহূর্তে এঁরা অপেক্ষা করছিলেন উদ্ধারকারীদের আসার জন্য। সেদিন সেই ভয়াবহ সময়টিতেই মিলিটারী ট্রাক নিয়ে গেলেন কমরেড ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত ও মনসুর হবিবুল্লাহ সাহেব। দু'বাড়ির কমরেডরা অল্পের জন্য বেঁচে গেলেন।

সবিস্তারে এই কাহিনী শোনাবার অন্য কোন কারণ ছিল না, শুধু মোমিন সাহেব, হাসিনা ও সেই গুজরাটী মুসলমান ভদ্রলোকটির অদম্য সাহস, মনোবল ও মানবতাবোধের পরিচয় তুলে ধরার জন্যই এই কাহিনীর অবতারণা। বন্দীদের অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কিন্তু রক্ষাকারীদের দিন-রাত ঘণ্টা-মিনিটগুলি যে কি ঝড় বইয়ে দিয়ে গেল তাদের মনের উপর তা অপরের পক্ষে অনুভব করা কঠিন বৈ কি। মোমিন সাহেবকে মুখের হাসি বজায় রেখে, মনের জোর অটুট রেখেই বারে বারে বলতে হয়েছে—'কোন হিন্দু আমার ঘরে নেই।' গুজরাটী ভদ্রলোকেরও একই অবস্থা। উদ্ধারকারীদের প্রহরায় সেদিন হাসিনা এবং মোমিন সাহেবকেও বাড়ি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল, নয়তো ওরা খুন হয়ে যেতেন। মস্তানরা মোমিন সাহেবকে শাসিয়েও দেয়, 'ফিন্ মাৎ আনা'।

ঠিক একই কাজ করেছিলেন পার্ক সার্কাস এলাকায় ডাঃ গণি। আমাদের সঙ্গে তাঁর এই প্রথম পরিচয়। উনি তখন পার্টিতে আসেননি। উদারচেতা, জনদরদী ডাক্তার হিসাবে এই এলাকায় তাঁর খ্যাতি ছিল, বিশেষ করে গরীব বস্তিবাসীদের তিনি ছিলেন হিতৈষী বন্ধু। আজ তিনি নেই। কিন্তু তাঁর প্রতিষ্ঠিত দাতব্য চিকিৎসালয়টিতে সকাল থেকে যখন বস্তিবাসীদের লাইন পড়ে তখন গণি সাহেবকে হয়তো তাঁরা এখনও মনে মনে স্মরণ করেন।

দাঙ্গার সময় দুপুর রাতে তিনি এ পাড়ায় আটক হিন্দুদের নিঃশব্দে বালিগঞ্জে পৌঁছে দিতেন। তাঁর নিজের বাড়ির পাশে একটি ধোবি-পরিবারকে তিনি বহুকষ্টে বাঁচান। তাঁর কাজে উৎসাহিত হয়ে পার্ক সার্কাস এলাকার বেশ

কিছু মুসলমান ভদ্রলোক হিন্দু-পরিবারগুলিকে বাড়িতে আশ্রয় দেন ও নানা-ভাবে তাদের নিরাপদ এলাকায় পৌঁছে দেন।

বালিগঞ্জেও এ-চিত্র দেখেছি। অনেক মুসলমান পরিবার এই পাড়ার কমিউনিস্ট কর্মী ও অন্যান্য ভদ্রলোকদের সহায়তায় পার্ক সার্কাস এলাকায় পার হয়ে এসেছিলেন।

পার্ক সার্কাস থেকে আসা দাঙ্গা-বিধ্বস্ত পরিবারগুলির জন্য আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছিল যশোদা ম্যানসনে ও কমলা গার্লস স্কুলে। দু'জায়গাতেই রিলিফের কাজ করেছেন ঐ পাড়ার ছেলে ও মেয়ে কর্মীরা। একদিন কমলা গার্লস স্কুলে গিয়ে সাক্ষাৎ পেলাম একটি মুসলমান পরিবারের। ওদেরকে এখানে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। রাত্রিবেলা পার্ক সার্কাস এলাকায় পার করা হবে। ব্যাপারটা ভেতরের অনেকেই জানত কিন্তু এ নিয়ে কারো মাথা ব্যথা নেই।

এইভাবে দু-পাড়ায় নিঃশব্দে বহু লোককে বিনিময় করা হয়েছে। এই কাজ করেছেন দুই সম্প্রদায়েরই লোক। এই টুকুই ছিল সেই অন্ধকারেও আশার আলো।

এই চিত্রের পাশাপাশি আমাদের পাড়ায় অন্য চিত্রও দেখেছিলাম। গড়িয়া-হাটের বাজারে বহু মুসলমান মাছ আর তরকারি বিক্রি করতে আসত গ্রাম থেকে। দাঙ্গার প্রথম দিন দুপুরের পর অনেকেই গ্রামে ফিরে গেছে। কিন্তু যারা ছিল তাদের কেউ কেউ পালাতে পেরেছে, অন্যরা মরেছে। দ্বিতীয় দিন গ্রাম থেকে সওদা নিয়ে অল্প লোকই এসেছিল। স্টেশনে ওদের জন্য দাঙ্গাবাজরা অপেক্ষা করছিল। তাই খুন-জখম দুই-ই ঘটেছিল সেখানে। এক বৃদ্ধ ডিমওয়ালাকে ধরে আমাদের পাশের বাড়ির কিছু মেডিক্যাল ছাত্র। তারা ওকে হাড়ের ডাণ্ডা দিয়ে পেটাতে শুরু করে। লোকটি বাঁচার চেষ্টায় ছুটে আসে আমাদের দুয়োরের সামনে। একটা গোঙানির শব্দ শুনে আমি যখন দরজা খুলতে যাই—তখন পেছন থেকে আমাকে টেনে ধরে বাড়িওয়ালার ভাই। সে অমাকে দরজা খুলতে দেয়নি। লোকটির ফাটা মাথার খানিকটা রক্ত আমাদের দেয়ালে লেগে রইল। আর ছেলেগুলো ওকে টেনে নিয়ে খুন করল। বাড়িওয়ালার স্ত্রী স্বামীর পা ধরে চিৎকার করে বলেছেন, 'ওকে বাঁচাও।' কিন্তু উনিও নড়তে পারলেন না। বৃদ্ধ ডিমওয়ালার মৃত্যুর সাক্ষী হয়ে রইলাম আমরা। দেওয়ালে রক্তের ছোপ অনেক দিন ছিল। তাকাতে সত্যিই ভয় করত—যদি লোকটি কিছু বলে ওঠে!

আমরা যশোদা ম্যানসনে রিলিফের কাজ করতাম। ওখানে ছিল উদ্ধারপ্রাপ্ত

পরিবারের আশ্রয় কেন্দ্র। একদিকে থাকত মেয়ে ও শিশুরা, অন্যদিকে পুরুষেরা। মেয়েদের মধ্যে একটি মেয়ে পাগল হয়ে যায় ওর স্বামীর শোকে। সে শুধু জানত, তার স্বামী আগুন লাগা ঘর থেকে বেরোতে পারেনি। মেয়েটিকে আমরা চারতলার বারান্দায় বেঁধে রেখেছিলাম। সামনে রাসবিহারীর ট্রাম লাইন। রাস্তায় কোন গোলমাল বা উত্তেজনা নেই। সেটা সম্ভবত দাঙ্গার চতুর্থ দিন। তখন বালিগঞ্জে আর মুসলমান কোথায়? হঠাৎ দেখা গেল একটি ভদ্রলোক এবং কোলে বাচ্চাসহ তার স্ত্রীকে লোকেরা ট্রাম থেকে টেনে নামাচ্ছে। লোকটি মুসলমান। পরে জেনেছিলাম, ওরা হাওড়া থেকে এসেছিল, দাঙ্গার খবর বিশেষ কিছু শোনেনি। মুহূর্তে রাস্তায় শ'পাঁচেক লোক জমা হয়ে গেল। অনেকের হাতেই বাঁশের লাঠি। একটি লোককে পিটিয়ে শেষ করতে এত লোক আর এত লাঠি! বৌটি স্বামীর প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে প্রত্যেকের পায়ে পড়ছে আর কাঁদছে। দেখলাম, ওকে কারা যেন নিয়ে গিয়ে একটা দোকানঘরের মধ্যে লুকিয়ে রাখল।

এদিকে সেই পাগল মেয়েটি চারতলা থেকে ঝাঁপ দিয়ে মরতে চাইছে। আমরা কয়েকজন তাকে ধরে বসে আছি। সামনের রাস্তার বীভৎস দৃশ্যটা দেখে ভাবছি—এই মেয়েটি আর রাস্তার ঐ মেয়েটির মধ্যে তো কোন তফাৎ নেই। এরা উভয়েই স্বামীর উপর নির্ভরশীল স্ত্রী এবং সন্তানের মা। এছাড়া এদের আর কি পরিচয়? অথচ দুটি বৌ-এরই তো একই দশা। দু'জনেই মরতে চাইছে। আমরাই বা এদের বাঁচিয়ে রেখে কি উপকার করছি? যারা এদের স্বামীদের মারল তারা কি?

দাঙ্গার কথা আর লিখব না। ওই কলঙ্কের বিবরণ দেওয়াও যায় না। কিন্তু আমার একটা ধারণা ছিল—মেয়েরা এর মধ্যে নেই। তারা এ হিংস্রতা বোধহয় সহ্য করতে পারে না। কিন্তু বালিগঞ্জ পাড়া আমার এ ধারণা পাল্টে দিয়েছিল। রাস্তাটার নাম বলব না। ফার্ন রোড থেকে রাসবিহারীর ট্রাম লাইনে আসতে দুপুর বেলা ঐ রকম একটা রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছি। দেখলাম সেখানে একটা চাঞ্চল্য। বাড়িগুলোর উপরতলা থেকে মহিলারা রাস্তায় দাঁড়ানো পুরুষদের হাতে লাঠি ফেলে দিচ্ছে। কি ব্যাপার? না, মুসলমান আসছে। আমি ভাবলাম বোধ-হয় মুসলমানরা দল বেঁধে আক্রমণ করতে এসেছে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে একটু ভয়ও পেলাম। ও হরি, শুনলাম একটা লুঙ্গি পরা লোককে মুসলমান ভেবে পাড়াময় এই উত্তেজনা। পরে লোকটির পরিচয় পেয়ে সবাই আশ্বস্ত হলো। আমি ভাব-ছিলাম অন্য কথা। একটা মাত্র লোককে নিকেশ করতে তো কয়েক শো বীর-

পুরুষ দাঁড়িয়ে গেছেন। কিন্তু মেয়েরা এই ব্যাপারে স্বামী-পুত্রদের ঠেকানোর চেষ্ট না করে উল্টে কি করে লাঠি এগিয়ে দিচ্ছেন? দাঙ্গার মত্ততা মানুষকে এতখানি নীচুতে টেনে নামায়? নারী-হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতাও উধাও হয়ে যায়? এ শুধু কি আমাদের পাড়ায় ঘটেছে? খোঁজ নিলে জানা যেত মুসলিম পাড়াতেও চিত্রটা হয়তো একই। পাশবিক বৃত্তিটা জাগিয়ে দিতে পারলে এরকমই ঘটে বোধহয়। ব্যতিক্রম পাশাপাশি থাকে বলেই হয়তো মনুষ্যত্ব আবার বাঁচে।

দাঙ্গা তখনও থামেনি। পুলিস এবার রাস্তায় নেমেছে। অথচ এদের আগে নামালে ঘটনা এতদূর গড়াতেই পারত না। কিন্তু এ তো রাজনীতির ব্যাপার। বাস-ট্রাম চলছে, রাস্তায় স্বাভাবিক লোক চলাচল আছে। আমরাও মহিলা সমিতির অফিসে বৌবাজার যাচ্ছি। একদিন দুপুরে পার্ক সার্কাস এলাকায় আমাদের এক পার্টি-বন্ধু মুসলমান-দম্পতির বাড়িতে গেছি। ভদ্রলোকটির নাম ইসমাইল সাহেব, বৌটির নাম রোশেনারা। আমি, কমলা এবং আরও অনেকে প্রায়ই যাই ওদের বাড়ি। সুশ্রী ও মার্জিত রুচির স্বামী-স্ত্রী। আমরা কেউ গেলেই ওরা আমাদের পেটপুরে খাওয়াতেন। ইসমাইল সাহেব তখন অফিসে বেরুবেন। তার আগেই আমি ১০ নং বাসে সমিতি অফিসে যাবার জন্য উঠলাম। কোন চাঞ্চল্য নেই। কিন্তু বৌবাজার মোড়ে নামতেই দেখলাম কেমন একটা থমথমে ভাব। রাস্তা দিয়ে যত হাঁটছি ততই দেখছি রক্তাক্ত মানুষ রাস্তায় পড়ে রয়েছে। বুঝতেই পারছি না কি ঘটছে। তাড়াতাড়ি সমিতি অফিসে পৌছালাম। উপরে উঠতেই অন্যেরা বলে উঠল—আপনি এলেন কি করে? এখানে তো সাংঘাতিক দাঙ্গা হচ্ছে। বুকের মধ্যে ধড়াস করে উঠল। ইসমাইল সাহেবের কিছু হলো না তো! তাছাড়া বরিশালে যদি দাঙ্গা হয়! তারপর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম বীভৎস কাণ্ডগুলো। একটা গরুর গাড়ি চালকহীন হয়ে চলছে। চালককে মেরে গাড়ির উপরেই শুইয়ে দিয়েছে। মাংসের দোকানীরা মাংসকাটা দা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে। জানি না ওরা হিন্দু কি মুসলমান। চীৎকারে, আর্তনাদে রাস্তাটাই যেন কসাইখানা হয়ে উঠেছে। আমার পিছনে এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে ছিলেন। সমিতির অফিস বাড়ির অন্য ঘরে তাদের চা-এর ব্যবসা ছিল। ভদ্রলোকটি হঠাৎ অতি উৎসাহী হয়ে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মুসলমানরা কোথায় লুকিয়ে আছে তা উপর থেকে দেখিয়ে দিচ্ছিলেন। আর আমার সহ্য হলো না। কড়া এক ধমক দিলাম তাকে: 'আপনি জানেন এর পরিণতি কি? এখানে একটি মুসলমানকে মারা হলে পূর্ববঙ্গেও একটি হিন্দুর জীবন বিপন্ন হবে? আমার মা, ভাইবোন হিন্দু, তাঁরা পূর্ববঙ্গে আছেন।

তাদের কারো কিছু হলে সে খুনের জন্য আমি আপনাকেই দায়ী করব, একথা মনে রাখবেন। আর যদি খুনের উস্‌কানী দেন তো এখুনি আপনাকে আমি পুলিসে ধরিয়ে দেব। ভদ্রলোকটি যেন চুপসে গেলেন। কিন্তু আমি তো জানতামই পুলিসে ধরিয়ে দেওয়ার ধমকটা কত হাস্যকর। কারণ চোখের উপর তো দেখছি—লালবাজার থেকে পুলিস আসছে রাস্তায় পড়ে থাকা মৃতদেহগুলি কুড়িয়ে নিতে, দাঙ্গা থামাতে নয়।

যাহোক, সন্ধ্যার মধ্যে অবস্থা একটু শান্ত হলো এবং বাসে করেই আমি বাড়ি ফিরলাম।

* * * *

এরপর বরিশালে দাঙ্গার খবর পেলাম। সেও একই ব্যাপার। রাত্রি ১২টার সময় ঢাকা থেকে স্টীমার এসে পৌঁছায় বরিশাল শহরে নদীর ঘাটে। ঐ সময়টাই বেছে নিয়েছিল দাঙ্গাবাজরা। ওরা প্ল্যান করেছিল যখন ভোঁ বাজবে তখন স্টীমার থেকে নামা যাত্রী ও অন্যদের উপর যুগপৎ আক্রমণ শুরু হবে। হলোও তাই।

কিন্তু আমার ছোট ভাইকে আশ্চর্য ভাবে বাঁচিয়ে দিল কিছু মুসলমান ছেলে। আমার ভাই-এর একটা রেস্তোরাঁ ছিল। নাম রুচিরা। এই সুবাদে হিন্দু-মুসলমান উভয় ক্রেতা ও পৃষ্ঠপোষকদের সে ছিল প্রিয়পাত্র। সেদিন রাত ৯টার পর থেকেই কিছু মুসলমান ছেলে—যারা একটু বাদে দাঙ্গায় নামবে, তারা এসে বারে বারে তাকে বলতে লাগল—'এত রাত পর্যন্ত আপনি দোকান খুলে বসে আছেন কেন? এখন বাড়ি যান দেখি।' এই রকম কথাবার্তা ও তাগাদা সত্ত্বেও সতু যখন কিছুতেই ওঠে না, তখন ওরাই একটা রিক্‌শা ডেকে সতুকে একরকম জোর করেই তুলে দিল। বললো, 'এখন দিনকাল ভাল না, এত রাতে বাইরে থাকবেন না।' রিক্‌শাওয়ালাকে সাবধান করে দিল—'জোরে চালিয়ে যা, ঠিকমত বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবি।' সতু বলেছিল—অর্ধেক রাস্তা আসার পরই ঢাকার স্টীমারের ভোঁ বাজল। সঙ্গে সঙ্গে ওদের সংকেত পৌঁছে গেল সমস্ত ঘাঁটিতে। তারপর চতুর্দিকের আকাশে শুধু আগুন আর কান্নার রোল।

পরদিন আমাদের বাড়িতে শ'তিনেক গ্রামবাসী হিন্দু আশ্রয় নিল। ওদিকে দাঙ্গা-নিবারণী ক্যাম্পটিও মুসলমান ছেলেরা বসালো আমাদের বাড়িতেই। এসব খবর পরে বরিশালে গিয়ে জেনেছিলাম। দাঙ্গা থামলে ক্যাম্পগুলি থেকে হিন্দু-মুসলমান পরিবারগুলি ধীরে ধীরে নিজেদের পাড়ায়

ফিরে যেতে লাগল। যশোদা ম্যানসনের ক্যাম্পও ক্রমে ক্রমে এইভাবে গুটিয়ে ফেলা হয়।

পূর্ববঙ্গের জিলাগুলির মধ্যে নোয়াখালি ও কুমিল্লা দাঙ্গায় সব থেকে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। রেণু, কমলা এবং আরও কয়েকজন ওদিকে চলে গেল। ওরা গেল নোয়াখালির হাইমচরে। সেখানে অবস্থা সাংঘাতিক। কিছু কিছু রিলিফের কাজ করে ফিরে এলো ওরা। ইতিমধ্যে গান্ধীজী নোয়াখালিতে ক্যাম্প খুলেছেন ও পদযাত্রা করছেন। রিলিফের কাজের জন্য আমাকে পাঠানো হলো চাঁদপুরে। ওখানে একটা মেয়েদের কেন্দ্র খোলা হয়েছিল। সেখানে আমি গেলাম। আমার সঙ্গে ছিল অবনী লাহিড়ীর স্ত্রী মায়া লাহিড়ী। কেন্দ্রটি সরকারী সাহায্য নিয়ে কোন একটি মিশন থেকেই খোলা হয়। এ. আই. ডব্লিউ. সি-র মহিলাদের সঙ্গে ঐ কেন্দ্রটির ভার আমাদেরও নেবার কথা ছিল। তাই আমি এবং মায়া লাহিড়ী আগেই চলে গেলাম। ওখানে একটা মেটারনিটি সেণ্টারের পাশে এক-খানা ঘরে আমরা থাকার জায়গা পেলাম এবং একটি রান্নার লোকের ব্যবস্থাও করে দিল পার্টির ছেলেরা। আমরা আগেই কাজ শুরু করে দিলাম। কয়েক দিনের মধ্যে কিছুটা গুছিয়েও নেওয়া গেল।

এর মধ্যে একদিন বিকেলে খবর এলো—একটা জীপে এ. আই. ডব্লিউ. সি-র শ্রীমতী অশোকা গুপ্ত, রেণুকা রায় ও শ্রী পি. কে. রায়-এর স্ত্রী শ্রীমতী রায় এবং আরো কেউ কেউ চাঁদপুর থেকে কিছু দূরে দুর্ঘটনায় পড়েছেন। জীপ উল্টে তার তলায় পড়ে রেণুকা রায় ও শ্রীমতী রায় দু'জনেই সাংঘাতিক ভাবে জখম হয়েছেন। নীচে কাদা ছিল বলে তাঁরা কোনরকমে বেঁচে গিয়েছিলেন। আমার কাছে খবর আসায় সেই মেটারনিটি সেণ্টার থেকে দুটো বেড ও পরিচর্যার জন্য অন্যান্য জিনিসপত্র আনিয়ে একটা ঘরে তা গুছিয়ে রাখলাম। রোগীরা সর্বাঙ্গে কাদামাখা ও পাঁজরের হাড়-ভাঙ্গা অবস্থায় এলেন। তিন দিন ধরে এঁদের নার্স ছিলাম আমি। সকালবেলা অশোকা গুপ্ত এসে অনেকটা কাজ করে দিয়ে যেতেন। বিকেলেও আসতেন। দুপুরে ও রাত্রে আমিই দেখতাম। রেণুকা রায় বোধহয় এই সেবায় আমার প্রতি একটু প্রসন্ন হয়ে উঠেছিলেন এবং একটু অবাকও হয়েছিলেন এইভেবে যে, কমিউনিস্ট মেয়েরাও তাহলে কংগ্রেসীদের এত সেবা করতে পারে! তাই একদিন রাত্রে আমার কানে কানে বললেন—'আচ্ছা মনি, তুমি কমিউনিস্ট হলে কেন?' বললাম, 'কথা পরে হবে, এখন রাত দুপুর, একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।' 'তুমি কিন্তু চলে যেও না'—বলে আমার হাতখানা ধরে রেখে একটু পরেই ঘুমোলেন।

কি করব? রেণুকা রায়কে এই দুপুর রাতে কমিউনিজম্ কি শিক্ষা দেয়, তা আমি শেখাতে বসব? দিন তিনেক পরে রোগীণীরা কলকাতায় ফিরলেন। আমি আমার নিজের কাজে ফিরে গেলাম।

ওখানে একটা অবাক কাণ্ড প্রত্যক্ষ করলাম। আমাদের হোমে একটি মেয়ে এসেছিল। তার ভাব ছিল মেয়েটির দাদার বন্ধু এক মুসলমান ছেলের সঙ্গে। তাকে ও বিয়ে করবে এটাই নাকি ঠিক ছিল। দাদারও অমত ছিল না। ঘটনাটা ও আমাদের বললো এবং দাদাকে চিঠি দিয়ে জানাতে বললো—যাতে সে এসে ওকে নিয়ে যায়। ঘটনাটুকু এই, কিন্তু এই নিয়ে যা সোরগোল উঠতে দেখলাম তাতে আমার রীতিমতো ঘেন্না ধরে গেল। যে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে আমরা কাজ করছিলাম, তাদের কেউ নাকি বলেছিলেন—মেয়েটাকে কেটে নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া হোক। গেরুয়াধারী সন্ন্যাসীরাও এত সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন হলে কি করে তারা মানবসেবার অধিকারী হতে পারেন, আমি জানি না।

এদিকে মেয়েটাকে নিয়ে আমরা মরি আর কি! মায়া আর আমি দু'জনে তাকে কত বোঝাচ্ছি—তুই আমাদের সঙ্গে কলকাতা চল্, তোকে লেখাপড়া শেখাব—তারপর যাকে হয় বিয়ে করবি। কিন্তু ভবি ভুলবার নয়। আমার যত দূর মনে পড়ে, ওর বাড়িতে চিঠি দেওয়া হলে ওর বাবা কিংবা ভাই এসে ওকে নিয়ে যায়। মেয়েটি ছিল বালবিধবা। ভাইয়ের সংসারে ছিল। বিধবা মেয়েকে হিন্দুসমাজে কে বিয়ে করবে? এ অবস্থায় ও যদি একটি সম্মানজনক ঘর-বর পায়, তাতে কার কি ক্ষতি? সমাজের কোন্ অংশ তাতে খসে পড়ে—তা আমার মাথায় আসে না। এই-ই আমাদের হিন্দু-সমাজ। আমরা আবার অন্য লোকদের বলি সাম্প্রদায়িক!

এরপরে ফুলরেণু গুহ গেল ওখানে। ও আমাকে কলকাতায় ফিরে যেতে বারংবার অনুরোধ করতে লাগল। তার কথার আভাসে বুঝলাম আমার ফার্ন রোডের বাড়িতে কোন বিপদ হয়েছে। তখন আর ঐ বাড়িটা কমিউন নয়। আমি যাবার আগেই ব্যবস্থা করে গিয়েছিলাম—আমার অসুস্থ দিদিকে ওখানে নিয়ে আসা হবে, সঙ্গে জামাইবাবু আর তাদের দুই ছেলে ও দুই মেয়ে থাকবে। দিদি যে এতটাই মুমূর্ষু ছিলেন তা আমার জানা ছিল না। আমার অনুপস্থিতিতে সবাই এলো বটে কিন্তু ৯ দিনের দিন দিদি মারা গেলেন। ফুলরেণু এই খবর জেনে গিয়েই আমাকে জোর করে পাঠিয়ে দিয়েছিল। আমি চলে এলাম কিন্তু মায়া লাহিড়ী থেকে গেল।

এদিকে স্বাধীনতা আসন্ন। গান্ধীজী নোয়াখালিতে। তিনি চেষ্টা করছেন

তাঁর মানবিক আবেদনে হিন্দু-মুসলমানকে আবার এক করতে, দেশটাকে ভাগ না করার জন্য। কিন্তু কংগ্রেসের কোন অংশই আর দেরি করতে পারছেন না। একদিকে জিন্নার হুমকি, অপরদিকে মাউন্টব্যাটেন সাহেব '৪৭-এর মার্চ মাসে এলেন দেশভাগের প্ল্যান নিয়ে। মার্চ থেকে ১৩ই আগস্ট পর্যন্ত চললো প্ল্যান নিয়ে নেহরু-প্যাটেল প্রমুখ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকের পর বৈঠক। এই আলোচনা থেকে গান্ধীজী সরে দাঁড়ালেন। যে দেশভাগ তিনি চাননি সেই দেশভাগের আসন্ন মুহূর্তে তাঁর পশ্চাদাপসরণ সত্যি দুর্বোধ্য। আমার ধারণা, তাঁর জোরালো অসম্মতি থাকলে দেশভাগ হতে পারত না। ওদিকে ভারতব্যাপী দাঙ্গার আগুনও আর নেভে না। বিহারের পাটনায় ও পাঞ্জাবে দাঙ্গা সাংঘাতিক রূপ নিল।

শেষ পর্যন্ত নেতারা ভারত ভাগ করেই ক্ষান্ত হলেন। কোন্ অংশ কোন্ দিকে যাবে তাও মোটামুটি ঠিক হলো। '৪৬-এর আগস্ট থেকে '৪৭-এর আগস্ট পর্যন্ত দাঙ্গার ক্ষত ধুতে ধুতে আমরা যে পুরস্কার পেলাম, তা হলো—দ্বিখণ্ডিত দেশ আর বুকভাঙ্গা কান্না। তবু আনন্দ করেছি। ভাঙ্গা হোক, টুকরো হোক—স্বাধীনতা এলো তো শেষ পর্যন্ত! আর এবার নিশ্চয়ই সাহেবগুলোকে বিলেত পাঠানো যাবে। ১৪ই আগস্ট মধ্যরাত্রিতে ঘোষণা করা হলো আকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা। কলকাতা সজ্জিত হলো আলোক মালায়। রেডিওতে ধ্বনিত হলো জওহরলালের কণ্ঠস্বর।

স্বাধীনতার আগে সুরাবর্দির কাণ্ডটা না বলে পারছি না। গান্ধীজী তখন বিধ্বস্ত বেলেঘাটায় ক্যাম্প খুলে অবস্থান করছেন। প্রার্থনাসভায় প্রতিদিন ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছেন। আবেদন করছেন অস্ত্র সমর্পণের জন্য। বহু লোক মহাত্মার আবেদনে অস্ত্র সমর্পণ করে যাচ্ছে। কিন্তু মহাত্মার পেছনে ঐ লোকটি কে? ডাইরেক্ট এ্যাকশনের জেনারেল স্বয়ং সুরাবর্দি সাহেবই তো! ভিজে বেড়ালটি যেন লেজ গুটিয়ে বসে আছে। যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না—এমন বিড়ালতপস্বী মুখ। এবার বুঝি তাঁর ভয় হচ্ছে—গান্ধীজীর আড়ালে, শান্তিবাহিনীর কমিটিতে আশ্রয় নিতে না পারলে নিজেরও নিরাপত্তা নেই। এসব দেখে আমার গা-জ্বালা করত।

আমার দুঃখ, সুরাবর্দিরা যা চেয়েছিলেন তা পেয়ে গেলেন। কিন্তু গান্ধীজী কি পেলেন? সত্যিই যখন ভারত দ্বিখণ্ডিত হলো তখন জাতির পিতা আর জাতির নেতৃত্বে থাকলেন না। কিন্তু তাতেও কি তিনি রক্ষা পেলেন? সাম্প্রদায়িক ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার অপরাধে তাঁকেও শেষ পর্যন্ত প্রার্থনাসভায় হিন্দুর গুলিতেই প্রাণ দিতে হলো। আর আশ্চর্য, একটা লোককে ফাঁসি দিয়েই দেশের

নেতৃত্ব তাঁদের কর্তব্য শেষ করলেন। একটা তদন্ত পর্যন্ত হলো না, পাছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়ে—এই ভয়ে। সেদিনের সেই ভয়টা আজ দেশসুদ্ধ লোককে ভয় দেখাচ্ছে—আর. এস. এস. ও জনসংঘের নেতৃত্বে সাম্প্রদায়িকতার ফণা তুলে। যে অচ্ছুতদের গান্ধীজী ঘৃণা আর অপমান থেকে মানুষের আসনে তুলে আনতে চেয়েছিলেন, 'হরিজন' নামকরণ করে সেই হরিজনদেরই আজ পুড়িয়ে মারা হচ্ছে। দলবদ্ধ সশস্ত্র লোকেরা পাড়ার পর পাড়া জুড়ে নারী-শিশু নির্বিশেষে সকলকে খুন করছে। দেশময় ধর্মান্ধতা, ভাষা-বৈরিতা, সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে ভারতবর্ষকে আরো টুকরো টুকরো করতে চাইছে। নিজেকে ভারতবাসী হিসাবে পরিচয় দিতে এরা যেন আর গর্ববোধ করে না।

কি হবে গান্ধীজীর মৃত্যুদিবসে ২ মিনিটের জন্য মৌন পালনের মাধ্যমে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে? কি হবে 'অষ্টপ্রহর' চরকা কেটে ও রামধুন গেয়ে গান্ধীজীর আদর্শকে একটা ব্যর্থ, অর্থহীন অনুষ্ঠানে পরিণত করে?

দ্বিখণ্ডিত দেশ : বাস্তহারার মিছিল

দেশ ভাগের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতা এলো। আর এরি সঙ্গে খণ্ডিত পশ্চিম বাঙলায় লাইন দিয়ে এলো 'আমরা কারা—বাস্তহারা' শ্লোগানে আকাশ মাথায় করে সর্বস্ব খোয়ানো উদ্বাস্তু মানুষ। আজ ৩৫ বছর পরে তারা হয়তো সবাই আর 'বাস্তহারা' নেই। টুকরো পশ্চিম বাঙলায় এবং সারা ভারতের দেহে আজ হয়তো তারা লীন হয়ে গেছে। কিন্তু কী দুঃখের মধ্য দিয়েই না তাদের দিনগুলো কেটেছে! প্রথমে আত্মীয়স্বজনের বাড়ি, তারপর শিয়ালদা, তারপর ক্যাম্প। নতুন সরকারের সাধ্য ছিল কি ছিল না—তা আমি জানি না, কিন্তু তাদের অভ্যর্থনা যে অবাঞ্ছিত মানুষের মতোই হয়েছিল, তাতে কোন ভুল নেই। মানুষ যেমন করে হোক বাঁচার চেষ্টা করবেই, বনজঙ্গল কেটে হলেও তারা বসতি স্থাপন করবেই। আদিমকাল থেকে এটাই মানুষের ইতিহাস। অতএব সরকারী দাতব্যশালা নামে শিয়ালদা, ধুবুলিয়া, রাণাঘাট প্রভৃতি বারোয়ারী 'ভিক্ষুকের' ক্যাম্পে যাঁরা থাকতে চাইলেন না, তাঁরা উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব কলকাতায় তাঁদের বসতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়াতে লাগলেন। খালি বাড়ি, খালি জায়গা আর পড়ে থাকল না। কত না বনজঙ্গল কেটে, কত মাটি কেটে, জলাজমি ভরাট করে, তাঁরা কুঁড়ে ঘর তুলে নিত্য নতুন জনপদ তৈরি করতে লাগলেন। যাঁরা সামান্ত সম্পদও নিয়ে আসতে পেরেছিলেন, তাঁরা তাই দিয়ে বাসস্থান গড়লেন। কিন্তু বাড়ি হলেই রুজি-রোজগার হয় না। সরকারের তরফ থেকেও কম অর্থব্যয় হয় নি। পাকাবাড়িও তুলে দেওয়া হলো অনেক। আবার জবরদখল জমিগুলো উদ্বাস্তুদের কাছ থেকে উদ্ধারের জন্য সরকার পুলিস ও গুণ্ডা বাহিনী নিয়ে মারামারি পেটাপেটি করতেও কসুর করল না। সরকারের চোখে তখন মানুষের চেয়ে আইনটাই বড় হয়ে উঠেছিল। মালিকের জলাজমিকে উদ্ধার করেও বসতি গড়া যাবে না, এই আইনটাই যেন তাদের কাছে শেষ কথা। কিন্তু যে সব উদ্বাস্তু একবার চালার তলায় মাথা দিতে পেরেছে, সরকার সেখান থেকে তাদের আর নড়াতে পারেনি। 'জান দেব তো ধান দেব না'-র মতো আর একটি শ্লোগান উঠল—'জান দেব তো ঘর দেব না'। একবার পুলিস ঘর ভাঙে, আবার ওরা ঘর তোলে। দেশটাকে যাঁরা টুকরো করলেন, ইংরেজদের বদলে সেই নেতাদের স্বাধীন সরকারই এদের আর

এক দফা লাঠিপেটা করলেন। অথচ এই উদ্বাস্তুদের ঠাঁই দেওয়ার জন্য তারা ছিলেন প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ঠিক তেভাগার লড়াই-এর মতন ২/৩ বছর পেটাপেটি করে অবশেষে সুরাবর্দি সরকারের মতোই কংগ্রেসী সরকারও হার মানলেন। সরকার যাদের 'অবাঞ্ছিত' বলে পেটালেন, তাদের কাছে কংগ্রেসী সরকারও তেমন আর 'বাঞ্ছিত' রূপে রইলেন না।

এই অগণিত মানুষদের চাহিদাকে সংগঠিত রূপ দেবার জন্যই কমিউনিস্ট পার্টি তাদের পাশে এসে দাঁড়াল। সংগঠন গড়া হলো, সরকারের কাছে দাবী-দাওয়াও পেশ করা হলো। তাই নিয়ে কখনও সংগ্রাম, কখনও আপোস—এই ভাবে চলতে চলতে অবশেষে জবর দখল কলোনীগুলি স্বীকৃতি পেল। কিন্তু এর পেছনে যে কত কান্না, কত বঞ্চনা, কত রক্তপাত ও কত ইজ্জত হারানোর কাহিনী লুক্কায়িত আছে সেসব কথা বিশেষ করে জানতেন এইসব সংগঠনের মধ্যে সেই সময় যারা ছিলেন কর্মরত।

একটা জিনিস আমার খুবই চোখে পড়ত। সেটা সরকারী ক্যাম্প-জীবনের সর্বনাশা চেহারা। এর কোন উপায়ও ছিল না। লাখ লাখ মানুষকে পরিবার-ভিত্তিক পুনর্বাসন দেওয়া অবশ্যই কঠিন কাজ। কিন্তু ক্যাম্প যে মানুষের সম্মানবোধকে কত নীচে নামিয়ে দেয় সেসব আমি নিজের চোখে দেখেছি, ক্যাম্পে ক্যাম্পে ঘুরে। এরা সবই তো আমার পূর্ববঙ্গের লোক। আমার মনে এদের ব্যথা-বেদনা নিদারুণ হয়ে বাজত। কোন ক্যাম্পে গেলে সবাই আমাকে তাদের কি ধরনের বিশ্রী কাপড় দেওয়া হচ্ছে, কি রকম বিশ্রী চাল দেওয়া হচ্ছে, এসব দেখাতেন। তাই নিয়ে সরকারের কাছে দরবারও করতাম। কিন্তু তাদেরকে বলতাম, ভিক্ষের চাল-কাপড়ের তো ভাল-মন্দ নেই। আপনারা কাজ দেবার দাবী করুন এবং তার বিনিময়েই চাল-কাপড় নেবেন। তখন ঐসব জিনিস খারাপ হলে যারা দিচ্ছে তাদের মুখের উপর ছুঁড়ে ফেলবেন। কিন্তু এ বোধটা জাগাতে পারতাম না। এরা তো এমন ছিল না। দেশগাঁয়ে এরা যে যার মতো কাজ করে খেত, ভিক্ষের অসম্মানে তো যেত না। দীর্ঘদিন ক্যাম্পে বাস করে এরা যে একটা পরনির্ভরশীল শ্রেণীতে পরিণত হলো এবং আত্মসম্মানবোধটাও হারিয়ে ফেললো, সেটাই এক পীড়াদায়ক ঘটনা।

তবে এদের মধ্যে চাষী-পরিবারদের দেখেছি, জীবিকা ভোলেন নি। ঐ ক্যাম্পের সামনেই একটুখানি খালি জায়গা পেলেই তাতে তাঁরা লাউ-শিম লাগিয়েছেন, লঙ্কা-বেগুন ফলিয়েছেন এবং ঐটুকু ফসলই বাজারে নিয়ে বিক্রী করে রুজি বাড়িয়েছেন। খেটে-খাওয়া মানুষের বসে থাকার মতো বিড়ম্বনা

আর কিছু নেই। দণ্ডকারণ্য এবং অন্যান্য অনেক জায়গায় এইসব কৃষিজীবী পরিবারদের পাঠানো হয়েছে। সেখানে তারা অনেক দুর্ভোগের পর আবার চাষীজীবন ফিরে পেয়েছেন। অনুর্বর জমিকে তারা নিজেদের জীবনরস ঢেলে উর্বর করে ফসল ফলিয়েছেন। এসব দেখার সুযোগ আমার হয়নি, শুধু শুনেছি ও কাগজে পড়েছি। কিন্তু সবাই যে এই স্তরে এখনও পৌছাতে পারেন নি, মরিচঝাপির খণ্ড যুদ্ধটাই তো তার প্রমাণ।

অকৃষক মানুষরাও যখন বুঝলেন—বসে থেকে লাভ নেই, তখন তারাও জীবনসংগ্রামে নেমে পড়লেন। এ ব্যাপারে মেয়েদের মধ্যে একটা অদ্ভুত নবজাগরণ দেখেছি। দেশে থাকলে হয়তো এত দ্রুত এই পরিবর্তনটা আসত না। নানা জায়গায় আমাকে ট্রেনে যেতে হতো, তাই ট্রেনে উঠলেই ঐসব মেয়েদের সঙ্গে দেখা হয়ে যেত। মেয়ে-কামরা, ছেলে-কামরা বোঝাই হয়ে এইসব মেয়েরা আসা-যাওয়া করত। ওদের সঙ্গে আলাপ করে জানতে পারতাম ওরা কেউ স্কুলে যাচ্ছে, কেউ কলেজে যাচ্ছে, কেউবা পড়াতে। প্রায়শই দেখা পেতাম বরিশালের মেয়েদের। বরিশালে যে এত লোক ছিল তা আগে জানতাম না। সারা ভারতই প্রায় ঘুরেছি। সব জায়গাতেই বরিশালের সেই নির্ভেজাল ভাষাটি শুনতে পেয়েছি। ভাল লাগত ভেবে, আমাদের দেশে ট্রেন নেই বলে লোকে আমাদের কত উপহাসই না করেছে। কিন্তু এখন আমরা সেই ট্রেনে চেপেই হিল্লিদিল্লী অনায়াসে চষে বেড়াচ্ছি। আর ঐ মেয়েরা? ছোট ছোট মেয়েরা পর্যন্ত স্টেশন থেকে একলা ওঠানামা করছে, নিজের কাজে একলা যাচ্ছে—একটুও ভয়ডর নেই। দেশে থাকলে বোধহয় এত দ্রুত ও সহজে এরা জীবনের হাল ধরে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না। শুধু নিজের জীবনের কেন—ঐসব মেয়েরা শক্ত হাতে পরিবারের হাল পর্যন্ত ধরেছে এবং নিজের জীবনের কথাটা আলাদা করে ভাবতেও ভুলে গেছে। আজ আর এরা ভেসে-আসা মানুষ নেই। পশ্চিমবঙ্গের অল্পপরিসর জায়গায় বিশাল জনসমুদ্রে সকলের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে। পূর্ববঙ্গের এইসব মেয়েরা শিক্ষিকা, নার্স, কেরানী—কোন কাজে নেই? বরং পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের তুলনায় এরাই সম্ভবত রুজির ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ। এই একটা ব্যাপারে একদিনের সর্বস্বহারা মেয়েরা পশ্চিমবঙ্গের মেয়েদের যে কি উপকার করেছে তা হয়তো কেউই টের পায়নি। ঐ মেয়েদের নির্ভীক চলাফেরা এবং রুজির জন্য ঘা মেরে মেরে সমস্ত বন্ধ দুয়ারগুলি খুলে দেওয়া, সম্ভবত এদের প্রয়োজনের চাপ ও সংখ্যার চাপে ছাড়া সহজ হতো না।

যাহোক, এরা আসায় আমাদের লাভ হলো, কাজও বেড়ে গেল। কলকাতার পুব, উত্তর ও দক্ষিণে কত যে কলোনীর পত্তন হয়েছে তার সীমা-সংখ্যা নেই। প্রায় সব জায়গাতেই আমরা হাজির। প্রথমে গিয়েছি পুলিসের সঙ্গে লাঠিবাজির মোকাবিলা করতে, পরবর্তী পর্যায়ে গিয়েছি প্রায় প্রত্যেকটি কলোনীতে মহিলা সমিতি গড়তে। একাজে নতুন করে আমরা আর এক দফা ঘুরতে আরম্ভ করলাম।

এইবার কলোনীগুলো থেকে পেতে লাগলাম নিত্য নতুন সাথী। পূর্ববঙ্গের আমার চেনাজানা সবাইকে তো পেলামই—আরও অনেক নতুন বোন ও মাসীমারাও এলেন মহিলা সমিতির কর্মী রূপে। এইসব কলোনীতে গড়ে উঠতে লাগল নিত্য নতুন মহিলা সমিতি ও কর্মকেন্দ্র। রেণু গাঙ্গুলী, কবিতা, কমলা, বাসন্তীর মতো অনেক মেয়েকেই পাওয়া গেল কলোনী সমিতির সংগঠক রূপে। ওরা সবাই ক্রমে ক্রমে দক্ষ কর্মী হয়ে উঠল। পরে পার্টি-কর্মীও হলো সবাই। এক-একটা কলোনী যেন এক-একটা সংগ্রামের দুর্গ। ওখানে গেলে আমার ফিরতে ইচ্ছা হতো না। সাক্ষাৎ বরিশালকে যেন পেয়ে যেতাম। সেই সোজা, সদাসিধে ও চিন্তাশীল মানুষদেরই দেখা পেতাম।

যে সব সমিতি এইসব কলোনীতে তৈরি হলো—তারা কেউই পশ্চিমবঙ্গ মহিলা আত্মরক্ষা সমিতিতে যোগ দিল না। ওরা ওদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চাইল। নেহরু কলোনী, গান্ধী কলোনী, নেতাজী নগর, আজাদগড়—বহু দেশনেতার নামে কলোনীগুলো গড়ে উঠেছিল। শতবার পিটনি খেয়েও নামগুলো ওরা পাল্টায়নি। সমিতিগুলোর নামকরণও হলো ঐ সব কলোনীর নামেই। এসব জায়গায় সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা নারী-পুরুষ সবাই জানে। সুতরাং মহিলা সমিতি গঠনে পরিবার থেকে কোন বাধা তো আসতই না বরং উৎসাহই ছিল বেশি। সব মেয়েরাই সদস্যা হতেন। কর্মকেন্দ্র ও স্কুল—এসব নিয়মিত চলত। একটা জিনিস খুব ভাল লাগত আমার। ওখানে মেয়েদের কোন সাধারণ সভা বা সম্মেলন হলে সেটা শুধু মেয়েদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত না—সমস্ত পুরুষরাও তাতে যোগ দিতেন।

সমিতির সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে লাগল। সংগঠনের কাজে সাহায্যের চাহিদা আমরা মিটিয়ে উঠতে পারতাম না। পরবর্তী সময়ে যখন আত্মরক্ষা সমিতিসহ এই সব সমিতিগুলির মিলিত কেন্দ্র রূপে মহিলা ফেডারেশন গড়ে উঠল তখন এ সমস্যা অনেকটা মিটল। ফেডারেশনের কথায় পরে আসছি।

ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়

আমাদের কী যে দুর্ভাগ্য! যখনই পার্টি একটু বেড়ে ওঠে, একটু গড়ে ওঠে, তখনই এমন এক-একটা ধাক্কা আসে যে পার্টি বাঁচাতেই আমাদের প্রাণান্ত হতে হয়।

দেশ স্বাধীন হওয়ার অল্প কিছুদিন পরে, '৪৭ সনের শেষের দিকে, কেন্দ্রীয় নেতা কমরেড রণদিভের উদ্যোগে পার্টি নীতি পরিবর্তনের সুপারিশ করা হলো। এর প্রেরণা ছিল 'আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি' সম্পর্কে তৎকালীন কমিউনিস্ট দেশ-গুলির সম্মিলিত মঞ্চ 'কমিনফর্ম'-এর সভায় সোভিয়েট নেতা কমরেড ঝানভের একটি বক্তৃতা। ঐ সভায় ধনতন্ত্রী দেশগুলিতে শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে সংগ্রামী (মিলিট্যাণ্ট) আন্দোলনের পরামর্শ দেওয়া হয়। এর ভিত্তিতেই পার্টি-নেতৃত্বের একাংশের মতে কমরেড পি. সি. যোশীর সময়ে যে-লাইন অনুযায়ী পার্টি পরিচালিত হচ্ছিল, সেটা হলো সংস্কারবাদী নীতি। কেন্দ্রীয় কমিটিতে নতুন নীতির সমর্থকরা ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। অবশ্য সদ্যস্বাধীন দেশ সম্পর্কে ঐ নতুন নীতির প্রয়োগ ঠিক ছিল কিনা, সেটা বিচার করা হয়তো আরও উচিত ছিল। এই নতুন নীতির সার কথা হলো: কংগ্রেস সরকার পুরোপুরি স্বাধীন নয়। এ সরকার একদিকে সাম্রাজ্যবাদ, অপরদিকে সামন্ততন্ত্র ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের সঙ্গে জোট বেঁধে আছে। এই জোট থেকে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত এই স্বাধীনতা অর্থহীন। অর্থাৎ, এ আজাদী ঝুটা।

এই নীতি সম্পর্কে যখন আলোচনা চলছিল তখন কলকাতায় একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। কমিউনিস্ট প্রভাবিত যুব সংগঠন এখানে একটি উৎসবের আয়োজন করেন। এই উপলক্ষে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেকগুলি দেশ থেকে তখনকার বিপ্লবী নেতারা আমন্ত্রিত হয়ে কলকাতায় আসেন। উৎসব অত্যন্ত আকর্ষণীয় হয়। কংগ্রেস এতে যোগ দেয় না কিন্তু যুব সাধারণের ব্যাপক যোগদানে তাদের অনুপস্থিতি ঢাকা পড়ে। উৎসবের শেষদিকে ডিক্সন লেনে শ্রী চারুচন্দ্র ঘোষের বাড়িতে বিদেশী অভ্যাগতদের আপ্যায়নের জন্য একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠান শেষে সমস্ত অতিথিরা যখন বেরোতে যাবেন তখন তাদের লক্ষ্য করে বাইরের থেকে হঠাৎ চালানো হয় গুলি। সৌভাগ্য-বশত বিদেশীদের গায়ে সে গুলি লাগেনি। কিন্তু লেডী অবলা বসুর পালিত

পুত্র সুশীল মুখার্জী ও চারুচন্দ্র ঘোষের আত্মীয় ভাবমাধব ঘোষ নামে দুটি যুবকের মৃত্যু ঘটে সেই গুলিতে। ঘটনাটা এত আকস্মিক এবং এত অপ্রত্যাশিত ছিল যে সংবাদপত্রগুলিও এর নিন্দা করে। সাধারণ লোকেরাও এই ঘটনায় মর্মাহত হন। পার্টির চোখে ঘটনাটি ছিল খুবই অর্থবহ। গুণ্ডা লাগিয়ে একাজ কংগ্রেস থেকে করানো হয়েছে, এমন সন্দেহ না করার কোন কারণ ছিল না। পার্টির নতুন নীতির চিন্তাধারাকে ঘটনাটি হয়তো জোরালো ভাবে প্রভাবিত করে।

অপর দিকে ১৯৪৬ সন থেকে হায়দ্রাবাদের নিজামের রাজত্বের বিরুদ্ধে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে চলছিল প্রচণ্ড কৃষক-বিদ্রোহ। তেলেঙ্গানার কৃষক-বিদ্রোহ হিসাবে এই আন্দোলন ভারতে স্মরণীয় হয়ে আছে। কৃষক নারীদের অপূর্ব বীরত্ব ও আত্মত্যাগ এই সংগ্রামের আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। নিজামের হিংস্র রাজাকার বাহিনীকে এই বিদ্রোহ দমনে ছেড়ে দেওয়া হয়। রাজাকার বাহিনীর হিংস্রতার খবর আমরা পরবর্তী কালে '৭১ সনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময়ে শুনে শিউরে উঠেছি। এ বাহিনীর জন্ম নিজামের রাজত্বে ১৯৪৭ সনে, ভারতের স্বাধীনতা লাভের পর, নিজামশাহী হায়দ্রাবাদকে স্বাধীন রাজ্য হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবীতে। এ দাবী কার্যত দাঁড়ায়, বিভক্ত ভারতের বুকে আর একটি স্বাধীন সাম্প্রদায়িক রাজ্যের পত্তন। স্বভাবতই কংগ্রেস এ দাবী মেনে নিতে পারে না। কৃষক-বিদ্রোহ তো চলছিলই। কংগ্রেসের একাংশের সেই কারণে কৃষক-বিদ্রোহের প্রতি পরোক্ষ সমর্থন ছিল। অন্তত কংগ্রেসের লোকেরা এ লড়াইতে নিরপেক্ষ ছিলেন। অবশেষে ১৯৪৮ সনে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সহায়তায় নিজাম গদীচ্যুত হয় এবং ভারতের সঙ্গে হয় হায়দ্রাবাদের সংযুক্তি সাধন।

কিন্তু তার পরের ঘটনা সত্যিই কলঙ্কজনক। কংগ্রেসের আসল চেহারার নগ্ন প্রকাশ আর একবার দেখা গেল। কমিউনিস্টরা যে সংগ্রামের মূল বাহিনী ছিল এবং নিজামের শাসনকে যারা তখন প্রায় পর্যুদস্ত করে এনেছিল, সেই কমিউনিস্টদের দমন করা ও কৃষক-বিদ্রোহকে ভেঙ্গে দেওয়াই ছিল এরপর থেকে ভারতীয় কংগ্রেসের প্রধান কাজ। বল্লভ ভাই প্যাটেলের নির্দেশে আন্দোলনের নেতারা গ্রেপ্তার হলেন। প্রধান নেতা রবিনারায়ণ রেড্ডীকে তারা ধরতে পারেননি। তিনি আত্মগোপনে ছিলেন। অন্যান্যদের শুধু গ্রেপ্তার করেই কংগ্রেস নেতৃত্ব খুশি ছিলেন না, প্যাটেল সাহেবের ঢালাও হুকুম ছিল—'যত পার কমিউনিস্টদের নিধন কর।' জওহরলালের সায় না থাকলে এমন নির্দেশ

প্যাটেল নিশ্চয়ই দিতে পারতেন না। দীর্ঘ কয়েক বছর ধরে কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে চলে ব্যাপক সন্ত্রাস। কমিউনিস্ট-বিদ্বেষ কংগ্রেসের হাড়েমজ্জায় প্রবিষ্ট হলেও পরবর্তী সময়ে একটি আশ্চর্য ঘটনা কংগ্রেসকে প্রত্যক্ষ করতে হয়েছিল। ১৯৫২ সনে স্বাধীন ভারতের প্রথম নির্বাচনে রবিনারায়ণ রেড্ডী আত্মগোপনে থেকেও ভারতের সমস্ত বিজয়ী প্রার্থীদের মধ্যে সর্বোচ্চ ভোটে জয়ী হন। কিন্তু তবুও তাঁর উপর থেকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা তুলে নেওয়া হয় না। পরে তৎকালীন পার্টিনেতা অজয় ঘোষ নিজে জওহরলালের সঙ্গে অনেকবার সাক্ষাৎ ও আলোচনা করেন এবং একটা আপোস হয়। ফলে, পার্টি তেলেঙ্গানা-সংগ্রাম প্রত্যাহার করে এবং প্রকাশ্য সরকারী সন্ত্রাসেরও অবসান ঘটে।

সম্ভবত দেশের এই নির্মম অভিজ্ঞতাগুলি কমিউনিস্ট পার্টিকে তার নতুন লাইন গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করে এবং তেলেঙ্গানার সশস্ত্র বিদ্রোহের দৃষ্টান্তকে সামনে রেখে নতুন ধরনের সংগ্রামের প্রস্তুতি গড়ার অনুপ্রেরণা যোগায়।

আমাদের পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস হয় ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারিতে। মহম্মদআলী পার্কে পার্টি-নেতাদের বক্তৃতায় 'তেলেঙ্গানা ওয়ে ইজ আওয়ার ওয়ে'—এই শ্লোগানে উচ্চারিত হলো সশস্ত্র সংগ্রামের আহ্বান। তেলেঙ্গানার পথই আমাদের পথ, শেষ পর্যন্ত এই রণনীতিই গৃহীত হলো। তারপরে '৪৮-এর ২৬শে মার্চ রুদ্ধদ্বার কক্ষে পার্টির প্রাদেশিক বর্ধিত সেক্রেটারিয়েট মিটিং-এ পার্টির উপর নিষেধাজ্ঞা আসতে পারে এমন আশঙ্কার কথা শুনলাম কিন্তু বিপদটা কোন রূপে আসবে তা তখনও আন্দাজ করতে পারিনি।

ট্রেড ইউনিয়নগুলিতে ইতিপূর্বেই নানা দাবী-দাওয়া নিয়ে ধর্মঘট শুরু হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু দেখা যাচ্ছিল—ধর্মঘটে আর তেমন তেজ নেই। সেই ২৯শে জুলাই-এর সাফল্যের পর এই পার্থক্যটা চোখে পড়ার মতন। ট্রাম-বাস শ্রমিকদের মধ্যে ছিল কমিউনিস্টদের প্রাধান্য। তারা রাস্তায় নামলেই কলকাতায় হরতাল সর্বদা সফল হয়ে যেত। কিন্তু ক্রমে ক্রমে তাদের মধ্যেও অন্যত্র কোন প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট হলে তার সমর্থনে হরতালে যোগ দিতে দ্বিধা দেখা যেতে লাগল। ২৯শে জুলাই-এর ধর্মঘটে যে ট্রাম শ্রমিকেরা ইউনিফর্ম পরে স্বেচ্ছায় রাস্তায় হাঁটল, তাদের মধ্য থেকেই এখন দাবী উঠল—সকালবেলা তারা ডিউটিতে যোগ দেবে, নাম সই করবে, ব্যাগ নেবে এবং ট্রাম গাড়ি রাস্তায় বের করবে। তারপর জনতা যদি গাড়ি আটকায় তবে 'জান খত্‌রা' অজুহাতে গাড়ি তারা ডিপোতে তুলে দেবে। স্পষ্টতই শ্রমিকদের মধ্যে ঘন ঘন ধর্মঘটে অনিচ্ছা এবং ভয় দেখা যাচ্ছিল। এ নিয়ে পার্টি মিটিং-এ অনেক আলোচনা

হতো, নানারকম মত্ত হতো কিন্তু সমস্যাটার মূল কোথায় বোধহয় তা গভীর ভাবে পর্যালোচনা করা হতো না। ধর্মঘট শ্রমিকের হাতে এক শক্তিশালী হাতিয়ার। তার সফল প্রয়োগে ২৯শে জুলাই হয়, তার ব্যর্থ প্রয়োগে কি হয় তা দেখা গেল '৪৯ সনের ট্রেড-ইউনিয়ন কংগ্রেসের ডাকা সারা ভারত রেল ধর্মঘটে। কিন্তু '৪৯-এর অভিজ্ঞতার পরেও জোর করে ধর্মঘট করানোর প্রবণতা চলতেই থাকল।

আমি ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে জড়িত নই। যেটুকু অভিজ্ঞতা চটকল, সুতোকল প্রভৃতি থেকে হয়েছিল—তার দ্বারা শ্রমিক আন্দোলন সম্পর্কে কোন গভীর উপলব্ধির মধ্যে আমি প্রবেশই করতে পারিনি। কিন্তু '৪৯-এর ধর্মঘটে হঠাৎই আমি জড়িয়ে যাই এবং তার থেকে যে অভিজ্ঞতা আমার হয়েছিল সেটুকুই এখানে বললাম।

সেই রুদ্ধদ্বার পার্টি মিটিং-এর পরের দিনই আমি গ্রেপ্তার হই। জানা গেল, পার্টি বে-আইনী ঘোষিত হয়েছে। ফার্ন রোডের বাড়িতে পুলিস এলো। ওটা তখন আর কমিউন নয়। আমার আত্মীয়দের সঙ্গেই আমি থাকি। আমাদের উপর বিপদ আসছে জেনেও ভেবেছিলাম—আমার মতো চুনোপুঁটির তাতে আর কি হতে পারে! দেখলাম পুলিস আমাকে চেনেও না। আমি সামনেই দাঁড়িয়ে—তবুও ওরা এদিক-ওদিক দেখছে। তখন আমি নিজে নাম বলতে আমাকে নিয়ে ওরা চলে গেল। ভাবতে ভাবতে গেলাম, আমাকে কেন ধরল? কি করেছি আমি? লর্ড সিন্‌হা রোডে গিয়ে দেখলাম, জ্যোতিবাবু, মুজফ্‌ফর আহমেদ সাহেব এবং আরও কেউ কেউ আগেই এসে গেছেন। একটু পরে গীতা মুখার্জী এলো। ওকে দেখে প্রাণে একটু জল এলো। জেলে যাওয়া এই আমার প্রথম, সুতরাং কিছুই জানি না। কাকাবাবুর কাছ ঘেঁষে গিয়ে বসে বললাম, 'কাকাবাবু, আপনি একটু ওদের বলে দিন, আপনাদের যেখানে রাখবে আমাকেও যেন সেখানেই রাখে। আমি অন্য কোথাও যাব না।' কাকাবাবু বললেন, 'সে কি করে হয়? ছেলেদের ও মেয়েদের তো আলাদা রাখে। আপনার কোন ভয় নেই। কোন অসুবিধা হবে না।'

আমি আর গীতা চলে গেলাম প্রেসিডেন্সি জেলের 'ফিমেল ওয়ার্ডে'। ওখানে ঢুকবার পরই ফাটক বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গেই যেন একটা শ্বাস-রোধকারী কষ্ট বুকের মধ্যে অনুভব করলাম। ইচ্ছা হলো চিৎকার করে বলি—আমি এখানে থাকব না। অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। তাছাড়া গীতাও তো আছে। ও আমার চেয়ে কত ছোট। দিনটা ওদের দেওয়া

খাবার ইত্যাদি খেয়েদেয়ে ভালই কাটল। অনেক মেয়ে কয়েদী ছিল। ভয় হলো সন্ধ্যাবেলা। এইবার আমাদের তালা বন্ধ করবে। অন্য কয়েদীদের মতো আমরাও ৬টার মধ্যে যা পারি খেয়ে নিলাম। তারপর আমাদের দু'জনকে দুটো ছোট ঘরে ঢুকিয়ে বাইরে থেকে ঘটাং করে তালা লাগিয়ে দিল। দু' 'ঘরের সামনে দু'টো লণ্ঠন রেখে দিয়ে গেল। ভেতরে দিল না—যদি পুড়ে মরি।

. আমরা দু'জনে যতক্ষণ পারি এই তামাশায় দু'ঘরে বসে প্রাণ খুলে হাসলাম ও চীৎকার করে কথা বলাবলি করলাম। কিন্তু তার তো একটা সীমা আছে। একসময়ে থেমে গেলাম। কিন্তু ঘুম কোথায়? মাথার মধ্যে কি যেন কিল-বিল করতে লাগল। ইচ্ছা হলো জানলার গরাদে মাথা ঠুকি আর চেঁচাই। মনে মনে ভয় হলো—সত্যিই কি পাগল হয়ে যাচ্ছি। শুনেছিলাম, উল্লাসকর এইরকম বন্দীজীবনে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন। নিজেকে অনেক চেষ্টায় শান্ত করলাম। তবু ঘুম আসছিল না। আমি তো একলা ঘরে শুতেও পারি না, আমার কেমন গা ছমছম করে। তবু শেষরাতে ক্লান্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম আর ঘুম ভাঙ্গল ওদের তালা খোলার শব্দে। তড়াক্ করে লাফিয়ে উঠে বাইরে নেমে গেলাম ও আমাদের চত্তরের আকাশটুকু দেখে যেন বুক ভরে নিঃশ্বাস নিতে পারলাম। দেখলাম, উঠোনের বাগানটুকুতে সুন্দর বেলফুল ফুটে রয়েছে। মুখ ধুয়ে কয়েকটা ফুল তুলে নিলাম। মধ্যবয়সী একটি মেয়ে কয়েদী আমাদের দেখাশুনা করছিল আগের দিন থেকে। বললো, দিদি, আপনি ফুল ভাল-বাসেন? তাহলে রোজ সকালে আমি আপনার বিছানায় থালা করে ফুল দিয়ে আসব। মেয়েটির নাম রাধারানী। খুনী কয়েদী। কিন্তু অত সুন্দর মনের মেয়ে কয়েদী হতে পরে তা আমার জানাই ছিল না। ওর কথা পরে বলব। ২/৩ দিন. পরে পুঁটুদি এলেন। তিনি তো আমার চেয়েও অবাক—তাঁকে কেন ধরল। যা হোক আমরা ৩ জনে জেলার ও সুপারের সহায়তায় জীবনযাত্রাটা একটু. সহনীয় করে তুলেছিলাম। সুপার রাজী হলেন ৬টার সময়ে আমাদের আর ঘরে ঘরে লক্‌আপ করে রাখবেন না। তবে দোতলায় উঠতে হবে এবং সিঁড়ির কোলাপসিবল্ গেটে তালা পড়বে। আমাদের খাবারগুলো ৬টাতেই আসত এবং সময়মত হ্যারিকেনের উপর সেগুলো গরম করে নিতাম। আমাদের জেল সুপারকে আশ্বাস দিলাম—আত্মহত্যা করে আমরা আপনাকে বিপদে ফেলব না। আমরা বাঁচতে চাই এবং আরো সুন্দর করে সকলে মিলে বাঁচতে চাই। আমাদের জেলে আসাটাও এই কারণে।

জেলের একটা লাইব্রেরী ছিল। দু'দিন অন্তর মাস্টার আসত আমাদের

বই দিতে। ওখানকার দু'জন মেট্রন, জমাদারনী ও কয়েদী—সকলের সঙ্গেই আমাদের খুব ভাব হয়ে গেল। বই পড়তাম আর বাকীটা সময় ওদের সঙ্গে গল্পগুজবে কেটে যেত। প্রতি সপ্তাহে জামাইবাবু দেখা করতে আসতেন—নানারকম খাবার নিয়ে। জেলের অফিসাররা ওঁকে বলতেন শিবতুল্য লোক। জামাইবাবুর পানের কৌটো তাঁরা খালি করে দিতেন। ইনি ছিলেন আমার সবচেয়ে বড় জামাইবাবু।

আমাদের খাবার আসত আমাদেরই পার্টির বন্দী ছেলেদের ওয়ার্ড থেকে। সকালে 'উপমা' নামক কি একটা সুজির পুলটিশ মতন পাঠাত—খাওয়াই যেত না। দুপুরে ভালই খেতাম, রাত্রে আসত মাংস। আমরা খেতাম রাত ন'টার পর, মাংস তখন জমে পাথর। হ্যারিকেনের সাধ্য কি তাকে গলায়। এ্যায়সা দালদা তাতে ঢালা হতো যে আমরা খেতেই পারতাম না। শুনতাম, কমরেড হুদার নেতৃত্বে ওটি রান্না হতো। আমরা নাম দিয়েছিলাম "হুঁদা কাল্‌ট"।

জেলের মধ্যে রাধারানীকে আমরা সবাই ভাল বাসতাম। ও খুনী আসামী। অনেক বছর সাজা খাটা হয়ে গেছে, আর কয়েক বছরের মধ্যেই ছাড়া পেয়ে যাবে। মেট্রনের কাছে শুনতাম ওর খুনের কাহিনী। এমন অদ্ভুত ঘটনাও ঘটতে পারে, জানতাম না।

রাধারানী ছিল বালবিধবা। বড় ভাই-এর সংসারে থাকত। দাদাও বোনকে খুব ভালবাসতেন, বোনও তেমনি দাদা বলতে অজ্ঞান। বৌদিও ভাল—কোন কাজই প্রায় ওকে করতে হয় না। একটু বড় হলে রাধারানী দীক্ষা নিতে চাইল। দাদাও মত দিলেন। ভালই তো পূজো-টুজো নিয়ে তবু দিন কাটবে। দীক্ষা নেবার পর ও পূজো নিয়ে মেতে থাকত। ওর গুরুদেব ওকে দিয়ে কি একটা ব্রত করালো। ব্রত অন্তে গুরুর আদেশ হলো—তোমার সব চেয়ে প্রিয়জনকে ঠাকুরের নামে উৎসর্গ করতে হবে তোমাকে। ও বললো, সে তো আমার দাদা। সেটা কেমন করে হবে গুরুদেব ? গুরুদেব অনড়, সম্ভবত ওকে কিছু খাওয়ানোও হয়েছিল। সেই মত্ত অবস্থায় ও দা দিয়ে ঘুমন্ত দাদার গলায় কোপ মেরে অজ্ঞান হয়ে গেল। পুলিস কেসে কি একটা চক্রান্ত ধরাও পড়ল—কিন্তু যে খুনী, তাকে তো আর ছাড়া যায় না। ওর চৌদ্দ বছর জেল হলো। জেলে ও পাগল হয়ে যায়। কোন চিকিৎসায় নয়, জেলের মেট্রন মিসেস সুইনীর সহৃদয় ব্যবহার আর আপ্রাণ চেষ্টায় ও শেষে ভাল হয়ে গেল। মেট্রনকে ও মায়ের মতোই দেখত। ছাড়া পেয়ে ও তাঁর কাছেই চলে গেল।

রোজ সকালে এই রাধারানী একখানি থালায় করে আমার জন্য বেলফুল তুলে আনত। মনে হতো, ও আবার কিসের খুনী? ওর মনটাও তো বেলফুলের মতোই শুভ্র। আমাদের দেশের মেকী গুরুরা যে কী সাংঘাতিক হতে পারে, রাধারানীর জীবনে সেই সত্যই উদ্ঘাটিত।

দেখতে দেখতে তিন মাস প্রায় কেটে গেল। এই সময়ে হঠাৎ পুঁটুদি একদিন পা ভেঙ্গে ফেললেন। সেও এক মজার গল্প। অনেক বলা-কওয়ার পর জেলার আমাদের জেনানা ফাটকের বাইরে সব্জী বাগানে বিকেলে এক ঘণ্টা বেড়াবার অনুমতি দিলেন। মেট্রন ও জমাদারনী সঙ্গে থাকবেন। প্রথমদিন সেখানে যেতেই পুঁটুদির খুশি যেন উপচে পড়ল। একটা বাঁধানো উঁচু জায়গায় উঠে সেখানে দাঁড়িয়ে হো হো করে হাসতে হাসতে তিনি 'ফেলু' নাম ধরে চীৎকার করে ডাকাডাকি শুরু করলেন। ফেলু ওর বোন। এমন কি মেট্রনের ছেলের নাম ধরেও চীৎকার করে ডাকতে লাগলেন তিনি। সেই ডাক যেন শেষ হয় না। হাসির দমক তার যেন থামেই না। আমরা সবাই অবাক। পাখি যেন এতদিনে আকাশ দেখছে। পাশে আমিও দাঁড়ানো। হাসি থামতে তিনি বললেন, এখন কি করা যায়? আমি বললাম, এখান থেকে লাফ দিতে পারেন? বলা মাত্রই দিলেন লাফ। কিন্তু পুঁটুদি বসে রইলেন, উঠছেন না। আমরা অন্যরা গিয়ে ধরে তুলতেই বোঝা গেল ডান পায়ের গোড়ালিতে চোট লেগেছে। ধরে ধরে নিয়ে এলাম ভেতরে। ভীষণ ব্যথা। পরদিন এক্সরে করে দেখা গেল হাড় একটু ফেটেছে। এর পর অনেক বলে কয়ে পুঁটুদির মুক্তির ব্যবস্থা করা গেল। একেবারে শোওয়া মানুষ, উনি আর বাইরে গিয়ে কি করবেন? তাই বোধহয় ছাড়া পেলেন তিনি। যাবার সময় আমার জামাইবাবু ছিলেন জেল গেটে। তিনিই পুঁটুদিকে বাড়ি পৌঁছে দিলেন। আমি তাঁকে বলে দিলাম, তিনি যেন একটু দেখা শোনা করেন। পুঁটুদির সম্বন্ধে বাকী কথাগুলিও এখানেই শেষ করে নিই।

তিন মাস পরে বাইরে এসে দেখেছিলাম, আমার জামাইবাবু তখন পুঁটুদিরই জামাইবাবু হয়ে গেছেন। রোজ তিনি ঐ বাড়ি যান খোঁজ নিতে আর বসে বসে খোস গল্প করেন। পুঁটুদি যখন খুঁড়িয়ে চলতে পারেন তখন আমাদের ফার্ন রোডের বাড়িতে তিনি প্রায়ই যেতেন এবং সবাইকে হাসির হুল্লোড়ে মাতিয়ে আসতেন। একদিন বললাম তাঁকে খেয়ে যেতে। ইলিশ মাছ হবে, লাউ-পোস্ত হবে। দুটোই পুঁটুদি ভালবাসেন। জামাইবাবুকে রান্নার পদ্ধতি বলে দিলাম যাতে রান্নার লোককে তিনি একটু দেখিয়ে শুনিয়ে দেন। আমরা দু'জন

কি কাজে বাইরে গেলাম। ফিরে এসে খেতে বসলে পুঁটুদি লাউ খেয়ে বলেন, 'মনি এটা কি?' বলি, 'কেন লাউ-পোস্ত।' বললেন, 'পোস্ত কোথায়?' আমিও মুখে দিয়ে দেখলাম—এটা তো পোস্ত নয়। জামাইবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—কি এনেছিলেন তিনি। বললেন—'ক্যান, তুই যে কইলি পেস্তা আনতে। তাই তো আনছি। আমি বাপু বাপের জন্মে শুনি নাই পেস্তা দিয়া কেউ লাউ খায়।' এতক্ষণে বুঝলাম সব। বরিশালের বাঙাল পোস্ত কাকে বলে জানেই না। বুদ্ধি করে পেস্তা এনেছেন। অতএব লাউ-পোস্ত নয়, লাউ-পেস্তা হয়ে গেছে। সেদিনকার পুঁটুদির ঘর-ফাটানো হাসি আর আমার জামাইবাবুরও অত জোরে জোরে হাসি যেন এখনও আমার কানে বাজে।

পুঁটুদির এই আপন করার স্বভাবই তাঁকে আর একটা মহৎ গুণের অধিকারী করেছিল।

পুঁটুদির পর তিন মাস বাদে আমিও ছাড়া পেয়ে খুশি হয়েছিলাম; কিন্তু গীতা রয়ে গেল জেলখানায়, তাকে একলা ফেলে চলে আসতে খুব খারাপ লেগেছিল। এই ৩ মাস একসঙ্গে কাটিয়েছি। গীতা আমাকে দিদির মতোই দেখত। নানা মজার কাজও করত সে। আমার নাকের মাথার দুধারটা নাকি বেশী কালো এবং এটা নাকি আমার স্বাভাবিক রং নয়। ধুলো জমে জমে নাকি ওরকম হয়েছে। গীতা কি একটা ক্রীম কিনিয়ে আনালো। আমার নাকের মাথায় গরম জলে ভেজানো ন্যাকড়া জড়িয়ে রাখা হতো। তারপরে আরম্ভ হতো কাপড়ের টুকরোয় ক্রীম লাগিয়ে তাই দিয়ে ঘষাঘষি, যতক্ষণে নাকের ছাল উঠে আসার মতো অবস্থা না হতো এবং আমি চেঁচিয়ে না উঠতাম, ততক্ষণ ছাড়াছাড়ি ছিল না। আমাকে ফর্সা করার এই চেষ্টা থেকে অনেক কাতুতি-মিনতির পর রক্ষা পেলে গীতা আবার হয়তো অন্য একটা কিছু নিয়ে পড়ত। এই রকম ছেলেমানুষ মেয়েকে একলা ফেলে আসতে সত্যিই আমার খুবই খারাপ লাগল।

আমাদের নীচের তলার সেলগুলোতে থাকত পাগল মেয়েরা। সারারাত তাদের চীৎকারে ও গরাদ ধরে ঝাঁকুনিতে আমাদের ঘুম মাথায় উঠে যেত। পরের বারে জেলে গিয়ে শুনেছিলাম, একদিন ওদের চীৎকারে ঘুমোতে না পেরে গীতা নিজেই পাগলের মতো চীৎকার করতে লাগল এবং উপরের দেওয়ালের ফাঁকা-ফোকর দিয়ে গেলাস-কাপ-ডিস-থালা যা কিছু ছিল সব ছুঁড়ে ফেলেছিল। পরদিন পাগল মেয়েদের নাকি অন্য ওয়ার্ডে সরিয়ে আনা হয়।

আমি বাইরে এসে কোথায় থাকব। সেই সমস্যায় পড়লাম। নেতাদের কাছ

থেকে নির্দেশ পেলাম ফার্ন রোডে না থাকার। আমাদের সমিতির অফিস ও সমস্ত কর্মকেন্দ্র পুলিস তখন সীল করে দিয়েছে। কোন কর্মীর দেখা পেলাম না। ফলে, কয়েকটা বাড়িতে ২/৪ দিন করে থাকলাম। কিন্তু আমার উপর তখন নির্দিষ্ট কোন কাজের ভার নেই। হঠাৎ খবর পেলাম গোপনভাবে 'ঘরে-বাইরে' বেরুচ্ছে। বেলা লাহিড়ী ও মুক্তি মিত্র বের করছে। তাতেই লেখা পাঠাতে লাগলাম।

ওরা দুজনে নাম নিয়েছিল গঙ্গা ও যমুনা। লেখা পাঠানোর জন্য বেলার চিঠি পেতাম। গোপনে থেকে কি করে ওরা কাগজ বের করছে তা ভেবে বিস্মিত হতাম। কাগজখানা এলে গর্বে আমার বুক ভরে উঠত। পরপর কয়েকটা সংখ্যা ভিন্ন ভিন্ন নামে বেরিয়েছিল। গোপনে থেকে কাগজ বের করা মোটেই সহজ কাজ ছিল না।

এরপর আরও দুটো বাড়িতে আশ্রয় জুটে গেল। কিন্তু সেখানে গিয়েও সারা দিনরাত আমার কিছুই করবার ছিল না, মাঝে মাঝে 'ঘরে-বাইরে'র লেখা ছাড়া। কয়েকদিন অন্তর পার্টির কাছ থেকে কিছু নির্দেশ আসে মাত্র। কিছুদিন এইভাবে চলার পরে আমি অস্থির হয়ে ওঠায় নেতৃত্ব একবার আমায় বড়াকমলাপুর পাঠালেন, পরে পাঠালেন খড়্গপুরে।

বড়াকমলাপুর তখন আমাদের মতে স্বাধীন হয়ে গেছে। ওখানে পুলিস ঢুকে কাউকে ধরতে পারে না। শাঁখ বাজিয়ে মেয়েরা পুলিসের আগমনের সংকেত-ধ্বনি দিতেন। সারা গাঁয়ে শাঁখ বেজে উঠতই ছেলেরা সরে যেত গোপন আস্তানায়।

আমাকে ওখানে নিয়ে যাবার জন্য এসেছিল ২২/২৪ বছরের একটি ছেলে। রাত্রির অন্ধকারে আমি একটা কাপড়ের পুঁটুলি নিয়ে তার সঙ্গে ট্রেনে উঠলাম। একগলা ঘোমটা দিয়ে সেদিন বৌ সেজেছি। ট্রেন থেকে নেমে যখন গ্রামের পথ ধরলাম তখন রাত্রি প্রায় ৮টা হবে। অনেকটা হাঁটার পর হঠাৎ আমাদের মুখের উপর টর্চের আলো পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটা লাঠিধারী ছেলে আমাদের ঘিরে ধরল। তারা ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করল—কোথায়, কার বাড়ী যাবে, সঙ্গে কে ইত্যাদি। ভয়ে ছেলেটার মুখ দিয়ে তখন কথাও সরছে না। ওরা ছেলেটার কলার চেপে ধরেছে এবং বার বার আমার দিকে তাকাচ্ছে। গ্রামদেশে এতবড় একটা ঢ্যাঙা লম্বা বৌ থাকতে পারে, এটা ওদের বিশ্বাস হচ্ছে না। ওদের সন্দেহ হচ্ছে—আমি কোন ছদ্মবেশী ছেলে-কমিউনিস্ট। তখন আমি স্পষ্ট বুঝলাম—অভিনয় না করলে ছাড়া পাব না। আমি ঘোমটার মধ্য থেকে

ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম এবং বললাম, 'ওগো, তুমি হাঁক পাড়ো না, একি ডাকাত নাকি গো? মেয়েছেলে নিয়ে চলতে দেবে না—এ কেমন কথা?'

ছেলেগুলো চমকে গেল। নারীকণ্ঠ শুনে বুঝল আমি ছদ্মবেশী নই। খানিকটা ত্রুটি স্বীকার করে ছেড়ে দিল। আমরাও আবার চলতে লাগলাম। ওরা পেছন পেছন আবার ছুটে এলো, ছেলেটার দেহ তল্লাসী করল। আমার হাতের পুঁটুলিটাতেও কিছুই পেল না। কেমন করে পাবে? সব হ্যাণ্ডবিলের বাণ্ডিল তো আমার বুকের মধ্যে। শীতকাল, গায়ে চাদর-ঢাকা। মেয়েছেলেকে তল্লাসী করতে ওরা বোধহয় সাহস পেল না, তাই ছেড়ে দিল। আমরাও হাঁফ ছেড়ে দ্রুত পায়ে হেঁটে নির্দিষ্ট বাড়ি পৌঁছে গেলাম। ঘটনা শুনে ওখানকার নেতা অজিত বসু বললেন, 'সেম্ সাইড্' হয়ে গেছে। এখানে কংগ্রেসের লোক আসবে কোথা থেকে? কিন্তু ছেলেটির কথায় অন্যরকম বুঝেছিলাম আমি। সে আমাকে বলেছিল, ঐ এলাকাটুকুতে কংগ্রেস আছে, তাই নিঃশব্দে হাঁটতে। বড়াকমলাপুরে কয়েকদিন থাকলাম। কৃষকদের লড়াইয়ের জায়গাগুলো দেখলাম। এখানেও লড়াই চলাকালে এক কৃষক রমণী গুলিতে মৃত্যু বরণ করেন। সেই জায়গাটাও দেখলাম। এছাড়া যে ক'দিন ছিলাম মিটিং করতে হতো।

এরপর খড়্গপুরে নিয়ে যাওয়া হলো আমাকে, ৯ই মার্চ-এর রেল-ধর্মঘটে সহায়তা করতে। ওখানে রাত্রিবেলা পৌঁছেছিলাম। এক বাড়িতে অন্য পরিচয়ে আমাকে রাখার বন্দোবস্ত হয়েছিল। দরজা খুলে দাঁড়িয়ে এক ভদ্রলোক আমাকে বললেন, 'ভেতরে আসুন'। ঘরে গিয়ে বসতেই ভদ্রলোক বললেন—'আপনি তো মনিদি, ঘোমটাটা এবার খুলে ফেলুন।' দু'জনেই হেসে মরে যাই। ভদ্রলোকটি আমার বরিশালের পরিচিত। উনি বললেন, সত্যি কথাটা আমাকে ওরা বললেই পারত।

পরের দিন রেল কলোনীর আর একটা বাড়িতে আমাকে তোলা হলো। সেখানে গিয়েই বাড়ির ভদ্রলোকটিকে আমি বললাম—'একি করেছেন? আপনার মা ও স্ত্রী তো আমাকে চেনেন। আমার বীণা দেবী নাম ওঁরা বিশ্বাস করবেন কেন?' হলোও তাই, মা আমার দিকে বারংবার তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বলেই ফেললেন—'ঠিক আপনার মতনই দেখতে একটি মেয়ে আমাদের বাড়িতে কয়েকদিন ছিল। সে সমিতি করত। তার নাম মনিকুন্তলা, বীণা নয়। তবে তার বিয়ে হয়নি।' দু'তিন দিন ধরে মা ঐ একই কথা আমায় বলে যাচ্ছেন: 'আপনি যেমন আমার রান্না খেতে পছন্দ করছেন, সেই মনিকুন্তলাও

খুব ভালবাসত আমার রান্না। আপনি কি তাকে চেনেন ? তার কেউ হন ?' হুঁ, না-র, জবাব দিয়ে কত আর ঢাকব ? বৌটিকে আড়ালে নিয়ে বললাম, 'তুমি কি আমাকে চিনতে পেরেছ।' বললো, 'হ্যাঁ'।—'মাকে বলেছ ?' বললো, 'না'। বললাম, 'মাকে ডাকো।'

মা এলে বললাম—'মাসীমা আমি আপনার সেই মনিকুন্তলাই। কিন্তু বীণা বলেই ডাকবেন, আর কাউকে যেন বলবেন না আমি এখানে আছি। আমাকে গোপনে থাকতে হবে।'

মাসীমা বাঙাল। বললেন, 'আমার চোখরে ফাঁকি দিবা ? আমি আগেই বুঝছি তুমি আমাগো সেই মনিকুন্তলা। তবে সিন্দুরের টিপ পরছ পরো, মাথায় দিও না, তোমার তো বিয়া হয় নাই।' কয়েকদিন হাসাহাসি করে কাটল। কমরেডরা আমাকে বললেন কোয়ার্টারের মেয়েদের নিয়ে মিটিং করতে।

মিটিং ডাকা হলো। আমি উপস্থিত হতেই একজন মেয়ে বলে উঠল—'তবে যে বললো কে নাকি বীণা দাস আসবে ? তাই বলেন, সেই বীণা দাস আসেন নি। আপনি তো মনিদি।' একঘর লোকের সামনে আমি যেন চুপসে গেলাম। বললাম, 'আপনারা ভুল করছেন—আমারই নাম বীণা দাস।" 'কইলেই হইব, আমরা আপনারে চিনি না ? থাউক গিয়া, পরিচয় আপনার দেওন লাগব না—আমরা আপনারে চিনি। মিটিং-এ যা কইবেন তাই ক'ন।'

কোনমতে ধর্মঘটের কথাগুলো আউড়ে ফিরে এসে বললাম, এ কোয়ার্টারে আমাকে দিয়ে কাজ হবে না, আমাকে শ্রমিক পাড়ায় নিয়ে চলুন। আপনারা তো জানেন এ কোয়ার্টারের প্রত্যেকটি লোক আমার পরিচিত। বছর খানেক আগে একমাস নানা বাড়িতে থেকে থেকে এখানে সমিতি করেছি। এখানে আমি গোপন থাকব কি করে ?

পরের দিন ঘোমটা মাথায় একটা রিক্শা করে যাচ্ছি। মুখোমুখি অন্য একটা রিক্শায় ছিলেন বিমলপ্রতিভা দেবী। আমাকে দেখেই হাসলেন্। আমি যেন তাঁকে চিনি না, এমন ভান করে রিক্শা জোরে চালিয়ে চলে গেলাম। বিমলপ্রতিভা এসেছেন জয়প্রকাশের মিটিং-এর প্রচার করতে। তাঁরা ধর্মঘট বিরোধী। রেল কোয়ার্টারের মধ্যবিত্ত মেয়েদের মধ্যে ধর্মঘটের পক্ষে কোন সাড়াই মিললো না। আমার বক্তৃতায় কেউ হুঁ-হাঁ কিছুই করল না।

আমাকে তখন বস্তি এলাকায় আনা হলো। ওখানে যে-পরিবারে উঠলাম তারা সিলেটের লোক। সিলেটের প্রতিটি মহকুমায় এবং বহু গ্রামে আমি আগে

গিয়েছি এবং থেকেছি। কাজেই আমি না চিনলেও সিলেটের অনেকেই আমাকে চেনেন। এই মেয়েটিও আমাকে দেখেই বললো, 'আপনি মনিদি না? আমার ঠিক মনে আছে। আমি অবশ্য তখন ফ্রক পরতাম কিন্তু আপনি আমাদের বাড়ি গেছেন। আপনাকে আমার মনে আছে।' ওদের দুই স্বামী-স্ত্রীকে নিয়ে বসলাম। বললাম, 'এখানে আমায় থাকতে হবে। তোমরা আমাকে চেন ক্ষতি নেই, কিন্তু তোমার দেওর দু'টিকে বলবে না। আমি এখানে স্বামী-পরিত্যক্তা, তোমাদের আত্মীয়া বীণা দাস হিসাবেই থাকব। পাড়াতেও তাই বলবে।' ওরা রাজী হলো। সবাই আমাকে দিদি বলেই ডাকতে লাগল।

কিন্তু ওখানে শ্রমিকেরা হয় তামিল-তেলেগু, নয়তো ছত্রিশগড়ি দেহাতী লোক। আমি তো কোন ভাষাই জানি না। বেছে নিলাম ছত্তিশগড়িদেরই। আমার ফুটাফাটা হিন্দী দিয়েই বস্তিতে ধর্মঘটের কথা বলতে লাগলাম। কিন্তু কোন সাড়া নেই, উৎসাহ নেই। ওখানে পণ্ডিতজী বলে একজন বৃদ্ধ শ্রমিক ছিলেন। তাঁর স্ত্রী দেখতে সুন্দরী, ভারিক্কি গিন্নী। তিনি কাজ করেন না। তিনি ঘুরতেন আমার সঙ্গে। আর হিন্দী ও দেহাতী ভাষা দুই-ই জানতেন।

এরকম কাজ করতে আমার ভালই লাগছিল, অন্তত কেউ আমাকে চিনতে পেরে বিব্রত করছিল না। তবে সাড়া নেই দেখে উৎসাহ পেতাম না। আত্ম-গোপনকারী কমরেডদের সঙ্গে মিটিং হতো। আমার অভিজ্ঞতা তারা উড়িয়েই দিতেন। যে-নেতা আসতেন তিনিই বলে যেতেন অবস্থা খুব ভাল। আমি কিন্তু কারখানার অন্যান্য বাঙালী-অবাঙালী ছেলেদের সঙ্গে আলাপ করে জেনেছিলাম —তারা কারখানার ভেতরে মুখ খুলতে সাহসই পাচ্ছেন না। এমনকি গেট মিটিংও করতে পারছেন না। অথচ নেতা-কমরেড বলে যেতেন, আপনারা কিছু ভাববেন না—ধর্মঘট ঠিক হবে। শ্রমিক আন্দোলনের কোন অভিজ্ঞতা আমার নেই। ভাবতাম, ওরা হয়তো ধর্মঘটের দিন ঠিকই ধর্মঘট করবে, এখন মুখ খুলছে না। কিন্তু ধর্মঘট যতই এগিয়ে আসছে আমি ততই নিরাশ হচ্ছি। কমরেডরা যখন গোপন মিটিং-এও আসছেন না তখন নেতা-কমরেড আমাকে বললেন, আপনাকে গেট মিটিং করতে হবে। কারখানা থেকে রাস্তা পর্যন্ত পারাপার করার জন্য একটা উঁচু গোল মতো জায়গা আছে। আমি সেই উঁচুতে দাঁড়িয়ে বলব। শ্রকিকরা গেটের সামনের মাঠে দাঁড়িয়ে শুনবেন। সাহস করে আমার ভাঙ্গা হিন্দীতে মিনিট পাঁচেক বললাম। কেউ পাঁচ মিনিট থাকলেন, কেউ বা আগেই সরে পড়লেন। আমার কথা তারা কি বুঝলেন তারাই জানেন। আমার পাশে কোন ছেলে নেই। আমি একলাই ওখান থেকে একটা রিকৃশা করে ফিরলাম।

এদিকে জয়প্রকাশের মিটিং-এর আয়োজন ঘটা করে হচ্ছে। মস্ত প্যাণ্ডেল উঠেছে, চারদিক ঘেরা দেওয়া।' আমাকে বলা হলো—ঐ মিটিং-এ আপনি শ্রমিক মেয়েদের নিয়ে যাবেন ও মিটিং-এ প্রশ্ন তুলবেন এবং আপনারা প্রশ্ন তুললেই ছেলেরাও তুলবে। মিটিং-এ গিয়ে দেখি বাইরে পুলিস ও ভেতরে লাঠি-ধারী ভলাণ্টিয়ার দিয়ে মিটিং সুরক্ষিত। আমি পণ্ডিতজীর স্ত্রীকে কয়েকটা প্রশ্ন করার জন্য শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। জয়প্রকাশ যখন বলছেন তখন একসময় তাঁকে তুলে দিলাম। তিনি একটি একটি করে প্রশ্ন করতে লাগলেন। দেখলাম, জয়প্রকাশজী একটু বিব্রতই বোধ করছেন। বিরক্ত মুখে তিনি বললেন, 'আচ্ছা তো, আপনি আইয়ে, ভাষণ দিজিয়ে, মেরা ভাষণ ম্যায় বন্ধ রাখতা হুঁ।' একথা বলার সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম, লাঠিধারী স্বেচ্ছাসেবকরা মেয়েদের দিকটা ঘিরে ফেললো। জয়প্রকাশ আবার বলতে লাগলেন। আমরা তখন ওখানে থাকা আর উচিত মনে না করে, মেয়েদের বেরুবার সরু পথটা ধরে সবাই মিলে উঠে এলাম। ছেলেদের মধ্য থেকে একটা আওয়াজও উঠল না।

উঠে আসবার পথটার দু'ধারে ঠাসা লোক। যখন বেরুচ্ছি তখন একজন বলে উঠলেন, 'একি, মনিকুন্তলা না? তুমি এখানে?' ভদ্রলোকটিকে আমি খুব ভালই চিনি। শান্তিনিকেতনে শিক্ষক ছিলেন—তখন থেকেই আলাপ। ওর ছোট বোন আমার সঙ্গে বরিশালে পড়ত। ভদ্রলোকটি সোশ্যালিস্ট পার্টি করতেন। যাহোক, নামটা শুনে আচম্‌কাই মুখটা ফিরিয়েছিলাম। আধা-অন্ধকারেও দেখলাম ভদ্রলোকটি খুব হাসছেন।

এর পরেও কমরেডরা আমাকে রেহাই দিলেন না। ওদিকে মিলিটারী দিয়ে গোটা খড়্গপুর ছেয়ে ফেলা হয়েছে। তারা অনবরত রাস্তায় এবং কোয়ার্টারের গলিগুলির সামনে দিয়ে মার্চ করছে। আমি রিক্‌শা করে ঘুরে ঘুরে ওদের বুটের আওয়াজ শুনছি আর বেয়নেটের ঝল্‌কানি দেখছি। শ্রমিক আন্দোলন কখনও করিনি তাই গুরুত্বটা বুঝছি না, কিন্তু অত মিলিটারী দেখে মনে আশঙ্কাও জাগছে।

৭ই মার্চ রাত্রে কমরেডরা আমাকে কতকগুলি হ্যাণ্ডবিল দিয়ে গেলেন—ভোরবেলা গেটে ছড়িয়ে দেবার জন্য এবং আশ্বাস দিয়ে গেলেন—ধর্মঘট হবেই, আমাদের অন্য ব্যবস্থাও রেডি আছে। হ্যাণ্ডবিল বিলি করার লোক তো আমি যে বাড়িতে থাকি সেই বাড়ির বাচ্চা দুটো ছেলে। পরদিন ভোরে ওরা রেশন-ব্যাগে হ্যাণ্ডবিল নিয়ে বেশ করে ছড়িয়ে দিয়ে এলো। সেদিন ওদের কেউ দেখতে পায় নি। তাই সাহস পেয়ে পরদিনও ওরা গেল এবং যথারীতি ওয়াচ

এণ্ড ওয়ার্ডের লোকদের হাতে ধরা পড়ল। ওরা বাচ্চা ছেলে, বাড়ির ঠিকানা বলে দিয়েছিল। সকালবেলা স্বামী-স্ত্রী দুজনেই স্কুলে পড়াতে চলে গেছে। বাড়িতে আমি একলা। হঠাৎ দেখি বাড়িটা পুলিসে ঘেরাও করেছে। আমি বললাম, আমার ভাই ও ভাই-বৌ স্কুলে গেছে—ওরা না এলে আমি কিছু বলতে পারছি না। পুলিস ওদের আনতে গেল। ইতিমধ্যে পুলিস একটা শ্রমিক মেয়েকে ঘরে ঢুকিয়ে আমার দেহ তল্লাসী করলো। ওরা সন্দেহ করছিল আমি কিছু সরাচ্ছি। কয়েকটা কাগজপত্র ছিল। তার মধ্যে বিশ্বনারী সংঘের চিঠিতে আমার নাম ছিল। বাণ্ডিলটা আমি জানালা দিয়ে ফেলে দিলাম। ঘরের ঐ জানালার পাশেই একটা বড় পুকুর, সেই পুকুরের ওপার থেকেই সিপাইরা ওটা পড়তে দেখে তুলে আনল। ইতিমধ্যে ভাই এবং ভাই-বৌ এসে গেল। সবাই মিলে উঠলাম পুলিসের গাড়িতে।

খড়্গপুরের থানায় জেরা শুরু হলো। আমি একেবারে নাকের জলে চোখের জলে একাকার হয়ে গ্রাম্য ভাষায় বলছি—'আমার কেউ নাই, এনাদের উপরই থাকি, থানা-পুলিসের আমি কি জানি, আমার ভয় করতাছে'—আমার অভিনয়ে ভদ্রলোকটি নরম হলেন। শুনলাম পাশের ঘরে গিয়ে বলছেন—'একে ছেড়ে দেওয়া যায়, এ কিছুই জানে না।' সেই অফিসারটি একবার এসে আমাকে দেখে বললেন, 'থাকুক না কিছুক্ষণ।' ওদিকে অন্যঘরে কলকাতায় টেলিফোন হচ্ছে শুনছি। এ পাশ থেকে বলছে—'মনিকুন্তলা সেন নামটা কাগজে পেয়েছি, একজন মহিলাকে ধরেছিও কিন্তু তার কপালে সিন্দুর, আমরা তাকে চিনি না, আপনারা লোক পাঠান।'

বুঝলাম আমার অভিনয়টা মাঠে মারা গেল। আমাকে ও ভাই-বৌকে মেয়ে লকআপে নিয়ে গেল। কলকাতার লোক এসে আমাকে বারে বারে দেখে যেতে লাগল। পরদিন মেদিনীপুর জেলে চালান হলাম। থানা লকআপ-এ ৯ই মার্চ সারা দিনরাত ছিলাম। অনবরত রেল চলার আওয়াজ পাই আর মনে হয়—আমার বুকের উপর দিয়েই যেন রেল চলছে।

মেদিনীপুর ও প্রেসিডেন্সি জেলে

মেদিনীপুর জেলে চালান হয়ে গেলাম আমরা দু'জন মেয়ে, আমি আর আমার পাতানো ভাই-বৌ। জেল সুপারের কাছে নাম লিখতে বললে টিপসই দিলাম। কারণ আমি তো 'বীণা দাস'।

কিন্তু গেট খুলে আমাকে ভেতরে ঢোকানো মাত্র সমস্ত রাজবন্দী ওয়ার্ড-গুলোতে ছেলেরা চীৎকার করে উঠল, 'মনিকুন্তলা সেন—জিন্দাবাদ'। দেখছে আমি ঘোমটা দেওয়া, হাত ইশারা করছি, তবু কি থামে? যতক্ষণ আমরা ফিমেল ওয়ার্ডে না ঢুকেছি ততক্ষণ এই চিৎকারের অভ্যর্থনা চললো। মেদিনী-পুরের ছেলেরা সবাই আমার চেনা। কিন্তু আমার আসবার খবর কি করে ওদের কাছে পৌঁছে গেল, সেটাই ভাবছিলাম।

পরিচয় না দেওয়াতে আমরা থার্ড ডিভিসনের বিচারাধীন বন্দী হলাম। কিন্তু পরের দিনই আমার শরীর খারাপ হয়ে গেল, জ্বর ও ব্যাসিলারি ডিসেন্টি, হয়েছে এটা নিজেই বুঝতে পারলাম। ওখানকার মেট্রন ছিলেন সাঁওতালী মহিলা। নাম সই করতে জানেন শুধু। তাঁকে বলতে তিনি কিছুই বুঝলেন না। শেষে তাঁকে বললাম—একটা বেড প্যান আনিয়ে দিতে। বেড প্যানটা জমাদারকে দিয়ে ডাক্তারের কাছে পাঠাতেই ডাক্তারবাবু ছুটে এলেন। সঙ্গে ঔষধপত্র। আমার তখন জ্বর ১০৩ ডিগ্রী। মাটিতেই কম্বল পেতে শুয়ে আছি। ডাক্তার আমার জন্য ওয়ার্ড-হাসপাতালে ভাল বিছানার ব্যবস্থা করলেন এবং আমি এতক্ষণে একটু আরাম পেলাম। ডাক্তার অভয় দিলেন, ঠিক সময়ে ধরা পড়েছে, আপনার কোন ভয় নেই। জেলের চিকিৎসায় শুনেছি ভরসাও থাকে না, কাজেই ভয় ও ভরসায় দুলতে দুলতে একটু ঘুমিয়ে পড়লাম। কিন্তু পেটের ব্যথায় জেগে গেলাম। বারে বারে রক্ত পায়খানা হতে লাগল। এবার মেট্রনটি ভয় পেয়ে ডাক্তারের কাছে ছুটলেন। ডাক্তার এসে আরো কি সব ঔষধ দিলেন। আর কিছু করার নাই। ভাবলাম আর হয়তো উঠতে হবে না! রাত তখন অনেক। আমি জ্বরে ও ব্যথায় কাতরাচ্ছি। হঠাৎ ঘটাং করে গেটের তালা খোলার একটা শব্দ পেলাম। দেখি ডাক্তার আরও একজন বড় ডাক্তার সঙ্গে করে এনেছেন। কম্পাউণ্ডারও আছে, জেলারও আছেন। ওঁরা আমাকে একটা ইন্ট্রাভেনাস ইনজেকশন দেবেন। পরিচয় পেলাম—বড়

ডাক্তারটি জিলার মেডিক্যাল অফিসার। আমার ডান হাতখানায় দু'তিনবার ছুঁচ ফুটিয়ে রক্ত বের করে দিলেন কিন্তু ঠিক মতন জায়গায় ছুঁচ যাচ্ছে না। আমি এটা জানতাম—আমার ডানহাতের ভেইনটা পাওয়া যায় না। তখন নিজেই বললাম, "ডান হাতে পাবেন না, বাঁ হাতে দিন, ভেইন পাবেন।" সবাই একটু থতমত খেয়ে আমার মুখের দিকে তাকালেন। তারপর ঠিকমতো ইনজেকশন দেওয়া হলো। আমি ইচ্ছে করেই এটা বলেছিলাম। কারণ বুঝে-ছিলাম ঠিকমতো চিকিৎসা না হলে বাঁচব না। ডাক্তাররাও আমাকে অভয় আর আশ্বাস দিয়ে, আমাকে কষ্ট দেবার জন্য অনেক দুঃখ প্রকাশ করে চলে গেলেন। বড় ডাক্তারই রোজ এসে আমায় দেখতেন। ভাল হতে দিন পনেরো লাগল। আমার শরীরটা তখন খুব দুর্বল।

জেলার, ডাক্তার প্রভৃতি সকলের কথা থেকে আমি বুঝতে পারলাম—ওঁরা সবাই আমার পরিচয় জানেন। আই. বি. অফিসার প্রায় রোজই অফিসে এসে আমাকে ডেকে পাঠান। ডেপুটি জেলার আসেন তাঁর সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করার অনুরোধ জানাতে। আমি কিছুতেই যাই না। জানি, গেলেই আমাকে নাম বলতে হবে। অথচ ছেলেদের ওয়ার্ড থেকে নির্দেশ এসেছে নাম প্রকাশ না করতে। কয়েকবার কোর্টে যাবার সময় আমি ওদের বলেছি—'এতে আর কি লাভ?' ওরা তবু বলেন, 'চলুক না, দেখি কি দাঁড়ায়।' মনে মনে ভাবি, জেলে ঢুকতেই তো তোমরা সে-পথ আমার বন্ধ করে দিয়েছ।

দুপুরে একদিন মাটিতে কাপড় পেতে শুয়ে আছি। এমন সময় জেলার রাউণ্ডে এসেছেন, আমি তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম। উনি বললেন, 'কি জন্য আপনি এই ভূমিশয্যা নিয়েছেন বলতে পারেন? আর নিজের পকেট খরচের টাকা থেকে তেল-সাবান-পেস্ট-ব্রাশ ইত্যাদি কিনতে অর্ডার পাঠিয়েছেন কেন? এ সবই তো আপনার জন্য কেনা রয়েছে—নামটা লিখে দিলেই তো সবই সরকারী খরচে পাবেন।' আমি বললাম, 'কি নাম লিখে দেবো?' উনি বললেন, 'কেন, মনিকুন্তলা সেন।' বললাম, 'না, যা আছি এই বেশ।'

নাম প্রকাশে এবার আমারও অনিচ্ছা ছিল। মেদিনীপুর থেকে বিমলা মাজি সহ প্রায় ৩০/৪০ জন কৃষক মহিলাকে ওরা ধরে নিয়ে এসেছে। এরা সবাই আমার চেনা। এক একজন আসে আর আমাকে জড়িয়ে ধরে মনে একটু ভরসা পায়। ওরাও আমারই মতো জেলখানায় নতুন। আমরা একসঙ্গে খাই-দাই, কম্বল বিছিয়ে শুয়ে থাকি। হাসি-হুল্লোড়েরও অন্ত নেই। আমাকে নিয়ে ঘরের দুঃখ অনেকটা ওরা ভুলে থাকে। ওদের বাড়ি-ঘর ফেলে আসার দুঃখ

বুঝতে পারছি। এরা সবাই লড়াই করে জেলে এসেছে—সেই কথা বুঝিয়ে ওদের বাড়ির দুঃখ ভোলাতে চেষ্টা করি। আমি এখন নাম প্রকাশ করলেই জাতে উঠব এবং জেলারের দেওয়া ফিরিস্তি মতো আমার সব জিনিস এসে যাবে। অর্থাৎ, রাজনৈতিক বন্দীর মর্যাদা নিয়ে আমি খাটে শোব, ওরা মাটিতে থাকবে—এ আমার মোটেই মানতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা আমাকে করতেই হয়েছিল।

সেটা বলবার আগে আমার সঙ্গী মেয়েদের কথা এবার একটু বলে নিই। এরা কৃষককর্মী হিসাবে নিঃসন্দেহে সেরা কর্মী। ওদের মধ্যে বিশাল চেহারার গঙ্গাদি-ই তো ১০টা পুলিসের সঙ্গে একাই লড়তে পারে। বামফ্রণ্টের বর্তমান মন্ত্রী কানাই ভৌমিকের মা ও স্ত্রী ছিলেন জেলখানায় এবং অনুপমা, সরোজিনী সাধনা পাত্র—আরও কতজন এসেছেন সবার নাম এখন মনে পড়ছে না। সব নিয়ে প্রায় ৩০/৪০ জন হবে। এই মেয়েরা সারাদিন জেলটাকে মাতিয়ে রাখত। কেউ এসে নালিশ করত—'দিদিমনি, গঙ্গাদি কাঁঠাল গাছের আগ ডালে উঠেছে কাঁঠাল পাড়তে।' কোনদিন দুপুরে দেওয়ালের এক কোণে ধোঁয়া উঠতে দেখে আমি ও মেট্রন গিয়ে দেখি—গোল হয়ে শ্রীমতীরা মসুর ডালের বড়া ভাজছেন। জিনিসপত্তর যোগাড় হলো কি করে? না, সাঁওতাল মেয়েরা ডাল ভাঙছিল, তাদের কাছ থেকে দু'টি যোগাড় করা হয়েছে। তেল? তা এসেছে জমাদারনী মা'র পায়ে তেল মেখে। নুন-লঙ্কার তো অভাব নেই। সেটা নিজেদের খাবার থেকেই তুলে রেখেছে ওরা। এই করেই বড়া হয়ে গেল। এই নিয়ম-বিরুদ্ধ কাজের নিষিদ্ধ কাঁঠাল এবং বড়া দুই-ই আমাকে ও মেট্রনকে খেতে হতো। গঙ্গাদি ছিলেন ভারি আমুদে মহিলা। তার কাণ্ড-কারখানা আমাদের সারাদিন জমিয়ে রাখত। ওকে ছাড়া আমাদের চলতই না। ওদের জন্য আমাকে নিয়মিত পেঁয়াজ, তেঁতুল, তামাক পাতা, শুকনো লঙ্কা আনিয়ে দিতে হতো। রাত্রে ওদের যে ভাত দেওয়া হতো তা থেকে খানিকটা তুলে নুন দিয়ে ওরা জলে ভিজিয়ে রাখত। ঐ 'আমানী' লঙ্কা-পোড়া দিয়ে সকালে খেয়ে নিত। জেলের 'লপ্‌সি' খেতে চাইত না।

এত চৌকস্ মেয়েরা কিন্তু রেল গাড়ি দেখেছে এই প্রথম জেলে আসবার সময়। তার আগে রেলগাড়ি দেখার সৌভাগ্য ও দরকার কোনটাই ওদের হয়নি। এক মহিলার একদিন অফিসে ডাক পড়ল, ছেলে দেখা করতে এসেছে। ফিরে এসে গল্পের আর শেষ নেই। একটা ভারি অদ্ভুত জিনিস দেখে এসেছে অফিসে। বর্ণনা দিয়ে বললো—'অফিস ঘরের উপরে দেখনু কি একটা ঘুরছে,

একটা হান্ডি (হাঁড়ি) মতন আছে সেটাও ঘুরছে। আর খুব হাবা (হাওয়া)।
ওটা কি দিদিমনি ?'

ওদের সবাইকে নিয়ে গোল হয়ে বসে বোঝাতাম—ওটাকে কি বলে, বিদ্যুৎ কাকে বলে ইত্যাদি। আমাদের ওয়ার্ডে অবশ্য লণ্ঠন জ্বলত—বিজলিবাতি ছিল না, তাই ওটা আর বোঝাতে পারিনি।

আমি ওদের নিয়ে কলকারখানা কাকে বলে, কি রকম সব জিনিস তৈরি হয়—এসব গল্প করতাম। কাপড় থেকে সুতো ছিঁড়ে নিয়ে কাপড় কি করে হয়, সুতো কি করে হয়, বোঝানোর চেষ্টা করতাম। মনে হতো অন্ধকে হাতি দেখাচ্ছি। আমি হতাশ হয়ে যেতাম কৃষক-মজুরের সম্পর্কটা বোঝাতে না পেরে। রেলগাড়িটা দেখার ফলে একটু সুবিধা হয়েছিল। ওটার হালচাল একটু বুঝেছিল বোধহয়। আর লেখাপড়াও শেখাতাম। কিন্তু গঙ্গাদি অন্য সব সময় আমার একান্ত বাধ্য হলে কি হবে, লেখাপড়া শিখতে এত 'অবাধ্য' ছিল যে ওকে আমি 'গ' লিখতেও শেখাতে পারিনি।

জেলে আর একদল মেয়েদের সঙ্গে আমাদের নিত্যনতুন পরিচয় হতো। ওরা ছিল উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জায়গা থেকে ধরে আনা সাঁওতাল মেয়ে। এদেরকে বলা হতো 'চোলাই' আসামী। অর্থাৎ, এরা সবাই মহুয়া থেকে অথবা ধান থেকে মদ তৈরি করত। এটা ওদের কুটির শিল্প। ওটা না খেলে ওদের চলে না এবং না খেয়ে থাকতেও পারে না। এমন কি জেলে এসে ওরা রোজ একটুখানি করে কেরোসিন খেয়ে ফেলত। লণ্ঠন পরিষ্কার করার সময় তার থেকে নিয়ে নিত। বলত, 'না খেলে খাটব কি করে ? গা ম্যাজ ম্যাজ করবে।'

কী খাটুনি যে এরা খাটত ! সমস্ত জেলখানার খোরাকির চাল ঝাড়া ও ডাল ভাঙ্গা বোধহয় এদের দিয়েই করিয়ে নেওয়া হতো। সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত একটানা খেটে যেত। দুপুরে দু'ঘণ্টা ছুটি।

সপ্তাহে একবার করে এদের কয়েকটা গাড়িতে পুরে এনে ছেড়ে দিয়ে যেত। ১৫ দিন পরে এরা চলে যেত এবং অন্য কয়েক গাড়ি নতুন আসত। পুলিসের সঙ্গে এদের সাপ্তাহিক দিন ঠিক করা থাকত বোধহয়। পুরুষেরা ধরা পড়ত না, মেয়েদেরই আনা হতো। এজন্য পুলিসের সঙ্গে ওদের কি বন্দোবস্ত ছিল—ওরা আমাকে তা বলেনি। এই সাঁওতাল মেয়েরা না এলে বোধহয় গোটা মেদিনীপুর জেলই অচল হতো। কারণ সারা জেলের চাল-ডাল ঝাড়াই-ভাঙ্গাই করত কে ? মেয়ে ওয়ার্ডের সমস্ত উঠোন, নালা-নর্দমা ঝক্‌ঝকে করে রাখত কে ? আর তো কোন আসামীকে এ-কাজ করতে দেখতাম না। আমরা তো ছিলাম রাজবন্দী।

মুখ বুজে যে-মেয়েরা এই খাটুনি খাটত একদিন তারা তাদের অপমানের বিরুদ্ধে এক হয়ে রুখে দাঁড়াল। জাঁদরেল জমাদারনী ছিল একজন। সারাক্ষণ বসে থাকত আর ওদের দিয়ে গা-হাত-পা টেপাতো। একদিন ঐ জমাদারনী একটি মেয়েকে ঝাঁটা মেরেছিল। ফলে, সব মেয়েরা গুম হয়ে গেল। খাটুনি খাটলো সবাই। কিন্তু দুপুরের খাবার এলে কেউ আর থালা নিয়ে গেল না। ব্যাপারটা আমার কানে আসতে আমি ওদের উৎসাহ দিলাম। বললাম, জমাদারনী যতক্ষণ তোমাদের কাছে ক্ষমা না চাইবে ততক্ষণ তোমরা খাবে না। জেলারকে আমি আসতে খবর পাঠালাম। জেলার এলে ওদের হয়ে সব ঘটনা জানালাম এবং বললাম, 'একে তো আপনারা বেআইনী কাজ করছেন। ওরা সশ্রম কারাদণ্ড নিয়ে কেউ আসে নি। এসেছে বিনাশ্রম দণ্ড নিয়ে। বসে থাকা ওদের অভ্যাস নয়, তাই মুখ বুজে আপনারা যত কাজ দেন, ওরা করে দেয়। তাতেও আমি কিছু বলছি না। কিন্তু কেউ যদি পুরোটি না করতে পারে, একদিন যদি কারো শরীর খারাপ থাকে— তবে জমাদারনী ওদের ঝাঁটা মারবে? ওকে সে অধিকার কি আপনারা দিয়েছেন?'

জেলার ভদ্রলোকের মুখখানা লাল হয়ে গেল। ভদ্রলোকটি সত্যিই ভদ্রলোক ছিলেন। আমাদের সামনে জমাদারনীকে দিয়ে ক্ষমা চাওয়ালেন এবং মেয়েদের বললেন, 'এবার মা তোমরা খাও।'

দেখতে দেখতে মেদিনীপুর জেলে আমার প্রায় মাসখানেক কেটে গেল। এই জেলে বসেই সেই বুকভাঙ্গা দুঃসংবাদটা আমাকে পেতে হয়েছিল। একদিন দুপুরে খাওয়ার পর শুয়ে আছি। এমন সময় জেলার রাউণ্ডে এলেন। আমরা সবাই উঠে বসেছি। জেলারের হাতে দু'খানা কাগজ। কাগজ আমাকে দেওয়া হতো না। কিন্তু আজ জেলার হাতে করে কাগজ দু'খানা এনে বললেন, 'আপনার জন্য খুব দুঃসংবাদ আছে কাগজে—তাই নিয়ে এলাম।' কাগজখানা মুহূর্তে পড়া হয়ে গেল। জেলার একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন। কাগজে লতিকা, প্রতিভা, গীতা ও অমিয়ার মৃতদেহের ছবি। ঘটনাটা ২৭শে এপ্রিল ঘটেছিল। সেদিন বন্দীমুক্তির দাবীতে মেয়েদের মিছিল করতে গিয়ে ওরা নিহত হয়। আমি শুধু ছবির দিকে চেয়েই আছি। কখন যে চোখ দিয়ে জল গড়াতে লাগল খেয়াল নেই। মনে পড়ছিল, এই সেই লতিকা—যে আমার হাত ধরে প্রথম পার্টি বন্ধু বলে কাছে টেনেছিল, এই সেই লতিকা—যে আমার তখনকার দিনের চালিকাশক্তি ছিল, এই সেই লতিকা—যে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু। অমিয়া-প্রতিভাও আমার সহকর্মী, প্রতিভার সঙ্গে যথেষ্ট

অন্তরঙ্গতা ছিল। একসঙ্গে এত আঘাত কেউ কি সইতে পারে? অন্য মেয়েরা আমার অবস্থা দেখে নিঃশব্দে বসে রইল। পড়তেও পারে না, বুঝতেও পারে না, আমারও কথা বলার অবস্থা নেই। আর বললেই বা কি বুঝবে ওরা? লতিকা পার্টি'র প্রথম মহিলা সদস্যা, লতিকা পার্টি'র কি ছিল, লতিকা আমার কি ছিল—ওদের আমি কি করে বোঝাব? বললাম, কাল বলব।

২৮শে তারিখ থেকে এই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে রাজবন্দীরা অনশন আরম্ভ করলেন। কলকাতায় ২৮শে শুরু হয়। আমরা দেরিতে খবর পাওয়ায় একদিন পরে শুরু করি। লতিকার জন্য অনশন করছি। লতিকাকে আমি ভালবাসি, কিন্তু এখন হিংসে হতে লাগল। ও কেন জেলে এলো না, আমি কেন বাইরে মিছিলে থাকলাম না। তবে তো ওর বদলে আমিই হয়তো শহীদ হতে পারতাম।

অনশন ধর্মঘট শুরু করার আগে আমি আমার নাম, বাবার নাম, ঠিকানা প্রভৃতি অফিসে গিয়ে আই. বি. অফিসারের সামনে লিখে দিয়ে এসেছি। বীণা দাস নাম এখন আর চলবে না। প্রতিবাদপত্র, দাবীপত্র ইত্যাদি লিখতে হবে, সরকারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হবে, ছেলে কমরেডদের সঙ্গেও।

দশ দিন অনশন চললো। অনশন সম্পর্কে আমার কোন ধারণা ছিল না। প্রথম দিন দুপুর থেকে আমাদের অনশন শুরু। বিকেলে অফিস থেকে নুন-লেবু পাঠিয়ে দিয়েছে জল দিয়ে খাবার জন্য। আমি তো চটে লাল। চিনি কৈ? দৈ কৈ? এতগুলো মেয়ে শুধু নুন-লেবু খেয়ে থাকবে? চিনি-দৈ না দিলে আমরা লক-আপে যাব না। জেল-কর্তৃপক্ষ হাসিমুখে চিনি-দৈ দিয়ে গেল—আমরা খুব জিতেছি মনে করে এক গ্লাস সরবৎ খেয়ে শুতে গেলাম।

পরদিন খবরটা ছেলেদের কানে গেল। ওরা খুব বকে পাঠাল এবং নুন-লেবুর জল ছাড়া আর কিছু খাওয়া চলবে না, সেটা জানিয়ে দিল। কৃষক মেয়েরা সবাই ১০ দিন অনশনে থাকতে পারল না। কেউ কেউ ছেড়ে দিল। আমরা যারা থাকলাম তারা বাধা দিলাম না। অনশন লড়াই ওরা বোঝে না। ১০ দিনের মধ্যে সরকার আমাদের দাবী মেনে নিলেন এবং অনশন তখনকার মতো শেষ হলো।

আমার নাম স্বীকার করার দিনই ওরা আমাকে সিকিউরিটি বন্দী হিসাবে গণ্য করল। বিছানা হলো খাটিয়ায়, খাওয়া-দাওয়াও আলাদা। আমি যেন লজ্জায় মরে যেতাম। খাওয়াটা সবাই ভাগ করে খেতাম। একদল একদিন, আর একদল আর একদিন ভাগ করে নিতাম। রোজই আশা করি, ওদেরও দ্বিতীয় শ্রেণীরূপে গণ্য করে জিনিসপত্র দিয়ে দেবে। কিন্তু দিচ্ছে না। অথচ

১০ দিনের অনশনে সব দেবে বলেই সরকার স্বীকার করেছিল।

এই করতে করতে মাস তিনেক কাটল। কিছুতেই যখন সরকার প্রতিশ্রুত জিনিসগুলো দিচ্ছে না তখন জুন মাসে দ্বিতীয় ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হলো। এবার কৃষক মেয়েদের অনেককেই আমরা বাদ দিলাম। যারা পারবে—তারাই শুধু অনশনে রইলাম।

আমার শরীর আগে থেকেই খারাপ ছিল। বড় অসুখের ধকলটা কিছুতে কাটে না। প্রায়শই আমাশা হয়। ডাক্তারবাবু বিশেষ যত্ন নিয়ে দেখতেন, কিন্তু এখনকার মতো ঔষধপত্র তখন তো ছিল না। তিনি আর কি করবেন, কিছু পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়াতে চেষ্টা করতেন মাত্র। আমি কিছুই খেতে পারতাম না, অন্যদের দিয়ে দিতাম। মেট্রন গিয়ে নালিশ করত। ডাক্তার বলে দিলেন—আরও বেশী করে খাবার যাবে, আপনি দেখবেন যাতে সবাইকে দিয়েও উনি কিছুটা খান। কিন্তু খাব কি? পেটেই যে সইত না।

অনশন আরম্ভ করার পর কয়েকদিন ভাল থাকলাম কিন্তু তার পরেই খুব জ্বর ও পেটে ব্যথা শুরু হলো। আমি ওষুধও খাচ্ছি না। জেলের ডাক্তার ইনজেকশন দিতে চাইলেন। জিজ্ঞেস করলাম—কি ইনজেকশন? বললেন—গ্লুকোজ। বললাম—'ও তো চিনি, নেব না।' মনে মনে হাসলাম, আবারও চিনি!

এদিকে জ্বর ও দুর্বলতার জন এক-এক সময় আমি আচ্ছন্নের মতো হয়ে যেতাম। কোনটা ঠিক মতো মনে থাকত না। এইরকম একদিন আচ্ছন্নতার পর হঠাৎ চোখ খুলে দেখি, মেয়েরা আমার চোখে-মাথায় জল দিচ্ছে ও কান্নাকাটি করছে। ওদের বললাম—'ভয় নেই, আমি বেঁচে থাকব।' ডাক্তার বাবুটি অত্যন্ত সহৃদয় ব্যক্তি। আমি ওষুধও খাই না দেখে উনি বলতেন, 'কি যে করব, কেমন করে আপনাকে আমি বাঁচাব? আর বোধহয় পারলাম না।' আমি বলতাম, 'ভয় নেই, আমি বাঁচব।'

এমনি আর একদিন আচ্ছন্নতার ঘোর কাটলে চোখ খুলে দেখলাম এম. ও. জেলার এবং ডাক্তারবাবু দাঁড়িয়ে আছেন। ওঁরা আমাকে বাইরের হাসপাতালে পাঠানোর কথা বলছেন। এখানে আর রাখতে সাহস হচ্ছে না। ওদিকে ছেলেদের নাকে নল দিয়ে খাওয়ানো শুরু হয়ে গেছে। আমাকে ওঁরা তাও করতে সাহস পাচ্ছেন না। আমি হাসপাতালে যেতে আপত্তি করলাম। এমন অবস্থায় ২৩ দিনের দিন খবর এলো ধর্মঘট তুলে নেওয়া হয়েছে। জেলার আমাকে টেলিগ্রামটা দেখালেন। ডাক্তারবাবু নিজে বসে চামচে করে আমাকে

হরলিক্স খাওয়ালেন। ২৩ দিনের মধ্যে ১২ দিনই এই অসুখটা ছিল।

আমরা জিতলাম, কিন্তু দফায় দফায় কৃষক মেয়েদের ছেড়ে দেওয়া হতে লাগল। রাখলে তো দ্বিতীয় শ্রেণীর সব পাওনা দিতে হয়। বাকী সবাই চলে গেল, রইলাম শুধু আমি আর বিমলা। বিমলার ছেলে বিপ্লব-এর বয়স তখন মাত্র বছর দেড়েক। জেলে আসার পর থেকেই ও আমার কোলে কোলে থাকত। ওকে একটু ছেড়ে গেলেই ঠোঁট ফুলিয়ে সে কী অভিমান! দেখতে ভাল লাগত খুব।

কিন্তু এবার ওদেরকে ছেড়ে আমি নিজেই কলকাতার জেলে বদলি হবার চেষ্টা করতে লাগলাম। আমার শরীর একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। জেলার ও ডাক্তারবাবুও সাহায্য করলেন এ ব্যাপারে। তারাও আমার অবস্থা দেখে ভয় পেলেন। কিছুদিনের মধ্যেই বদলির অর্ডার এলো। বদলির চেষ্টা আমার জামাইবাবু না করলে অবশ্য এত দ্রুত হতো না। ওঁর চেষ্টাতেই কলকাতায় আসা হলো।

ট্রেনে কলকাতা যাওয়ার সময় যে অফিসারটি আমার পাহারায় ছিলেন—তিনি বললেন, 'আপনি তো আমার চাকরিটি খেয়েছিলেন আর একটু হলে।' বললাম, 'সেটা কি রকম?' বললেন, 'খড়্গপুর থানায় আপনার অভিনয়টা আপনার মনে পড়ে না? আমি তো প্রায় ছেড়েই দিয়েছিলাম আপনাকে। তাহলেই হয়ছিল আর কি! আপনি এত অভিনয় করতেও জানেন?'

মেয়েদের রাখবার জন্য প্রেসিডেন্সি জেলটাই ছিল সব চেয়ে বড়। মেদিনীপুরে তো ওখানকার মেয়ে ছাড়া আর কাউকে দেখিনি। এখানে এসে দেখি, সারা কলকাতা তো বটেই এমন কি হাওড়া, হুগলি, বীরভূম, বাঁকুড়া থেকে আমাদের সমস্ত মহিলা কর্মীরা জড়ো হয়ে গেছেন। শুধু রেণু, মুক্তি, গীতা, বেলা, বাণী, পঙ্কজ, মাধুরী প্রভৃতি কয়েকজনই ধরা পড়েনি। আমি আসাতে আমাদের কর্মীমণ্ডলীটা আর একটু জোরালো হলো।

কিন্তু মেদনীপুরের মতো নিস্তরঙ্গ জীবন এখানে নয়। বিপ্লবী কার্যকলাপ ও চিন্তাধারা নিয়ে প্রচণ্ড আলোচনা। তার সঙ্গে খাওয়া-শোওয়া-বসা, চলা-ফেরা-কথাবার্তা প্রভৃতি সব কিছু নিয়ে আত্মসমালোচনার মিটিং প্রতিনিয়ত বসছে। একে তো মেয়েরা মিটিং-এ বসলে সবাই একসঙ্গে কথা বলে, তার উপর সমালোচনা—পাল্টা সমালোচনা—এর কি কখনও শেষ আছে? এখন মনে পড়লে নিজে নিজে হাসি। কি ছোটখাটো বিষয় নিয়েই না আমাদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত।

অবশ্য আমরা শুধু এই করে সময় কাটাতাম না। পড়াশুনাও করতাম। ছোটরা পড়ত, বড়রা পড়াত। সকালে-বিকেলে নিয়মিত এই ক্লাস বসত।

ওদিকে বাইরের থেকে খবর পাচ্ছি সারা পশ্চিমবঙ্গে বিপ্লবের পরিস্থিতি সুস্পষ্ট। কোথাও কোথাও বিপ্লবের গোড়াপত্তন হয়ে গেছে। যেমন—কাকদ্বীপ স্বাধীন হয়ে গেছে, বড়াকমলাপুর তো অনেক আগেই হয়েছে। হঠাৎ সংবাদ এলো দক্ষিণ কলকাতা স্বাধীন হয়ে গেছে। প্রতিদিন পাতি পাতি করে সব কাগজগুলো খুঁজি, কিন্তু কোথাও এ-সম্পর্কিত কোন সংবাদ থাকত না। অবাক হয়ে ভাবতাম, নচ্ছার বুর্জোয়া কাগজগুলো নিশ্চয়ই খবর চেপে দিচ্ছে। দক্ষিণ কলকাতা 'স্বাধীন' হবার গোপন সংবাদ আসতে আমাদের বন্ধু মেট্রন মিসেস্ সুইনীকে বললাম—একটু ঘুরে দেখে এসে বলতে। ও বলত—'আমি তো রোজই যাই ওদিকের বাজারে, দোকানে, বন্ধুবান্ধবদের বাড়িতে কিন্তু যেমন ছিল তেমনিই তো দেখি। কলকাতা তো আছে কলকাতাতেই।'

বাইরের থেকে যেসব মেয়েরা নতুন নতুন আসত তাদের কাছেও নানা চমকপ্রদ এবং কখনও কখনও গা-শিউরে ওঠা খবর পেতাম। বিশেষত গ্রাম এলাকার মেয়েরা গল্প করত—কি করে ক্ষেতমজুর ও জোতদারদের লড়াই চলছে। একজন বললো, আমাদের ওখানে একজন জোতদারকে কেটে টুকরো টুকরো করে হাঁড়িতে ভরে নদীতে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে। এ সবের বিবরণ শুনলে আমার যেন গা বমি বমি করত। বোধহয় নার্ভাস্ লাগত। মনকে শক্ত করতে চেষ্টা করেও পারতাম না। একদিন বিতর্ক উঠল—নিজের শিশু ও জোতদার যদি হঠাৎ এক জায়গায় এসে পড়ে তবে নিজের শিশুকে বাঁচাবার জন্য জোতদারের গায়ে বোমা ছুঁড়ব, কি ছুঁড়ব না। এ সব আলোচনায় আমি বেশি কথা খুঁজে পেতাম না। মত দিতে হলে কম বিপ্লবী হয়ে যাবার ভয়ে বোধহয় 'হ্যাঁ' বলেই দিতাম।

আমি ভাবি, নকশাল ছেলেদের দোষ দিয়ে লাভ কি? ওরা তো আমাদেরই সৃষ্টি। আমাদের সেদিনের নীতির পরিণতি দেখে আজ আঁৎকে উঠলেও দায়িত্ব অস্বীকার করতে আমরাই কি পারি?

এইসব নানাদিনের নানা আলোচনায় ক্রমশ আমি সংশোধনবাদী বলে অন্যদের মনে সংশয় হতে লাগল। একদিনের আলোচনা-সভায় আমি দুর্বলচিত্ত এবং সব ব্যাপারে অগ্রণী হয়ে পথ দেখাতে পারিনি, ইনিসিয়েটিভ নিতে পারি না—এ বিষয়ে সকলে একমত হয়ে গেল। আমি অনেক করে বুঝিয়ে বললাম, সত্যিই আমি এসব পারছি না—আমার আর সেক্রেটারী থাকা উচিত নয়। অন্য

কেউ হোক। কিন্তু কমিউনিস্ট পার্টিতে সাধারণত সেক্রেটারী বদল হয় না। অযোগ্য বলে স্থিরীকৃত হলেও তাকে সরানো হতো না। জোর করে সেই লোককেই আবার সেই পদে বহাল রাখা হতো। বাইরে না হয় আমি একাই হোলটাইমার ছিলাম বলে লোক বদলানোর কোন উপায় ছিল না। অনেক অযোগ্যতা প্রমাণিত হলেও আমাকেই থাকতে হতো, কিন্তু জেলে তো সবাই বেকার। তবুও ওটাই একটা অভঙ্গ নিয়মের মতো গণ্য করে আমাকেই সেক্রেটারী থাকতে হলো।

এরকম সময়ে বাইরের থেকে নির্দেশ এলো—বাইরের আন্দোলনকে জোরদার করতে হলে আমাদেরকে জেলের ভেতরেও দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খুলতে হবে। এবং সে আন্দোলনটা শুধু অনশন আন্দোলন হবে না। সোজা কথায় জেল-কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সোজাসুজি সংঘর্ষে আসতে হবে।

দিন তারিখ ঠিক হলো। ছেলেরা তাদের ওয়ার্ডে কোন একটা কিছু উপলক্ষ করে হাঙ্গামা করবে এবং একই সময়ে আমরাও একটা কিছু করব। সেই 'একটা কিছু' যেন আর খুঁজেই পাচ্ছিলাম না। আমরা লক্‌আপ ভঙ্গ করলে কর্তৃপক্ষ গায়ে মাখে না। কারণ এমনিতেই তো আমরা দেয়ালের মধ্যে দেয়াল দিয়ে ঘেরা অবস্থায় আছি। ঘরে না ঢুকলেও উঠোনেই সারারাত বসে থেকে কষ্ট পেতে পারি এই পর্যন্ত। তাতে কর্তৃপক্ষের নিদ্রাভঙ্গ হবে না।

নিদ্রাভঙ্গ করার জন্য অবশেষে আমরা যা করেছিলাম তা মনে করলে এখনও লজ্জা বোধ হয়। স্থির হলো, মিসেস্ সুইনীর হাত থেকে চাবি কেড়ে নিয়ে তাকেই পাগলীদের যে সেলে রাখা হতো তেমন একটা সেলে বসিয়ে তালা লাগিয়ে দেব।

ছেলেদের মহলে সংগ্রাম শুরু হবার পর পাগলা-ঘন্টি বাজতেই আমাদের 'এ্যাক্‌শন' শুরু হলো। জামাদারনীর হাত থেকে গেটের চাবি কেড়ে নিয়ে বাইরের জঙ্গলের দিকে ছুঁড়ে মারা হলো। মিসেস্ সুইনীর হাত থেকে চাবি নিয়ে তাকে একটা সেলে তালাবন্ধ করা হলো। ভাগ্যিস্, ওকে বসবার জন্য একটা চেয়ার ভেতরে রেখে দিতে আমাদের সুমতি হয়েছিল। ওকে যখন চাবি কেড়ে নিয়ে দু'পাশ থেকে আমরা ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম তখন আমি শুধু ওর কানে কানে বলে দিয়েছিলাম—'এটা তোমাকে অপমান করার জন্য নয়, আমাদের সংগ্রামের 'প্রতীক' হিসাবে তোমাকে কিছুক্ষণের জন্য ব্যবহার করছি মাত্র।' দেখলাম তার মুখখানা অপমানে লাল টকটকে হয়ে গেছে।

তারপর সংগ্রাম তো খুব হলো। আমরা সারিবদ্ধভাবে এক একখানা

ভাঙ্গা চেয়ারের হাতল বা পায়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি। দেয়াল টপকে একটা সেপাই ভেতরে এসে একটা দরজার তালা ভেঙ্গে দিল। ঢুকে পড়ল—সুপার, জেলার-ডেপুটিরা এবং জাঁদরেল সব সেপাই। মিসেস্ সুইনীকে ওরা সর্বাগ্রে মুক্ত করল। সামনে দেখছি একদল সেপাই দেয়ালের উপরে তীরের মতো সরু বাঁশের লাঠি নিয়ে আমাদের দিকে তাক করে বসে আছে। একটু নড়লেই ছুঁড়বে এবং আমরা বিদ্ধ হব। সুপার সামনে এসে হুকুম দিলেন, 'আপনারা ঘরে যান।' বার দুই বললেন, তারপর যমদূতের মতো হুকুম দিলেন, 'অন্দর লে যাও।' আমাদের এক-একটাকে ঠিক যেন মুরগীর ছানার মতো ডানা ধরে ব্যারাকের ভেতর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল সেপাইরা। কে কেমন লড়াই করেছিল আমি দেখিনি, কিন্তু আমার হাতের লাঠিটা নড়েনি তা মনে আছে। আমাদের সকলকে ছুঁড়ে দিয়ে ব্যারাকে তালাবন্ধ করার পর শুরু হলো ঘরে যা কিছু বাসন-কোসন, থালা-গেলাস ছিল, রাগের চোটে সেই সব বাইরে ছুঁড়ে মারা। উঠোনটা কাঁচের টুকরোয় ভরে গেল।

খানিকক্ষণ পরে ভেতর থেকে দেখছি—সন্ধ্যা চ্যাটার্জীর দু'বছরের মেয়ে মিঠু কাঁদতে কাঁদতে খালি পায়ে ঐ উঠোনের উপর দিয়ে ব্যারাকের দিকে হেঁটে আসছে। দেখতে পেয়ে মিসেস সুইনীই ছুটে এসে ওকে কোলে তুলে নিলেন কিন্তু তাঁর সমস্ত চাবি সুপার নিজে নিয়ে গেছেন। সুতরাং দরজা খুলে উনি ওকে ভেতরেও দিতে পারছেন না। অগত্যা সেই মিসেস্ সুইনীই আবার অফিসে লিখে চাবি আনিয়ে মিঠুকে ভেতরে দিলেন। সেই রাত থেকে আমাদের অনশন শুরু। চলেছিল ৫৩ দিন।

জেলের ভেতরে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলে হাঙ্গামা বড়জোর একদিনই করা যায়। তারপর তো অনশন ছাড়া আর কোন অস্ত্র নেই। কিন্তু এইরকম একদিনের হাঙ্গামায় প্রেসিডেন্সি জেলে একজন ও দমদম জেলে তিন জন কমরেডকে সেপাইদের গুলিতে শহীদ হতে হলো।

সেদিনের হাঙ্গামার অপরাধে অলকা ও আমাকে এক দিনের জন্য একটা বিশেষ শাস্তি দিয়ে পাগলদের সেলে বন্দী করে রাখল। খবর পেয়ে জেল ভিজিটর শ্রীঅবনী ব্যানার্জী এলেন ও আমাদের ঐ অবস্থায় দেখে নিজের চোখ মুছতে লাগলেন। ব্যানার্জী ভারি শান্ত মানুষ। উনি জেলার-সুপারকে ধরাধরি করে সন্ধ্যার মধ্যেই আমাদের মুক্ত করেন। অথচ এই ভদ্রলোকটির সঙ্গে আমাদের কিছু মেয়ে কী খারাপ ব্যবহারই না করল! ভদ্রলোককে 'দালাল' বলে তাড়িয়ে দেওয়া, গায়ের কোটে কালি ছিটিয়ে দেওয়া—কোন কিছুই বাদ গেল না। পরে

একদিন উনি আমাদের কাছে এ ব্যবহার কেন করা হলো জানতে চাইলেন। সেদিন ওর মুখখানা লাল আর চোখে জল ছিল। আমরা লজ্জায় মাথা নীচু করে থাকলাম। আসলে কাজটা করেছিল কয়েকটি অল্পবয়সী মেয়ে। কিছুদিন আগে বাইরে পুলিসের সঙ্গে ওদের মারামারি হয়। ওরা মার খেয়েছে, মেরেওছে। ওদের মাথা গরম ছিল, তাই জেলে ঐকাজ করে বসে।

এবারের সংগ্রামে সরকার পক্ষের মনোভাব ছিল অত্যন্ত কঠিন। দাবী মানবার কোন লক্ষণই নেই। জেল-সংগ্রামের শহীদদের জন্য এবং অনশনী-ব্রতীদের জন্য তাদের পরিবারবর্গেরই শুধু বুক ভাঙ্গল কিন্তু এর প্রতিবাদে বাইরে জনতার মধ্যে কোন বিক্ষোভ দেখা গেল না।

নতুন আসা একজনের কাছে হঠাৎ খবর পেলাম জেল ভাঙ্গার অভিযানে বাইরের থেকে বিশাল মিছিল আসবে। ব্যাপারটা ছিল 'বাস্তিল দুর্গ' ভাঙ্গার মিনি-অনুকরণ। মিছিল এলো একদিন রাত্রে। আমরা তখন তালাবন্ধ। প্রেসিডেন্সি জেলের ফিমেল ওয়ার্ডের দোতলা থেকে বেকার রোড দেখা যায়। মিছিলটা সেই দিক থেকে এলো। গোটাকতক বোমা ফাটল। তারপর পুলিসের লাঠি চললো। রাস্তার উপর কয়েকজনকে পড়ে থাকতে দেখেছি, আর বুকের মধ্যে শুধু কাঁপুনী ধরেছে। মনে মনে ভেবেছি—বেঁচে আছে তো? মিছিলে কত মানুষ এসেছিল বোঝা যায় নি। কিন্তু মিনিট খানেকের মধ্যেই রাস্তাটা ফাঁকা হয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে মঞ্জুদি অস্থির হয়ে পড়লেন। মায়ের প্রাণে কু-ডাকই তো আগে ডাকে। উনি যেন শুনতে পেলেন গুরুর (ওঁর দ্বিতীয় ছেলে) কণ্ঠস্বরে কে যেন 'মা', 'মাগো' বলে ডেকেছে। মঞ্জুশ্রী দেবী অত্যন্ত চাপা ও শক্তমনের মানুষ। জেলে আমরা তাঁর সঙ্গে যতখানি ঘনিষ্ঠ হতে পেরেছিলাম বাইরে ততটা ছিলাম না। সেই মঞ্জুদি যখন এ বিষয়ে স্থির নিশ্চয় হয়ে একেবারে ভেঙে পড়লেন তখন তাঁকে বোঝাবার মতো কোন কথা আমরা খুঁজে পাইনি। বলেছিলাম বটে—'মঞ্জুদি, তুমি ভুল শুনেছ, গুরু আসতেই পারে না। ও তো আণ্ডার গ্রাউণ্ডে আছে।' কিন্তু এও তো আন্দাজেই বলেছিলাম। বাড়ির খবর না পাওয়া পর্যন্ত মঞ্জুদি আর হাসেননি।

অমায়িক, স্নেহশীলা ও নীরবকর্মী হিসাবেই মঞ্জুদিকে আমরা এ পর্যন্ত জানতাম। জেলে দেখেছিলাম তাঁর নীরব তেজস্বিতা। আমরা অবাক হইনি, তবে মুগ্ধ হয়েছি। বাড়িতে অসুস্থ ছিলেন তাঁর স্বামী ক্ষিতীশপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। তবুও প্রতি রবিবারে তিনি নানা খাবার-দাবার নিয়ে আসতেন।

আর মঞ্জুদি খুশি মনে সেগুলো আমাদের খাওয়াতেন। আমাদের জেল ভিজিটর বোধহয় তাঁর স্বামীর কথা ভেবেই একদিন মঞ্জুদির কাছে প্রস্তাব করেছিলেন—'আপনি আর এর মধ্যে কেন? ইচ্ছে করলেই তো আপনি বাড়ি যেতে পারেন।' ইঙ্গিতটা বুঝতে পেরে উচ্চৈস্বরে শুধু 'না' বলেই উনি ঘর থেকে যেন ছিটকে বেরিয়ে এসেছিলেন। রাগে, অপমানে মুখখানা থেকে যেন রক্ত ফেটে পড়ছিল। বেশী কথা উনি বলতেন না। আমাদেরও তখন কিছু বললেন না। আমরা পরে জেনেছিলাম ঘটনাটা।

আমাদের উপোসী দিনগুলো মন্দ কাটত না। পড়াশুনা চলত খুব। খাওয়ার তাড়াও নেই, ঘুমও পেত না। যতক্ষণ ক্লান্তি না আসত ততক্ষণ ক্লাস চলত। আমরা কয়েকজন মিলে তখন চীনের কমরেড লিউ-শাও-চি-র একটা দলিল পড়ছিলাম। তাতে ছিল ওঁরা উত্তর চীনে কেমন করে কৃষকদের মধ্যে জমি বিলি করেছিলেন। দলিলের মোটকথা ছিল—'মনে রাখবে, গ্রামে শতকরা ১০ জন তোমার শত্রু আর বাকী ৯০ জন তোমার মিত্র।' ঐ ক্লাসে আমরা যারা ছিলাম তারা প্রায় সবাই ভবঘুরের দল। একা মঞ্জুদিই আমাদের তুলনায় অনেক বড়লোক। দলিলের সঙ্গে মিলিয়ে দেখা হতো মঞ্জুদি শত্রুর দলে—না মিত্রের দলে পড়েন। কিন্তু লিউ-শাও-চি-র কৃপায় মঞ্জুদি প্রতিবারেই নিষ্কৃতি পেতেন এবং বাড়ি ও গাড়ি থাকা সত্ত্বেও আমাদের মিত্রই রয়ে যেতেন। গাড়িটাকে আমরা অবিশ্যি ভাঙা বলে মাফ করে দিতাম। এই নিয়ে মঞ্জুদি নিজে এবং আমরা হেসে লুটোপুটি খেতাম।

অনশনের সময় দুটো অভিজ্ঞতা আমার বেশ ভাল মনে আছে। নুন-জল খেয়ে পড়াশুনাটা ভালই হতো। পেটও সাফ্, মাথাও সাফ্। অন্যটা হচ্ছে রাত্রে যার যার বিছানায় শুয়ে ডেকে ডেকে খাওয়ার গল্প করা। এইভাবে দিনগুলো মন্দ কাটত না।

কিন্তু এর শেষ কোথায়? আশার সংবাদ তো কিছুই আসছে না। এদিকে দিনে দিনে আমরা সবাই ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হচ্ছি। মাঝে মাঝেই আমি মেয়েদের প্রতিনিধি হিসাবে অফিসে জেল কমিটির প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করতে যেতাম। অনশনক্লিষ্ট আমাকে নিয়ে যেত ধীরে ধীরে। এদিকে সবাই আমার প্রতীক্ষায় থাকত—নিশ্চয়ই সুখবর আনব। আমি ফিরে এসে সবার মুখের হাসি নিভিয়ে দিতাম। একদিনের কথা স্পষ্ট মনে পড়ে। অফিস থেকে ফিরে এসে দেখি সবাই আমার অপেক্ষায় বসে আছে। আমি বললাম, 'এবার আমাদের নুন ও লেবু খাওয়া বারণ, শুধু জল খেতে হবে।' ছোটরা বোধহয়

এর মানেটা ঠিক বোঝে নি। কিন্তু আমি বুঝেছিলাম, জেলে আমাদের কিছু লোকের মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত বোধহয় বাইরের লোক ক্ষিপ্ত হবে না, কিংবা আন্দোলনেও আসবে না, তাই এই নির্দেশ। সেদিন সকলের মুখ কালো দেখেছিলাম কিনা মনে নেই কিন্তু আনন্দোজ্জ্বল দেখিনি, তা মনে আছে।

অবশ্য সরকারও অত বোকা নয়। এত সহজে আমাদের শহীদ হতে ওরা দেবে না। জবরদস্তি নাকে নল দিয়ে এক কাপ করে দুধ পেটের মধ্যে চালিয়ে দিত। তাতে বেঁচে থাকার মতো আরও কিছু উপাদান মিশিয়ে দিত। অতএব আমরা বেঁচে রইলাম, মরা আর হলো না।

এই নল দিয়ে খাওয়ানোর জন্য জেল-কর্তৃপক্ষ বস্তি থেকে কিছু মেয়েদের টাকা দিয়ে নিয়ে আসত। প্রথমে ওরা আমাদের এক-এক জনকে বিছানায় উপর চিৎ করে ফেলে ৪/৫ জন মিলে চেপে ধরত, তারপর ডাক্তার নল দিয়ে খাওয়াতেন। উপবাসে আমরা হীনবল, তবুও যতক্ষণ পারতাম ঐ মেয়েদের সঙ্গে লড়াই করতাম। একদিন আমাকে শুইয়ে ফেলে মেয়েরা একটু আলগা দেওয়ায় আমি চট করে দৌড়ে নীচে গিয়ে দুধের বালতি উপুড় করে দিলাম এবং নাকে দেবার নলগুলি ছুঁড়ে ফেললাম দেয়ালের বাইরে। সেদিন আর জোর করে খাওয়ানো সম্ভব হলো না।

একদিন একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে গেল। নল দিয়ে খাওয়ানোর পর চেপে ধরতে আসা একটি মেয়ের কপালে আমাদের একজন সহবন্দী একটা ঘটি ছুঁড়ে মারল। মেয়েটির কপাল কেটে তখন রক্তাক্ত অবস্থা। আমাদের যে মেয়েটি এই কাজ করেছিল—তার বয়স কম ছিল। একাজ করা আমরা বড়রা কেউ সমর্থন করলাম না। এরকমটা যে হয়ে যাবে তা মেয়েটিও বুঝতে পারেনি। একজন ডাক্তারবাবু মন্তব্য করেছিলেন, 'আপনাদের কাছে এই ব্যবহার আশা করিনি।' এরপর থেকে ঐ মেয়েদের সঙ্গে খারাপ ব্যবহার যাতে না করা হয় সে বিষয়ে আমরা সাবধান হয়ে গেলাম।

অনশনের শেষ দিকে একটা ঘটনা ঘটল যাতে আবার আমরা পার্টির লাইন নিয়ে গোলালে পড়ে গেলাম। হঠাৎ দৈনিক কাগজে দেখলাম 'ফর দি লাসটিং পীস্ এ্যাণ্ড ডেমোক্রেসী'-র একটা উদ্ধৃতি। 'লাসটিং পীস' বেরুতো বুখারেস্ট থেকে। ঐ কাগজকে আমরা আন্তর্জাতিক পার্টির মুখপত্র বলে জানতাম। ঐ কাগজে লেখা হয়েছে ভারতের গণতান্ত্রিক আন্দোলন হবে জাতীয় বুর্জোয়া দল, শ্রমিক এবং ধনী চাষী আর গরীব চাষী সবাইকে একসঙ্গে নিয়ে। আগে অলকার চোখেই পড়েছিল খবরটা। সে সবাইকে

ডেকে দেখাল। কী কাণ্ড! আমরা তো তখন শ্রেণীসংগ্রাম করছিলাম। সঙ্গী ছিল শ্রমিক, মধ্যবিত্ত, চাষী ও ক্ষেতমজুর। বাকী সবাই শত্রুপক্ষ। কিন্তু ঐ পত্রিকায় বর্ণিত গোষ্ঠী নিয়েই যদি আবার মিত্রতা গড়তে হয় তবে এতদিন করছিলামটা কি?' 'এ আজাদী ঝুটা হ্যায়' বলে জেলেই বা এলাম কেন? আর উপোস করেই বা মরছি কেন? প্রথমে এটা বুর্জোয়া কাগজের মিথ্যে খবর মনে করতেই ইচ্ছে হলো। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই মূল দলিল পেয়ে গেলাম। সন্দেহ রইল না—এ নিয়ে পার্টির মধ্যে তোলপাড় হবে। গোটা লাইনই যখন পাল্টাতে হবে তখন অন্তত উপোসের এই ক্ষুদ্র সংগ্রামী লাইনটাও তুচ্ছ হয়ে যাবে। হলোও তাই। এর ১০/১২ দিন পরে বিনাশর্তে ৫৩ দিনের অনশন ভঙ্গ করা হলো।

সত্যিই বেঁচে গেলাম আমরা। যেদিন অন্নপথ্য গ্রহণ করলাম সেদিনের কথাটা মনে আছে। ক্ষুধা যে মানুষের লজ্জাসরম কি পরিমাণ কেড়ে নেয় তার প্রমাণ আমিই দিলাম। ঠিক একহাতা করে গলাভাত এসেছে সকলের জন্য। কমলা সবাইকে তা ভাগ করে দিচ্ছে। আমরা ঐ সামান্য অন্নটুকু থালায় করে নিয়ে নিমেষে নিশ্চিহ্ন করে দিলাম। হঠাৎ কমলা চেঁচিয়ে বললো—'আরও একটু আছে, কে নেবে এসো।' চার-পাঁচজনের কানে কথাটা যেতেই তারা দৌড়ে গেল। দেখলাম, লাইনে আমিই সর্বাগ্রে দাঁড়িয়ে।

জেলের মধ্যে এর পরের দিনগুলো নিতান্তই একঘেয়ে হয়ে উঠল। নানারকম দলিল আসত এবং আমরা তা পড়তামও কিন্তু তাতে যেন ঠিক পথ-নির্দেশ পেতাম না। তর্ক করতেও আর ভাল লাগত না। তখন আমরা চেষ্টা করতাম নানারকম কাজের মধ্য দিয়ে দিনগুলো সহনীয় করে তুলতে। বুর্জোয়া ডেমোক্রেটিক রেভ্যুলিউশন কি ব্যাপার, কে মিত্র, কৌশল কি ইত্যাদি নিয়ে তর্ক-বিতর্কে যখন আমাদের মাথাগুলি প্রায় খারাপ হবার জো, তখন রসিক মানুষ কনক একটা ব্যঙ্গ-নাটিকা লিখে ফেললো। সেই নাটকের মর্মকথা হলো: জেলে একটা ভূত ঢুকেছে। সে কেবল নাকি সুরে 'বুঁ-দেঁ-রি'—এই আওয়াজ করে বেড়াচ্ছে। পায়খানা, বাথরুম এবং ঘরে একলা ঢুকলেই এই আওয়াজ শোনা যায় এবং ভূতের চেহারাটাও এক-এক জনের চোখে এক-এক রকম হয়ে যাচ্ছে ইত্যাদি। গল্পটা সবাই পছন্দ করলাম এবং 'বুঁ-দেঁ-রি' ভূতকে তাড়াবার জন্য গরম আলোচনায় একটু ভাঁটা পড়ল।

এবার কিছু মেয়ে নাটক করার উদ্যোগ নিয়ে মেতে উঠল। এতে অগ্রণী হলো অলোকা, আরতি, প্রীতি লাহিড়ী, ডলি, তৃপ্তি দাশগুপ্ত, ছায়া ঘোষ,

শোভনা এবং আরও কয়েকজন। ডলি, তৃপ্তি ও ছায়ার কাজই ছিল নানারকম হাসির খোরাক জুটিয়ে আমাদের মাতিয়ে রাখা। ডলির একটা স্পেশ্যাল নাচে আমরা হেসে গড়িয়ে পড়তাম। হাসি-কৌতুকে, নাচে-গানে জেলের আবহাওয়াটা খানিকটা হাল্কা হলো। রবীন্দ্র-সঙ্গীতে প্রীতি সরকারই আমাদের মাতিয়ে রাখত। রোজ ভোরে ওর গানে আমাদের ঘুম ভাঙত। মঞ্জুদিও গাইতেন। এর সঙ্গে ব্যাড্‌মিণ্টন খেলাও শুরু হলো।

'নটীর পূজা' নৃত্যনাট্যটি আমরা মঞ্চস্থ করলাম। ডেপুটি জেলাররা সমস্ত আয়োজন করে দিলেন। তারা একটু দেখতেও চেয়েছিলেন, কিন্তু আমরা তাতে রাজী হলাম না। এমনকি জেল-ভিজিটর শ্রী অবনী ব্যানার্জীকেও আসতে দেওয়া হলো না। শুধু মেট্রন ও সাধারণ কয়েদি মেয়েরাই ছিল এর দর্শক। শোভনার নাচ এবং অন্যদের অভিনয় আমাদের ভালই লেগেছিল।

এছাড়া নানা গল্পগুজবে দিনগুলো কেটে যেত। বাইরে যারা নিত্যদিনের সহকর্মী ছিলাম তারা প্রায় সবাই তো এখানে। বাঁকুড়া থেকে ভক্তিও এসে জুটেছিল আমাদের সঙ্গে।

আমাদের এই বন্দীজীবনের মধ্যে একটা নিরানন্দের ঘটনাও ঘটলো। মিসেস সুইনী পদত্যাগ করলেন। পদত্যাগ না করলে ওকে বরখাস্ত করা হতো। কর্তৃপক্ষ ওকে বিশ্বাস করতেন না, আমাদের মিত্র বলেই মনে করতেন। তাছাড়া আমাদের সেদিনের সেই ব্যবহারেও উনি খুব ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। কেবলই বলতেন—'আমার নিজের উপরে যে আত্মবিশ্বাস ছিল সেটা ভেঙ্গে গেছে। এ কাজে আমি আর থাকতেও চাই না।' ওর চলে যাওয়ায় আমরা খুব দুঃখিত হলাম এবং সেদিন নিজেদেরকে বেশ অপরাধী বলেই মনে হয়েছিল।

এদিকে বাইরে থেকে পার্টির উকিল ও ব্যারিস্টার বন্ধুরা চেষ্টা করতে লাগলেন কোর্টে সিকিউরিটি আইনের বিরুদ্ধে মামলা করে আমাদের মুক্ত করবার জন্য। এ ব্যাপারে স্নেহাংশু আচার্য আমার সঙ্গে আইনজীবী হিসাবে জেলে গিয়ে কয়েকবার দেখাও করেছিলেন। স্নেহাংশু তো পার্টির লোক কিন্তু আর একজন বিশিষ্ট আইনজীবী শ্রদ্ধেয় অতুল গুপ্ত মহাশয় আমাদের জন্য যা করেছিলেন তা ভুলবার নয়। আইন ও কোর্টের স্বাধীনতার উপর যাতে কেউ অন্যায় হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার জন্য প্রকৃত চিন্তাশীল গণতন্ত্রী মন নিয়েই উনি আমাদের পক্ষে দাঁড়ালেন। শেষ পর্যন্ত সিকিউরিটি আইনে ধৃত বন্দীরা সবাই বিচারকদের নির্দেশে মুক্তি পেল। বিশিষ্ট আইনজ্ঞদের যুক্তি বিচারকেরা মেনে নিয়েছিলেন। পরদিন সকালের কাগজে খবরটা দেখে আমরা কেবল ভাবছি এই বুঝি আমাদের

মুক্তির পরোয়ানা নিয়ে কোন ডেপুটি জেলার আসছেন। আবার ভাবছি, গত কালই তো অর্ডার হয়ে গেছে—তবে এত দেরিই বা হচ্ছে কেন? আমরা সবাই বিছানা ছেড়ে একযোগে গরাদের সামনে দাঁড়ানো, কিন্তু এতবড় প্রহসন যে আমাদের কপালে লেখা ছিল তা জানতাম না। ডেপুটি বাবু একহাতে আমাদের মুক্তির পরোয়ানায় সই করিয়েই অন্য হাতে প্রিভেন্টিভ ডিটেনশন অর্ডিন্যান্সের জোরে আবার আটক হবার নির্দেশনামাখানাও সই করালেন, লক্ আপ্ আর খুললেন না। আমরা বাতি নিভিয়ে যে-যার মতো দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে শুয়ে পড়লাম।

অবশ্য বছর দুয়েকের মধ্যেই আমরা সবাই মুক্তি পেলাম। নতুন অর্ডিন্যান্সে একটা রিভিউ কমিটির ব্যবস্থা ছিল। এই কমিটির কাছে বন্দীরা প্রত্যেকেই নিজ নিজ মুক্তির জন্য আবেদনপত্র লিখতে পারতেন এবং কেন তাকে আটক রাখা অনুচিত সে বিষয়ে তাতে যুক্তিও দেখানো যেত।

আইনজীবীদের পরামর্শ নিয়ে আমরা প্রত্যেকেই দরখাস্ত করেছিলাম এবং ১৯৫২ সনের এপ্রিলের মধ্যে একে একে সবাই বাইরে এসে গেলাম। তাছাড়া সরকারও বুঝে গিয়েছিল যে আমাদের আটক রাখার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কারণ পার্টি লাইন নিয়ে এখন আমাদের মাথা ঠোকাঠুকি চলবে। ফলে সরকার আপাতত নিরাপদ। তাই তারা নিজেরাই ধীরে ধীরে ছেড়ে দিতে শুরু করে দিয়েছিল। চটকলের আতরবালা সহ কয়েকজন শ্রমিক মেয়ে আগেই ছাড়া পেল। তারপর মুক্ত হলো ছাত্রীরা এবং দূরের জিলার কমরেডরা, সবশেষে বেরিয়ে এলাম আমরা, অর্থাৎ রিভিউ কমিটির কাছে দরখাস্তকারীরা।

আমার জন্মভূমি ঃ পাকিস্তানের বরিশাল

জেল থেকে বেরিয়ে যেন চতুর্দিক ফাঁকা দেখতে লাগলাম। কোথায় যাব ? আশ্রয় কোথায় ? পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি অনেক পথই পেরিয়ে এসেছি কিন্তু কুল নেই কোথাও। আবার যদি সব গোড়া থেকে শুরু করতে হয় তবে শেষ করব কবে ? এই সময় মা-র কথা খুব মনে হতে লাগল। মা-ই তো আমাকে এ পথে আসতে সাহায্য করেছিলেন। সেদিন যে-নৌকোতে তিনি আমাকে যাত্রা করিয়েছিলেন তা কি এরপর থেমে যাবে ? কোথায় যাব এখন ?

মাকে দেখার জন্য মনটা সত্যিই ব্যাকুল হয়ে উঠল। জেলে মা-র চিঠি নিয়মিত পেতাম। ডেপুটি জেলাররা সেই চিঠি পড়ে বলতেন—রাজবন্দীদের মধ্যে মা-মেয়ের এমন চিঠি আর কখনও দেখিনি।

যাহোক, এই মানসিক অবস্থায় বরিশাল থেকে চিঠি এলো—মা খুব অসুস্থ, না-ও বাঁচতে পারেন। তিনি নাকি কেবল আমার কথাই বলেন। কিন্তু যাই কি করে ? মা যে এখন 'বিদেশে' রয়েছেন, সদ্য জেল-ফেরত আমার তো সেখানে পা দেওয়াই বিপদ ! জেল-ভিজিটর শ্রী অবনী ব্যানার্জীর মারফতে পাকিস্তান হাইকমিশনের অফিসে গেলাম। সেখান থেকে একখানা অনুমতি-পত্র যোগাড় হলো।

বেনাপোলে টিকিট বদল করব। সহযাত্রী এক ভদ্রলোকের কাছে টিকিট করতে দিয়ে বসে আছি। বাক্স-বিছানা সার্চ হয়ে গেছে। হঠাৎ মনে হলো কয়েকজন লোক আমাকে নিয়ে কি যেন আলোচনা করছে। আঙ্গুল দিয়ে আমাকে অন্যদের কাছে চিনিয়ে দিচ্ছে। বুঝলাম এরা পাক-পুলিশ। এতদিনেও ভোলেনি আমাকে। আমিই ওদের ইশারায় ডাকলাম। কাছে আসতেই জিজ্ঞেস করলাম, 'আমাকে নিয়ে বিপদে পড়েছেন তো ?' হাই-কমিশনারের চিঠিখানা দেখালাম। চিঠি দেখে ওরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। কাঁচুমাচু হয়ে বললো, 'দেখুন তো, এতদিন পরে আপনি দেশে যাচ্ছেন—সে তো আমাদের আনন্দের কথা, কিন্তু এমনি চাকরি আমাদের যে···।' তখন একজন ছুটে গিয়ে খাবার নিয়ে এলো। ফিরিয়ে দিলাম তা, কারণ একটু আগেই খেয়েছি। একজন বললো, 'তবে আপনার টিকিট করে নিয়ে আসি ?' এইভাবে আপ্যায়িত হলাম আমি। ওরা পাকিস্তানের গাড়িতে আমার বাক্স-বিছানা তুলে দিয়ে,

অনেক ক্ষমাটমা চেয়ে বিদায় নিল।

বাড়িতে গিয়ে আমি হতবাক। মা বিছানা থেকে উঠতেই পারেন না। আমাকে দেখে অবিরল ধারায় ঝরে পড়তে লাগল তাঁর চোখের জল। আমিও মাকে না দেখে এতদিন থাকিনি কখনও। বছরে দু'বারই যেতাম। কাজের চাপ বেশি থাকলে পুজোয় একবার তো যেতামই।

বরিশালে মাসখানেক ছিলাম। মার কাছেই থাকতাম প্রায় সারাক্ষণ। আর যাবই বা কোথায়? শুধু মনোরমা মাসীমা আছেন—আর কেউ নেই। চেনা-পরিচিতদের বাড়িতে দেখা করতে গেলে তারাই মুশকিলে পড়তেন। পরদিনই পুলিস গিয়ে হাজির হতো সেই বাড়িতে—কেন আমি গিয়েছি, সেই খোঁজে। বাড়িতেও এদিক-ওদিক পুলিস পাহারা বসিয়ে দিল—যাতে আমার গতিবিধি ওরা নজরে রাখতে পারে। রাস্তাঘাটে চেনামানুষ খুব একটা চোখে পড়ত না। কেবলই মনে হতো—'এ বরিশালকে তো আমি চিনি না।' অমৃত নাগ, হীরালাল দাস দাঙ্গায় নিহত হয়েছেন, সে খবর জেলেই পেয়েছিলাম। পার্টি-অফিস নেই, সুতরাং আমি ওখানে নিঃসঙ্গ।

তবে একটা জিনিস খুব ভালো লাগল। পাকিস্তান হবার আগে পর্যন্ত স্কুল-কলেজে মুসলমান মেয়েরা বড় একটা আসত না। রাস্তাতেই বেরুত না। কিন্তু এবার দেখছি দলে দলে হেঁটে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে। বোরখা নেই, চাল-চলনে একেবারে সহজ। শুনলাম—ওরা নাচ-গান শেখে, এমনকি ছেলেদের সঙ্গে স্টেজে উঠে অভিনয়ও করে। নামগুলোও আধুনিক—হেনা, লিলি, ময়না—আরও কত কি। আমার ছোট ভাই সতু যন্ত্রসঙ্গীতে ওখানে নাম করেছিল এবং অনেক মুসলমান মেয়েকে সে যন্ত্রসঙ্গীত শেখাত। এমনকি বড় বড় অফিসারদের বাড়িতেও তার আসর বসত। মনে পড়ল আমাদের যুগের কথাটা। ছেলেমেয়ে একসঙ্গে স্টেজে উঠে অভিনয়? অসম্ভব ব্যাপার তখন। বোধহয় নতুন স্বাধীনতাই ওদের এই নতুন জীবনের সন্ধান দিয়েছে।

আমার ভাইদের কিছু খারাপ দেখলাম না। ওদের উদ্বাস্তু হতে হয়নি এতেই ওরা খুশি। পাকিস্তানকেই স্বদেশ বলে মেনে নিয়েছে এবং সম্মানের সঙ্গেই বাস করছে। আমাদের 'রুচিরা' রেস্তোরাঁয় শুনলাম আগেকার মতোই এখনও নতুন নতুন কমিউনিস্ট ভাবাপন্ন ছেলেরা ভিড় জমায়, আবার মুসলিম লীগের ছেলেরাও আসে। কিন্তু কোন গোলমাল নেই। মনোরমা মাসীমার কাছে শুনলাম, ওরা সেখানেও যায় এবং নেতা খুঁজে বেড়ায়—যে ওদের একটু মার্কসীয় দর্শন শেখাবে। বরিশালের নেতারা তখনও জেলে। এসব ছেলেদের

সঙ্গে পরিচিত হবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পুলিসের জ্বালায় তার উপায় ছিল না। দিন পনেরো না যেতেই পুলিসের লোক আমার দাদার ছেলেকে জিজ্ঞেস করতে লাগল—'এই শোভন, তোর পিসীমা যাইবে কবে? আর তো মশার কামড় খাইতে পারি না।'

এক মাসের অনুমতি নিয়ে গিয়েছিলাম আমি। জানি এবার চলে গেলে আর ফিরে আসা হবে না, মাকেও আর দেখতে পাব না। মা-র সঙ্গে এই হয়তো আমার শেষ দেখা। দুঃখ রইল, একটু ভাল করে চিনে যেতে পারলাম না বরিশালকে।

ইতিমধ্যে আমার অনুমতির একমাস ফুরিয়ে গেল। এবার ফিরে যেতে হবে। মনটা কিন্তু যেতে চাইছে না। একে তো মাকে ছেড়ে যাচ্ছি—তার উপর কলকাতায় গিয়েও বা কি করব? আবার সেই সব পার্টি-পরিজন ফিরে পাব তো?

যাহোক, দিন ফুরোলে চলেই এলাম এবং তার মাসখানেক পরেই পেলাম মা-র মৃত্যুসংবাদ।

পাকিস্তানের বরিশালকে তখন চিনে আসিনি। কিন্তু আমাদের পরিবারের উপর দিয়ে যে প্রতিকূল ঝড় বয়ে গেল সে কাহিনী শুনে সরকারকেও চিনলাম আর জনতাকেও চিনলাম। আমি আসার কিছুদিন পরেই আমার দাদা গ্রেপ্তার হলেন। নতুন করে সম্ভবত কিছু কমিউনিস্ট ছেলেও ধরা পড়ল। তাদের সঙ্গে দাদাও। জেলের মধ্যে একদিন রাজবন্দীদের পাইকারী হারে পেটানো হলো। আমার দাদাও মার খেলেন। তবে ভোগান্তিটা বেশী দিনের ছিল না, চার মাস বাদেই তিনি ছাড়া পেলেন।

আয়ুব খানের রাজত্বের শেষদিকে মুসলিম লীগের ছেলেদের মধ্যে বেশ কিছুটা হিন্দু-বিদ্বেষী মনোভাব প্রকাশ পেতে লাগল। 'রুচিরা'য় বসে আমার ভাইকে সরাসরি বলত—'কি বলেন সতুদা, আপনি হিন্দু হয়ে অনেককাল তো 'রুচিরা' চালালেন, এটা কি আর ভাল দেখায়? এখন এটা একটা মুসলিম রেস্তোরাঁ হওয়া উচিত।' এসব কথাগুলোকে আমার ভাই ঠাট্টাই মনে করেছিল। ওরা যে সত্যই তলে তলে অন্য প্রস্তুতি চালাচ্ছিল তা ভাবতে পারেনি।

হঠাৎ একদিন দুপুরে বাড়ি থেকে সতুকে দোকানে ডেকে নিয়ে গেল এবং সেখান থেকেই সোজা জেলে। কি ব্যাপার? না, তার দোকানে দুধের মধ্যে জল পাওয়া গেছে। দোকানটা প্রধানত ছিল ছানার মিষ্টির দোকান। দুধে জল দিলে দোকানীরই লোকসান। সুতরাং জল-মেশানো দুধ এসেছে দুধ-

ওয়ালার কাছ থেকেই। এতে দোকানীর অপরাধ কোথায়? কিন্তু মিলিটারী গভর্নমেণ্টের আইন। ধর্মের কাহিনী সেখানে অচল। অতএব সতু গ্রেপ্তার হলো। সেদিন কিন্তু দেখা গিয়েছিল সরকার ছাড়াও আরও একটা বরিশালকে। মিলিটারী হুকুমকে পরোয়া না করে সতুর সঙ্গে সঙ্গে চললো হাজার খানেক মানুষ, 'সতুদা—জিন্দাবাদ' করতে করতে। জেল হাজত পর্যন্ত ছিল এই জনতার স্রোত। চারদিন পরে মিলিটারী গভর্নরের কক্ষে আসামীর বিচার। স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে বার লাইব্রেরীর উকিলরা অনেকেই আসামীর পক্ষ সমর্থনে দাঁড়িয়ে তার অপরাধ খণ্ডন করেছেন। আর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা অগণিত জনতার ধ্বনি উঠেছে 'সতুবাবুর মুক্তি চাই'। উকিলদের যুক্তি ও জনতার দাবীতে কোন কাজ হয়নি। ওর শাস্তি হয়ে গেল—চার মাস জেল ও চার হাজার টাকা জরিমানা। বয়স বেশী বলে চার ঘা বেত মাফ করা হয়েছিল। এই বিচারের প্রহসনে চেনা গেল সরকারকে আর খুঁজে পাওয়া গেল আমার পুরনো বরিশালের মানবিকতা-বোধে উদ্বুদ্ধ মানুষদের। এরাই সেই মানুষ, যাদের মধ্যে জঙ্গী-শাসনের বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য ভবিষ্যৎ মুক্তিযোদ্ধারা অঙ্কুরিত হচ্ছিল।

ওখানকার পরবর্তী ইতিহাস আমার মনোরমা মাসীমার মুখেই শোনা। '৭২ সনে অল্প কয়েকদিনের জন্য গিয়েছিলাম ওখানে, সেকথা আগেই লিখেছি। তখন বাইরের বরিশাল দেখেছি, ভেতরেরটা দেখিনি। মাসীমার মুখেই শুনতাম নতুন নতুন ছেলেদের মধ্যে নবজাগরণের কথা। ওখানে কমিউনিস্ট পার্টির রাজনীতি শিখতে এবং পার্টিভুক্ত হতে যুবছাত্ররা দলে দলে আসত। মাসীমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধার সীমা নেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় কি করে যে তারা মাসীমা এবং অন্য নেতাদের রক্ষা করেছে এবং একে একে এপারে পার করে দিয়েছে, সে ছিল এক রোমাঞ্চকর কাহিনী। মাসীমাকে অশ্রয় নিতে হতো রঙীন শাড়ি পরে, হাতে কাঁচের চুড়ি পরে মুসলমানদের বাড়িতে, আত্মীয়া হিসাবে। তাও এক জায়গায় বেশীদিন নয়। কিন্তু ঐ বিপদের ঝুঁকি নিতে মুসলমান পরিবারের অভাব হতো না। বিধবা মাসীমাও ঐ নতুন বেশধারণ করতে দ্বিধা করতেন না। দিনের পর দিন শুধু আলুসেদ্ধ আর ভাত খেয়ে বেঁচে ছিলেন তিনি।

আমার পরিবারের লোকেরাও এমনি করেই '৭১ সনে এইসব নির্ভীক দরদী মানুষদের আশ্রয়েই প্রাণে বেঁচে আসতে পেরেছিলেন। আমাদের বাড়িটা ভেঙে অবশ্য সবই লুঠ করা হয়েছিল, একটা কাগজের টুকরোও পাওয়া যায়নি সেখানে।

দ্বিজাতি-তত্ত্বের রাজনীতি একদা জিতে গেলেও তার তলায় আছে যে আসল বরিশালের আসল মানুষ তারাই আবার জিতবে, এই আশা নিয়ে এখনও বেঁচে আছি।

অশ্বিনীকুমারের কংগ্রেসী আন্দোলন ও অনেক পরের কমিউনিস্ট আন্দোলনের যে গণতান্ত্রিক ধারা ওখানে প্রবাহিত ছিল সেই ধারায় স্নান করে আবার হয়তো প্রকাশিত হবে বাঙালীর নতুন রূপ।

পার্টির নতুন নীতি ও নির্বাচন

জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর পার্টির অভ্যন্তরে আলোচনা শুরু হলো নতুন কর্মসূচী ও কৌশলগত প্রশ্ন নিয়ে। ১৯৪৮-৪৯-এর অনুসৃত নীতি ভুল ছিল, একথা স্বীকৃত হলো। কিন্তু নতুন নীতি স্থির হতে বেশ সময় লাগল। অনেক আলোচনা ও সমালোচনার পর কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টিতে আলোচনার জন্য দু'টি দলিল প্রকাশ করল। একটি হলো প্রোগ্রাম ও অপরটি কৌশলগত দলিল।

প্রোগ্রামে বলা হলো, ভারতের সরকার এখনও সাম্রাজ্যবাদের বন্ধন থেকে মুক্ত নয় এবং বৃহৎ পুঁজিপতি ও সামন্ততন্ত্রের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। ফলে, দেশের স্বাধীন অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারছে না, কৃষি-সমস্যার সমাধানের পথও উন্মুক্ত হচ্ছে না। অর্থাৎ, দেশের স্বাধীন বিকাশের পথে সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ, একচেটিয়া ফাটকাবাজী ও সামন্ততান্ত্রিক স্বার্থ বিরাট বাধা হয়ে আছে এবং দেশের স্বাধীনতাও পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারছে না।

এই ত্রিমুখী শৃঙ্খল ভাঙ্গতে হলে আমাদের ব্যাপক গণসংগ্রাম করতে হবে। সংগ্রামের অংশীদার হবে ঐ তিন শক্তি ছাড়া দেশের অন্য সমস্ত শ্রেণী। অর্থাৎ, জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী, শ্রমিক, কৃষক, মধ্যবিত্ত প্রভৃতি সমস্ত শ্রেণীকে নিয়ে সংগ্রামী ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। দেশের জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী শিল্পবিকাশের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রবেশ করতে আগ্রহী। কিন্তু তাদের প্রধান বাধা সাম্রাজ্যবাদী একচেটিয়া পুঁজিপতি ও ফাটকাবাজ পুঁজিপতিদের স্বার্থ। আমাদের সংগ্রাম যে তিন শক্তির বিরুদ্ধে পরিচালিত হবে তাতে জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী তাদের স্বার্থেই সহযোগী হবে। সামন্ততন্ত্র উচ্ছেদ করতে না পারলে শ্রমিক-কৃষক কিংবা শিল্পপতি কোন শ্রেণীরই অগ্রগতি হবে না। অতএব এ ব্যাপারেও জাতীয় বুর্জোয়া শ্রেণী আমাদের সঙ্গে থাকবে। এই সব শক্তিকে যদি এক সংগ্রামী লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ করা যায় এবং সঠিকভাবে সংগ্রাম পরিচালিত হয় তবেই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারব। এই পথেই আমাদের দেশে স্বনির্ভর অর্থনীতি গড়ে উঠতে পারবে, শিল্পের বিকাশ ঘটবে, সামন্ততন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত কৃষকশ্রেণী দেশের দারিদ্র্য দূর করতে সহায়ক হবে, সাম্রাজ্যবাদী ও বৃহৎ পুঁজির স্বার্থকে পরাস্ত করা যাবে আর দেশের স্বাধীনতাও পূর্ণতা পাবে। সংগ্রামের এই স্তরের নাম দেওয়া হলো—পিপল্‌স্ ডেমোক্রাটিক রেভ্যুলিউশন।

একথাও বলা থাকল যে, এর নেতৃত্ব থাকবে শ্রমিক শ্রেণীর হাতে।

পার্টি-নীতির এই ব্যাখ্যা পার্টির সকলেই মেনে নিলেন। দু'একটা ব্যাপারে কিছু তর্কাতর্কি হলো। যেমন, জাতীয় বুর্জোয়া বলতে আমরা কি টাটা-বিড়লা-কেও বুঝব, অথবা তারা বাদ যাবে। আরও একটা তর্ক ছিল। যথা, সংগ্রামের কৌশলের ব্যাপারে বলা হয়েছিল যে, 'সরকারের এই চরিত্র জনসাধারণ বুঝিতে পারিয়াছে ও তাহাদের মোহমুক্তি ঘটিয়াছে।' এই প্রসঙ্গে অনেকের মত হলো, 'মোহমুক্তি ঘটিয়াছে'র পরিবর্তে 'ঘটিতেছে' বলা উচিত। এই তর্কটা পশ্চিম-বঙ্গেই বেশ কিছুদিন চলেছিল, অন্য কোথাও বিশেষ নয়। আমাদের এই এক স্বভাব। ঘরে বসে তর্ক করার চেয়ে লোকের মধ্যে গেলেই তো বোঝা যাবে 'ঘটিযাছে' না 'ঘটিতেছে', তবু আমরা অকারণ তর্ক করে মরি।

একটা বিষয় আমি তখন থেকেই লক্ষ্য করতাম। ১৯৪৮—৫১ পর্যন্ত যাঁরা তখনকার উগ্রনীতির নেতৃত্বে ছিলেন, তাঁদের সঙ্গে পরবর্তী নেতৃত্বের আন্তরিক সম্পর্কের কিছুটা যেন অভাব ঘটছিল।

অবশ্য ঐসব আলোচনা নিয়ে বেশিদিন আটকে থাকার অবসর তখন ছিল না। ১৯৫২ সনের ফেব্রুয়ারীতে নির্বাচন এসে গেল। আমরা গুছিয়ে আরম্ভ করার সময়ও পেলাম না।

আমি তখন আশ্রয় নিলাম সেই বর্ধমানের করিম সাহেব ও বাদশাদের বাড়িতে। কলকাতায় ওদের একটা বাড়ি ছিল। তার দোতলায় পার্টির রাজ্য অফিস। তেতলায় করিম সাহেবদের সঙ্গে আমার থাকার ব্যবস্থা হলো। ওরা আমাকে বাড়ির লোকই ভাবতেন। বছরখানেক কিংবা তারও বেশি বাড়ির লোক হয়েই ওদের সঙ্গে থাকলাম।

নির্বাচনের জন্য পার্টি-সভায় স্থির হলো—মোট ১০০টা আসনে আমরা লড়ব। জিতি বা হারি—পার্টির প্রচার অন্তত হবে। আমাদের পার্টি-নীতি লোকে গ্রহণ করে কিনা, লোকের চোখ কতখানি ফুটেছে, সেটা তো বোঝা যাবে।

আমার সঙ্গে পার্টিনেতাদের একটা বিষয়ে বিরোধ হলো। ১০০টা সীটে আমিই মেয়েদের মধ্যে একমাত্র প্রতিনিধি রূপে কেন মনোনীত হব? অনিলা, পঙ্কজ, কনক—ওরা কেন হবে না? এটা দেখতেও তো বিশ্রী লাগে। কমিউনিস্ট পার্টি তাদের মহিলা-কর্মীদের এতই অযোগ্য মনে করে? অনেক ঝগড়া করে বোঝা গেল—কালীঘাট সীটে অন্য বিরোধীদলগুলির কোন দাবী-দার নেই বলেই ওটা কমিউনিস্ট পার্টি পেয়েছে এবং ঐ সীটে পার্টিরও কোন দাবীদার নেই বলে আমার ঘাড়েই ওটা পড়েছে। অন্য কোন সীটে মহিলাদের

দাঁড় করাতে পার্টি একেবারে নারাজ। কারণ দাবীদারের সংখ্যা অনেক। ব্যাপারটা আমার খুব খারাপ লাগল। মনে হলো—আইনসভার সদস্য হওয়াটার প্রতি এত আকর্ষণ কেন? আমার মনে হয় ১০০টার মধ্যে সম্ভবত আমরা মোট ২৮টা সীট পেয়েছিলাম। হয়তো আর দু'একজন মেয়ে দাঁড় করালে আমার মতো তারাও সীট জিতে যোগ্যতার প্রমাণ রাখতে পারত। রেণুও তো পার্লামেণ্ট সীটে জিতে তার যোগ্যতা প্রমাণ করেছিল।

যা হয়নি তা হয়নি কিন্তু নির্বাচনে নেমে মনে হলো—আমরা তো জনতার প্রত্যাখ্যাত মানুষ নই। আমাদের কথা তো সবাই কান পেতে শোনেন।

প্রথমটা আমি কালীঘাটের দিকে পা বাড়াইনি ভয়ে আর সঙ্কোচে। একদিন সুব্রত সেনশর্মা প্রায় অগ্নিশর্মা হয়ে পার্টি অফিসে এসে আমাকে ধমক লাগালেন। বললেন, 'আপনি কি যাবেন না ঠিক করেছেন? সীটটা কি আমরা ছেড়ে দেব?' তার পরদিনই গেলাম। মাত্র জন ১২/১৩ পার্টিসভ্য নিয়ে কাজ শুরু হলো।

উদ্বোধনী মিটিং হলো হাজরা পার্কে। পুঁটুদি সভানেত্রী। সামনের সারিতে বসে তাঁর মা। উনি আমার সব মিটিং শুনতে যেতেন। খুব লোক হলো মিটিং-এ। বোধহয় একজন মেয়েপ্রার্থী কি বলেটলে সেটা জানার জন্য কৌতূহলই ছিল বেশী।

এরপর থেকে যেখানেই মিটিং করি আমার মিটিং-এর সামনের সারির শ্রোতা হিসাবে আগে থেকেই এসে বসে থাকতেন সে পাড়ার প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধরা। রাস্তায় ঘুরতে দেখলে এঁরা অনেকেই আমাকে উপদেশ দিতেন, 'এখানে একটা মিটিং করুন, ওখানে একটা মিটিং করুন' ইত্যাদি।

পাড়ায় পার্টিগত ভাবে আমাদের ছেলেদের বিশেষ কোন পরিচিতি ছিল না। এইবার আমরা ঘরে ঘরে ঢুকছি। বড় সভা যেখানে সম্ভব হয়েছে করেছি কিন্তু বেশী হয়েছে ছোট ছোট ঘরোয়া সভা। কি বস্তি, কি মধ্যবিত্ত এলাকা—কোন রাস্তা বা কোন বাড়ি বাদ যায়নি, আমাদের কথা পৌঁছে দিয়েছি। খুব সাড়া পেতে লাগলাম আমরা—আমাদের মনে জয়ের একটু ক্ষীণ আশাও জাগল।

ব্যক্তিগতভাবে আমি মুগ্ধ হয়েছিলাম অগণিত ভাইবোন পেয়ে। ওদের 'কমরেড' বলব কি, সবাই তো ছোট ছোট ভাই আর বোনের মতো। আমাকেও দিদির মতো সবাই ভালবেসেছে ও প্রাণ দিয়ে খেটেছে। এখানে কত বাড়িই যে আমার নিজের বাড়ি হয়ে গিয়েছিল—গুণে বলতে পারব না। দুপুরের খাওয়া রোজই এইসব ভদ্রলোকদের বাড়িতে হতো। এজন্য আর

আমাকে বাদশাদের বাড়ি ফিরতে হতো না।

আমার সাজপোশাক নিয়ে এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু-ভদ্রলোক আমাকে একদিন বলে দিলেন, 'আপনি এত ফর্সা কাপড় পরে আসবেন না তো। আপনি কমিউনিস্ট, লোকে নিন্দে করবে।' এ নিয়ে তিনি আন্তরিকভাবেই চিন্তিত ছিলেন। আমি হোলটাইমার লোক। কাপড় আমার সর্বসাকুল্যে খান চারেকের বেশী থাকতই না। নিজে রোজ কাপড় কেচে তা শুকিয়ে বালিশের নীচে রেখে দিতাম। এইরকম সাদা ধোওয়া শাড়িই রোজ পরে বেরুতাম। কিন্তু নির্মলবাবু আমাকে দিদির মতো দেখেন এবং সঙ্গে নিয়ে নিয়ে ঘোরেন। ওঁর মনে ভয় ছিল—বস্তির লোকদের মধ্যে যদি আমার অত ফর্সা শাড়ি দেখে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়, তাই তাঁর এই সাবধানতা। আমার গ্রামের কথা মনে পড়ে গেল। তবে কলকাতা অতটা পিছিয়ে নেই। শাড়িখানা অন্তত সকলেই কেচে পরে থাকে। কিন্তু নির্মলবাবুর কথাটা আমার বড় ভাল লাগল। বাপী, অশোক বসু এরা সব এখন কত বড় বড় পার্টি-নেতা। তখন সব ছোট ছিল। আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরত, সভা-মিছিলের যোগাড় করত। রাজনীতিতে সেই তাদের হাতেখড়ি। অশোকদের বাড়িও আমার নিজের বাড়ি ছিল এবং প্রায়ই ওদের বাড়িতে খেতাম। অশোকের বাবা আমায় নিয়ে ঘুরতেন। সুব্রত সেনশর্মা ছিল পাড়ার জনপ্রিয় ছেলে। সবাই ওকে ভালবাসত। কালীঘাটের নির্বাচনে শ্যামল চক্রবর্তী, সুধীর ভট্টাচার্য, অমিয় চ্যাটার্জি প্রভৃতি কমরেডরা ছিলেন পাড়ার নেতা। আমি ওদের প্ল্যান অনুযায়ী কাজ করতাম। দ্বিতীয় নির্বাচনে এদের সঙ্গে যুক্ত হলেন ধৃতিকান্ত রায়চৌধুরী। সে সময়ে ধৃতি-র মা-র কাছে প্রায়ই খেতে যেতাম। তিনি যে যত্ন করে খাওয়াতেন, কোন দিন তা ভুলব না। কার কথাই বা ভুলতে পারি? মৃগাঙ্ক, পল্টু, শ্যামল, অরূপ, চিত্ত, অনিমেষ, রাধানাথ, বিদ্যুৎ হালদার, রাণী সর্বজ্ঞ, রাণী মুখার্জী, বিমলা—এরা কেউ আমার স্মৃতি থেকে মুছে যাবে না। এদের ভালবাসাটুকু মনের মধ্যে তোলা আছে। আর ছিল সাধনা ঘোষের বাড়ি। আমার চাল রোজই তাঁদের হাঁড়িতে নেওয়া হতো। ওদের সকলের মিষ্টি ব্যবহার আমার মনে থাকবে। হাতে করে সাধনাকে গড়ে তুলেছিলাম। তাকে কি ভুলতে পারি? কতবড় মহিলা সমিতি হয়েছিল ওর বাড়িতে! ও বাড়ির মেয়েরা, ওদের ভাই শৈলেন ঘোষ, সবাই নির্বাচনের কর্মী ছিলেন। মহিলা সমিতির জন্য প্রায়ই সাধনার বাড়িতে যেতাম আমি। কেমন করে সংগঠন গড়তে হয়, মেয়েদের কাছে কিভাবে কথা বলতে হয়, সবই সে একটু একটু করে শিখে নিল।

তারপর সে নিজেই নেত্রী হলো। বরিশালে ওর শ্বশুরবাড়ি। শাশুড়ী সেখানে সমিতি করতেন। ওর স্বামী ছিলেন রাজনীতিতে তখনকার দিনের পি. এস. পি. মতাবলম্বী। কিন্তু স্ত্রীকে অবাধ স্বাধীনতা দিতে কখনও কুণ্ঠিত হতে দেখিনি।

আমার একচেটিয়া স্থান ছিল বরিশালবাসীদের কাছে। রাজনীতির চেয়েও তাদের কাছে বড় কথা ছিল আমি বরিশালের মেয়ে। একদিন রীতিমতো উচ্চশিক্ষিত এক ভদ্রলোকের বাড়িতে গেছি বাড়ি-ঘরের চেহারা দেখে মনে হলো এ বাড়িতে আমাদের ভোট নেই। তাই কোনরকমে কথাগুলো বলে চলে আসবার চেষ্টায় ছিলাম। কিন্তু ভদ্রলোক হঠাৎ বললেন, 'অত বলতে হবে না। আপনি বদ্যি এবং বরিশাল। আমার ভোট আপনি পাবেন।' আমি তো অবাক। জাতি বিচারের মানদণ্ডে রাজনীতি কি শিক্ষিতকুলেও এভাবে অর্থহীন হয়ে যায়?

এটা দেখেছিলাম গ্রামে আরও বেশী। নির্বাচনী প্রচারের কোন দরকারই নেই। যদি মাহিষ্যদের মধ্যে একজন মাহিষ্য প্রার্থী দেওয়া হয় তবে ষোলকলা প্রায় পূর্ণ। যতই আমরা প্রগতিশীল হই না কেন জাতিপাতির কাছে আমাদেরও হার মানতে হতো। আমরাও প্রার্থী দিতে গেলে ঐ কথাটা সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারতাম না।

নির্বাচনগুলিতে স্বভাবতই আমি শুধু আমার কালীঘাট নিয়ে পড়ে থাকতে পারিনি। সব জিলাগুলিতেই ঘুরতে হতো। ভালই হয়েছিল তাতে। বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেছি জীবনে। এসবের কয়েকটা উল্লেখ করছি। এতে ১৯৫২ ও '৫৭—এই দুটো নির্বাচনের ঘটনা হয়ত থাকবে। কোনটা কোন সময়ের ঠিক মনে নেই।

মুসলমানদের ভোট আমরা বেশি পাব না, সেটা জানা ছিল। সংখ্যালঘুরা ভয়েই শাসকদলের দিকে থাকবে এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু অপরপক্ষের প্রচারের নমুনা দেখে একদিন রীতিমতো ভড়কে গিয়েছিলাম। এটা দ্বিতীয় নির্বাচনের সময়কার ঘটনা। হাওড়া জিলায় একটি মুসলমান কৃষকপল্লীর ভোট আমাদের পাবার আশা ছিল। হঠাৎ তারা বিগড়ে গেছে। কারণ খুঁজতে গিয়ে আমি মেয়েদের নিয়ে বসলাম। আমাকে কোনরকমই খাতির দেখাচ্ছে না তারা। বসেছিলাম একটা নারকেল ও সুপারি বাগানের মধ্যে। ওরা গাছের শুকনো ডালের পাতা ছাড়াচ্ছে আর ডালগুলো কেটেই যাচ্ছে। আমার কথা শোনারও যেন সময় নেই। কিছুতেই ওদের মুখ খোলাতে পারছি না। অবশেষে একজন মহিলা বলে ফেললো, 'তোমাদের ভোট দেব কি করে? তোমরা

ধর্ম মানো না। আল্লার চাঁদ, আমাদের ঈদের চাঁদ, সেখানে তোমরা কুকুর পাঠিয়ে দিয়েছ। এমন পাপ কেউ করে?' বুঝলাম এতক্ষণে। সোভিয়েটের স্পুট্‌নিক তখন কুকুর লাইকাকে নিয়ে মহাকাশ-পরিক্রমা করছে। অবাক বিস্ময়ে লোকে তার খবর শুনছে। আর তাই নিয়ে এই পল্লীতে আমরা জাতিচ্যুত! অপরপক্ষের বুদ্ধির তারিফ না করে পারলাম না। সমস্ত জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব আবিষ্কার এককথায় ভেঙেচুরে একাকার। তর্কের বৈঠক অনেক করেছি কিন্তু এখানে হার মানলাম। মনে দুঃখ হলো। আমরা এখনও এত পিছিয়ে?

জলপাইগুড়ির একটা গ্রাম। অতি দরিদ্র কৃষক এলাকা। আমি মেয়ে হয়েও ঘরে ঢুকতে পারি না—বস্ত্রাভাবে মেয়েদের এমনই অবস্থা। ছেলেরা একটা লম্বা কাপড়ের ফালিকে লেংটি হিসাবে ব্যবহার করে কোনমতে লজ্জা ঢাকে। ভাবলাম খুব খাঁটি জমিন পেয়েছি—এখানে আমাদের কথায় ফল হবে। ওরা রাজবংশী।

তাদের অবস্থার কথা তুলে, এজন্য দায়ী কারা তা যতদূর সহজ কথায় পারা যায়, বোঝালাম। কেন আমাদের কৃষকরা মরে যাচ্ছে, সে বিষয়ে আমার সমস্ত জ্ঞানগম্যি তাদের মনে ও মগজে অনর্গল ঢাললাম। শেষ হলে জিজ্ঞেস করলাম, 'কি বলেন আপনারা?' সব শুনে ওরা বললো, 'আমরা পূর্বজন্মের কর্ম-ফল ভোগ করছি, জমিদার কি করবে? জমিদারই তো বাঁচিয়ে রেখেছেন আমাদের। তাছাড়া 'রাণীমা'রে এট্টা ভোট দিবার লাগে।' বুঝলাম, রাণী অশ্রুমতী জিতে গেলেন। আর রাগে নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছা হলো। আর কি করে বোঝাব তাদের? দারিদ্র্যের এই সীমানায় নেমেও 'কর্মফল' আর 'রাণীমা'? এই না সেদিন তর্ক করছিলাম দেশের মানুষের মোহ 'ভাঙ্গিয়াছে কি ভাঙ্গিতেছে'—এই নিয়ে? এ যে দেখি অন্ধ, চোখ ফুটিতেছেও নয়। কেন যে ছাই আমরা তর্ক করে মরি! মানুষের কাছে এলে ওরাই তো আমাদের চোখ ফোটায়। এতবড় একটা দেশের মানুষের মন ঘরে বসে বুঝতে চাওয়া শুধু নিরর্থক নয়, বিপজ্জনকও বটে।

আবার, আমাদের স্বপক্ষের গরীব কৃষকদেরও দেখেছি। মেদিনীপুরের কোন একটা এলাকায় গেছি। নাম এখন আর মনে নেই। আমরা ৪/৫ জন আছি। মনে আছে জ্যোতির্ময় নন্দীও আমাদের সঙ্গে। এত লোককে খেতে দেবার সঙ্গতি তাদের নেই। ধার করে ধান নিয়ে আসত। সেই ধান কুটে তবে দু'বেলার ভাত হতো। ভাতের উপরে একটুখানি আলুসেদ্ধ আর সামান্য একটু

ডালের জল দিতে পারত। ভাতের থালা সামনে দিয়ে আর লাগবে কিনা জিজ্ঞেস করতেও মেয়েরা বেরুত না। হয়তো থাকতও না কিছু।

একদিন সন্ধ্যায় অনেক হেঁটে, ঘুরে ঘুরে আমরা ফিরেছি। কমরেডরা সত্যিই খিদে-তেষ্টায় কাতর। আমি ঘরে গিয়ে এক ঘটি জল এনে দিলাম। তাতে ওদের হলো না। নন্দী বললো, মুড়ি টুড়ি কিছু নেই? আমি চুপি চুপি বললাম, 'চাইবেন না, নেই কিছু। দেখছেন না, মেয়েরা চুপ করে ঘরে বসে আছে। থাকলে ওরা দেয় না সেটা কি এদের ঘরে হয় কখনো? এ যে ওদের ইজ্জতের কথা। চুপ করুন। মেয়েরা শুনলে কষ্ট পাবে।' তবু ঐ কথা জোরে জোরেই বলা হলো। শেষে গৃহস্বামী কৃষকটি বেরুলেন দুটি মুড়ি যোগাড় করতে। মুড়ি এলে সবাই অল্প করে তাই খেল। আমি উঠোনেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত ২ টায় খেতে ডাকল। ঘুমের মধ্যে যেন ঢেঁকির শব্দ শুনেছিলাম। ধার করে ধান এনে অত রাতে চাল কুটে তবে ভাত হলো। এত গরীব, তবু আমাদের প্রতি কী মমতা! কমরেডরা এসেছেন, তাঁদের পেটভরে খেতে দিতে পারছে না বলে কী দুঃখ! মেয়েরা যেন লজ্জায় আর মুখ দেখাতে পারে না।

আর ঐ রাক্ষসগুলোরও যেন খিদের আর শেষ নেই। একদিন দুপুরে ফিরছি। বাড়ির কাছেই একটা ছোট হাঁটুজল ডোবা। একটা যেন মাছের ঝাপ্টানির শব্দ পাওয়া গেল। আর যায় কোথায়? তিন-চার জন লাফিয়ে পড়ে জল-কাদা মাখামাখি করে গামছা চেপে তুললো ছোট্ট একটা চ্যাং মাছ। সেইটাকে নিয়ে এক মহা সমস্যা। কোথায় তেল, কোথায় হলুদ! চেয়েচিন্তে যোগাড় করে ওরা নিজেরাই রাঁধতে বসে গেল। গাছ থেকে কাঁচা তেঁতুল পেড়ে তাই দিয়ে এক কড়াই মাছের ঝোল নয়, 'জল' রান্না হলো। এখন আমি ওদের নিয়ে টিপ্পনি কাটছি বটে কিন্তু সেদিন আমিও বেশি ভাত খেয়েছিলাম।

এই কৃষকরা সংগ্রামী কৃষক। ঐক্যবদ্ধ পার্টির সমর্থক কৃষক। ওদের ওখানে নির্বাচনী প্রচারে গিয়ে সহকর্মীকে খুদকুঁড়ো দিয়েও যে ভালবাসা যায়, এ জিনিস চোখে দেখলাম।

দিনাজপুরের অন্য একটা এলাকায় গিয়ে উঠেছি এক মধ্যবিত্ত গৃহস্থের ঘরে। দেখলাম, তাদের এক প্রজা-কৃষক লেংটি পরা অবস্থাতেই এসেছে। এও রাজ-বংশী। ক্ষেতমজুর হিসেবে কাজ করে দুপুরে খেতে এসেছে। তাকে দেওয়া হলো একথালা ভাত এবং একপাশে খানিকটা পাটপাতা সেদ্ধ। আমি বলেই ফেললাম—'এই দিয়ে খাবে কি করে?' উনি বললেন, 'ওরা ওই দিয়েই খায়, অন্য কিছু খায় না।' অনেক কড়া কথা বলতে পারতাম, কিন্তু বললাম না।

কারণ, ইনিও যে আমাদের ভোটার ! গরীব কৃষকেরা বাবুদের ঘরে এই ব্যবহার পায়—এও আমার এক নতুন অভিজ্ঞতা। সত্যি, ঘেন্না ধরে গিয়েছিল এসব জোতদার বাবুদের উপর।

যাহোক, আমার একটা লাভ হলো এই নির্বাচনে। আবার আমি সব জিলার উঁচু-নীচু সব মানুষদের সঙ্গে মিশতে পেলাম—তাদের আসল চেহারাটাও দেখতে পেলাম।

মনে পড়ে, একটা চা-বাগানের এলাকাতেও গিয়েছিলাম। ঐ একই দরিদ্র অবস্থার লোক তারা। রাত্রে দেখি, যে ঘরটায় মেয়েরা ছিল আমাকেও সেই ঘরে শুতে দিয়েছে এবং সেই ঘরে আমাদের সঙ্গী ছিল একটা ছাগল ও কয়েকটা মুরগী। ঘরের মাঝখানে প্রকাণ্ড একটা জ্বলন্ত উনুন, তাতে নল লাগানো একটা পেতলের কলসীতে চা ফুটছে এবং যার যখন ইচ্ছে বাটি করে ঢেলে নিয়ে খাচ্ছে। কুলিদের 'লালরক্ত'-ই বটে! দুধ-চিনির প্রশ্ন ওঠে না। চা-টা ওরা মাগ্না পায়। শরীরের উপরার্ধে তাদের কিছুই নেই, নীচের দিকে এক টুকরো কাপড় জড়ানো। লাল গনগনে আগুন, তার মাঝখানে ওদের তামার মতো চেহারাগুলো দেখে মনে হচ্ছিল—ওরা বুঝি এ পৃথিবীর মানুষ নয়।

আমাকে ওরা একটা দড়ির খাটিয়ায় বিছানা করে দিয়েছিল। রাত্রে ঘুমিয়েছি। হঠাৎ খাটিয়ার নীচে থেকে পিঠে একটা ঢুঁ। লাফ দিয়ে উঠে বসতে মেয়েরা ছাগলটাকে সরিয়ে আনল। সাড়া পেয়ে মুরগীগুলো উড়ে গিয়ে উঠে বসল মশারির চালে। ওদিকে লাইন দিয়ে ছারপোকাগুলো কাঁথার নীচে-উপরে চরে বেড়াচ্ছে ও মনের সুখে আমার রক্ত পান করছে। থাকতে না পেরে আগুনের পাশে মেয়েদের সঙ্গেই বসলাম। ওরাও সারারাত বসে। বোধহয় বিছানাটুকু আমাকে দেওয়ায় শোওয়ার মতো আর কোন বস্তু ছিল না ওদের। ওরাও দেখলাম মাটির দেওয়ালের গায়ে বেয়ে ওঠা ছারপোকাগুলোকে টিপে টিপে মারছে। গোল হয়ে বসে আগুন তাপাচ্ছে, ঝিমুচ্ছে আর বাটিতে ঢেলে চা খেয়ে নিচ্ছে। চা-শ্রমিকেরা যে এত গরীব তা জানতাম না। আমার কথাও ওরা ঠিক বোঝে না। কেমন যেন এক বোবা চোখে তাকায়। পেটে দানাপানি পড়েছে কিনা তাও বুঝলাম না। সারা রাতটা তো চা খেয়েই কাটিয়ে দিল। ভাবলাম, এই আমার দেশ! ইংরেজের ফেলে-যাওয়া ছিব্‌ড়ে করা দেশটার নীচুতলার আসল মানুষ এরা। চা-বাগানে এখনও এরা ইংরেজেরই বুটের তলায় পিষ্ট হচ্ছে।

ওদের পাশে বসে সেদিন ভাবছিলাম, মানুষের জীবনযাত্রার কত নমুনাই

যে দেখে যেতে হবে! ওরা ভগবানে বিশ্বাসী, কর্মফলে বিশ্বাসী—তাই মুখ বুজে এই অদৃষ্টের মার খেয়ে যাচ্ছে। নইলে কি করত জানি না। হাত-পা ছুঁড়ে আকাশটাকে ভাঙ্গত কিনা কে জানে!

তবু এরা 'স্বাধীনতা'র ভোটটা তেরঙ্গা ঝাণ্ডাকেই দিয়ে আসে। মালিকের সঙ্গে মজুরির লড়াইতে লালঝাণ্ডা অবশ্যই তাদের নিজস্ব ঝাণ্ডা। এই ঝাণ্ডার তারা কত অনুগত, এর প্রতি তারা কত শ্রদ্ধাশীল, কিন্তু স্বাধীনতার কথাটা তো আলাদা! বজবজেও ঠিক এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করেছিলাম।

তখন মনে হতো এই বিশাল দেশের বিপুল সংখ্যক নিরক্ষর জনতার সবার মন জয় করা কী কঠিন ব্যাপার। কমিউনিস্ট কর্মীকে কী অসীম ধৈর্যের পরীক্ষাই না দিতে হয়! হাঁস-মুরগী যেমন নিজের বুকের উত্তাপ দিয়ে ডিমের খোলস ছাড়ায়, বাচ্চার চোখ ফোটায়, তেমনি কমিউনিস্ট কর্মীরাও তাদের ধৈর্য ও ভালবাসা দিয়েই ওদের চোখ ফোটাতে পারে। লৌহপিণ্ডকে পারে খাঁটি ইস্পাতে পরিণত করতে।

অবশেষে নির্বাচন হয়ে গেল। আমরা ২৮টা সীট জিতলাম এবং ১০'৭৬ পার্সেন্ট ভোট পেলাম। আইনসভা জমজমাট। আমরাই প্রধান বিরোধীদল। অন্য বিরোধী দলের সঙ্গে মিলে আমরা সংখ্যায় তখন মোট ৪১ জন। জ্যোতিবাবু হলেন বিরোধী দলের নেতা। আইনসভায় জ্যোতিবাবু একাই একশো। আমরাও বক্তৃতা করি। কাগজে আমাদের নাম বেরোয়, প্রশংসা বেরোয়, বেশ লাগে।

আইনসভার একটা মোহ আছে, একটা জাঁকজমকও আছে। নিজেকে মনে হয়—বুঝি কত বড় হয়ে গেছি। এ থেকে নিজেকে মুক্ত রাখা খুব কঠিন।

অপরদিকে এলাকার লোকদের প্রত্যাশা আছে। কারো বাড়িতে অসুখ-বিসুখ হোক কিংবা অন্য কিছু হোক অথবা কিছু নাই হোক, এম. এল. এ-কে সর্বদা তাঁরা ঘরের লোক হিসাবে দেখতে চান। প্রয়োজনে উপস্থিত থাকতে না পারলে তাদের মন বিগড়ে যায়। অভিযোগ ওঠে—কেন তবে ভোট দিয়েছিলাম। যারা গরীব তাদের সমস্যা অনেক। রোগ, পীড়া, চাকরি, বাড়ি-উচ্ছেদ প্রভৃতি নিত্য নতুন দুর্বিপাক লেগেই থাকে। এম. এল. এ-রা চাকরির ক্ষেত্রে যতখুশি সার্টিফিকেট লিখতে পারেন কিন্তু তাতে কোন কাজ হয় না, বিশেষত বিরোধী এম. এল. এ-দের দেওয়া সার্টিফিকেটে। রোগ-পীড়ায় পরিচিত ডাক্তার বা হাসপাতালের ব্যবস্থা করে কিছুটা সাহায্য করা যায় বটে, কিন্তু ভাড়া না দিলে বাড়ি-উচ্ছেদ ঠেকান যাবে কি করে? বিরোধীদলের

চেষ্টায় টিকা প্রজাস্বত্বের আইন হলো কিন্তু তাতেই বা কি করা গেল ? আর এটাও তো সম্ভব নয় যে এম. এল. এ-রা সর্বক্ষণ তাদের সামনে থাকবে !

আমার হতো খুবই মুশকিল। আমি তো আমার সময়ের সবটা এলাকায় দিতে পারি না, আইনসভাতেও বসে থাকতে পারি না। আমার গণসংগঠন আছে, মহিলা সমিতি আছে। ফলে, এলাকার লোকেরা আমার সম্পর্কে ক্ষুব্ধ হতে লাগলেন। অথচ আমি কেমন করে তাদের বোঝাই আমার অন্য কাজের কথা, আর কেমন করেই বা বোঝাই যে শুধু আমার উপস্থিতি দিয়েই আমি তাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিরোধীদল হিসাবে যদি সত্যিই আমরা কিছু পরিবর্তন আনতে পারি তবেই তারা উপকৃত হবেন। পরে আমার মনে হতো—গণসংগঠনের কোন লোক আইনসভায় না গেলেই ভাল। অন্তত আমার না গেলেই ভাল হতো। কারণ, আমি 'এলাকা', 'আইনসভা' ও 'গণসংগঠন' কারো প্রতিই সুবিচার করতে পারিনি।

আমাদের পার্টি বেআইনী হবার পর মেয়েদের সংগঠন একেবারে ভেঙ্গে গিয়েছিল। আবার তা জোড়া লাগানো হয়েছে। অফিস চলছে, 'ঘরে-বাইরে' চলছে। পাড়ায় পাড়ায় কর্মকেন্দ্রগুলিও চালু হয়েছে। বলা যায়, আগের চেয়েও জমজমাট। আমি তো এর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত। আইনসভায় বক্তৃতা না থাকলে অগত্যা আমাকে পালাতে হতো এবং হয় এখানে-সেখানে মিটিং, নয় সমিতি অফিসে যেতেই হতো। তাছাড়া আইনসভার ঐ একঘেয়ে বক্তৃতা—বেশিক্ষণ বসে শুনতেও আমার ভাল লাগত না।

এদিকে পশ্চিমবঙ্গ মহিলা সমিতি (এখন আর আত্মরক্ষা সমিতি নয়) ছাড়াও মেয়েদের সংঘবদ্ধ করার আরও বৃহত্তর ক্ষেত্র আমাদের সামনে প্রসারিত। তখন বিশ্বগণতান্ত্রিক নারীসংঘ বার্লিনে গঠিত হয়েছে। এর ইতিহাসটা পরে বলছি। আমাদের কাছে ডাক এলো তাদের সঙ্গে যুক্ত হবার। একে তো পশ্চিমবঙ্গে মহিলা সমিতির অসংখ্য শাখা আছে। তার উপর পৃথক নাম ও সত্তা নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন সমিতি। এদের সবাই নিজ নিজ সত্তা নিয়ে মিলিত হলো ভারতীয় গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশনের সঙ্গে। এ নিয়ে প্রতিদিন মিটিং করে বেড়াতে হতো। আন্তর্জাতিক সমিতি কি এবং কেন—এসব তো নতুন ধরনের কথা। অনেক ধৈর্য ধরেই বোঝাতে হতো সেসব।

ভারতের সমস্ত প্রদেশের মহিলা সমিতিও যুক্ত হলো এর সঙ্গে। অর্থাৎ, সারা ভারতের মহিলা কর্মীরা তাঁদের নিজ নিজ সংগঠন নিয়েই একটি মঞ্চে এবার মিলিত হলেন। পশ্চিম বাঙলাতেও ফেডারেশনের পশ্চিমবঙ্গ শাখা খোলা হলো।

অর্থাৎ, আমাদের পরিধি অনেক বেড়ে গেল। নিত্য-নতুন এমন মহিলাদেরও আমরা পেতে লাগলাম, যাঁরা পার্টিভুক্ত নন। পুষ্পময়ী বসু, অরুণা মুন্সী, শান্তা দেব, অঞ্জলি মুখার্জী—এঁরা সবাই এলেন। আমাদের কাজের ধারাও এই মঞ্চে এমন ভাবে রচিত হলো যে তাতে সমস্ত শ্রেণীর মহিলারাই নিঃসংকোচে এসে যোগ দিতে পারেন। সংঘের উদ্দেশ্য হলো—শান্তি, নারীর অধিকার ও শিশুর কল্যাণ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করা। কোন্ নারী এটা না চান? কে এর থেকে মুখ ফেরাবেন? ফেডারেশনের প্রথম কাজ হলো একটি সারাভারত সম্মেলন ডাকা, যাতে আমরা বুঝতে পারি এই প্রোগ্রামের ভিত্তিতে সংগঠনকে কতটা প্রসারিত করতে পেরেছি।

১৯৫২ সনে কলকাতাই প্রথম সম্মেলনটি ডাকার সম্মান পেল। কারণ অন্যান্য প্রদেশগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গে তখন মেয়েদের সাংগঠনিক শক্তি বেশী। এই সম্মেলন সম্পর্কে কিছু বলার আগে বিশ্বনারী সংঘ গড়ে ওঠার ইতিহাস একটু বলা প্রয়োজন।

গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশন ঃ বিশ্বনারী সংঘ

১৯৪৫ সনে যুদ্ধ থেমেছিল। ফ্যাসিস্ট হিটলারের বিশ্বজয়ের দুরাশা সফল হয়নি। কিন্তু তার লোভের আগুন গোটা ইউরোপকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল। লণ্ডন, প্যারিস প্রভৃতি শহরগুলি তখন বিধ্বস্ত। সব থেকে বড় আক্রমণ সহ্য করতে হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দেশগুলিকে। ফ্যাসিবাদের সবচেয়ে বড় শত্রু ও প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল কমিউনিজম। এই শত্রুকে শেষ করতে না পারলে ফ্যাসিবাদের পা রাখবার জায়গা থাকে না, একথা বুঝেই হিটলার সর্বশক্তি নিয়ে একসঙ্গে রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলিকে নিশ্চিহ্ন করার অভিযানে নেমেছিল। কিন্তু নিশ্চিহ্ন করতে সে পারেনি, নিজেকে নিশ্চিহ্ন করেই ফ্যাসিবাদের পরাজয় সম্পূর্ণ করতে হয়েছিল তাকে। পাল্টা আক্রমণে হারাতে হয়েছিল নিজের দেশ জার্মানীকে।

যুদ্ধ যারা লাগায়, অপরের দেশ যারা আক্রমণ করে তাদের সম্ভবত পশুত্বের সাধনা করতে হয়। নয়তো সব যুদ্ধেই আক্রমণকারীরা এত পাশবিক আচরণ করে কি করে? মানব এমন দানবে পরিণত হয় কি ভাবে? দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে ভিয়েতনাম, কোরিয়া এবং সর্বশেষ বাঙলাদেশের মুক্তি-সংগ্রামের বিরুদ্ধে সমস্ত জঙ্গী শাসকচক্র বা ফ্যাসিস্ট চক্রের একই নারকীয় নিষ্ঠুরতা দেখা যায় কেন?

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের মারণযজ্ঞে ইউরোপ ও সোভিয়েট রাশিয়া কী ধ্বংসস্তূপেই না পরিণত হয়েছিল! আজ ৩৫/৪০ বছর পরে ঐসব দেশে গেলে সেই ক্ষতচিহ্ন হয়তো চোখে পড়বে না কিন্তু সেদিন যাঁরা বেঁচে গিয়েছিল তাঁদের বাঁচাটাও ছিল বোধহয় অভিশপ্ত হয়ে বেঁচে থাকা। কারণ, হিংসা ও নিষ্ঠুরতার সেই বীভৎস চিহ্নগুলো তো তাঁদের চোখের উপর জ্বলজ্বল করে ভাসত।

যুদ্ধের আঘাতটা স্বভাবতই মেয়েদের বুকে বাজে বেশী। তাদেরই স্বামী আর সন্তানদের যুদ্ধের প্রথম বলি হতে হয়। তাই যুদ্ধশেষে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হলো নারীকণ্ঠেই। সারা ইউরোপে ও রাশিয়ায় ধ্বংসস্তূপের নীচে মেয়েরা তখনও চোখের জলে বুক ভাসিয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন তাঁদের প্রিয়জনদের। অন্তত ছিন্ন রক্তাক্ত গাত্রবস্ত্রের টুকরোটুকু পাওয়ার জন্য তাঁদের বুকের মধ্যে লুকানো আকুলতার কথা আমরা অনুমান করতে পারি। এই সময়ে

রাশিয়া ও পূর্ব ইউরোপের মেয়েদের একটি প্রতিনিধিদল বেরিয়েছিলেন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত দেশগুলির কোথায় কি ঘটছে তা নিজেদের চোখে দেখতে। নিষ্ঠুরতার কী ভয়ংকর চিহ্ন যে তাদের জন্য অপেক্ষা করছিল তা তাঁরা বুঝলেন—যেদিন পোল্যাণ্ডের ওয়ারশতে একটা ক্যাম্পে গিয়ে তাঁরা দেখেছিলেন ছোট ছোট শিশুদের পায়ের জুতোর পাহাড়। ফ্যাসিস্ট-দস্যুরা গ্যাস চেম্বারে ফেলে যত শিশুকে মেরেছিল, তারই বোধহয় একটা হিসেব রেখে গিয়েছিল তারা। গ্যাস-চেম্বারটা ছিল পাশেই। তার সামনে দাঁড়িয়ে মায়েরা কি কাঁদতে পেরেছিলেন? তাঁদের অশ্রু কি হিমশীতল তুষার হয়ে যায়নি? বুক কি তাঁদের পাথর হয়ে যায়নি? নিশ্চয় গিয়েছিল। তাই সেদিন সেই মায়েরা চোখের জমাট জল মুছে ফেলে, নিজেরা মুঠো করে সেই জুতো বুকে চেপে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন—'আর নয়, যুদ্ধ আর নয়, এমন করে আমরা সন্তানহারা, স্বামীহারা হতে পারব না, কাউকে আর হতেও দেব না।'

এই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ মায়েরাই গড়ে তুলেছিলেন বিশ্বনারী সংঘ। পৃথিবীর প্রতিটি কোণে সেই প্রতিজ্ঞাপত্র চলে গিয়েছিল। তাতে আবেদন জানানো হয়েছিল: 'পৃথিবীতে যত মা আছ, যত বোন আছ, যত স্ত্রী আছ—এসো, শক্ত হাত বাড়িয়ে স্বাক্ষর দাও এই প্রতিজ্ঞাপত্রে। এসো, আমরা একত্রিত হই, আমাদের সন্তানের জন্য সুন্দর এক নতুন পৃথিবী গড়ে তুলি।' এই মায়েদের সঙ্গে যুক্ত হলেন গ্রেটব্রিটেন, ফ্রান্স, ইটালী ও জাপানী মেয়েরাও।

এলো আমাদের দেশেও সেই প্রতিজ্ঞাপত্র। যুদ্ধক্ষত তো আমরাও। যুদ্ধ আমরা করিনি বটে কিন্তু এই বাঙলায় আমাদের ৩৫ লক্ষ লোক প্রাণ দিয়েছে যুদ্ধসৃষ্ট দুর্ভিক্ষে এবং ইজ্জৎ দিয়েছে যে কত নারী, তার হিসাব কেউ রাখেনি।

এই প্রতিজ্ঞাপত্রখানি আমরা কয়েক হাজার ছাপিয়ে নিলাম। সারাভারতের কয়েক লক্ষ মহিলার স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আমাদের সর্বান্তকরণ সমর্থনের প্রতীক হিসাবে প্রতিজ্ঞাপত্রগুলি পাঠিয়ে দিলাম পূর্ব বার্লিন অফিসে, যেখানে বিশ্বনারী সংঘের নেত্রীরা এরি প্রতীক্ষায় বসে ছিলেন।

এই স্বাক্ষর সংগ্রহের কাজে আমরা সেদিন হাজির হয়েছি নতুন নতুন এলাকায়। এর ফলে কর্মীর সংখ্যাও বেড়েছে এবং আমাদের এই আবেদনপত্র নিয়ে আমরা যেখানেই পৌছাতে পেরেছি, বিমুখ হইনি কোথাও।

এবার আমরা বিশ্বনারী সংঘের ভারতীয় শাখার প্রথম সম্মেলনের আয়োজন করলাম। দিল্লীতে ছিল আমাদের কেন্দ্রীয় অফিস। তাঁরা আমাদের সব কাজে সাহায্য করেছেন। বার্লিন থেকেও অভিনন্দনপত্র এলো। শুধু বার্লিন নয়, পূর্ব

ইয়োরোপের দেশসহ লণ্ডন, সোভিয়েট, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান প্রভৃতি দেশের প্রগতিশীল মেয়েরাও পাঠালেন অভিনন্দন। মাদাম ইউজিন কোঁতো-র অভিনন্দন-বার্তাও পৌঁছে গেল আমাদের কাছে। এই বিদুষী পক্ককেশ ফরাসী মহিলা আমৃত্যু বিশ্বনারী সংঘের সভানেত্রী ছিলেন।

সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিটির সভানেত্রী হলেন পুষ্পময়ী বসু। পুষ্পদির নাম শুনেছি পুঁটুদির কাছে, কিন্তু এর আগে তাঁর কাছে আমরা যাইনি কখনো। এবার পঙ্কজ আচার্য তাঁকে আনল। প্রস্তুতি কমিটিতে এলেন—শ্রীযুক্তা সুষমা সেন, অরুণা মুন্সী, প্রভাবতী দেবীসরস্বতী প্রমুখ আরো অনেকে। মেট্রোপলিটন্ (মেইন) স্কুলটা আমরা পেয়েছিলাম সর্বভারতীয় প্রতিনিধিদের থাকার জন্য। স্কুলবাড়ি উপচে উঠেছিল প্রতিনিধির সংখ্যা। কত হবে মনে নেই। তবে অনেককেই স্কুলবাড়িতে জায়গা দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাঁদের নানা জায়গায় রাখতে হয়েছিল।

ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে সম্মেলনটি হয় আর প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল মধ্য কলকাতার একটা স্কুলে। উপচে-পড়া উদ্বোধনী সভার সভানেত্রী ছিলেন মিসেস অনসূয়া জ্ঞানচাঁদ। আমাদের মেয়েদের বিশাল বর্ণাঢ্য মিছিলে মধ্য কলকাতা মুখর হয়ে উঠেছিল।

সম্মেলন-মঞ্চে প্রথম এবং প্রধান প্রস্তাব ছিল—যুদ্ধ নয়, শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর জন্য কামনা, শিশুর নিঃশঙ্ক ও নিরাপদ জীবনযাত্রার জন্য প্রতিজ্ঞা। সমস্ত বক্তৃতাই হয়েছিল শান্তি ও নিরাপত্তার অধিকার দাবী করে। এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫২-র শেষে। পশ্চিম বাঙলা কমিটির সভানেত্রী হলেন শ্রীযুক্তা অরুণা মুন্সী। যুগ্ম-সম্পাদিকা হয়েছিলাম অঞ্জলি মুখার্জী ও আমি। সর্বভারতীয় কমিটিতে মিসেস্ জ্ঞানচাঁদ হলেন সভানেত্রী। সহ-সভানেত্রী হলেন পুষ্পময়ী বসু, অরুণা আসফআলি ও রেণু চক্রবর্তী। হাজরা বেগম হলেন সম্পাদিকা। আমাদের সম্মেলন ভালোই হলো। অনেক নতুন মেয়েকে সঙ্গে পেয়ে আমরা তখন খুব খুশি। কিন্তু যাঁদের হাড়ভাঙা খাটুনিতে এই সাফল্য তাঁদের নাম উল্লেখ না করে পারছি না। তাঁরা হলেন আমাদের নিত্য সহকর্মী রেণু, গীতা, বাণী, বেলা, পঙ্কজ, উমা, প্রীতি, মুক্তি প্রমুখ নেতৃস্থানীয়া কর্মী। আরো কত অসংখ্য ছাত্রী ও শিক্ষিকা বোনেরা যে প্রাণ দিয়ে খেটেছিলেন তা বলে শেষ করা যায় না। এই সম্মেলনের জন্য আমরা কোন সরকারী সাহায্য পাইনি। বরং এ ব্যাপারে কমিউনিস্ট গন্ধ পেয়ে সরকার নাক কুঁচকেই রেখেছিলেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের দানে আমাদের আঁচল ভরে উঠেছিল এবং তাই দিয়ে আমরা জাঁক-

জমকের সঙ্গেই সম্মেলন সফল করেছিলাম।

এখন ভাবি, সেদিন আর আজকের দিনে কত তফাত! সেদিন এই শান্তি-সম্মেলনে সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস যোগ দিতে পারেন নি, এতে সোভিয়েটের গন্ধ পেয়েছিলেন তাঁরা। কিছু উদারপন্থী কংগ্রেসী মহিলা অবশ্য আমাদের সঙ্গে ছিলেন। কিন্তু তারপরে আমরা ভারত ও সোভিয়েট সরকারের মধ্যে মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হতে দেখেছি এবং কংগ্রেস অনুবর্তীদের দলে দলে সোভিয়েট ভ্রমণের কাহিনীও শুনেছি।

এই সম্মেলনের পর কোপেন হেগেন-এ বিশ্বনারী সংঘের প্রথম সম্মেলন হয়। ভারত থেকে তাতে যোগ দিতে যান মিস্ ম্যাস্কারিণী ও মিসেস জ্ঞানচাঁদের নেতৃত্বে একটি বড় প্রতিনিধি দল। তাতে রেণু, অরুণা আসফআলী ও পুষ্পদি ছাড়াও ছিলেন আরো অনেকে। পুষ্পদি সেই থেকে এখনও পর্যন্ত এই সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত থাকার চেষ্টা করে এসেছেন। উনি বিশ্বনারী সঘের অন্যতম ভাইস প্রেসিডেন্টও নির্বাচিত হন। পরবর্তী সময়ে ভারতীয় শাখার সভানেত্রীও হয়েছিলেন।

সম্মেলন থেকে ফিরে এসে পুষ্পদি উৎসাহ নিয়ে এই সংগঠনের কাজে আত্ম-নিয়োগ করেন। পাড়ায় পাড়ায় সমিতিগুলোর মিটিং-এ উনি যেতেন, সম্মেলনের কথা বলতেন, গঠনমূলক কর্মকেন্দ্রগুলি ঘুরে দেখতেন ও নানা পরামর্শ দিতেন। আরো অনেক কাজই হয়তো করতে পারতেন, কিন্তু বৃদ্ধা ও অসুস্থ মায়ের সমস্ত ভার ওঁর উপরে ছিল বলে ইচ্ছে থাকলেও এর বেশী পেরে উঠতেন না। তাছাড়া উনি ছিলেন বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনের প্রিন্সিপ্যাল। সুতরাং সময় পেতেন খুবই কম।

বিশ্বনারী সংঘের পশ্চিমবঙ্গ শাখায় উনি ছিলেন কমিটির তহবিল রক্ষক তথা হিসাব রক্ষক। পুষ্পদিকে নিয়ে আমাদের একটু মুশকিলে পড়তে হতো, ওর সময়জ্ঞান ও হিসাব রক্ষার নিপুণতার জন্য। বালিগঞ্জ শিক্ষাসদনের প্রিন্সি-প্যালের কাজে দীর্ঘকাল যুক্ত থাকার ফলে এই দুটি বিশেষ গুণ তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। কিন্তু আমরা পড়তাম মুশকিলে। মেয়েদের মিটিং হলে সময়টা ওঁকে অন্তত ঘন্টাখানেক হাতে রেখেই বলা হতো। কারণ, আমাদের মহিলাদের সময়জ্ঞান তো ঘড়ির কাঁটা ধরে চলে না। হাতের কাজ শেষ হবে তবে তো আসা। অনেক সময়ে দেখা যেত নির্দিষ্ট মিটিং-এ এসে পুষ্পময়ী বসু ঘুরে চলে গেছেন, কিন্তু ঠিক সময়ে মেয়েরা আসেননি

হিসাব রক্ষার ব্যাপারে উনি ছিলেন ভীষণ কড়া। একটু এদিক-ওদিক হবার

উপায় ছিলনা। আমাদের মেয়েরা ভয়ে ভয়ে থাকত। মধ্যমগ্রাম মহিলা সমিতির রেশম সুতো তৈরি কেন্দ্রের উনি ছিলেন হিসাব রক্ষক। বেচারী হিরণদি! কেন্দ্রটি চালাতেন তিনি। মধ্যবয়সী এই মহিলা কস্মিনকালেও হিসাব-কিতাবের মধ্যে ছিলেন না। পুষ্পদি খুঁত বের করলে তিনি দৌড়ে আসতেন রেণু কিংবা আমার কাছে।

এই দুটি 'মহৎ দোষ' বা গুণ ছাড়া আর সব বিষয়ে পুষ্পদিকে আমাদের সহায়ক হিসাবে পেয়েছি। একজন অ-কমিউনিস্ট মহিলা তাঁর নিজস্ব চিন্তাধারা অক্ষুণ্ণ রেখেও বরাবর আমাদের সঙ্গে থেকেছেন, স্নেহ করেছেন। এরকম ক'জনকে আর পেয়েছি আমরা? আমি সব কিছু ছেড়ে দেবার পরেও আজও পুষ্পদির প্রীতিধন্য। পুষ্পদি এখনও ফেডারেশনের সঙ্গেই যুক্ত আছেন।

হিন্দু-কোড বিল ও আমরা

এরপরে একটা বড় আন্দোলনে যোগ দিয়ে আমরা গোটা সমাজেরই এক নতুন চেহারার মুখোমুখি হলাম। হিন্দু-কোড বিলের আগে 'রাও বিল' নামে একটা বিল পাশ হয়েছিল পার্লামেন্টে। নারীর অধিকারের ব্যাপারে সেই আইন ছিল অসম্পূর্ণ। তাই পার্লামেন্টে নতুন করে এলো হিন্দু-কোড বিল। এই বিলের নিরিখে আমরা দেখার সুযোগ পেলাম নামী ও দামী লোকেরাও সমাজচেতনায় কত সংকীর্ণমনা এবং কত রক্ষণশীল।

এই বিলে মেয়েদের বিবাহের বয়স-সীমা বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে, শিশুবিবাহ ও বহুবিবাহ বন্ধ করা হয়েছে, অসবর্ণ বিবাহকে হিন্দু-বিবাহবিধিতে পূর্ণ মর্যাদা দেওয়া হয়েছে এবং কতকগুলি নির্দিষ্ট কারণ থাকলে মেয়েদের বিবাহ-বিচ্ছেদের অধিকারও স্বীকার করা হয়েছে। এছাড়া এই বিলে ছেলেদের সঙ্গে মেয়েদের সমানাধিকারের ভিত্তিতে পৈতৃক সম্পত্তিতে সমান অংশীদারিত্বও স্বীকৃত। অর্থাৎ, নারীসমাজকে পরিপূর্ণ আত্মমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা হয়েছে এই আইনে।

এই বিল পার্লামেন্টে ওঠায় আমরা সত্যই খুশি হয়েছিলাম। যে সমান অধিকারের জন্য এতকাল আমরা সচেষ্ট ছিলাম তা অতি সহজে এসে গেল আমাদের হাতের মুঠোয়।

সরকারপক্ষ থেকে আনীত বিলটিকে সমর্থনের জন্য সমস্ত রাজ্যের আইন-সভাগুলিতে পাঠানো হয়েছিল। এজন্য আমাদের খাটাখাটুনীর বিশেষ প্রয়োজন ছিল না, কারণ আমরা জানতাম এ বিল পাস হবেই। তবুও মেয়েদের এবং জনসাধারণের মধ্যে এর প্রচার হোক, এটা আমরা চেয়েছিলাম। অন্তত মেয়েরা জানুক তারা কি পেতে যাচ্ছে। কত বিবাহিত মেয়ের সারা গায়ে স্বামীর অত্যাচারের চিহ্ন দেখেছি কিন্তু কোন পথ বাতলাতে পারিনি এতদিন, এবার হয়তো সত্যি তাদের সাহায্য করতে পারব।

রেণু চক্রবর্তী আমাদের পার্লামেন্ট-সদস্যা। তার নেতৃত্বে স্থির হলো আমরা এ নিয়ে ছোট-বড় সভা করব, ঘরোয়া আলোচনা করব এবং এই বিলের সমর্থনে হাজার হাজার নারী-পুরুষের স্বাক্ষর তুলে আইনসভা মারফতে কেন্দ্রের কাছে পাঠাব।

কিন্তু আগে কি জানতাম এ বিলের বিরোধিতা করতে নামবেন বড় বড় সব নামজাদা লোকেরা ? স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, অনুরূপা দেবী প্রমুখ অনেক রথী-মহারথীরাই আমাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ালেন। হিন্দু-সমাজে 'গেল, গেল' রব উঠল। আমরাও নিশ্চেষ্ট ছিলাম না। কোন ভাল আইনজ্ঞের সাহায্য ছাড়া বিলটায় কি আছে আর নেই তা বুঝতে পারা সহজ ছিল না। তাছাড়া মনুসংহিতায় কি আছে তাও একটু দেখে নেওয়া দরকার ছিল।

আমরা প্রখ্যাত আইনজ্ঞ অতুল গুপ্ত মহাশয়ের কাছে গেলাম। তাঁর কাছ থেকেই আমরা সংগ্রহ করতে পারলাম আমাদের প্রচারের মালমসলা। নানা জায়গায় তাঁর বক্তৃতার জন্য আমরা মহিলা ও ভদ্রলোকদের নিয়ে ঘরোয়া সভারও আয়োজন করেছিলাম।

প্রচারে নেমে দেখি শুধু হিন্দু মহাসভাই আমাদের বাধা নয়। সম্পত্তির অধিকার মেয়েকে দিতে সাধারণ গৃহস্থ ঘর থেকেও আপত্তি উঠল। বিবাহ-বিচ্ছেদেও তাঁরা ভীত। সুতরাং স্বাক্ষর সংগ্রহের অভিযান চললো। প্রতি বাড়িতে বহু তর্ক-বিতর্ক করেই একটি স্বাক্ষর সংগ্রহ করতে হতো। প্রভাবতী দেবীসরস্বতী এ ব্যাপারে আমাদের অনেক সহায়তা করেছিলেন। তিনি সুবক্তা না হলেও সুলেখিকা হিসাবে ঘরে ঘরে নমস্যা ছিলেন। কলকাতার বাইরে যেখানেই তাঁকে জনসভায় নিয়ে গেছি, সেখানেই দেখেছি ভিড়ের অন্ত থাকত না। গাছে উঠে পর্যন্ত লোকে তাঁর বক্তৃতা শুনত। আমরাও টেবিল-চেয়ার পেতে স্বাক্ষরপত্র নিয়ে স্বাক্ষর সংগ্রহে লেগে যেতাম।

সমাজের চিরাচরিত অন্ধনীতি ও সংস্কারে একটু ঘা দিয়েই বোঝা গেল—আমাদের তথাকথিত প্রগতিশীলতার পরিধি কতটুকু। মেয়েরাই যে মেয়েদের পথরোধ করে দাঁড়িয়ে থাকে, তাও দেখা গেল। আর তা কেনই বা দেখা যাবে না ? এই তো সেই সমাজ, যেখানে বিদ্যাসাগর ও রামমোহনকে সমাজ-সংস্কার করতে গিয়ে লাঞ্ছিত হতে হয়েছিল। আমরা তবু একালের লোক, সেকালের কেউ নই। পশ্চিমী হাওয়া আমদের নিঃশ্বাসে-প্রশ্বাসে। পশ্চিমের খোলা জানালা দিয়ে প্রগতিশীলতার নামে অনেক মন্দ জিনিস যেমন প্রবেশ করেছে, তেমনি অনেক ভাল জিনিসও প্রবেশ করেছে আমাদের অন্দরমহলে। তথাপি এই সমাজের অচলায়তনকে আইনের ঘা মেরে ভাঙতে গেলেই সমাজদেহ কঁকিয়ে ওঠে। মনে হয় বুঝি একটা অনর্থই ঘটে গেল। অথচ বর্তমান যুগে একটু চোখ খুলে তাকালেই দেখা যায় আইনের জন্য মানুষ অপেক্ষা করে না, মানুষের প্রয়োজনের পেছন পেছন আইনকেই ছুটতে হয়। প্রয়োজন ঘটলে সমাজকে

বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতে লোকে পেছ্পা হয় না। তাদের অনিয়মকে 'নিয়ম' বলে স্বীকৃতি দিতে একদিন না একদিন আইনকেই এগিয়ে আসতে হয়। আর সমাজকেও তা মেনে নিতে হয় শেষ পর্যন্ত।

তবুও এই ব্যাপারটা নিয়ে তখন বিশিষ্ট লোকেদের 'বিশিষ্টতা' একটা ঘটনায় আমাদের চোখে বড় লজ্জাকর ঠেকেছিল।

আমরা সেই সময় প্রচারমূলক কর্মসূচীর সমাপ্তির উদ্দেশ্যে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট হলে একটা জনসভা ডেকেছিলাম। প্রধান বক্তা শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু আর সভানেত্রী ছিলেন প্রভাবতী দেবীসরস্বতী।

মিটিং-এর ঘণ্টাখানেক আগে আমরা হলের দুয়ারে গিয়ে তাজ্জব। হল তখন পরিপূর্ণ। রাস্তা বা গেট দিয়ে প্রধান বক্তা ও সভানেত্রীকে নিয়ে আমরা ঢুকতেই পারছি না ভিড়ের ঠেলায়। ভাবলাম, হয়তো আমাদের মিটিং শুনতেই এত লোকের আগমন। কিন্তু এত অবাঙ্গালী কেন? তাদের মধ্যে তো আমরা প্রচারে যাইনি। তাদের চেহারা আর হাবভাব দেখেও কেমন সন্দেহ হচ্ছিল। অতিকষ্টে ভেতরে ঢুকে দেখি মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন স্বয়ং শ্যামাপ্রসাদ ও রমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। কিছু মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও ছিলেন এবং অনুরূপা দেবীও উপস্থিত। কোনমতে দুখানা চেয়ার যোগাড় করে মিসেস নাইডু ও প্রভাবতী দেবীকে বসালাম। চারিদিকে তাকিয়ে দেখি সভায় বাঙালী কেউ নেই, উপরের গ্যালারী জুড়ে বসে আছে একগলা ঘোমটা দেওয়া সব মাড়োয়ারী মেয়েরা।

আমার বুক টিপ্ টিপ্ করতে লাগল। কি করব এখন? শ্যামাপ্রসাদকে বললাম, এটা তো আমাদের ডাকা সভা, মিসেস নাইডু এসেছেন বক্তৃতা করতে। উনি বললেন, 'বেশ তো, করুন না মিটিং।' মিসেস নাইডুকে যেন তিনি চেনেন না এমন ভাব দেখালেন। কোনমতে মিসেস নাইডুকে দাঁড় করিয়ে দিয়ে আমরা তাঁর পেছনে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিসেস নাইডুর কম্বুকণ্ঠ ডুবে গেল সভাস্থ লোকের হল্লায়। খানিকক্ষণ বলার বৃথা চেষ্টা করে তিনি বসে পড়লেন। এই মিটিং আমরা করতে পারব না বুঝে বিশেষ অতিথিদের নিয়ে পেছনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

নির্বাচনের সময় পার্লামেন্টের সীটে দাঁড়িয়েছিলেন শ্যামাপ্রসাদ। কালীঘাট ছিল তাঁর কেন্দ্রগুলির একটি। পার্লামেন্টে আমাদের প্রার্থী ছিলেন শ্রী সাধন গুপ্ত। আমার প্রত্যেকটি জনসভায় আমি হিন্দু মহাসভা-প্রার্থীর বিরুদ্ধে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করতাম। ফলে, একদিন রাস্তায় আমাকে

কিছু প্রৌঢ় ভদ্রলোক ধরে বললেন—'দেখুন, আপনাকে তো আমরা ভোট দেবই ঠিক করেছিলাম কিন্তু আপনি শ্যামাপ্রসাদের বিরুদ্ধে যেভাবে বলছেন তাতে আমরা দ্বিধাবোধ করছি।' আমি স্পষ্টই জবাব দিয়েছিলাম, 'আপনাদের ইচ্ছা না হলে আমাকে ভোট দেবেন না, তাতে আমার কিছু বলার নেই। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা ও সংকীর্ণতার বিরুদ্ধে নীতিগতভাবে আমাকে বলতেই হবে।' নির্বাচনে আমার কেন্দ্রে হিন্দুমহাসভার প্রার্থী মাত্র হাজার দুই ভোট পেয়ে হেরে গিয়েছিলেন। কারণ, সাধারণ মানুষ ছিল সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে। কিন্তু শ্যামাপ্রসাদ জিতেছিলেন তাঁর অন্য বিশিষ্টতায়, হিন্দু মহাসভার জোরে নয়। পশ্চিমবঙ্গে হিন্দু মহাসভার কোন জমিন ছিল না।

কিন্তু শ্যামাপ্রসাদের স্বরূপ আমরা দেখেছিলাম পূর্ব-বর্ণিত সভায়। খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম, গাড়ি গাড়ি মেয়ে আনা হয়েছিল পাথুরেঘাটা থেকে এবং তাদের বলা হয়েছিল সমস্ত হিন্দুকে মুসলমান করে দেবার আইন বন্ধ করার জন্য তোমাদের যেতে হবে। বেচারীরা মুসলমান হবার ভয়ে এসে হল্লা করে গেল। দু'টো করে টাকাও নাকি প্রত্যেকে পেয়েছিল।

যাহোক, এতে আমাদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় নি। অনেক স্বাক্ষর সংগৃহীত হয়েছিল। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায়ের হাতে আমি সেগুলো তুলে দিয়েছিলাম পশ্চিম বাঙলার পক্ষ থেকে পার্লামেণ্টে পাঠাতে। সব রাজ্য থেকেই এরকম করা হয়েছিল। এইভাবে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে পার্লামেণ্টে হিন্দু-কোড বিল পাস হলো।

পার্লামেণ্টে এই বিলের বিরোধী ছিলেন অনেকেই। এমন কি কংগ্রেসের মধ্যেও তাঁদের দেখা গেল। রক্ষণশীল ও গোঁড়াপন্থীরা কেবলমাত্র হিন্দু মহাসভাতেই ছিলেন না। নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ দেবার জন্য এমন কি প্রধানমন্ত্রী জওহরলালকেও পার্টির হুইপ প্রয়োগ করতে হয়েছিল দলের সদস্যদের সমর্থন আদায় করতে।

আমাদের অনেক দিনের অনেক সংগ্রামের ফলেই অন্তত এই একটি বিষয়ে আইনগত স্বীকৃতি পাওয়া গেল। কিন্তু শুধু আইনের স্বীকৃতিই কি মেয়েদের সমান মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করার পক্ষে যথেষ্ট? সমিতির সেই প্রথম দিনগুলি থেকে আজকের দিনেও মেয়েদের অভিজ্ঞতা বোধহয় এর বিপরীত সাক্ষ্য দেবে।

পণপ্রথার বিরুদ্ধে

হিন্দুকোড আইন পাস হলো কিন্তু মেয়েদের পারিবারিক জীবনে শান্তি এলো কোথায়? আরও একটি কলঙ্কজনক সমাজবিধির দাপটে বহু মেয়েকে আজও অশান্তির আগুনে জ্বলতে জ্বলতে একদিন সত্যিই আগুনের বেড়াজালে জীবনটাকে শেষ করে মুক্তি পেতে হয়। এই বিধির নাম—পণপ্রথা। এদেশে গরীব-বড়লোক নির্বিশেষে বহু মেয়েই হয় এই কলঙ্কিত প্রথার শিকার। লোকসভায় এর বিরুদ্ধে আইন পাস হয়েছে বহু পূর্বেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কংগ্রেসকে লোকসভায় নিজ দলের প্রতি হুইপ্ প্রয়োগ করেই এই আইনটি পাস করাতে হয়েছিল। অর্থাৎ, কংগ্রেসেও ছিল মতভেদ। বিরোধীদের মধ্যে যারা রক্ষণশীল তাদের তো আপত্তি ছিলই।

এই আইন নিয়ে আলোচনা চলার সময়ে আমরা এর স্বপক্ষে বহু প্রচারসভা, স্বাক্ষর সংগ্রহ এবং মেয়েদের নিয়ে ঘরোয়া সভা করেছিলাম। তাতে দেখা গিয়েছিল—শহরে ও গ্রামে গরীব গৃহিণীরা, এমনকি কৃষক-পরিবারের অনেক মায়েরাও এর বিপক্ষে কথা বলতেন। কারণটা ছিল মূলত ভয়। পণ ছাড়া যখন মেয়ের বিয়ে দেওয়া যাবে না তখন আইনের পক্ষে স্বাক্ষর দিয়ে কি হবে? আলোচনা প্রসঙ্গেই জানা যেত—কৃষকের ঘরে এবং নিম্ন বা উচ্চ মধ্যবিত্তের ঘরে কে কত জমি হারিয়েছেন বা সর্বস্বান্ত হয়েছেন মেয়ের বিয়ে দিতে গিয়ে। তবু তারা সাহস করে বলতে পারতেন না—'পণ আর দেব না'। কারণ, যে করেই হোক মেয়েকে তো পার করতেই হবে! মেয়েটির অবস্থা ছিল আরও করুণ। লেখাপড়া শিখলে বা গৃহকর্মে নিপুণা হলেও তার মূল্যায়ন হতো না। একমাত্র পিতৃদত্ত সোনাদানা আর টাকাকড়িতেই হতো তার মূল্যবিচার। এই অপমান মাথায় নিয়ে এবং সর্বস্বান্ত পিতার কথা মনে করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে মেয়েটিকে বসতে হতো বিয়ের পিঁড়িতে। নইলে তার সংসার করা হবে না। 'স্নেহলতা' আর ক'জনই বা হতে পারে? আজকাল অবশ্য দেখা যাচ্ছে—বিয়ের পরে 'স্নেহলতা'দের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান। বিয়ের সময় যৌতুকের সব দাবী হয়তো পিতা পূরণ করতে পারেন না, বাকী যা থাকে তা পরে দেওয়া হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েই অনেক পিতা কিছুটা সময় নেবার চেষ্টা করেন। কিন্তু প্রতিশ্রুত সময়ের মধ্যে তা না দিতে পারলে অনেক ক্ষেত্রে নববধূটিকে হতে

হয় স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ীর অত্যাচারের শিকার। এ ব্যাপারটা শুধু গরীব ঘরেই নয়, ধনী মারোয়াড়ীদের ঘরে পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। শুধু নির্যাতন নয়, বধূটিকে হত্যা করে অথবা আত্মহত্যায় বাধ্য করে পুনর্বিবাহের স্বপ্ন দেখে এক শ্রেণীর সমাজবিরোধী দুর্বৃত্ত। এই ধরনের ঘটনা আজকাল হামেশাই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হচ্ছে। এমন কি মারোয়াড়ীদের পণপ্রথা-বিরোধী মিছিলে নামতেও দেখা গেছে।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও আইন প্রয়োগের ব্যাপারে আজও সরকারের কোন ভূমিকা নেই বললেই চলে। যদি তা থাকত তবে এই কলকাতার বুকে উচ্চবিত্ত ধনশালী ব্যক্তিদের আয়োজিত বিলাস ও ব্যয়বহুল বিবাহগুলি অনুষ্ঠিত হতে পারত কি ? বিদ্যুতের চরম ঘাটতির সময়েও ঐ সব বাড়িগুলিতে এত আলোর ঝলকানি দেখা যায় কেমন করে ? সেখানে কি দেওয়া-নেওয়া হয় পুলিস তার কোন খবরই বা রাখে না কেন ? দু'চারটে জাঁদরেলকে পাকড়াও করে আইনমাফিক শাস্তি দেওয়া হয় না কেন ?

সত্যিই তো, এদের যদি সাতখুন মাফ হয়ে যায় তবে গরীবরা আশ্রয় নেবে কার কাছে ? পণপ্রথার দাপট তো গ্রামে আমি নিজেই দেখেছি। শহরে বসে দেখি আরও করুণ অবস্থা। গরীব পিতামাতাকে দেখি, পাঁচ বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করে কোন রকমে দিন চালায়। অথচ তাদেরই মেয়ের বিয়েতে জামাইকে দিতে হবে ট্রানজিস্টার, ঘড়ি, সোনার আংটি, বোতাম, সাইকেল ইত্যাদি। পাত্রটি হয়তো ক্ষেতমজুর অথবা ছোট চাষী। পিতামাতা দফায় দফায় এসব দাবী মেটাতে না পারলে মেয়েটি ফেরত আসে। বহুবিবাহ বন্ধ করার আইনটা কেউ তখন প্রয়োগ করতে যায় না। অতএব পাত্রটি আবার বসে বিয়ের পিঁড়িতে।

এই অপমানকর নিষ্ঠুর প্রথা দূর করার একটি মাত্র রাস্তা আছে। সেটি মেয়েদের নিজেদের হাতেই আছে। তারা সংঘবদ্ধভাবে এর বিরুদ্ধে না দাঁড়ালে এই বর্বর প্রথাটি আরও বাড়বে ছাড়া কমবে না। যেসব বিবেকহীন ছেলে শ্বশুরের পয়সায় বিলেত যায় বা যৌতুকের টাকাকড়ি ও বিলাস-ব্যসনের দ্রব্যগুলি ঘরে তোলে, সেই মেরুদণ্ডহীন নীচমনা ছেলেগুলিকে শাসন করার জন্য মেয়েরা নিজেরা যদি না দাঁড়ায় তবে সমাজ বা সরকার কেউ তাদের সম্মান ও জীবনরক্ষা করতে পারবে না। মহিলা সমিতিগুলির কাছে এই সামাজিক ব্যাধি দমন করার কাজটি তাদের কর্মসূচীর অপরিহার্য অঙ্গ হওয়াই উচিত।

প্রসঙ্গ : গণআন্দোলন

এবার রাজনৈতিক দিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য কিছু গণআন্দোলনের কথা বলি। স্বাধীনতা লাভের পর কলকাতায় একটা বিরাট গণআন্দোলন হয়েছিল। সেটা 'এক পয়সার আন্দোলন' নামেই পরিচিত। তখন কলকাতার ট্রাম কোম্পানী ছিল ইংরেজদের হাতে। প্রথম নির্বাচনের পর '৫৩ সনে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। ঐ সময়ে ট্রাম কোম্পানী যাত্রী-ভাড়া এক পয়সা বৃদ্ধি করে। সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত বিরোধীদল এই ঘোষণার বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে। কিন্তু কোম্পানী তার মত বদলায় না।

সাধারণ লোকের প্রতিবাদ শুরু হলো ভাড়াবৃদ্ধির দিন থেকেই। কণ্ডাক্টার বর্ধিত ভাড়া চাইলে প্রত্যেক যাত্রী পুরনো হারের ভাড়াটি তার হাতে বাড়িয়ে দিয়ে বসে থাকতে লাগল। এ ভাড়া কণ্ডাক্টার নিতে পারে না। হুকুম আছে নতুন হারের ভাড়াই নিতে হবে। সুতরাং যাত্রী উঠছে, ভাড়াও দিতে চাইছে, কিন্তু কণ্ডাক্টার নিচ্ছে না, যাত্রীরা গন্তব্যস্থলে নেমে যাচ্ছে। প্রথম তিন দিন ধরে এটাই ছিল আন্দোলনের রূপ। লোকেরা রীতিমতো মজা পেয়ে গেল। বাচ্চা ছেলেরা পর্যন্ত বিনা পয়সায় মনের আনন্দে সারাদিন ট্রামে চড়ে বেড়াতে লাগল। সকলেরই ধারণা—এটা ইংরেজ কোম্পানীর ব্যাপার সুতরাং লড়াইটা কোম্পানীর বিরুদ্ধে, সরকারের বিরুদ্ধে নয়। কিন্তু তিন দিন পরে সরকারী পুলিসবাহিনী রাস্তায় নামল, জোর করে ভাড়া আদায় করতে। প্রত্যেক ট্রামে পুলিস উঠে নতুন হারে ভাড়া দিতে বলছে, না দিলে চড়চাপড় দিয়ে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিচ্ছে। ফলে, আগুনে যেন ঘৃতাহুতি পড়ল। গাড়ি বোঝাই করে লোক উঠছে, নামছে, আবার উঠছে। পুলিসের সাধ্য নেই এদের কাছ থেকে ভাড়া আদায় করে। লোকেরা পুলিসকে বলত—'মশাই, আপনারা এতে নাক গলাচ্ছেন কেন ? কোম্পানীর বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই, ইংরেজ কোম্পানীকে বর্ধিত ভাড়া দেব না, সরকারের বিরুদ্ধে তো আমরা কিছু করছি না।' কিন্তু দেখা গেল, সরকারের হুকুমে পুলিস মারমুখী হয়ে উঠেছে। তারা লাঠি মারছে, গ্রেপ্তার করছে কিন্তু লোকের গাড়িচড়া ঠেকানো যাচ্ছে না। এক-এক জায়গায় খণ্ডযুদ্ধ বেধে যেতে লাগল। পুলিস পেটায়, জনতাও ছেড়ে কথা বলে না। ট্রামে ঢিল পড়তে লাগল। অবশেষে

কলকাতার রাস্তায় রাস্তায় ট্রামে আগুন জ্বললো ; পুলিসের গুলি-লাঠি-গ্রেপ্তার যত বেশী চলে, ততই আগুন জ্বলে। রাস্তায় রাস্তায় ব্যারিকেড রচনা করে ট্রাম চলাচল বন্ধ করতে অগ্রসর হলো মানুষ। তার কাটা থেকে আরম্ভ করে সব কিছু বাধা সৃষ্টি করা হতে লাগল। লোকেরা ড্রাইভার বা কণ্ডাক্‌টারদের কিছু বলে না। তারাও বাধা পেলেই গাড়ি থামিয়ে বসে থাকে। কিন্তু পুলিস পাইকারী হারে লাঠি আর গ্রেপ্তার চালালো। লোকের মুখে মুখে ধ্বনি উঠল, 'ইংরেজ কোম্পানী মুর্দাবাদ,' 'কংগ্রেস সরকার ইংরেজের দালাল' —ইত্যাদি। এরপর চললো ট্রাম বয়কট করার আন্দোলন। রাস্তায় রাস্তায় আওয়াজ উঠল, 'হেঁটে যাব, বাসে যাব, তবু ট্রামে চড়ব না।' আগের মতো লোক আর ট্রামে ওঠে না। ফলে কোম্পানীর হলো মুশকিল ।

আন্দোলনের নেতারাও গ্রেপ্তার হতে লাগলেন। পার্টি'র কলকাতা জিলা কমিটিই বিশেষ ভাবে এই আন্দোলন চালাচ্ছিল। আন্দোলনের মেজাজ দেখে পুলিসও কিছুটা ঘাবড়ে গেল। নেতাদের চোরাগোপ্তা গ্রেপ্তার করতে লাগল। জলি ক'ল ও আমি তখন শ্যামানন্দ রোডে থাকি। আন্দোলন তখন দিন সাতেক ধরে চলছে। এমন সময় একদিন সকাল বেলা জলি ক'লকে বাজার থেকে ফেরার পথে হঠাৎ সাদা পোশাকের দু'তিনজন লোক জাপটে ধরে গাড়িতে তুলে নিয়ে গেল। গ্রেপ্তার করা হচ্ছে একথা রাস্তার লোক বুঝবার আগেই ওরা উধাও। ঘণ্টা দুই পরে বাজারের থলেটা বাড়িতে একটি সাধারণ লোক দিয়ে গেল। বললো, 'উনি আমাকে থলেটা পৌঁছে দিতে বলেছেন।' তারপরেই লোকটা হাওয়া হয়ে গেল। দেরি দেখে আমারও এরকমই সন্দেহ হচ্ছিল। বাজারের থলিটা এইভাবে ফেরত আসায় বুঝেই গেলাম ব্যাপারটা। ভবানীপুর থানায় যেতে ওরা বললো, 'এখানে নেই, আই· বি· অফিসে নিয়ে গেছে'। অনেক নেতাকেই ওরা এভাবে আটক করতে লাগল। কিন্তু আন্দোলন তাতে বাড়ল বৈ কমল না।

ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে কলতাকায় যে বিরাট অভ্যুত্থান সেদিন দেখা গেল, ১৯৪২-৪৩-এর 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনও সেই আকারে কলকাতায় দেখা যায়নি। কোম্পানী বুঝল, আর মারামারির পথে গেলে একটা ট্রামও বাঁচবে না। ডাক্তার রায় তখন প্রস্তাব দিলেন, ব্যাপারটা ট্রাইবুন্যালে পাঠানো হবে। যখন বোঝা গেল যে 'ভাড়া বৃদ্ধি' আর হবে না তখন কলকাতা শান্ত হলো।

ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে যে শিক্ষানীতি বা পদ্ধতি চালু ছিল তা দেশের লোককে শিক্ষিত করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে রচিত হয়নি। এতবড় সাম্রাজ্য চালাতে গেলে এ দেশের জনসাধারণের একটা অংশকে যতটুকু শিক্ষিত করে নেবার প্রয়োজন, সেইটুকুই শুধু চালু করেছিল ব্রিটিশ সরকার। ইংরেজী শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, কারিগরী শিক্ষা, আইনের শিক্ষা, ডাক্তারী শিক্ষা প্রভৃতি নানামুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করা হয় তখনকার অর্থনীতি ও শিল্পবিস্তারের সঙ্গে তাল রেখেই। দেশের সমগ্র অধিবাসীকে শিক্ষিত করে তোলা, শিক্ষা ও কর্মের সমন্বয় সাধন করা, শিক্ষাকে কর্মভিত্তিক করে গড়ে তোলা ইত্যাদি চিন্তা সেই যুগের শিক্ষা-পরিকল্পনায় ছিল না বললেই চলে।

স্বাধীনতা লাভের পরবর্তী সময় থেকে এই সব নতুন চিন্তার সূত্রপাত হয়। সীমাবদ্ধ কর্মক্ষেত্রে শিক্ষিত এবং উচ্চশিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকারের সংখ্যা স্ফীত হতে শুরু করে ইংরেজ আমল থেকে। সমাজের উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী কর্তৃক সেই সময়ের সীমিত শিক্ষাব্যবস্থার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করার ফলে যে কেরানীকুলের সৃষ্টি হতে থাকে, আজও তা অবাধগতিতে চালু আছে। এর ফলেই শিক্ষিত বেকারের বিশাল সংখ্যাটি বর্তমানে দেশের সামনে একটি বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে শিক্ষাক্ষেত্র প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বেকারের সংখ্যা আরও বাড়ছে এবং তা সমগ্র দেশজুড়ে সৃষ্টি করছে প্রচণ্ড এক সংকট।

এদেশের শিক্ষাবিদগণ এই সংকটের সূত্রপাত থেকেই সংকট-সমাধানের নানা উপায় চিন্তা করেছেন এবং এই শিক্ষাব্যবস্থার আমূল সংস্কার সাধনের প্রয়োজনও অনুভব করেছেন। এ নিয়ে নানা পরিকল্পনা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষাও চালানো হচ্ছে। কিন্তু সুষ্ঠু সমাধান আজও বেরিয়ে আসেনি, যদিও দেশের স্বাধীন সরকার শিক্ষার দায়দায়িত্ব বহুল পরিমাণে গ্রহণ করেছেন।

দেশের শিক্ষকসমাজও এই সমস্যা নিয়ে চিন্তিত। কারণ, প্রত্যক্ষ দায়িত্বে তো তাঁরাই আছেন। প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে তাঁরাই এই সমস্যাগুলোর সঙ্গে সবচেয়ে বেশী পরিচিত। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে স্থান সমস্যা, ভর্তি সমস্যা, সিলেবাস সমস্যা, পরীক্ষা সমস্যা, ছাত্রদের বেতন সমস্যা, বিদ্যালয়ের খরচ সংকুলান সমস্যা এবং সর্বোপরি শিক্ষকের বেতন সমস্যার সঙ্গে তাঁরা জড়িত। উপর থেকে কেউ কিছু করুন আর নাই করুন, দৈনন্দিন পরিচালনার ক্ষেত্রে শিক্ষকদের এই সমস্যাগুলোকে সাধ্যানুযায়ী সমাধান করতেই হয়। বহুকাল

ধরে শুধু ছাত্রবেতনের উপর নির্ভর করেই এদেশের স্কুলগুলি চলে এসেছে। অসংখ্য স্কুল গড়ে উঠেছে সমাজ-কল্যাণকামীদের দানের উপর নির্ভর করে। শুধু স্কুল নয়, উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য। কিন্তু চিরকাল তো এভাবে চলে না। গরীবের সংসারে গৃহিণীদের যেমন নিয়ম করে কম খেতে হয়, প্রাইভেট স্কুলগুলিতেও দানের উৎস শুকিয়ে গেলে এবং ছাত্র-বেতনে ঘাটতি পড়লে, অন্যান্য সমস্ত আবশ্যিক খরচ মিটিয়ে তবেই শিক্ষকদের জীবনধারণের জন্য ভাগ করে নিতে হয় অবশিষ্ট অর্থ।

বিদ্যাসাগর মহাশয় ও তৎকালীন পণ্ডিতসমাজ দেশের শিক্ষককুলের জন্য এইটুকুই বরাদ্দ করে গিয়েছিলেন। শিক্ষকদের এই আদর্শবাদী জীবনযাত্রা সরকার ও সমাজ বহুকাল ধরে 'চিরন্তন' বলে মেনে নিয়েছিল। শিক্ষকদেরও যে সংসার আছে, সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ও ভরণপোষণের দায় আছে, তাদেরও যে ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্যের বাজারে অন্যদের মতন একই মূল্যে জিনিসপত্র কিনতে হয়, একই হারে বাড়িভাড়া ও যাতায়াত ভাড়া গুণতে হয়, এসব যেন সবাই ভুলেই বসেছিল। যতদিন শিক্ষকেরা মুখ খোলেননি ততদিন অন্য কেউ তাদের কথা ভাববারও অবকাশ পাননি।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক প্রতিষ্ঠান, স্বাধীনতার পরবর্তীকালে সরকারের সঙ্গে স্কুল পরিচালনা ও খরচ সংকুলানের সমস্যা নিয়ে বহু লেখালেখি ও আলাপ-আলোচনা করেছেন। শিক্ষার সংস্কার-সাধনের জন্য তারা বহু প্রস্তাব দিয়েছেন। শিক্ষার ব্যয়ভার সরকারেরই বহন করা উচিত, এ-কথা ক্রমাগত তুলেছেন। শিক্ষকদের বেতন প্রদানের উপযুক্ত ব্যবস্থার দাবীও করেছেন। কিন্তু সরকার কানে তোলেননি এসব কথা। বেসরকারী স্কুলে সরকারী সাহায্য দেওয়ার বিশেষ রেওয়াজ ছিল না। কিছু কিছু স্কুল বহু শর্ত-কণ্টকিত ব্যবস্থায় কিছু সাহায্য পেত কিন্তু সেটা পাওয়ার অধিকার যে সমস্ত স্কুলেরই আছে, এই কথাটা মেনে নিতে সরকারী দীর্ঘসূত্রিতায় শিক্ষকদের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে যায়।

বিধানসভায় শিক্ষাবিদ্-সদস্যরা এসব আলোচনা তোলেন। শিক্ষা-সংস্কারের ও শিক্ষার ব্যয়ভার বহনের দায়িত্ব সরকারের নেওয়া দরকার, এ দাবী বিশেষ ভাবে বিরোধীদলের পক্ষ থেকেই তোলা হতো। কিন্তু সরকার এ ব্যাপারে কোনদিন বিশেষ কর্ণপাত করতেন না।

এমন অবস্থায় ১৯৫৪ সনে শিক্ষকেরা এই সমস্যা সমাধানের জন্য আন্দোলনের পথে পা বাড়াতে বাধ্য হন। অনেক সভামিছিল অনুষ্ঠিত হয়। শিক্ষা-সংস্কার, শিক্ষার ব্যয় বহনে সরকারী সাহায্য, শিক্ষক-বেতন সমস্যার সমাধান প্রভৃতি

দাবী নিয়ে আইনসভার ভিতরে ও বাইরে আন্দোলন চলতে লাগল। এতেও সরকার কোন উচ্চবাচ্য না করায় শিক্ষক-শিক্ষিকারা অতঃপর রাজপথে অনশন সত্যাগ্রহ শুরু করেন। রাজভবনের সামনে তাঁবুর নীচে চট বিছিয়ে একদল অনশনে বসলেন এবং অন্যদল তাঁদের পালা আসবার প্রতীক্ষায় রইলেন। তাঁবুর চারদিকে লোকে লোকারণ্য। এমন দৃশ্য কেউ কখনও দেখেননি। কয়েক হাজার শিক্ষক-শিক্ষিকা বসে আছেন। রাজনৈতিক দলের বিভিন্ন নেতা একের পর এক তাঁদের দাবীর প্রতি সমর্থন জানিয়ে বক্তৃতা করে যাচ্ছেন। আমাদের মহিলা সমিতির কর্মীদের একটা বড় অংশ শিক্ষিকা। তাঁরাও অনশনে আছেন। অতএব আমরা মহিলা সমিতির প্রায় সকলেই তাদের পাশে আছি। কত যে মেয়েদের স্কুল আর কত যে তার শিক্ষিকা, তা যেন টের পেলাম এই প্রথম।

দেশভাগের পর সেই যে দেখতাম—মেয়েরা অবাধে ট্রেনে-বাসে বোঝাই হয়ে স্কুল-কলেজে যাচ্ছে, নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে শুধু নিজের নয়—পরিবারের ভার কাঁধে নিচ্ছে, আজ এই ভিড়ের মধ্যে তাদেরও যেন খুঁজে পাচ্ছি।

আগে হলে হয়তো শিক্ষিকাদের জন্য একটা আলাদা শিবির খুলতে হতো। কিন্তু সে যুগ আর নেই। এখন রাজপথে নারী-পুরুষ সমান অধিকারেই বসে আছেন। এ অধিকার কোন আইন করে পাওয়া নয়, জীবনসংগ্রামের মধ্য দিয়ে অর্জিত হয়েছে এই অধিকার। শিক্ষায় পূর্ববঙ্গ থেকে পশ্চিমবঙ্গ অনেক পিছিয়ে ছিল। আজ আর তা নেই। পূর্ববঙ্গ থেকে আগত মানুষ পশ্চিমবঙ্গকে যেন শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতমানে তুলে দিয়েছে। যে সব স্কুলের পক্ষ থেকে শিক্ষিকারা এসেছেন তার অধিকাংশই সরকারের গড়া নয়। নিজেদের প্রচেষ্টায় ও পরিশ্রমে এঁরা এইসব স্কুল গড়ে তুলেছেন। এখন দাবী তুলেছেন—এবার সরকারও উপযুক্তভাবে এর দায়িত্ব গ্রহণ করুন। এ তো অন্যায় দাবী নয়।

জনসাধারণের অকুণ্ঠ সমর্থন ছিল শিক্ষকদের প্রতি। সকাল থেকে রাত ১২টা পর্যন্ত জনসমাগমের চেহারায় তা প্রকাশ পেত। কিন্তু সরকারের মনো-ভাব বোঝা যাচ্ছিল না। এরপর ছাত্ররাও শিক্ষকদের সমর্থনে রাস্তায় নামল। ওদিকে সরকারও আপোসের পথ ছেড়ে দমননীতি শুরু করলেন। শিক্ষকদের মাথায় পড়ল পুলিসের লাঠি। এই সময় পুলিস-মন্ত্রী ছিলেন কালিপদ মুখার্জী।

আইনসভায় একদিন খবর এলো—মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ রায়ের বাড়ির সামনে স্কুলের ছেলেদের পেটানো হয়েছে। খবর শুনে আমাদেরও রক্ত মাথায় উঠল। একের পর এক বিরোধী পক্ষের সদস্যেরা উঠে পুলিস-মন্ত্রীকে ধিক্কার দিলেন। সেদিন আমিও একটা জ্বালাময়ী ভাষণ দিয়ে ফেললাম। কিন্তু আশ্চর্য, পুলিস-মন্ত্রী

অযথাই জোরে জোরে হাসতে লাগলেন। আমাদের সহ্যের সীমা অতিক্রম করে গেল। জ্যোতিবাবু জুতো দেখালেন, আমি জুতো ছুঁড়লাম। তারপর বইখাতা যার হাতে যা ছিল ঘরময় ছোড়াছুঁড়ি হতে লাগল। তখন স্থির বুদ্ধির কিছু সদস্য মাঝখানে পড়ে এই অস্বাভাবিক পরিস্থিতি সামাল দিলেন। আমরা রাগে গরগর করতে করতে বিধানসভা ছেড়ে বেরিয়ে এলাম। অধ্যক্ষ মহাশয় সভা স্থগিত রাখলেন।

পরদিন সব কাগজে বিস্তৃত বিবরণ বেরুলো। পরে অবশ্য এই নিয়ে আমার একটু লজ্জা করতে লাগল। আইনসভায় পচা টোমাটো বা ডিম ছোঁড়াছুঁড়ির ঘটনা পশ্চিম দেশগুলিতে হামেশাই হয়। কিন্তু তাই বলে জুতো ছোঁড়া? এটা যেন একটু শালীনতার বাইরের ব্যাপার বলে ঠেকছিল।

এর দু'চারদিন পরেই আমি ও পঙ্কজ আচার্য গ্রেপ্তার হয়ে গেলাম। তাছাড়া সরকারও মধ্যরাত্রিতে জনতাবিহীন শিবির থেকে শিক্ষকদের তুলে নিয়ে জেলে পাঠানো নিরাপদ মনে করলেন। রোজ সকালে দেখতাম দলে দলে শিক্ষিকারা এসে ফিমেল ওয়ার্ড ভর্তি করে দিচ্ছেন। আমাদের মহিলা সমিতির নেত্রীদেরও ধরে জেলে পোরা হলো। বেলা লাহিড়ী এবং সমিতির আরো অনেক কর্মী এলেন জেলে। আমরা জেলে তখন শতাধিক মেয়ে। এবার আর এখানে কোন 'মিলিট্যান্ট' আন্দোলনের বালাই ছিল না। দিন দশেক পরে দফায় দফায় শিক্ষিকারা বেরিয়ে গেলেন। জেলের মধ্যে এসে সরকারের প্রতিনিধিরা শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন ও দুর্মূল্য ভাতার দাবীটি মেনে নেন।

এরপর জেলের মধ্যে পড়ে রইলাম শুধু আমি আর পঙ্কজ। পঙ্কজ তবু শিক্ষিকা, আন্দোলনকারী নেত্রীদের একজন। কিন্তু আমি তো গোটা কতক বক্তৃতা ছাড়া আর কিছুই করিনি। দিন যায়, মাস যায়—গেটে ঠক ঠক আওয়াজ পেলেই ভাবি এই বুঝি আমাদের মুক্তির বার্তা এলো। স্নেহাংশু আচার্য কয়েকবার আমার সঙ্গে দেখা করে গেলেন। কিন্তু কেউ কিছু বুঝেই উঠতে পারছেন না ব্যাপারটা কি।

অবশেষে জানা গেল ব্যাপারটা। আমি তৎকালীন কারামন্ত্রী জীবনরতন ধরকে দেখা করতে অনুরোধ করলাম। উনি এলেন। ভারি ভদ্র এবং অমায়িক মানুষ ছিলেন উনি, কারো বিদ্বেষ-বিরক্তির পাত্র ছিলেন না। আমি জিজ্ঞাসা করলাম—'এটা কি হচ্ছে? আমাদের দু'জনকে আটকে রেখেছেন কেন? যাঁরা আপনাদের লক্ষ্য ছিল তাঁরা তো দিব্যি গট্ গট্ করে চলে গেল।' উনি বললেন, 'বলতে আমার বারণ আছে, তবু আপনাকে বলছি। এর কারণ আপনি

নিজেই। ডাঃ রায় আপনার উপর ভারি চটে আছেন। তিনি বলেছেন—'মেয়েটা থাকুক আরও কিছুদিন জেলে। এমন শান্ত ও ভদ্র মেয়ে শেষে কিনা এই কাজ করল। ওর একটু শাস্তি হওয়াই দরকার।' আমি আর কিছু বললাম না, লজ্জাই বোধ করছিলাম। ডাঃ রায়কে আইনসভায় আমি কম অভিযোগে জর্জরিত করিনি। কিন্তু আমি তাঁকে সম্মানও করতাম। উনিও আমাকে স্নেহ করতেন। আমরা বিরোধী দলে থাকলেও মানুষের যোগ্যতাকে সম্মান করব না না কেন? ডাঃ রায়ের আগে ও পরে কতই তো কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী এলেন আর গেলেন। কিন্তু তিনি ছাড়া কার নামই আর স্মরণযোগ্য এখন!

শিক্ষক আন্দোলনে আর একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটল। ট্রাম শ্রমিক ইউনিয়নের তরফ থেকে এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানানো হয়। যে কয়েকশো শিক্ষক-শিক্ষিকা ওখানে বসে থাকতেন, তাদের জন্য ট্রাম ইউনিয়ন থেকে রোজ প্রচুর খাবার পাঠানো হতো।

শিক্ষক আন্দোলনে ছাত্রদের যুক্ত করা নিয়ে আমার মনে তখন দ্বিধা ছিল, এখনও আছে। শিক্ষকদের সমর্থনে সমস্ত কলকাতা এবং পশ্চিম বাঙলার মানুষ যেভাবে দাঁড়িয়েছিলেন সেটা দেখবার মতো ছিল এবং এর প্রয়োজনও ছিল। নিজেদের জোর এবং এই জনতার জোর মিলেই শিক্ষকদের দাবী আদায় হতো। ছাত্রদের রাস্তায় কারা নামিয়েছিলেন জানি না, কিন্তু আমার মনে হয় এটা না করলেই ভাল হতো। শিক্ষকেরা আমার এই কথায় সায় দেবেন কিনা জানি না। তবু আমার ধারণা, এতে শিক্ষক ও ছাত্রের সম্পর্কটা কিছুটা বিঘ্নিত হয়। তাছাড়া শিক্ষক আন্দোলনকে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করাও আমার কাছে সঙ্গত মনে হয়নি।

শিক্ষক আন্দোলনের নেত্রী অনিলা দেবীর সঙ্গে আমার পরিচয় বহুদিনের। সেই ইউনিভার্সিটিতে পড়ার সময় থেকেই ওর সঙ্গে আমার আলাপ। পরবর্তীকালে একসঙ্গে মহিলা সমিতি করেছি। আমরা তো শিক্ষিকাদের মহিলা সমিতিতে কাজ করার জন্য সর্বদাই টানতাম। আমাদের সমিতির নেত্রীরাও অধিকাংশই ছিলেন শিক্ষিকা। অনিলার সঙ্গে আমার এ নিয়ে একদিন যে আলোচনা হয় তাতে বুঝলাম—ওরা শিক্ষক সংগঠনকে ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করাটা যুক্তিসঙ্গত মনে করেন। তাঁর কথায় সেদিনও আমি সায় দিতে পারিনি, আজও পারি না। যেমন আমি হাসপাতালের নার্স ও কর্মীদের ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত হওয়া ও মিলিট্যাণ্ট আন্দোলন করা তখনও সমর্থন করতাম না, এখনও করি না। তখনকার নার্স আন্দোলনের নেত্রীদের সঙ্গে এ নিয়ে আলো-

চনা করে আমি তাদের বোঝাতে পারিনি যে, সেবা-প্রতিষ্ঠান এবং উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত ট্রেড ইউনিয়ন কখনই এক হতে পারে না। বহুকাল আগে ন্যাশনাল মেডিক্যাল হাসপাতালে (আগে চিত্তরঞ্জন বলা হতো) কর্মীদের ধর্মঘটের রূপ দেখে আমার এত বিশ্রী লেগেছিল যে এখনও সেটা মনে আছে। কর্মীরা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাসপাতালের উপরে ঢিল ছুঁড়ছে এবং তাতে তিনতলা পর্যন্ত জানালার কাঁচ ভেঙ্গে পড়ছে ঝনঝন করে। ঐ ঢিল অনায়াসে রোগীদের গায়েও পড়তে পারত। পড়েছিল কিনা জানা নেই। কিন্তু এই যদি বিক্ষোভ প্রকাশের নমুনা হয় তবে এটা নিঃসন্দেহে দুশ্চিন্তার বিষয়। এ নিয়ে ওদের নেতার সঙ্গে আমার কথা হয়েছিল। তিনি আমার এক ডাক্তার বন্ধু। তাঁর উত্তর ছিল—কর্মীরাই বা কি করবে যদি সরকার তাদের দাবী না মানে।

এতকাল পরে আমার এই দ্বিধার জবাব পাচ্ছি বামফ্রন্ট রাজত্বে হাসপাতাল-কর্মীদের ব্যবহারে এবং তার বিরুদ্ধে নেতাদের উক্তিতে। কিন্তু ইতিমধ্যে জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। হাসপাতালগুলি দুর্নীতি ও হট্টগোলের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। ডাক্তার ও কর্মীদের সঙ্গত দাবী পূরণ করা হোক—সবাই এটা চাইবে, তবে তা রোগীদের প্রতি কর্তব্যে অবহেলার বিনিময়ে কখনই নয়। হাসপাতালে এখন অন্যরাই মুখ্য, রোগীরাই গৌণ। এই পরিস্থিতির দায়িত্ব আমরাও কি আজ এড়াতে পারি?

বিশ্ব-মাতৃ সম্মেলন

বিশ্বনারী সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলনের পরে ১৯৫৪ সনে ডাক এলো বিশ্ব-মাতৃ সম্মেলনের। এই সঙ্ঘের নেত্রীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে নারী-মা ও শিশু—এই তিনের জন্য সুখী ও স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বর্তমান ও নিরাপদ ভবিষ্যৎ গঠন। এই সংগঠন সমাজে নারীর সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শিশুদের সর্বাঙ্গীণ কল্যাণ এবং বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিরাপত্তার দাবীকেও তাঁরা পৃথক করে দেখেন না। যুদ্ধের পর থেকেই যুদ্ধ-বর্জিত, শান্তিপূর্ণ পৃথিবীর কামনায় এই সংগঠনের প্রচার ছিল নিরবচ্ছিন্ন। শান্তির বাতাবরণ গড়ে না উঠলে নারী ও শিশুর কি দশা হয় তা তাঁরা দেখেছেন। তাই যত ভাবে পারা যায় নারীর অধিকার ও মর্যাদা, সুখী ও নিশ্চিন্ত মাতৃত্ব এবং শিশুর উজ্জ্বল ও নিরাপদ ভবিষ্যতের জন্য এরা প্রচার করেছেন। এঁরা চেয়েছেন—সমগ্র পৃথিবীর নারী-সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করতে, যাতে পৃথিবীর দেশে দেশে মেয়েরা ও মায়েরা-শান্তির সংগ্রামের প্রথম সারিতে দাঁড়াতে পারেন।

এবারে বিশেষ আবেদন এলো মায়েদের কাছে। বলা হলো: শিশুদের বাঁচাও, ওদের সুখী ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করো। আর দেশে দেশে দাবি তোল—যুদ্ধ নয়, অশান্তি নয়, ফুলের মতো শিশুদের জন্য উন্মুক্ত হোক নন্দনকানন।

এই আবেদনপত্র তাঁরা পৃথিবীর সবদেশে পাঠালেন। আমরাও পেলাম সেই আবেদনপত্র।

এবার আমাদের আয়োজনটাও ওদের আবেদন অনুযায়ী হলো। সুখী মা ও সুস্থ সবল শিশুকে আমরা হাত বাড়িয়ে গ্রহণ করতে চাই, শান্তি ও নিশ্চিন্ততার পরিবেশে, যুদ্ধ-বর্জিত এই পৃথিবীতে। সুতরাং চাই সরকারের সাহায্য এবং প্রয়োজন অনুযায়ী আর্থিক পরিকল্পনা, চাই বেসরকারী উদ্যোগে প্রসূতি ও শিশু-কল্যাণের জন্য যত বেশী সম্ভব কেন্দ্র খোলার ব্যবস্থা। এর প্রধান দায়িত্বে থাকবে মহিলা সমিতিগুলি। আর বিশ্বশান্তির পক্ষে সমর্থন সংগ্রহের জন্য আমরা উপস্থিত হব ঘরে ঘরে, স্ত্রী-পুরুষ সকলের কাছে।

এই মূল কথাগুলি উল্লেখ করে স্বাক্ষরপত্র ছাপানো হলো। তাতে বিশ্বনারী-সঙ্ঘের পরিচয়ও থাকল। সমিতিগুলির উদ্যোগে খোলা হলো অনেক শিশু-কল্যাণ কেন্দ্র। এরকম কেন্দ্র আগেও ছিল কিন্তু এবার বিশেষভাবে ডাক্তারদের

সাহায্য চাওয়া হলো। অনেক পুরুষ ও মহিলা ডাক্তার কেন্দ্রগুলিতে এসে শিশু ও প্রসূতিদের দেখতেন। অল্প খরচে শিশু এবং প্রসূতির পুষ্টি ও সামান্য সাধারণ অসুখ-বিসুখে ওষুধপত্র সম্বন্ধে তাঁরা উপদেশ দিতেন। ডাক্তারদের আনার ব্যবস্থা করতেন ডাঃ রেণুকা রায়।

আজ গর্ব ও আনন্দের সঙ্গেই আমরা স্মরণ করি, তখনকার শিশু-চিকিৎসক-দের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য ডাঃ মণীন্দ্রলাল বিশ্বাস স্বয়ং আমাদের এই প্রচেষ্টার প্রধান পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন। আমাদের তৈরি শিশুকল্যাণ পরিষদের সভাপতিও হলেন উনি। আর ওঁর বাড়িতেই ছিল আমাদের অফিস। সারাক্ষণ এটা-ওটা-সেটা নিয়ে ওঁর মূল্যবান সময় আমরা তখন কেড়ে নিয়েছি। হাসিমুখেই সব কাজ উনি করে দিতেন। ওঁর নিজের ছোট্ট ছেলে 'খুঁদু' সেই সময় দুরারোগ্য ব্যাধিতে শয্যাশায়ী ছিল। উনি বোধহয় তাই নিজের শিশুটির মধ্যেই অন্যসব শিশুর প্রতিচ্ছবি দেখতে পেয়েছিলেন।

বিশ্বনারী সঙ্ঘ ঘোষণা করেছিল ৪ঠা জুন দিবসটি পৃথিবীর সবদেশে 'শিশু-দিবস' হিসাবে পালন করার জন্য। এ দিনটিতে শিশুদের নিয়ে নানা অনুষ্ঠান করা হতো সমিতিগুলি থেকে। এবার কেন্দ্রীয়ভাবে একটি অনুষ্ঠান হলো শিশু-কল্যাণ পরিষদের উদ্যোগে। এর প্রধান ভূমিকায় থাকলেন ডাঃ বিশ্বাস নিজে। শিশুদের নিয়ে একটি সুসজ্জিত মিছিল হয়েছিল। ডাঃ বিশ্বাস নিজের গাড়ি ভর্তি বাচ্চাদের নিয়ে আগে আগে চললেন। গাড়িটি ফেস্টুনে সাজানো ছিল। পেছনে বহু সংখ্যক শিশু নিয়ে চলেছিলেন মায়েরা। বর্ণাঢ্য ছিল মিছিলটি। মিছিল শেষে শিশুদের মুখে তুলে দেওয়া হয় মিষ্টি।

এরপর ঠিক হলো ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের কাছে একটি দাবীপত্র নিয়ে মায়েরা যাবেন।

দক্ষিণ পাড়ার মায়েরা, অর্থাৎ যাদবপুর-টালিগঞ্জ এলাকার সমিতিগুলির পূর্ব-বঙ্গীয় মায়েরা জীবনে কখনো বাচ্চাদের আটার রুটি খাওয়াননি। ডাঃ বিশ্বাসের কাছে তারা বললেন—দাবীপত্রে লেখা হোক রেশনে চালের বরাদ্দ বাড়াতে, আটার রুটি বাচ্চারা খেতে চায় না এবং তা পেটেও সহ্য হয় না। ডাঃ বিশ্বাস হেসেই অস্থির। বললেন, 'আমি ডাক্তার হয়ে একথা বলি কি করে? আমার ছেলেরাই যে রুটি পেলে ভাত চায় না। আর রুটি খেলে তারা ভালই থাকে।'

যাহোক, দাবীপত্র নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্রের কাছে যাওয়া হলো। তিনি বললেন, 'সবই তো ভাল কথা, কিন্তু করতে যে সময় লাগবে, আস্তে আস্তে সব হবে।' আর বললেন, 'এটা তোমরা কি লিখেছ? রুটি খেলে

বাচ্চাদের সহ্য হয় না?' মায়েরা তো আর একবার তারস্বরে যুক্তিতর্ক দিয়ে ভারতের শ্রেষ্ঠ ডাক্তারটিকে প্রায় কাৎ করেন আর কি! তিনি যত বলেন, 'ভাতের চেয়ে রুটি পুষ্টিকর, একটু পাতলা করে সেঁকবে আর একটু কম করে খাওয়াবে, চাইলেই যত ইচ্ছা দেবে না, দেখবে ওদের শরীর ভাল হবে,' ততই তারা বলতে লাগলেন, 'আমরা জন্মেও ঐ রুটিফুটি বাচ্চাগো খাওয়াই নাই, এখন খাওয়াইয়া মাইরা ফ্যালামু?' বিধানচন্দ্র বললেন, 'আচ্ছা, আমি যে একজন ডাক্তার এটা তো মানো? আমি মুখ্যমন্ত্রী—একথা ভুলে যাও, ডাক্তারের কথা-টাই শুনে দেখ না। আমি কি বাচ্চাদের ক্ষতি হোক এমন কথা বলতে পারি, না চাইতে পারি?' ডাক্তার বাবুটির দুরবস্থা দেখে আমারই মায়া হলো। আমিও মায়েদের বোঝাতে লাগলাম। অবশেষে শান্ত হয়ে সবাই ফিরলাম।

মায়েদের নিয়ে আর এক সমস্যায় পড়েছিলাম তখন আমরা। এ তো আজকের কথা নয়। ১৯৫৪-৫৫ সনের কথা। পাড়ার যে কোন সমিতিতে গেলে সব কথার পর মেয়েরা হয় রেণুকে নয় আমাকে বলত—'এর একটা বিহিত না করলে তো এখন আর চলে না।' কিসের বিহিত? না—'এত সন্তান তো আর সামলাতে পারি নে, নিজের দেহও তো পাত হয়ে গেল।' এসব কথা ফিস্‌ফিস্ করে বলত। কারণ তখন জন্মশাসন বা পরিবার-পরিকল্পনার কোন কথাই ওঠে নি।

রেডিওগুলো তখন এ নিয়ে চেঁচাত না। কাগজ আর দেওয়ালগুলিও তখন বিজ্ঞাপনে বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ হয়নি। অপরদিকে আমাদের পার্টি তো এসব পছন্দই করত না। এটাকে মার্কসীয় মতে গ্রহণের অযোগ্য 'ম্যাল্‌থাস-থিওরি' বলা হতো। অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পার্টির মত হলো—জনবল হচ্ছে দেশের সম্পদ, সঠিক পথে এই জনবলকে কাজে লাগালে দেশের উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এবং অর্থনীতি সবল হবে। আমি নিজেই এ নিয়ে কত বক্তৃতা করেছি।

কিন্তু আমাদের মহিলারা সত্যিই যেন অপেক্ষা করতে পারছে না। নতুন সন্তানটির জন্মলগ্ন তাদের মনে আনন্দের বদলে যেন আতঙ্কই জাগিয়ে তুলছে। তাই আমাদের কাছে তারা এর একটা 'বিহিত' জানতে চান। কিন্তু বিহিত আমরা আর কি দেব? ডাক্তারদের শরণাপন্ন হতাম। ডাক্তাররা তাদের কি পরামর্শ দিতেন তাঁরাই জানেন। তখন তো জন্মশাসনের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এতদূর এগোয় নি। হয়তো তাঁরা আত্মসংযমের উপদেশই দিতেন।

আমাদের 'ঘরে-বাইরে' পত্রিকায় তখন শিশুপালন ও শিশু-মনস্তত্ত্ব সম্পর্কে লেখা বেরুতো। লিখতেন প্রধানত ডাঃ রেণুকা রায় ও ডাঃ জ্যোৎস্না মজুমদার,

অন্যান্য ডাক্তারদের কাছ থেকেও লেখা পাওয়া যেত। মেয়েরা এইসব লেখা খুবই পছন্দ করতেন। কোন মাসে বাদ গেলেই চিঠি আসত।

অর্থাৎ, আমরা তখন নানাভাবে শিশুকল্যাণের উপায়াদি নিয়ে ব্যস্ত থাকছি আর শিশুরক্ষার জন্য বিশ্বশান্তির কথাটাও প্রাণপণে বলে বেড়াচ্ছি। এই প্রচারের পরেই আমাদের প্রদেশিক মাতৃসম্মেলন হলো। মাতৃসম্মেলনে শিশুরাই পেল অগ্রাধিকার। সন্তানসম্ভবা মেয়েদের চাকুরীস্থলে মেটারনিটি-ভাতা প্রদান, মেয়েদের জন্য বেশীসংখ্যায় প্রসূতি-কেন্দ্র খোলা, হাসপাতালে বেড বাড়ানো ও চাকুরীজীবী মায়েদের বাচ্চাদের জন্য ক্রেশ খোলা—এসবই ছিল আমাদের দাবী। এসব নিয়ে প্রস্তাব নেওয়া ও বক্তৃতা দেওয়াও হলো। শিশু-শ্রমিক নিয়োগের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে গৃহীত হলো একটি প্রস্তাব। এসব বিষয়ে বড় বড় মহিলা ডাক্তাররা বক্তৃতা করলেন। তাছাড়াও তাঁদের বক্তব্যের মূল সুর ছিল শিশুপালন ও প্রসূতি-কল্যাণ কেন্দ্রিক। তাঁরা বললেন, বেশী শিশুর জন্ম হলে মা ও শিশু উভয়েরই স্বাস্থ্য খারাপ হয়। সুতরাং কম সন্তান হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এ বিষয়ে তাঁরা নানা উপদেশ দিলেন। অধিক শিশুর জন্ম সংসারে অর্থকষ্ট আনে এবং শিশুদেরই তাতে ভুগতে হয়, একথাও বললেন। তিনদিন ব্যাপী উৎসবে প্রতিদিন দু'জন করে মহিলা ডাক্তার থাকতেন।

এসব ছাড়াও বিশ্বশান্তির জন্য সংগ্রামের আবেদনও রাখা হলো মায়েদের কাছে। আজকের দুনিয়ায় এই সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত থাকা প্রতিটি নারীর অপরিহার্য কর্তব্য। নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি হলো। রঞ্জি স্টেডিয়ামেই অনুষ্ঠানটি হয়েছিল।

আমাদের সম্মেলনের প্রস্তাব ও বক্তৃতা শুনে পার্টির একজন নেতা মন্তব্য করলেন, 'এটাকে মাতৃসম্মেলন না বলে জন্ম-নিয়ন্ত্রণ সম্মেলন বললেও চলে।' পার্টি আমাদের আচরণে খুশি হয়নি, কিন্তু আমরা নাচার। বাস্তবতার চাপে পড়ে আমাদের এভাবেই ভাবতে হয়েছিল। এ বিষয়ে পার্টি-নেতৃত্ব আজও কি ভাবেন, সঠিক জানি না।

আমি ভাবি, আমাদের দেশের লোকসম্পদ কোনদিন কাজে লাগিয়ে আমরা সম্পদ সৃষ্টি করতে পারব কিনা—সেটা ঘোরতর সন্দেহের বিষয়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক চীনে লোকবলকে যতদূর সম্ভব কাজে লাগিয়েও তো লোকসংখ্যা উপচে পড়ছে। এর প্রতিবিধানের জন্য পৃথিবীর সব দেশের সরকারই জন্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রয়োজন সম্বন্ধে প্রচার করেন এবং নানাবিধ আইনেরও সুযোগ করে দিয়েছেন। শোনা যায়, লোক-বৃদ্ধির গতিটা তারা ইতিমধ্যে প্রশমিত করতেও

সক্ষম হয়েছেন। আর কোন দেশ না হোক—চীন দেশের কাছ থেকে এই নীতি গ্রহণ করলে আমরা অন্তত তাত্ত্বিক দিক দিয়ে কোন ভুল করব বলে মনে হয় না। অবশ্য অর্থনৈতিক বিকাশ না ঘটালে শুধু জন্মশাসন দিয়ে আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির সমস্যার সমাধান সম্ভব নয়। চীনের সরকার অর্থনৈতিক উন্নতি সাধন সত্ত্বেও যেভাবে অল্প সন্তানের পিতামাতাকে আর্থিক সহায়তা দিয়ে পুরস্কৃত করছেন ও বেশী সন্তানের পিতামাতাদের উপরে সাহায্য-সঙ্কোচ নীতি প্রয়োগ করছেন, সেটা আমাদের লক্ষ্য করা উচিত। প্রকৃতপক্ষে সীমিত পরিবারের জন্য প্রচার করা এবং এই বিষয়ে সব রকম সহায়তা দেওয়া ছাড়া আমাদের দেশের সামনে আর পথ নেই। সমস্যাটার প্রতি অমরা চোখ বুজে থাকতে পারি না।

এর পরে বিশ্ব-মাতৃ সম্মেলন হলো সুইজারল্যাণ্ডের লোজান নামে একটি শহরে। সেখানে আমাদের দেশ থেকে আবার প্রতিনিধি দল পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলো। এবারে আমার নাম উঠল, যদিও আমি মাতৃপদবাচ্য নই। পার্টির পক্ষ থেকে যাঁরা যাবেন, তাঁদেরও নাম স্থির হয়ে গেল। এবার পশ্চিম-বাঙলা থেকে আমাদের সঙ্গে গেলেন অরুণা মুন্সী, মৈত্রেয়ী দেবী ও লেক স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রী সুষমা সেনগুপ্তা। এছাড়া মহিলা সমিতি থেকে আমাদের মাসীমা স্থানীয়া অনেকেই গেলেন। বিশেষ করে কলোনী সমিতিগুলির নেত্রী হিরণদি, রেণু গাঙ্গুলী প্রভৃতি মিলে আমরা ২০/২৫ জন ছিলাম প্রতিনিধি-দলে। অমিয়া (ঘোষ) মাসীমাও গিয়েছিলেন। সম্মেলন কর্তৃপক্ষ ওঁর একটা ছবি তোলেন এবং ভারতীয় মায়ের প্রতীক রূপে সেই ছবি সম্মেলনের রিপোর্ট বইতে প্রকাশ করেন।

প্রতিনিধি রূপে যাবার জন্য মৈত্রেয়ী দেবীকে অনুরোধ করার ভার পড়ল আমার উপর। এর আগে তাঁর সঙ্গে আমার বোধহয় সামান্যই আলাপ ছিল। শুনলাম, তিনি নাকি ভয়ানক রকম কমিউনিস্ট-বিরোধী। এই কাজটিতে আমাকে উস্‌কে দিয়েছিলেন আমার বান্ধবী শ্রীমতী অঞ্জলি মুখার্জী।

কম্পিতবক্ষে শ্রীমতী মৈত্রেয়ী দেবীর কাছে প্রস্তাবটা পেশ করলাম। সম্মেলনের কাগজপত্রও দিলাম তাঁকে এবং সম্মেলন শেষে রাশিয়ায় যাবার সম্ভাবনা আছে তাও বললাম। দেখলাম, যতটা ভীতিজনক মনে করেছিলাম তাঁকে তিনি মোটেই ততটা ভয়ঙ্কর নন। আমাকে 'দূর ছাই' করে বিদায় না দিয়ে বরং বসালেন এবং চা ইত্যাদি খেতেও দিলেন। তারপর নিজেই বললেন, 'আমি তো কমিউনিস্ট নই, সোভিয়েট দেশ দেখে এসে আমার যদি

কিছু বিরূপ মন্তব্য করার বা লেখার থাকে তবে তার স্বাধীনতা আমার থাকবে কি?' বলেছিলাম, নিশ্চয়ই, সোভিয়েটের পক্ষে বলার জন্য তো আমরাই আছি। আপনার অপছন্দের কোন কিছু চোখে পড়লে তা লিখবেন বইকি, সেই স্বাধীনতা আপনার তো রইলই। মৈত্রেয়ী দেবী রাজী হয়ে গেলেন। আমি দেখলাম, তাঁকে সম্মত করানোর কাজ মোটেই শক্ত ছিল না। ইনি কমিউনিস্ট-বিরোধী হতে পারেন কিন্তু 'তেড়ে মেরে ডাণ্ডা' নিয়ে আসার মতন নন।

আমরা সদলবলে সম্মেলন-স্থান লোজানে চললাম। এই দলে বিশ্বনাথ মুখার্জীর মাসীমা ছিলেন। আমরা সকলেই তাঁকে 'মামীমা' ডাকি। তিনি দমদমে গিয়ে আমাকে বললেন, 'মনি, আমি কিন্তু ড্যানার দিকে বসব না, আমাকে হয় ন্যাজের দিকে, নয় মুড়োর দিকে বসিয়ে দিও।' তাঁর কথা ঠিক মতো বুঝতে পারছিলাম না। ন্যাজা-মুড়ো তা মাছেরই থাকে। যাই হোক, প্লেনে উঠে গিয়ে বুঝলাম উনি কি চাইছেন এবং সেইমতো মুড়োর দিকেই বসিয়ে দিলাম। আমাদের অনেকেরই আকাশ-ভ্রমণ এই প্রথম। হঠাৎ সামনের চেয়ার থেকে 'ওয়াক' শব্দ শোনা গেল এবং পেছনের যাত্রীটিও তাই শুরু করলেন। তিন দিন এইরকম কষ্ট পেয়ে কেঁদে কঁকিয়ে সুইজারল্যাণ্ড গিয়ে পৌঁছলাম। সেখান থেকে বাসে করে উপস্থিত হলাম লোজান শহরে। পথে সুইজারল্যাণ্ডের একদিকে বিশাল লেক ও অপর দিকে পাহাড়ের যে অপূর্ব দৃশ্য দেখতে দেখতে গিয়েছিলাম, তা লিখতে গেলে কাব্য হয়ে যাবে।

আমাদের একটি সুন্দর হোটেলে ওঠানো হলো। কিছুক্ষণের মধ্যে খেয়ে-দেয়ে আমরা সবাই সুস্থ হলাম। শ্রীমতী গীতা ওখানে সম্মেলনের প্রস্তুতির জন্য আগে থেকেই ছিল। সে আমাদের জন্য একটা সস্তা খাবারের দোকান ঠিক করে রেখেছিল। কারণ, সম্মেলনে আমরা দুপুরের খাওয়া পাব, রাত্রের নয়। তাছাড়া সকালের চা-ও নয়। ওখানে ভাল করে খেলে তার যা দাম হয় তা দেওয়া আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাই অনেক খুঁজে পেতে গীতাকে এই দোকনটি আবিষ্কার করতে হয়েছিল। আমরা বঙ্গবাসিনীরা তো সবাই সমান। গোমাংস খাই না, মুরগীর দর চড়া। তরকারী মানে—আলু-মটর সেদ্ধ। আমরা সবাই ঐ আলু-মটর আর ডিম দিয়েই পেট ভরিয়ে নিতাম। কিন্তু মামীমা অত কিছুর ধার ধারতেন না। 'ডাল দাও', 'তরকারী দাও'—এসব হিন্দীতে ফরমাস করতেন। সব চেয়ে মজা হতো দুপুরে। বিরাট বিরাট খাবার হলে আমরা হাজার দুই মহিলা খেতে বসেছি। খাদ্যবস্তু যা-ই আনা হচ্ছে মামীমার গ্রহণযোগ্য কোনটাই ছিল না—তিনি চীৎকার করে বলছেন

—'ডাল লাও' 'পটাটো লে আও'। যত বলছি 'মাসীমা থামুন, ওরা আপনার হিন্দী বুঝছে না—তবু তিনি বলে যাচ্ছেন। ওই খাদ্য-তালিকায় আলুসেদ্ধ, স্যালাড, স্টু এবং তরকারীর সেদ্ধ ঝোল মতন কিছু না কিছু থাকত। গীতা উঠে গিয়ে খুঁজে পেতে তাই এনে দিলে তবেই মাসীমা শান্ত হতেন। বেচারীর খাওয়ার যৎপরোনাস্তি কষ্ট হয়েছিল—সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কি আর করা যাবে!

হোটেলে আমাকে আর মীনা দাশগুপ্তকে মাসীমা সত্যিই তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন একদিন রাত্রে। আমাদের ঘরে তিনি উঠে এসেছিলেন সের দুই কাঁচা সিমাই নিয়ে। উঠে এসেছেন একেবারে বঙ্গজননী রূপে। গায়ে ব্লাউজ নেই, পেটিকোটের উপর শুধু শাড়িটা সাধারণভাবে পরে এসেছেন। যে মেয়েটি আমাদের বারান্দায় পাহারা দিচ্ছিল, সে মুচকি হেসে ওঁকে আমাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে গেল। আমরা ওঁর পোশাক দেখে অবাক, হাতের সের দুই সিমাই দেখে আরও অবাক। মাসীমার বক্তব্য হচ্ছে—দুধ-চিনি যোগাড় করে দাও, উনি প্রতিনিধিদের সিমাই রান্না করে খাওয়াবেন। অতিকষ্টে বোঝানো গেল এটা একান্তই অসম্ভব প্রস্তাব। তখন কাঁদো-কাঁদো হয়ে বললেন, তবে কি এগুলো আবার কলকাতায় ফিরিয়ে নিয়ে যাব? বললাম, 'ঠিক আছে, আপনি ওগুলো রেখে যান, আমরা একটু একটু করে কাগজের মোড়ক করে প্রতিনিধিদের সকলের টেবিলের উপর রেখে আসব।' বিশ্বাস করুন, আমি ও মীনা রাত জেগে ওগুলো মোড়ক করেছিলাম এবং যতজনকে কুলিয়েছিল ততজনের টেবিলে অন্যান্য উপহারের তলায় গুঁজে দিয়ে এসে ছিলাম। মাসীমার ইচ্ছা ছিল—তাঁর উপহার সম্পর্কে আমরা কেউ একটা বক্তৃতা দিই এবং কেমন করে রান্না করতে হয় তা শিখিয়ে দিই। আমরা বললাম, ওরা এসব কত রেঁধে খায়, ওদের আর শেখাতে হবে না। তিনি খুশি হলেন না। এই নিয়ে আমরা বাঙলার প্রতিনিধিদল প্রাণভরে হেসেছিলাম।

সম্মেলন শুরু হলো। বিরাট সুসজ্জিত হল। আন্তর্জাতিক সম্মেলন আমি এই নতুন দেখছি। সুরটা ভারি সুন্দর ছিল। মঞ্চের দুপাশ থেকে সাদা পোশাকের উপর ফুলের সাজ পরা, বেণী দোলানো ছোট ছোট ফুটফুটে মেয়েরা ফুল হাতে হলে প্রবেশ করল ব্যাণ্ডের তালে তালে। মনে হলো যেন দুই ঝাঁক পায়রা নেচে নেচে মঞ্চে বসা সভানেত্রীদের ফুল দিয়ে বরণ করে গেল। হাততালিতে মুখরিত হলো সভা। আমরা কানে যন্ত্র লাগিয়ে বসলাম। ঐ যন্ত্রের মাধ্যমে সভার সব বিবরণ ইংরাজীতে দেওয়া হচ্ছিল। এটাও এক নতুন

অভিজ্ঞতা। এরপর শুভেচ্ছাবাণী পাঠ ও অভ্যর্থনা জানিয়ে ভাষণ দেওয়া হলো। মাদাম কোঁতো সভানেত্রীর ভাষণ দিলেন।

এরপর সাম্রাজ্যবাদী দেশের অধীনস্থ দেশগুলি থেকে আগত প্রতিনিধি মেয়েরা একের পর এক উঠে তীব্রকণ্ঠে বললেন—কিভাবে তাদের দেশের উপর নিষ্ঠুর অত্যাচার হচ্ছে ও কেমনভাবে তাদের স্বামী ও শিশুদের নিরাপত্তা বিপন্ন হচ্ছে। এই সঙ্গে দুটি জীবন্ত দৃশ্য চোখে দেখলাম। এই দৃশ্যের একটি হলেন—জুলিয়াস্ ফুচিকের বিধবা পত্নী মাদাম ফুচিক। ফুচিকের লেখা 'ফাঁসির মঞ্চ থেকে' বইখানা তখনকার দিনে প্রায় সবারই শতবার করে পড়া ছিল। ফ্যাসিস্ট জেলে বুদ্ধিজীবীদের উপর কিভাবে অত্যাচার করা হতো এবং কতখানি বীরত্বের সঙ্গে তাঁরা তা সহ্য করে জীবন বিসর্জন দিতেন—বইখানি তারই একটি জীবন্ত দলিল। বইতে প্রকাশিত চিঠিগুলি ছিল স্ত্রীর উদ্দেশে লেখা। স্বামীর অগাধ ভালবাসা তাতে যেমন ঢালা ছিল, তেমনি ছিল দেশপ্রেমের উজ্জ্বল স্বাক্ষর। যতক্ষণ ঐ বই পড়েছিলাম ততক্ষণ আমার চোখের জল অঝোরে ঝরেছিল। আর যখন নিজের চোখে দেখলাম সেই মাদাম ফুচিককে, যৌবনেই যাঁর মাথার চুলগুলি সাদা ধবধবে হয়ে গেছে, মুখে যার একটি মলিন হাসি লেগেই আছে, তখন নিজেকে সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লেগেছিল। হঠাৎ এমনভাবে তাঁরই সামনে পড়ে যাব জানতাম না। মনে পড়ে গেল ফুচিকের একটি চিঠি। তাতে তিনি স্ত্রীকে প্রশংসা করে লিখেছিলেন, 'যেদিন আমার সামনে তোমাকে আনা হলো, তুমি আমাকে চেনো কিনা জানতে, সেদিনটা বড় কঠিন পরীক্ষার ছিল। কিন্তু তুমি যখন 'চিনি না' বলে হেঁটে চলে গেলে তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কি সাহসের পরিচয়ই না দিলে! অথচ বুক তোমার হয়তো ভেঙে যাচ্ছিল। আমার মুখের মধ্যে তখন একদলা রক্ত। ওরা দাঁতগুলো ভেঙে দিয়েছে। আমি মুখখানা ঘুরিয়ে নিলাম তুমি যাতে দেখতে না পাও। কিন্তু আমাকে বাঁচানোর জন্য তোমার অগাধ প্রেম ও সাহস আমাকে সব কষ্ট ভুলিয়ে দিয়েছিল।' এই সেই মাদাম ফুচিক। শ্রদ্ধায় মাথাটা নত হলো।

আর একজনকে দেখেছিলাম, তিনি হলেন 'ওলগা'র মা। যে-রাত্রে সপ্তদশী মেয়ে ওলগাকে নিয়ে উলঙ্গ করে সারারাত বরফের উপর হাঁটানো হয় এবং অকথ্য অত্যাচারের পর মেরে ফেলা হয়, তার কয়েক দিনের মধ্যেই নাকি মায়ের চুলগুলি সব সাদা হয়ে গিয়েছিল। শোকের এমন চলমান মূর্তি আমি আর দেখিনি। কিন্তু তবুও ওলগার জন্য আমরা গর্ব বোধ করেছি, ফ্যাসিস্টরা তার মুখ থেকে একটি কথাও বের করতে পারেনি।

এঁদের শোকের সঙ্গে সুর মিলিয়ে ঐ মঞ্চের উপর উঠে একের পর এক নারী যখন তাঁদের শোকের কথা ও বীরত্ব-গাঁথা শুনিয়ে যাচ্ছেন আর চাইছেন পৃথিবীর সব দেশের মেয়ে হাতে হাত ধরে একত্রিত হয়ে এর প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠুক—তখন কোন্ নারী সে ডাক শুনে মুখ ফিরিয়ে থাকতে পারে?

তিন দিন পরে সম্মেলন শেষ হলো। তারপর মেয়েরা অনেক রাত অবধি হাতে হাত ধরে নাচলেন। একসঙ্গে নানা রং-এর নানা দেশের এত বিদেশিনী-দের এই প্রথম দেখলাম। কত জায়গা থেকে, কত দূর-দূরান্ত থেকে এঁরা এসেছেন। আফ্রিকার নানা দেশ থেকে গোপন পথেও প্রতিনিধিরা এসেছেন। ফাঁক পেলেই প্রতিনিধিরা একে অপরের সঙ্গে আলাপ করছেন, কার দেশের কি অবস্থা তা জেনে নিচ্ছেন। আমরা যেন সবাই একসূত্রে বাঁধা। আমাদের যেন রাখীবন্ধন হয়ে গেল। একে অপরকে যাহোক কিছু স্মৃতিস্মারক উপহার দিলেন। আমি স্মৃতিস্মারক উপহার পেয়েছিলাম জাপানী, ইটালি ও হাঙ্গেরীয় মেয়েদের কাছ থেকে। সব দেখেশুনে মনে হয়েছে, জাপানে তোজো জয়ী হয়নি, হয়েছেন এই শান্তিকামীরাই। ইটালির মুসোলিনী কবরের অন্ধকারে বিলীন, আর আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে এসেছেন নতুন ইটালির প্রতিনিধিরা।

কিছু প্রতিনিধির কাছে নিমন্ত্রণ এলো সোভিয়েট রাশিয়া সফর করার জন্য। মৈত্রেয়ী দেবী, অরুণা মুন্সী ও সুষমা সেন—এই দলে ছিলেন। আমাদের মাসীমা গেলেন মীনার সঙ্গে হাঙ্গেরিতে। এবার আমরা সবাই রাজ-অতিথি। মাসীমাকেও 'পোটাটো লাও' বলে আর দুঃখ পেতে হয়নি। আমিষ, নিরামিষ সব রকম উপাদেয় খাদ্য আমরা সব দেশেই টেবিলের উপর সাজানো পেয়েছি। আদর-আপ্যায়নের সত্যি অন্ত ছিল না। তবে ওসব দেশে একমাত্র অসুবিধা ছিল পানীয় জলের। টেবিলে ও শোবার ঘরে ওরা ফলের রসের বোতল আর 'মিনারেল ওয়াটার' নামক এক বিস্বাদ পানীয় জল রেখে দিত। 'কলের জল খাওয়া' ছিল একদম নিষিদ্ধ। কিন্তু আমরা ভারতীয় রমণীরা স্নান করে, কাপড় কেচে দিনের মধ্যে দু-বার ওদের ট্যাঙ্ক খালি করে দিতাম আর মনের সুখে বেসিন থেকে গ্লাস ভরে জল নিয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করতাম।

সোভিয়েটদেশে যাবার দিন রাত্রে ট্রেনে আমাদের গাইড ছিলেন নাদিয়া। মধ্যবয়সী হাসিখুশি স্নেহশীলা মহিলা। উনি রাত্রে আমার কামরায় এসে আমরা যারা যাচ্ছি তাদের তালিকা দেখিয়ে পরিচয় জানতে চাইলেন। আমি মৈত্রেয়ী-দির নামের তলায় আঙ্গুল বুলিয়ে বলে দিলাম—তালিকার মধ্যে এই একজনই আছেন কমিউনিস্ট-বিরোধী, এঁকে তোমরা সামলিও। আর বেশীর ভাগই

তো আমরা কমিউনিস্ট, তাদের নিয়ে ভাবতে হবে না। তাছাড়া কয়েকজন আছেন তাঁরা সবকিছু দেখেশুনে জানতে চান। আমাদের মতো নির্ভেজাল ভক্ত নন। তাঁরা যা যা দেখতে চান অবশ্যই দেখাবে ও যত্ন নেবে। আর মৈত্রেয়ী দেবীকে যদি তোমরা আকৃষ্ট করতে পার তবে ফল পাবে। কারণ উনি লেখিকা। খুশি হয়ে ফিরলে ভাল লিখবেন। তা ছাড়া উনি রবীন্দ্র-সাহিত্যে পারদর্শিনী। সেদিক দিয়েও তোমরা ওঁর কাছ থেকে সাহায্য পাবে।

তারপর থেকে দেখলাম মৈত্রেয়ী দেবী কিছুটা 'ভি.আই.পি.'র মতো খাতির পাচ্ছেন। অবশ্য আমরা যে যেমন দর্শনীয় স্থানগুলি দেখতে চেয়েছি তেমনি স্থানেই যেতে পেরেছি। কিন্তু মৈত্রেয়ীদির জন্য কিছু কিছু 'স্পেশাল এপয়েণ্ট-মেণ্ট' থাকত। সুষমা সেন ও অরুণা মুন্সীর জন্যও বরাদ্দ ছিল বিশেষ প্রোগ্রাম।

ওখানে আমরা যে যা দেখি তাতেই আশ্চর্য হয়ে যাই। অন্তত আমি তো অবাক-বিস্ময়ে দেখেছি সবকিছু। কিণ্ডার-গার্টেন দেখতে গিয়ে বাচ্চাদের জন্য একটা বিরাট হলে নানা রকম পুতুল ও খেলনা মডেল ছড়ানো দেখলাম। বাচ্চারা খেলছে তাই নিয়ে। জিজ্ঞেস করলাম, 'ওরা এমন সুন্দর জিনিস ভাঙ্গে না?' ওদের তত্ত্বাবধানে যিনি ছিলেন তিনি বললেন, 'ভাঙ্গবেই তো, না ভাঙ্গলে শিখবে কি করে? আবার নতুন দেওয়া হবে।' শুনে আমার দেশের গরীব শিশুদের কথাটা মনে পড়ল। একটা ভাঙ্গা পুতুলের আধখানাই হয়তো তার সর্বস্ব। তাই নিয়েই তার শিশুজীবন কাটে।

এর আগে আমি কখনও কোন পাশ্চাত্য দেশে পা দিইনি। দিলে হয়তো শিশুদের জন্য সোভিয়েটের এইসব এলাহি ব্যবস্থা দেখে অমন চিৎপাৎ হয়ে পড়তাম না। পাশ্চাত্য দেশগুলির সর্বত্রই শুনেছি শিশুদের জন্য যত্নের আয়োজন কমবেশী এইরকম। কিন্তু আমি তো শুধু আমার দেশের অযত্ন-বর্ধিত, অবহেলিত শিশুদের দেখেছি। তাই যা দেখি, তাতেই তাক্ লেগে যায়।

কৃষকদের কো-অপারেটিভ দেখাতে নিয়ে গেল আমাদের। সবাই কিরকম স্বচ্ছল। তাদের ঘরে স্তরে স্তরে সাজানো লেপ-তোষক আর পেতলের বাসন-পত্র। মেয়ে-পুরুষ মিলে দিব্যি মনের সুখে গড়গড়ায় তামাক খাচ্ছে। সামোভারে কফির জলের ধোঁয়া বেরুচ্ছে। অন্য দেশের কৃষকের অবস্থা আমি জানি না। আমি জানি আমার দেশের কৃষকদের। তাদের তো দেখেছি একখানা করে কাপড়ও থাকে না। কাজেই কৃষকের যদি এমন স্বচ্ছল অবস্থা হয় তবে তো আমার বিস্ময়ের সীমা না থাকবারই কথা। এমন কি মৈত্রেয়ী দেবীও বললেন —'এই যদি কৃষক-জীবন হয় তবে আমি নিজের জন্যও এর বেশী চাই না।'

আমাদের শ্রমিকদের ফ্ল্যাটবাড়ি দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। ভেবে-ছিলাম, আমাদের দেশের শ্রমিকরা যদি এসব একটু চোখেও দেখতে পেত! এগুলি সত্যই অবস্থাপন্ন পরিবারের ফ্ল্যাটের মতো।

এখন তো শুনি আমেরিকার শ্রমিকেরা নাকি ওর থেকেও সুখে থাকে—তবে তারা থাকে কৃষ্ণাঙ্গদের অধিকারকে পদদলিত করে এবং পৃথিবীর অনুন্নত দেশগুলির সঙ্গে অসম ব্যবসায়ে অর্জিত বিপুল অর্থে। সোভিয়েটের সব শ্রমিক কমবেশী একই রকম স্বচ্ছলতায় বাস করে।

আমাদের তাসখন্দেও নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে এক বৃদ্ধ মুফ্তির বাড়িতে আমরা ভোজ খেলাম। মাংস দিয়ে খিচুড়ি, বিরিয়ানি—এসব খাবারের স্বাদ-গন্ধের সঙ্গে নিজের দেশের খাবারের এত মিল যে মনটা দেশে ফেরার জন্য একটু উতলা হয়েই উঠেছিল। কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছিলেন—ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হয় কিনা? নব্বই বছরের গ্র্যাণ্ড মুফ্তি বললেন, 'আমার মাথাটা তো এখনও গলার উপরেই আছে, আর চলো তোমাদের দেখাচ্ছি—আমাদের মসজিদেও নামাজ হচ্ছে।' আমরা গিয়ে সত্যি সত্যি নামাজরত মুসলিমদের দেখলাম।

তাসখন্দের মিউনিসিপ্যাল মেয়র আমাদের বিপুল সম্বর্ধনা দিলেন। বিরাট ভোজ হলো। ওখানকার কৃষকদের সঙ্গে নেচেগেয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা খুব জমিয়েছিল। শ্রীমতী রেবা রায় (বিনয় রায়ের বোন) সোভিয়েটেই ছিল। সেও আমাদের দলে জুটে গেল। সে ছিল নৃত্যশিল্পী। সবাই নাচে-গানে আসর জমালো। কেউ আর কাউকে যেন ছাড়তে চায় না। বৃদ্ধারাও কিরকম নাচে আর গান করে তাও দেখলাম। কিন্তু তাতে যোগ দিতে পারলাম না আমরা কিছু অকালপক্করা। খুঁটি ধরে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই শুধু দেখলাম এই নাচ-গান।

ওখানে আমরা বেশ আনন্দ করে তরমুজ খেয়েছিলাম। খুব মিষ্টি আর রসাল তরমুজ। এই তরমুজেরই একটি ছোট্ট রসাল গল্প বলে আমার সোভিয়েট ভ্রমণের কাহিনী শেষ করব।

এবার আমরা সোভিয়েট ছাড়ব। বিমান বন্দরে এসে গেছি। তানিয়া আমাদের সঙ্গে আরও কিছুক্ষণ থাকবে। ও আমাদের দোভাষী। নাদিয়া আর তানিয়া এই তিন সপ্তাহে আমার মন এতটা জয় করে ফেলেছিল যে ওদের ছেড়ে যাবার কথা মনে উঠলেই একটা বেদনা অনুভব করতাম। অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়ে তানিয়া। আমরা সকলেই ওকে বোনের মতো স্নেহ-ভালবাসা দিয়ে

আপন করে ফেলেছি। লেনিনগ্রাডে আমাদের যখন 'লেনিনগ্রাড অবরোধ'-এর সেই মর্মান্তিক ছবিটা দেখাচ্ছিল তখন তার ইংরাজী ভাষ্য পরিবেশন করতে করতে হঠাৎ দেখি তানিয়া সরে এলো। আর একটি মেয়ে শুরু করল সেই কাজ। একটু পরে পেছনে ফুঁপিয়ে কান্নার শব্দ শুনে ফিরে দেখি তানিয়া উপুড় হয়ে কাঁদছে। মনে পড়ল—ও বলেছিল, ঐখানেই ওর বাবা খেতে না পেয়ে মারা যান। আমার ইচ্ছে করছিল উঠে গিয়ে ওর মাথায় পিঠে একটু হাত বুলিয়ে দিই। ওরা বলেছিল, সোভিয়েট রাশিয়ায় তোমরা এমন একটি পরিবার পাবে না—যার এক বা একাধিক আত্মীয়স্বজন যুদ্ধে নিহত হয়নি। ক'জনকেই বা আমরা সান্ত্বনা দেব! তবু তানিয়াকে যে ভালবাসি; ওর কান্নায় আমরা সবাই কেঁদেছিলাম।

আমার প্রিয় সোভিয়েটভূমির কত কিছুই তো দেখা হয়নি। তবু যা দেখেছি—মন তাতেই ভরে আছে। এই সোভিয়েটভূমি আর নাদিয়া ও তানিয়াকে ফেলে যাব কেমন করে?

তবু যাচ্ছি। বিমান বন্দরে এসে গেছি। একে একে সবাই উঠলাম প্লেনে। তানিয়াও উঠেছে। সিঁড়ি নিয়ে গেছে, দরজা বন্ধ হয়েছে, ইঞ্জিনও চালু করেছে। হঠাৎ দেখি ইঞ্জিন বন্ধ হলো, দরজা খুলে গেল, সিঁড়িও আবার লাগানো হলো। ভাবলাম, এ প্লেনটা বোধহয় খারাপ। কিন্তু এ কি? তাকিয়ে দেখি দু'খানা ইয়া বড় বড় তরমুজ দু'হাতে করে নাদিয়া সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে আসছে। আমরা তো অবাক। এরজন্য প্লেনও থামায় নাকি? আমরা হাতে করে তরমুজ দুটি নিলাম—দেখি নাদিয়ার চোখে জল।

আবার দরজা বন্ধ হলো। প্লেন উড়ল আকাশে। আমরা জানালা দিয়ে উঁকি মেরে শেষ বারের মতো দেখে নিলাম সোভিয়েটভূমিকে।

আমার পাশেই বসেছিল তানিয়া। ওকে জানালাম আমার মনোবেদনা। তোমাদের ছেড়ে যাচ্ছি, আমার স্বপ্নরাজ্য ছেড়ে যাচ্ছি, ভাবতেই পারছি না। তানিয়া আমাকে সান্ত্বনা দিল—তোমাদেরও হবে। আমাদের সম্বন্ধে অতটা ভেবো না। আমরাও মানুষ, এটাও স্বর্গরাজ্য নয়, 'অল্ ইজ নট ওয়েল হিয়ার'। কথাটা শুনে একটু যেন কেমন লাগল।

দেশে ফিরে এসে কিছুদিন পরেই ওর কথার মানেটা বুঝেছিলাম। ওখানে স্টালিনের কার্যকলাপ নিয়ে তখন তীব্র মতান্তর শুরু হয়ে গেছে। আরও পরে শুনলাম, মুসোলিয়াম থেকে স্টালিনের সযত্ন রক্ষিত দেহটি তুলে এনে কবর দেওয়া হয়েছে অন্যত্র।

এই প্রসঙ্গে মৈত্রেয়ীদির একটা কথা মনে পড়ে গেল। এক সঙ্গেই আমরা মুসোলিয়াম দেখতে গিয়েছিলাম। আমি মুগ্ধবিস্ময়ে স্তব্ধ। লেনিন ও স্টালিনের সত্যমৃত দেহ দুটি যেন সেখানে সযত্নে শায়িত। যেন একেবারে জীবন্ত। চোখে আমার আপনা থেকেই জল এসে গিয়েছিল।

বাইরে এসে মৈত্রেয়ীদিকে জিজ্ঞেস করলাম—'কেমন লাগল?' বললেন, 'ভাল না।' আমি আশ্চর্য হলাম—'কেন, আমাদের দেশে যদি রবীন্দ্রনাথকে আমরা এমনি করে জীবন্ত রাখতে পারতাম তবে তো যুগ যুগ ধরে লোকে দেখতে পেত বিশ্বকবিকে।' উনি বললেন, 'রক্ষে করুন, সেটা করার দুর্বুদ্ধি যে আমাদের হয়নি, তাই বাঁচোয়া। কবি যুগ-যুগান্ত বেঁচে থাকবেন তাঁর সৃষ্টি ও কীর্তিতে। মৃত দেহটা নিয়ে কি হবে?' কথাটা কিন্তু আমার খারাপ লাগেনি। আর স্টালিনকে অন্যত্র কবর দেবার পর ঐ কথাটা বারংবার মনে হয়েছে।

মৈত্রেয়ী দেবীকে নিয়ে যাওয়া আমাদের সার্থক হয়েছিল। 'মহা সোভিয়েট' বই বেরিয়েছে ওঁর কলম দিয়ে। মাদাম নভিকোভাকে মাসের পর মাস বাড়িতে রেখে রবীন্দ্র-সাহিত্য অনুবাদ করতে সাহায্য করেছেন। এ ছাড়া পাড়ায় পাড়ায় মেয়েদের কত যে সভা ডেকে দিয়েছি আর সেখানে উনি সোভিয়েটের কত যে গল্প শুনিয়েছেন, তার হিসেব ছিল না। আমি সঠিক জানি না, তবে মনে হয় মৈত্রেয়ী দেবীর কিছুটা রাজনৈতিক সচেতন কর্মজীবনের শুরু এই সময় থেকেই।

শ্রীযুক্তা সুষমা সেনগুপ্তেরও সোভিয়েট ভ্রমণ সংক্রান্ত একটা ধারাবাহিক লেখা বেরিয়েছিল 'যুগান্তর' পত্রিকায়।

এরপর ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে আমাদের কাছে চাওয়া হলো ভারতীয় সেক্রেটারী হিসাবে কাজ করবার জন্য একজন মহিলা-প্রতিনিধি। কিন্তু কেউ আমরা সেখানে যেতে চাইলাম না। বিদেশে গিয়ে কে থাকবে? অবশেষে বাণী দাশগুপ্ত যেতে রাজী হলো। ওখানে সে ৫/৬ বছর কাজ করেছে। বাণী যাওয়াতে আমাদের খুব উপকার হয়েছিল। কেন্দ্রের সঙ্গে আমাদের যোগসূত্র বাণীই রক্ষা করত।

দ্বিতীয় নির্বাচন

১৯৫৭ সনে হলো দ্বিতীয় নির্বাচন। তার ত্ব'বছর আগে ১৯৫৫ সনে ভারতের আমন্ত্রণে সোভিয়েট থেকে ক্রুশ্চভ ও বুলগানিন এলেন ভারত সফরে। ক্রুশ্চভ ছিলেন পার্টি নেতা, বুলগানিন প্রধানমন্ত্রী। সোভিয়েটের সঙ্গে তখন ভারতের বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছে। যবনিকার আড়াল সবে ভাঙতে শুরু করেছে। স্টালিন তখন অস্তগামী, শুধু মৃত্যুতে নয়—নীতিতেও।

সোভিয়েটের তুই নেতাকে নিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গায় বিশাল অভ্যর্থনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। কিন্তু কলকাতার জনসভার কোন তুলনা হয় না। এতবড় জনসভা, আমার ধারণা, কলকাতায় অতীতে আর হয়নি।

এই সভায় ক্রুশ্চভ ভারতের উন্নতির উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন। সামনের সারিতে শ্রোতারূপে কমিউনিস্ট এম. এল. এ-রা বসেছিলেন। আমরা ভাবছিলাম—সৌজন্য সফরে এলে বন্ধু দেশ সম্পর্কে এরকম সপ্রশংস উক্তি হয়তো করতেই হয়। আর উচ্ছ্বাসের চরমে পৌঁছে যে কথাটা তিনি বললেন সেটা আতিশয্য হলেও আমাদের তেমন মুশকিল হতো না। কিন্তু তিনি যখন বললেন, 'কুকুরেরা যতই চিৎকার করুক ভারতের উন্নতির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকবেই' তখন আমরা অবাক না হয়ে পারিনি।

সর্বনাশ! কুকুর তাহলে কারা? আমরা? সামনের সারিতে যাঁরা বসে আছেন—সেই কমিউনিস্টরা? আমরাই তো সরকারের বিরোধীদল। আমরাই তো সরকারের বিরুদ্ধে চেঁচাই। এ তো অতিশয্য নয়, আমাদের উপর সরাসরি আক্রমণ! আমরা একটু চোট খেলাম। বোঝা গেল, সরকারে সরকারে বন্ধুত্ব রাখতে গেলে এসব অতিভাষণ দরকার হয়।

১৯৫৭ সনে চৌ-এন-লাইও এদেশে বন্ধুত্ব সফরে এসেছিলেন। চীনের গণতান্ত্রিক সংগ্রামের প্রতি ভারতের প্রথম থেকেই সমর্থন ছিল। তখন আমাদের দেশ স্বাধীন হয়নি। এই সমর্থনের প্রতীকস্বরূপ ১৯৩৮ সনে কংগ্রেসের উদ্যোগে ঔষধপত্রসহ একটি চিকিৎসক দল চীনে পাঠানো হয়েছিল। চীনের অষ্টম রেড আর্মি বাহিনীর সেবাকাজের জন্যই এই দল যায়। দলের নেতৃত্বে ছিলেন ডাঃ কোট্‌নিস। বাঙলা থেকে গিয়েছিলেন তরুণ চিকৎসক ডাঃ বিজয় বসু। ডাঃ কোট্‌নিস অতিরিক্ত পরিশ্রমের ক্লান্তিজনিত ব্যাধিতে চীনেই দেহত্যাগ করেন।

চীনা নেতৃত্ব শ্রদ্ধাসহকারে সেদিনের প্রেরিত এই 'মিশনটি'র স্মৃতি আজও রক্ষা করে চলেছেন।

১৯৪৯ সনে চীনের মুক্তি-সংগ্রামের সমাপ্তি ঘটে। মাও-সে-তুং-এর নেতৃত্বে সেখানে গঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক সরকার। দিনটির কথা আজও আমার মনে পড়ে। আমরা তখন জেলে। সংবাদপত্রে খবরটি পাবার পর আমরা জেলখানাতেই খুব আনন্দ-উৎসব করেছিলাম। ভারত সরকার নয়াচীনের স্বাধীন সরকারকে স্বীকৃতি দিতেও বিলম্ব করেনি। দুই সরকারের মধ্যে বন্ধুত্বও স্থাপিত হলো। 'হিন্দী-চীনী—ভাই ভাই' শ্লোগানে দু'দেশ তখন মুখরিত।

এই বন্ধুত্বের পথ ধরে প্রধানমন্ত্রী চৌ-এন্-লাই সৌজন্য সফরে এলেন এদেশে। নিতান্ত সাদাসিধে, ঘরোয়া চালচলন ও সাধারণ পোশাক পরিহিত এই মানুষটিকে এদেশের লোক একান্ত আপনজন হিসাবেই গ্রহণ করল। নিজের দেশে মানুষটি যে এত কাণ্ড করে এসেছেন, সদাবিনয়ী এই মানুষটিকে দেখলে তা যেন বোঝাই যায় না।

কলকাতার ময়দানে তাঁকে সম্বর্ধনা জানানো হয়েছিল। ক্রুশ্চভ-বুলগানিনের সময়কার মতোই লোক জমেছিল সেই সভায়।

চৌ-এন-লাই তাঁর বক্তৃতায় ভারতের অশেষ প্রশংসা করলেন। চীন ও ভারতের অগ্রগতির কথাও বললেন। তিনি আরো বললেন, 'জওহরলাল নেহরু আমার বড় ভাই, তাঁর কাছে আমার অনেক কিছুই শেখার আছে।' এই ভারত-বন্ধুটিও আমাদের একটু মুশকিলে ফেললেন। আমরা তো এতদিন ভেবেছিলাম এর উল্টোটাই। চীনের কাছেই অনেক কিছু শিখতে হবে আমাদের। তবু সৌজন্যের খাতিরে এই প্রশংসা হতেই পারে, এটা আমরা মেনে নিলাম। উনি অবশ্য এসেছিলেন নির্বাচনটা হয়ে যাবার পর।

এইরকম আরো একটি মানুষকে আমরা এদেশে অতিথি হিসাবে দেখেছিলাম আরও অনেক পরে। তিনি ভিয়েতনামের বিপ্লবী মহানায়ক হো-চি-মিন্। ছোটখাটো রোগা মানুষ, পোশাকে আরও সাদাসিধে এবং বিনয়ে যেন সর্বদা অবনত। মানুষটিকে দেখলে কে বুঝবে যে তিনি ছিলেন ভিয়েতনামের কিংবদন্তীর মহানায়ক? তিনিও অনায়াসে ভারতের মন জয় করে গিয়েছিলেন।

যাহোক, ১৯৫৭ সনের নির্বাচনে পার্টি প্রস্তুত হতে লাগল। এবারে পার্টির আওয়াজ হলো—পাল্টা সরকার গঠন করতে হবে। জনসাধারণের কাছে আবেদন করা হলো কংগ্রেসের বিকল্প সরকার গঠনের জন্য। বামপন্থী পার্টিগুলি যৌথভাবে

এই আবেদনে স্বাক্ষর দেয়। কিন্তু এই শ্লোগানে পার্টির একাংশের আপত্তি ছিল। তাদের মত হলো—আরও অধিক সংখ্যক সদস্যের জয়লাভে একটি শক্তিশালী বিরোধী দল যাতে আইনসভায় যেতে পারে, সেইরকম আবেদনই জনসাধারণের কাছে রাখা উচিত। বিকল্প সরকারের শ্লোগানে উল্টো ফল হতে পারে, লোকেরা ভয় পেয়ে কংগ্রেসের দিকে ঝুঁকতে পারে। শেষ পর্যন্ত বিকল্প সরকারের শ্লোগানকে ভিত্তি করেই নির্বাচন হলো।

প্রচারে নেমেই দেখা গেল, ক্রুশ্চভ সাহেবের প্রশংসাপত্রটি লাখে লাখে ছাপিয়ে কংগ্রেস ঘরে ঘরে পৌছে দিয়েছে। তাঁর কথাগুলোই পোস্টারে লিখে দেওয়াল ভরে ফেলেছে। সেই সৌজন্য সফরের বক্তৃতার ফল এটা। আমরাও জানতাম এটা ব্যবহৃত হবেই।

অবশ্য পশ্চিমবঙ্গে আমরা এতে বিশেষ বিপদে পড়িনি। কারণ জনসাধারণ তাদের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে বক্তৃতার চেয়ে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। তাঁরা ঠিকই রায় দিয়েছিলেন। '৫২ সনের ২৮টির জায়গায় এবারে ৪৬টি আসন কমিউনিস্ট পার্টি পেয়ে গেল। ভোট পেল শতকরা ১৭.৮২। সমস্ত বিরোধী দল মিলিতভাবে আসন পেলেন ৬১টি।

এবারের নির্বাচনে আমাকে একটু বেগ পেতে হলো। কালীঘাটে ঘুরতে গিয়ে দেখি এলাকার চেহারাটা যেন অন্যরকম। না-ই বা হবে কেন? অত 'বিশ্বনারী' করে বেড়ালে এলাকার লোকেরা শুনবে কেন? এলাকায় ঘোরাঘুরি করার জন্য আমি তো অল্পই সময় দিতে পেরেছি। তাছাড়া পাড়ার বেশীর ভাগ পার্টি-কমিটিগুলিও এমন শক্তিশালী ছিল না যে তারা তাদের উপস্থিতি ও কাজ-কর্ম দিয়ে পাড়ায় পার্টির প্রভাব বজায় রাখবে।

যদিও কলকাতার এম. এল. এ-রা প্রায় অলঙ্কারস্বরূপ। সার্টিফিকেট দেওয়া ছাড়া তাদের খুব বেশী কিছু করার থাকে না। সেদিক থেকে কর্পোরেশন-এর যেকোন কাউন্সিলার এম. এল. এ-র চেয়ে পাড়ার অনেক বেশী উপকার করতে পারেন এবং তা করেনও। কালীঘাটের এক অংশের কাউন্সিলার ছিলেন পার্টির বারীন চ্যাটার্জী। তিনি এলাকাটি জুড়ে সর্বক্ষণ বিচরণ করতেন এবং সত্যি-কারের জনসেবক হিসাবে সকলের কাছে ছিলেন অতিশয় প্রিয়ব্যক্তি।

তথাপি পাড়ার মানুষ এম.এল.এর উপস্থিতিটা দেখতে চায়। যখন পাড়ায় যেতাম তখন কেউ বলতেন, 'এই যে, দু'বছর পরে দেখলাম,' কিংবা 'আপনার দেখাই তো পাওয়া যায় না' ইত্যাদি। মুশকিল ছিল আমি ঐ পাড়ায় বাস করতাম না। তাই লোকের বাড়ি না গেলে আমার সঙ্গে কারও দেখা হতো না।

পার্টি অফিসে আসতে তাঁরা ঠিক পছন্দও করতেন না। এইসব ছিল এবারে আমার অসুবিধার কারণ।

প্রচারে নেমে তাই আমার দরদীও সমর্থক বন্ধুবান্ধবদের কাছে এবং পার্টি ছেলেদের কাছে অনেক অভিযোগই শুনতে হলো। সত্যিই তো আমি তাঁদের বিপদে ফেলেছি। কিন্তু যাঁরা বকুনি দিয়েছেন তাঁরাই নিজেদের গরজে, পার্টির প্রতি ভালবাসায় আবার আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরেছেন ও নিজেদের আসনটি নিজেরাই জিতে নিয়েছেন। প্রতি নির্বাচনের সময় পার্টির কমরেড রাজ্যেশ্বর নিয়োগী এসে এলাকায় হাজির হতেন। তিনি থাকতেন অন্য পাড়ায়। কিন্তু নির্বাচনে বাড়ি বাড়ি যাওয়া থেকে শুরু করে নানারকম দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করতেন। ভদ্রলোকটি ছিলেন অত্যন্ত আশাবাদী। পাড়ায় ভোট কমে যাচ্ছে, একথা তিনি কখনও বিশ্বাস করতেন না। এমন কি তৃতীয়বারে যখন হারব বলে আমি নিজে জানতাম, তখনও তিনি কোন 'খারাপ লক্ষণ' দেখতেই পাননি। রাজ্যেশ্বর হলেন জলি ক'লের দীর্ঘ দিনের বন্ধু। নির্বাচনের সময় থেকে রাজ্যেশ্বর ও প্রভাতী আমাদের উভয়েরই সুদিন ও দুর্দিনের একান্ত নির্ভর-যোগ্য ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু আমি পার্টি ছেড়ে দেবার জন্য রাজ্যেশ্বর আমার প্রতি সেই যে অপ্রসন্ন হলেন, সেটা থেকেই গেল।

যাহোক্, এবারে জিতলেও এম. এল. এ. থাকা যে আমার পোষাবে না—এটা আমি ভাল করেই বুঝেছিলাম। গণসংগঠনের কাজ, জিলায় জিলায় ঘোরা—এসব করার পর পাড়ার দৈনন্দিন প্রত্যাশাপূরণের মতো ক্ষমতা আমার আর ছিল না।

এইসব নানা কারণেই তৃতীয় নির্বাচনে আমি কালীঘাটে হেরে গিয়েছিলাম। অবশ্য অন্য একটি বড় কারণও ছিল এবং হেরে গিয়ে কেন আমি খুশি হয়েছিলাম, সে কাহিনী ভিন্নতর।

আপাতত আবার বিশ্বনারী সঙ্ঘের দশম বর্ষ পূর্তিউৎসব ঘটা করে করার ডাক এলো। আমি পুনর্বার যথারীতি তাতেই ডুবে গেলাম।

একটি হত্যাকাণ্ড ও সমিতির ভূমিকা

বিশ্বনারী সংঘের উৎসবের কথা বলার পূর্বে একটা ঘটনার কথা লেখা দরকার। ১৯৫৭ সনের নির্বাচন হয়ে যাবার কয়েক মাস পরে হাওড়া জিলায় একটা মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে। কমরেড ইলিয়াস-এর নির্বাচনী এলাকার কোন এক গ্রামে এই বেদনাদায়ক ব্যাপারটা ঘটেছিল। ওখানকার বিধানসভা কেন্দ্রে একজন ফরোয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী নির্বাচনে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি জয়লাভ করেছিলেন কিনা ঠিক মনে নেই। তাঁর সমর্থনে ওখানকার একজন যুবক অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে কাজ করেছিলেন। ঐ যুবকটি ছিলেন বহুলোকের প্রিয়পাত্র। জনকল্যাণমূলক কাজের জন্য তার সুনামও ছিল। পাড়ার ছেলেদের সহায়তা নিয়ে তিনি ওখানে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের একটি কো-অপারেটিভ স্টোর চালাতেন। সরকারী সাহায্য নিয়ে এটা করা হয়েছিল। এই স্টোরে স্থানীয় লোকেরা ন্যায্যদরে জিনিসপত্র কিনতেন। যুবকটি নিজে কোন পার্টির সদস্য ছিলেন না। কিন্তু নির্বাচনে বামপন্থীদের পক্ষেই কাজ করতেন। তার এই জনপ্রিয়তা, বামপন্থীদের হয়ে কাজ করা এবং ঐ কো-অপারেটিভ স্টোরটিই ওখানকার কিছু প্রভাবশালী কংগ্রেসী পাণ্ডাদের আর কিছু ব্যবসায়ীদের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্যবসায়ীরা নিজেদের স্বার্থেই কো-অপারেটিভ স্টোরের বিরোধী ছিল।

এইসব কারণে যুবকটি খুন হয়ে যান বীভৎসভাবে। একদিন রাত্রে খেতে বসেছিলেন তিনি। স্ত্রী পরিবেশন করছিলেন। হঠাৎ বাইরে থেকে একটা দরকারী কথা শোনার জন্য একজন ওঁকে ডাকে। খাওয়া ফেলে উনি উঠে যান। খেয়ে যাবার জন্য স্ত্রীর অনুরোধ উপেক্ষা করে তিনি বলেন, 'ঢেকে রেখে দাও, আমি আসছি।' ভাত ঢাকা পড়ে রইল কিন্তু উনি আর এলেন না। স্বামীর আর্ত চীৎকার শুনে স্ত্রী ছুটে বাইরে এসে দেখেন—বাড়ির পাশের এঁদো পুকুরের কাদায় ফেলে ওকে হত্যা করার চেষ্টা হচ্ছে। স্ত্রী সেদিকে ছুটে যেতেই কয়েকজন লোক তাকে ঠেলে নিয়ে এসে ঘরে বন্ধ করে দিল। ওদিকে খুনী ততক্ষণে ওর ঘাড় থেকে একটা হাত ও উরুর ওপর থেকে একটা পা নামিয়ে দিয়েছে ভোজালীর আঘাতে। একেবারে খুন করার আগেই চীৎকার শুনে লোকজন জড়ো হয়ে যায়। খুনী ওর ঘাড়ে ও কোমরে আরও কয়েকটা কোপ বসিয়ে পালিয়ে যায়।

খুনীরা প্রথমে কো-অপারেটিভ অফিস ঘরে ওর খোঁজে গিয়েছিল। সেখানে তখন দুটি ছেলে হিসাবপত্রের কাজ করছিল। ওখানে ওকে না পেয়ে ওরা বেরিয়ে আসে। ছেলে দু'টি কোনমতে পালিয়ে এসে একজন ছুটল থানায়, অন্যজন কমরেড ইলিয়াস-এর কাছে। গ্রামের লোকেরা যুবকটিকে প্রায় মৃত অবস্থায় তুলে এনে পুকুর পাড়ে মাদুরের উপর শুইয়ে দেয়। স্ত্রী, মা ও আত্মীয়-বন্ধুরা ছাড়া পেয়ে ওর কাছে ছুটে আসে। যুবকটি তখনও জীবিত। তিনি জল চাইছিলেন, পরে খেতেও চাইলেন। বলেছিলেন, 'খিধে পেয়েছে কিছু খেতে দাও।' তার স্ত্রী দুধ ও জল খাওয়ান। এর কিছুক্ষণ পরেই তিনি চোখ বুজলেন।

ইতিমধ্যে ইলিয়াস সাহেব থানা থেকে ও. সি. এবং পুলিস নিয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন। খুনীর বাড়ি ছিল ঐ এঁদো পুকুরের অপর দিকে। লোকেরা বলে দিতেই ও. সি. পুলিস নিয়ে গিয়ে আসামীকে ধরেন। ভোজালী আর রক্তাক্ত জামাটিও পাওয়া গেল। এরপর আসামীকে হাতকড়া লাগিয়ে পুলিস নিয়ে গেল থানায়।

আসামী ওখানকার নামকরা জোতদার। সে একটা দোকানের মালিক এবং কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট পাণ্ডা।

ইলিয়াস সাহেব দু'দিন পরে ঘটনাটা আমাদের জানালেন। খবর শুনে আমরা সমিতির কর্মীরা সেদিনই ওখানে চলে যাই। মৃত যুবকটির মা, স্ত্রী ও দু'টি শিশু-সন্তানকে দেখে আমাদের কর্মীরা সকলেই মুহ্যমান। পরদিন সমিতির পক্ষ থেকে একটি বিবৃতি লিখে আমি 'যুগান্তর' সম্পাদক শ্রীবিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পাঠাই। তাঁকে অনুরোধ জানাই সম্পাদকীয়তে তিনি নিজেও যেন কিছু লেখেন। ঐ বিবৃতি এবং পরে এক তীব্র সম্পাদকীয় 'যুগান্তর' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সম্পাদকীয়টি আমরা হ্যাণ্ডবিল আকারে পুনর্মুদ্রিত করে ঐ গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় ঘরে ঘরে পৌঁছে দিই। সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন পাড়ায় মেয়েদের প্রতিবাদ মিছিল বেরুতে থাকে। সেই পুকুর পাড়ের পার্শ্ববর্তী খালি মাঠে চলতে থাকে মেয়েদের ও গ্রামবাসীদের নিয়ে জনসভা। মাইক লাগানো জনসভার প্রত্যেকটি বক্তৃতাই আসামীর বাড়ি থেকে শোনা যেত।

এরপর আমরা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে সমিতির পক্ষ থেকে যাতে কেসটা বিলম্বিত না হয় এবং অপরাধীর শাস্তি হয়, সেই আবেদন নিয়ে যাই।

আমাদের বিরোধী প্রচার ও আন্দোলন এত উচ্চগ্রামে উঠে যায় যে, আসামীর বাড়ির ছায়াও আর মাড়াতো না কেউ। ওরাও বাড়ি থেকে কেউ বেরুতো না। ওদের তখন একরকম একঘরে অবস্থা।

সমিতি থেকে স্থির করা হয় স্বামীহীনা বধূটির জন্য একটি সেলাই-কল কেনার টাকা তোলা হবে। সংগৃহীত অর্থ তার হাতে তুলে দেবার জন্য সেই পুকুর ধারে গ্রামাঞ্চলের স্ত্রী-পুরুষের একটি মিলিত সভাও ডাকা হলো। মৃতের বৃদ্ধা মা ও স্ত্রীকে সভায় আনা হয়। আমাদের কর্মীরা অনেকেই শোক প্রস্তাবের উপর বলতে উঠে খুনীর প্রতি ধিক্কার জানিয়ে বক্তৃতা করেন। সেদিনের সভায় কনক মুখার্জির বক্তৃতা আজও যেন আমায় কানে বাজে। সে যখন বারে বারে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বক্তৃতা করছিল তখন উপস্থিত মেয়ে-পুরুষেরা সবাই ঘন ঘন চোখ মুছ্‌ছিল।

টাকা দেবার সময় সেই বধূটিকে আর দাঁড় করানো গেল না। আমরা নিজেরাও চোখের জল মুছে বৃদ্ধা মায়ের হাতেই টাকাটা তুলে দিলাম। স্থানীয় কৃষক সমিতির পক্ষ থেকে দেওয়া হলো কিছু জমির দানপত্র।

মাসখানেক বা তারও কিছু পর ইলিয়াস সাহেব আমাদের খবর দিলেন, আসামী নিজের বাড়িতে জামিনে থাকাকালীন অবস্থায় একদিন গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মহত্যা করে। বিচারের জন্য সে আর অপেক্ষা করেনি। লোকটি গ্রামে সম্মানিত ছিল বলে শুনেছি। তার কুকর্মের জন্য লোকের ঘৃণা আর বিতৃষ্ণা এবং আমাদের আন্দোলনের তীব্রতাও তার মনে হয়তো অনুশোচনা সৃষ্টি করেছিল। বোধহয় সবচেয়ে অসহনীয় হয়েছিল তার নিজের স্ত্রীর বিরূপতা। শুনেছিলাম, মহিলাটি নাকি ঐ ঘটনার পর থেকে স্বামীর সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। স্ত্রীর এই তীব্র নীরব ঘৃণা সম্ভবত তাকে আত্মহননের পথে ঠেলে দেয়।

ঘটনাটা আজও মনে করি আর ভাবি, খুনের বদলা খুনে না নিয়ে এ ধরনের প্রতিবাদ আন্দোলন করলে তা বোধহয় হয় আরও অনেক বেশী কার্যকর।

বিশ্বনারী সংঘের স্বর্ণ জয়ন্তী

দশম বর্ষ পূর্তি-উৎসবকে স্বর্ণ জয়ন্তী বলা হয় না। কিন্তু ওঁরা বললেন, তাই আমরাও বললাম।

এবারে সংঘ বিশেষ আহ্বান জানিয়েছিল 'বিশ্ব শান্তি'র জন্য। তৃতীয় মহাযুদ্ধ না বাধলেও, ভিয়েতনামের যুদ্ধ তখনও চলছিল। অন্য নানাস্থানেও অস্ত্রের সংঘাত লেগেই আছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধটা জীইয়ে রাখতে পারলে সব চেয়ে লাভ হয় আমেরিকার। তাহলে অস্ত্র বিক্রী করে সব দেশ থেকে সে টাকা লুটে আনতে পারে। দ্বিতীয় যুদ্ধে আমেরিকা হিরোসিমা ও নাগাসাকিকে শাস্তি দিয়েছিল এ্যাটম্‌বোমা বর্ষণ করে। তারপর থেকে চললো সোভিয়েট ও আমেরিকার মধ্যে আণবিক অস্ত্রের প্রতিযোগিতা। কে কত শক্তিশালী এবং কে কত বেশী অস্ত্র তৈরি করতে পারে তারই যেন পাল্লা চললো। কিন্তু এই প্রতিযোগিতার দরকার কি? এরই গোটাকতক অস্ত্র ছুঁড়ে মারলে তো আমরা গোটা পৃথিবীকেই নিশ্চিহ্ন করতে পারি। তখন কেই বা পয়সা লুটবে আর কেই বা সর্বোচ্চ আসনে বসবার জন্য বেঁচে থাকবে? তার চেয়ে এগুলো বন্ধ করে দিলেই তো হয়।

এই পরিপ্রেক্ষিতে নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাবটা এলো সোভিয়েট থেকে। দুই বৃহৎ শক্তি শক্তিপরীক্ষায় নামলে হার-জিতের প্রশ্ন থাকবে না, পৃথিবীর বুক থেকে উভয়েই মুছে যাবে। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধটা থমকে দাঁড়াল এই অস্ত্রের ভারসাম্যের জন্য। উভয়েই জানত—তারা কেউ কাউকে হারাতে পারবে না। কিন্তু এ অবস্থা সত্যি অসহনীয়। কারণ হিটলারের মতো একটি বদ্ধপাগল যদি এই অস্ত্রের মালিক হয় এবং তা ব্যবহারে উদ্যত হয়, তবে? অতএব সোভিয়েটই আনল নিরস্ত্রীকরণের প্রস্তাব। কিন্তু কে শুনছে সোভিয়েটের কথা? তাই গণআন্দোলন চাই, জনমত চাই। শান্তির ললিতবাণী নয়, যুদ্ধের বিরুদ্ধে জনমতের শাণিত প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

বিশ্বনারী সংঘ এরই একটুখানি দায়িত্ব পালনের ভার দিলেন আমাদের উপর। আবার শুরু হলো সেই শান্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করা। এবার আমরা আরও বিস্তৃত পরিধিতে প্রবেশ করতে পারলাম। আমাদের ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত নয় এমন অনেক নতুন নতুন মহিলা সমিতিও এই স্বাক্ষর অভিযানে আমাদের

সঙ্গে যোগ দিলেন।

আমরা শ্রীযুক্ত জে·সি· গুপ্ত মহাশয়ের বাড়িতে বড় করে অফিস খুললাম। উৎসব-অনুষ্ঠানে নানাবিধ খেলাধূলার প্রতিযোগিতাসহ প্রবন্ধ, অঙ্কন, আবৃত্তি, আলপনা, গান প্রভৃতির প্রতিযোগিতা, শিশুপ্রদর্শনী ও নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান—এর কোনটাই বাকী থাকল না। পার্টি, অ-পার্টি নির্বিশেষে প্রাণ খুলে এই অনুষ্ঠানে সবাই যোগ দিলেন। মানুষের অকাতর দানে আমাদের ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে উঠল। পুষ্পময়ী বসু, সুধা রায়, শান্তা দেব, মীরা দত্তগুপ্ত—এঁরা সবাই কোন না কোন কাজের ভার গ্রহণ করলেন। এই উৎসবে ছাত্রীদের যোগদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। খেলাধূলো ইত্যাদিতে ওরা না থাকলে উৎসবের অঙ্গহানি হতো। বিভিন্ন পাড়া থেকে মেয়েদের জুটিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ানোর দায়িত্বেও ছিল ছাত্রীরাই। বিশেষভাবে গীতা, বাণী, ইলা মিত্র এবং আরও অনেক ছাত্রী একাজের ভার নেয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রতিযোগিতার তদারক করার জন্য ভিন্ন ভিন্ন কমিটি হলো। সেইসব কমিটিগুলোকে মিটিং-এ বসানো, দায়িত্ব বুঝিয়ে দেওয়া এবং তাদের কাজ বুঝে নেওয়া—এ সবের ভার ছিল গীতা মুখার্জীর উপর। গীতা পাগলের মতো দৌড়-ঝাপ করেই খাটত।

উৎসবের পাঁচদিন আগে থেকে সব প্রতিযোগিতার 'হিট' আরম্ভ হয়ে গেল এবং অফিসে তার ফলাফল জমা হতে লাগল। পুরস্কারের জন্য মেডেলের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। অনুষ্ঠান-মঞ্চ থেকে সেই সব পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

ইডেনের ইনডোর স্টেডিয়ামে পাঁচদিন ব্যাপী জমাট উৎসব হলো। যেমন বিশ্বশান্তি সম্পর্কে খ্যাতনামা ব্যক্তিদের বক্তৃতা রোজই থাকত, তেমনি থাকত প্রখ্যাত শিল্পীদের গানের আসর, অভিনয় ইত্যাদি।

উৎসবে নারী-পুরুষ সকলেরই ভিড় জমত। কলকাতায় ভালই সাড়া জাগানো গিয়েছিল। শান্তির স্বাক্ষর সংগ্রহ করে আমরা বিশ্বনারী সংঘের কাছে পাঠালাম। সোভিয়েট দেশে অনুষ্ঠিত বিশ্ব সম্মেলনে আবার গেলেন আমাদের ডেলিগেটরা।

শান্তি-আন্দোলন আমাদের দেশের নানা প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে নানাভাবে প্রায় প্রতি বছরই কিছু না কিছু হয়। অন্যসব দেশেও হয়। কিন্তু এর ফলে যুদ্ধ থামছে কি? ভিয়েতনামের উপর বর্বরতা কে ভুলতে পারে? আক্রমণকারী দেশের মানুষেরা যদি নিজের দেশে জোরালোভাবে শান্তি-আন্দোলন করতে পারে তবেই হয়তো যুদ্ধ ঠেকাতে পারে।

হলোও তাই। শান্তি-আন্দোলন শুরু করলেন সাম্রাজ্যবাদী দেশের

মানুষেরাই। ভিয়েতনাম যখন মার্কিন দেশের সৈন্যদের কবরখানায় পরিণত হলো তখনই আমেরিকায় শান্তি-আন্দোলন শুরু হলো। বিরাট বিরাট শান্তি-সমাবেশ ও শান্তি-মিছিলে মেয়েরাই নিয়েছিলেন অগ্রণীর ভূমিকা। তাঁরা তাঁদের স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধের বলি হতে কিছুতেই পাঠাবেন না, এই ছিল তাঁদের রণধ্বনি। স্কুল-কলেজের ছেলেদের ধরে ধরে যুদ্ধে পাঠানো হচ্ছিল। তাই মায়েরাই বিদ্রোহ করলেন। মেয়েদের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেরাও যুদ্ধের বিরুদ্ধে মুখর হয়ে উঠল। সেনা-বিভাগের নিয়োগপত্রগুলি ছিঁড়ে কুচি কুচি করে তারা বাতাসে উড়িয়ে দিতে লাগল। হাজারে হাজারে ছেলেদের জেলে আটক করা হলো, তবু তাদেরকে যুদ্ধে পাঠানো গেল না। কত ছেলে দেশ ছেড়ে পালিয়েও গেল।

ভিয়েতনাম-যুদ্ধে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তিকে নতজানু হয়ে ফিরে আসতে হলো। এর সর্বপ্রধান কারণ—ভিয়েতনামের অজেয় দেশপ্রেম, অভূতপূর্ব আত্মদান এবং অমর নেতা হো-চি-মিনের নেতৃত্ব, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমেরিকার শান্তি-আন্দোলনের প্রবল শক্তিও নিক্‌সন ও ফোর্ডদের কম ঘায়েল করেনি। অস্ত্র থাকলেই হয় না—তাকে ব্যবহার করবার মতো লোক তো চাই। সেই লোকেরাই বেঁকে বসে ভিয়েতনামীদের জয়ী হতে সাহায্য করল। তারপরে নিক্‌সন-ফোর্ডের অপকর্মের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ জিমি কার্টারকে জেল থেকে তথাকথিত অবাধ্য ছেলেগুলিকে মুক্তি দিতে হয়েছিল। দেশ ছেড়ে যারা চলে গিয়েছিল তাদেরও ফিরিয়ে নিতে হয়। শান্তি-আন্দোলন এভাবেই জয়ী হলো।

আন্তঃপার্টি সংগ্রাম

ইতিমধ্যে পার্টির ভিতরে আবার নীতি ও কৌশল নিয়ে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো। অবস্থার পরিবর্তন ঘটলে পার্টির নীতি বদলাতে হয়, এটাই স্বাভাবিক। এর ফলে পার্টির অনুসৃত পথের ভুলভ্রান্তি শুধরে নেবার সুযোগ ঘটে।

নেহরু সরকারের দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশিত হবার পর আমাদের নীতি নিয়ে তাই আর একবার আলোচনার প্রয়োজন দেখা দিল।

পরিকল্পনায় এমন কতকগুলো বিষয় ছিল, যা আমরা চাইছিলাম। এ নিয়ে আমাদের প্রচারও চলছিল দীর্ঘদিন ধরে। পরিকল্পনায় এবার বলা হলো : ১) বিশ্বশান্তি ভারতের কাম্য। ভারতের অগ্রগতির জন্য শান্তির পরিবেশ প্রয়োজন। সোভিয়েটের সঙ্গে বন্ধুত্বও ভারতের কাম্য ; ২) রাষ্ট্রীয় মালিকানায় শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করা হবে ; ৩) শিল্পের বিকাশ ও কৃষি-উন্নয়নের জন্য সামন্ত-তন্ত্রের অবসান ঘটানো প্রয়োজন।

এই তিনটি বিষয়ের প্রত্যেকটি সম্পর্কে পার্টি অবশ্যই একমত। পার্টি সব সময়ে সরকারের এই সব কাজ সমর্থন করবে। কিন্তু দ্বন্দ্ব উপস্থিত হলো আমাদের সহযোগী কারা হবে, তাই নিয়ে। আমাদের মূল সংগ্রাম কার বিরুদ্ধে এবং সেই সংগ্রামে কারা আমাদের সাথে থাকবে—এই নিয়ে বিতর্ক শুরু হলো। পার্টির একাংশের মতে—জাতীয় বুর্জোয়া, শ্রমিক, মধ্যবিত্ত ও কৃষক—এরা অবশ্যই আমাদের সহযোগী। কিন্তু এবার আমাদের পরিধি আরও বাড়াতে হবে। কংগ্রেসের মধ্যে যে অংশের নেতৃত্ব করেন পণ্ডিত নেহরু, সেই অংশের সঙ্গেও আমাদের সহযোগিতা করতে হবে। কারণ, কংগ্রেসের সব অংশ পরিকল্পনায় বর্ণিত প্রগতিশীল কর্মসূচীগুলি সমর্থন করবে না। অথচ এর সার্থক রূপায়ণ আমরা চাই। তাই কংগ্রসের প্রগতিশীল অংশের সঙ্গে আমাদের সহযোগিতা প্রয়োজন।

নেতৃত্বের এই অংশ তাদের পরিকল্পিত নতুন সহযোগী নিয়ে গঠিত ফ্রন্টের নাম দিলেন 'ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট'। পরে শুধু 'ন্যাশনাল ফ্রন্ট' নামটাই চালু থাকল।

আর অপর অংশের মতে—নেহরু সরকার দেশের বৃহৎ পুঁজিপতি ও একচেটিয়া মালিকগোষ্ঠীর প্রতিভূ। পরিকল্পনায় প্রগতিশীল কর্মসূচী থাকলেও

এই সরকারের সঙ্গে ফ্রন্ট গঠন সম্ভব নয়। এই অংশের পরিকল্পিত 'ডেমোক্রাটিক ফ্রন্টে' জাতীয় বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, শ্রমিক, কৃষক—এই সব শ্রেণী অবশ্যই থাকবে, এমন কি কংগ্রেসের অভ্যন্তরস্থ গণতান্ত্রিক চেতনাসম্পন্ন মানুষদের সহযোগিতাও কাম্য। কিন্তু সরকারের শ্রেণীচরিত্র বিবেচনায় এর কোন অংশের সঙ্গেই সার্বিক সহযোগিতা অসম্ভব ব্যাপার।

এই দুই মতের পক্ষে-বিপক্ষে আলোচনা ও তর্ক-বিতর্ক শুরু হয়ে গেল এবং ধীরে ধীরে উত্তাপ সৃষ্টি হতে লাগল।

তত্ত্বগত আলোচনা আমার খারাপ লাগত না। কারণ, এর মাধ্যমে অনেক বিষয় জানতে ও বুঝতে পারতাম। কিন্তু উত্তাপটা ভাল লাগত না।

তাছাড়া পার্টিতে শুধু তো তত্ত্বগত আলোচনা নিয়ে কেউ থাকত না, দৈনন্দিন কাজের ব্যাপারে ছোট-খাটো প্রতিটি বিষয় নিয়েই প্রাদেশিক কমিটির মিটিং-এ মতের অমিল হতে থাকল। বোঝা যেত, দু'টি পরস্পরবিরোধী দৃষ্টিকোণের সতর্ক প্রহরায় প্রতিটি বিষয়ের চুলচেরা বিশ্লেষণের ফলে বিষয়টি ঘুলিয়ে উঠছে। তাত্ত্বিক তর্কের কথাটা মনে না থাকলে হয়তো এই সব বিষয় সহজেই মীমাংসা হয়ে যেত। কিন্তু তা হতো না। শেষ পর্যন্ত ভোটাভুটির শরণ নিতেই হতো। এছাড়া তখন আর উপায়ও ছিল না। আমার খারাপ লাগত পার্টির ক্ষতির কথা চিন্তা করে। মনে হতো, প্রত্যেক ভোটাভুটির পরই পার্টির দুই অংশের মধ্যে ফারাকটা যেন একটু একটু করে বেড়ে যাচ্ছে। এই জন্য এসব মিটিং আমার ভাল লাগত না। মনটা যেন বিষণ্ণ হয়ে যেত। ভোটে অনেক সময় নিরপেক্ষ থাকতাম, নয়তো থাকতাম সংখ্যা গরিষ্ঠদের সঙ্গে।

শুধু এও নয়। সোভিয়েট পার্টির বিংশতি কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৬ সনের শেষ দিকে। 'নিউ ইয়র্ক টাইম্‌স্‌' পত্রিকায় তার একটা রিপোর্ট বেরিয়ে যায়। ঐ রিপোর্টে যেসব কথা প্রকাশিত হয় তা বিশ্বাস করা আমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। সুতরাং মার্কিনী প্রচার মনে করে ওটা নিয়ে প্রথম দিকে আমরা মাথা ঘামাই নি। কিন্তু '৫৭-র নির্বাচনের পরে সোভিয়েটের কাগজপত্র পাওয়া গেল। বিংশতি কংগ্রেসে স্টালিন সম্পর্কে এমন সব তথ্য প্রকাশ পেল, যা আমাদের প্রায় হতবাক করে তুললো। সোভিয়েট পার্টি-নেতৃত্বের অভ্যন্তরে পরস্পরের প্রতি সন্দেহ, ঘৃণা এবং হত্যার সংবাদ যেভাবে বিবৃত হলো, যেভাবে সাধারণ পার্টি কর্মীদের ও দেশরক্ষার সংগ্রামে লিপ্ত এক সময়ের বীর নেতা ও সৈনিকদের উপর নিছক সন্দেহবশে উৎপীড়ন করার সংবাদ জানা গেল, তাতে সোভিয়েট পার্টি-নেতৃত্ব, বিশেষ করে স্টালিনের প্রতি শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের মূলে

যে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি লাগল, একথা বলা যায়।

১৯৫৪সনে সোভিয়েট সফরকালে আমাদের দোভাষী তানিয়ার সেই কথাটা কেবল আমার কানে বাজতে লাগল—'অল ইজ নট ওয়েল হিয়ার'। তানিয়াকে এখন আর খুঁজে পাব না। কারণ এক বছর আগেই জেনেছিলাম, একটি মহিলা ডেলিগেশনের সঙ্গে নরওয়ে যাবার পথে সে নিহত হয় বিমান দুর্ঘটনায়।

সোভিয়েটের এইসব ব্যাপার নিয়ে আমাদের পার্টিতেও অস্বস্তি দেখা দিল। পার্টির একাংশের মধ্যে সোভিয়েট পার্টির ঐসব তথ্য উদ্ঘাটনে বিরূপতা ও তার সত্যতা সম্পর্কে ঘোর সন্দেহ দেখা গেল। অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের পার্টিটা এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিভাবে উপর থেকে নীচ পর্যন্ত দু'ভাগ হয়ে গেল, তারই অশোভন রূপ দেখলাম কালীঘাটের একটি এলাকার পার্টি অফিসে। ঘরের দেওয়ালে একখানা ছবি টাঙ্গানো ছিল। সেই ছবি লেনিন, না ক্রুশ্চেভের —সেটা আমি দেখিনি। ঘরে কি একটা আলোচনা হচ্ছিল, হঠাৎ ঐ এলাকার একজন কর্মী ঘরে ঢুকে কোন দিকে ভ্রূক্ষেপ না করে সোজা দেওয়ালের দিকে গেল এবং একটা চেয়ারে উঠে টাঙ্গানো ছবিটিকে নামিয়ে স্টালিনের একখানা ছবি সেখানে টাঙ্গিয়ে দিয়ে চলে গেল।

ঘটনাটা খুবই ছোট। কিন্তু আমার মনে হলো—এসব আমরা করতে যাব কেন? যেখানকার ঘটনা সেখানে কেউ প্রতিবাদ বা আপত্তি করল না, আর আমরা এখানে মাথা খুঁড়ে মরছি! এটা বিশ্বাস-অবিশ্বাস কিংবা তর্কের ব্যাপার নয়, একটা গুরুতর ঘটনা। সে দেশে যদি এসব ঘটেই থাকে তবে তা থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা ছাড়া আমাদের আর কি করণীয় আছে? লেনিনের প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট পার্টিতে দ্বিতীয় পুরুষেই যদি এসব ঘটনা সম্ভব হতে পারে, তবে সেই ভয়ঙ্কর বাস্তবের আশঙ্কা থেকে আমাদের পার্টিকে সযত্নে রক্ষা করাই তো আমাদের কর্তব্য। আমাদের সাবধান হতে হবে, যাতে এসবের কোন লক্ষণ পার্টির মধ্যে প্রবেশ করতে না পারে। সেই সব কথা চিন্তা না করে কেন আমরা এই অকারণ তিক্ততার সৃষ্টি করছি।

ধাক্কাটা অবশ্য সোভিয়েট পার্টি সামলে নিল। যাঁরা বিংশতি কংগ্রেসে স্টালিনের শেষ বয়সের মতিভ্রমের কথা প্রকাশ করেছিলেন, নতুন নেতৃত্বে তাঁদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হলো। ব্যক্তিপূজা ও নেতার প্রতি অন্ধভক্তি যে কতবড় ক্ষতিসাধন করতে পারে, সোভিয়েট পার্টিকে তা বুঝতে হয়েছে বহু ক্ষয়ক্ষতি আর প্রাণবলির বিনিময়ে। এবারে নতুন নেতৃত্ব ব্যক্তিপূজা ও অন্ধভক্তির বিরুদ্ধে প্রচার শুরু করলেন। পার্টির আরও দুটো কংগ্রেস হয়ে গেল। ২২তম

কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মুসোলিয়ম থেকে স্টালিনের মৃতদেহ তুলে নিয়ে কবর দেওয়া হলো। আরও কিছুকাল পরে স্টালিনের জীবনীও পাল্টে নতুন করে লেখা হলো!

অনেক বছরের ব্যবধানে সোভিয়েটের ঘটনা চীনের পার্টিতেও ঘটল—আর সেটা ঘটল বেশ ভয়ঙ্কররূপে এবং প্রথম পুরুষ মাও-সেতুং-এর জীবৎকালেই। বোঝা গেল, সোভিয়েটের শিক্ষা তাদের কোন কাজে লাগেনি। কিন্তু পৃথিবীর সমস্ত দেশের পার্টিকে চীনের ঘটনা থেকেও দ্বিতীয় বার শিক্ষা নিতে হলো। পৃথিবীতে সম্ভবত কোন পার্টি-নেতৃত্বের প্রতি নির্বোধ আর অন্ধভক্তির অর্ঘ্য অতঃপর কোন দিন নিবেদিত হবে না।

এসব সত্ত্বেও আমাদের পার্টি বেশ কিছুকাল স্টালিনের ব্যাপারে বিভ্রান্তির শিকার হয়ে রইল।

এইসব মতান্তর-মনান্তর ও তর্ক-বিতর্ক এবং ভোটাভুটি আমাকে ক্রমশই বিরক্ত করে তুলছিল। আমার কেবলই মনে হতো এর সবটাই বিশুদ্ধ তাত্ত্বিক ব্যাপার নয়। সেই ১৯৪৮-এর ভ্রান্তনীতির ফলে নেতৃত্বের মধ্যে যে ব্যক্তিগত রেষারেষি ও প্রতিক্রিয়া শুরু হয়েছিল, এ যেন তারই জের।

আমার মনটা যখন এই স্তরে ঘুরপাক খাচ্ছে তখন ১৯৫৮ সনে অমৃতসর পার্টি কংগ্রেসে যাবার জন্য আমি প্রতিনিধি নির্বাচিত হলাম। প্রতিবার কংগ্রেসে আমিই যাই মেয়েদের মধ্যে। এটা আমার পছন্দ হতো না। এবার আমি চাইছিলাম পঙ্কজ আচার্যকে নেওয়া হোক আমার বদলে। সে তখন মহিলা সমিতির সম্পাদিকা আর পার্টি কংগ্রেসে আমরা তো কিছু শিখব বলেই যাই। সুতরাং মহিলা কর্মীদের মধ্য থেকেও এক-একবার এক-একজনের যাওয়াই সঙ্গত। কিন্তু পার্টি নেতা বললেন—সে হতে পারে না, আপনি না গেলে অন্য ডেলিগেটের অভাব হবে না। বুঝলাম, ভোটের জন্যই এই আপত্তি। একটা ভোট অন্য দিকে গেলেও এ-পক্ষের হেরে যাবার কোন ভয় ছিল না। তবু ভিন্নমতের সহকর্মীর প্রতি এত বিরূপতা?

আমার মন ক্ষুব্ধ হয়ে উঠল। বলে দিলাম, 'আমি যাব না।' কিন্তু শুধু আমার মনোভাবে কি হবে? পার্টির অপরাংশের নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গীতেও কি এর কোন ব্যতিক্রম ছিল?

মহিলা সমিতিতে আমাদের মধ্যে তর্ক হতো না, তা নয়। তবে মোটামুটি এটা আমরা মেনে নিতাম যে আমাদের মঞ্চটা হবে ব্যাপকভিত্তিক গণতান্ত্রিক মঞ্চ। কারণ, নারী হিসেবে কতকগুলি মৌলিক দাবীতে উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের

সঙ্গেও আমাদের মিল আছে। কিন্তু ভাবলেই কি আর সব কিছু হয়? একটু উপরতলার মেয়েদেরই বা আমরা আনতে পারতাম কোথায়? কমিটি মিটিং-গুলোতে তো আমরা ক'জন বাদে আর শুধু চেয়ার-টেবিলই উপস্থিত থাকত। তবুও তর্ক উঠত—সমিতির কমিটি বা 'ঘরে-বাইরে'র কমিটি গঠন নিয়ে। কোন ফাঁকে আবার কোন বুর্জোয়া এসে পড়েন—সেই ভয়ে আমরা যেন সন্ত্রস্ত থাকতাম। সন্দেহ নেই, এর ফলে আমাদের পরিধিটাও যেন ছোট হতে থাকল।

তথাপি সমিতিতে আমাদের কোন দিন ভোটাভুটি করতে হতো — [illegible] না। একমত হয়েই আমরা সব কিছু করতাম। আমাদের কর্মীদে[illegible] পরস্পরের প্রতি আত্মীয়তা ও মমত্ববোধে কোন ফাটলও লক্ষ্য [illegible]চর হতো না।

কিন্তু পার্টি-নেতৃত্বের মধ্যে [illegible] বড় বেশী প্রকট হয়ে উঠছিল। ধীরে ধীরে বুঝতে পারছিলা[illegible]—পার্টিতে আমি আর সংখ্যাগরিষ্ঠের খুব কাছের মানুষ নই। [illegible] ছোট খাটো ব্যাপারেও চোখে পড়ার মতন হতে লাগল।

আইন সভায় প্রত্যেকটি অধিবেশনেই আমার নাম বক্তার তালিকায় থাকত। আমি কিছু বললে কাগজগুলো অল্প হলেও তা উল্লেখ করত। কিন্তু ১৯৬০-৬১ সনের একটা বছরে আমি মাত্র ৭ মিনিট বক্তৃতা করেছিলাম। তখন আমাদের সদস্য সংখ্যা অনেক এবং তার মধ্যে সুবক্তাও ছিলেন অনেকে। সময় নিয়ে তাই টানাটানি ছিলই। ফলে তালিকা তৈরি করা কঠিন হতো। এজন্য কিনা জানি না, কিন্তু আমার নামটা সেই তালিকায় থাকত না। এ নিয়ে কাউকে আমি অনুরোধও করতে যাইনি। বরং কোন কাজ যখন নেই, তখন ঘণ্টা ছয়েক সভায় বসে থেকে নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে আসতাম।

মুশকিলে পড়তাম প্রেস রিপোর্টারদের নিয়ে। রঞ্জিত রায়, অমিতাভ চৌধুরী (বর্তমানে ম্যানিলায়), প্রয়াত গোবিন্দ সেন প্রভৃতির সামনে পড়লে ওঁরা বলতেন, 'কি, মুখে কুলুপ এঁটেছেন নাকি? কিছু বলবেন না বলেই কি ঠিক করেছেন?' ইত্যাদি। ব্যাপারটা সেক্রেটারিয়েট সদস্যদের মধ্যে মাত্র একজনকেই জানিয়েছিলাম।

আর একটা ঘটনার কথাও মনে পড়ে। একদিন আইনসভা থেকে ফিরবার সময় ঝড়-জলে খুব বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম। সন্ধ্যার অন্ধকারে বেরিয়ে দেখি সর্বত্রই জলমগ্ন। পার্টির গাড়িটা তখনও দাঁড়িয়ে, দেখলাম সেটা ভর্তি হয়ে গেছে। অত জলে সেটাই স্বাভাবিক। আমাকে দেখে সবাই যেন একটু উসখুস করলেন, কিন্তু ডাকলেন না কেউ। হয়তো জায়গা ছিল না বলেই। অবশ্য আমাকে

নিয়ে গাড়িতে জায়গার প্রশ্ন আগে কখনও ওঠেনি। কারণটা সহজ, এটা হলো একজন মহিলার প্রতি সৌজন্য প্রদর্শন মাত্র। কিন্তু এবারে এ বিষয়ে তাঁদের একটু দ্বিধা দেখে আমিই লজ্জা পেয়ে চট্ করে সরে গেলাম এবং জল ভেঙে হেঁটে বাড়ি ফিরলাম। বোধহয় এমনিই ঘটে। সব পার্টিতেই বোধহয় মতপার্থক্য ঘটলে দূরত্ব সৃষ্টি হয়ে যায়। কিন্তু আমার তো এইখানেই আপত্তি। পরদিন একজন আমাকে অবশ্য বলেছিলেন, 'আপনি কোথায় চলে গেলেন? আমরা আপনাকে খুঁজেছিলাম।' ভাবলাম, স্বাভাবিক সৌজন্যবোধটা যখন প্রথম চিন্তায় আসেনি তখন কি আর খুঁজে পাওয়ার জন্য দ্বিতীয় চিন্তা পর্যন্ত অপেক্ষা করা শোভন হতো আমার পক্ষে?

কিন্তু কেন এমন হয়? রাজনীতি কি এর উর্ধ্বে উঠতে পারে না? আমার কেমন যেন ভয় করত। পার্টি কি তবে ভাঙনের মুখে? আমারও আয়ু কি তবে ফুরিয়ে এসেছে?

এমনি যখন আমাদের নিজেদের অবস্থা তখন হিমালয়ের অপর পার থেকে আমাদের মাথায় হঠাৎ যেন বজ্রপাত হলো। এজন্য পার্টি সত্যিই একেবারে প্রস্তুত ছিল না।

ভারত-চীন সংঘাত

আমাদের রাজনৈতিক ভাগ্যাকাশে, বোধহয় শনির দশা উপস্থিত হলো। নয় তো ভারতের সঙ্গে চীনের সংঘাত লাগতে যাবে কেন? মাও-সেতুং, চু-এন-লাই তখন নমস্য আন্তর্জাতিক নেতা। শুধু কমিউনিস্ট পার্টিই নয়, ভারতের বিশাল জনসমুদ্র তখন সমাজতান্ত্রিক চীনের দিকে তাকিয়ে ছিল এবং তারা ভাবত কবে আমরাও এমনটি হতে পারব। ভারত সরকারের সঙ্গেও চীনের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব। হিন্দি-চীনী ভাই-ভাই শব্দে দুই দেশ মুখরিত। ভারত থেকে পদস্থ সরকারী ব্যক্তিরা কৃষি-বিষয়ে, শিল্প-বিষয়ে চীন কি করে এত এগিয়ে গেল—এসব দেখবার জন্য ডেলিগেশনে যেতেন। ফিরে এসে তাঁরা শুধু তাঁদের অগ্রগতি নয়, তাঁদের পদ্ধতির পর্যন্ত অকুণ্ঠ প্রশংসা করতেন। ডাঃ আর. আহমেদ ছিলেন তখনকার কৃষিমন্ত্রী। উনি নিজে ডাঃ রায়ের উদ্যোগে একটি ডেলিগেশান নিয়ে চীনদেশে গিয়েছিলেন। ফিরে এসে চীনের কৃষি-ব্যবস্থার উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন। আমি ওঁদের বাড়ি যেতাম। ওঁর মুখে চীনের অনেক সাফল্যের গল্পও শুনেছি। সরকারী প্রতিনিধি ছাড়াও দলে দলে আরও অনেক লোক তখন চীন ভ্রমণে যাচ্ছেন। চীন ও আমাদের দেশের মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। বৃহৎ দেশ, বিপুল জন-সংখ্যা ও দুটিই কৃষিপ্রধান দেশ। উপরতলার লোকেরাও ক্রমশ ভাবতে শুরু করলেন—কি সে পথ, যে পথে চীন এত অল্প সময়ে আমাদের চেয়েও জনসংখ্যায় পিষ্ট দেশের মানুষের মুখে দুমুঠো ভাত বেশী দিতে পেরেছে? ভারতের প্রধান-মন্ত্রী জওহরলাল নেহরু এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রী কৃষ্ণমেননও চীনের পরম বন্ধু ছিলেন। চীনের কাছ থেকে কখনও তাঁদের কোন বিপদ আসতে পারে এটা তাঁরা একবারও ভাবেননি। বরং চীনের কাছ থেকে আমরা অনেক বিষয় জানতে পারব—এটাই ছিল তাঁদের ধারণা।

চীনের সঙ্গে হিমালয়ের উপরে একটা সীমান্ত চিহ্নিত হয়ে আছে ব্রিটিশ আমল থেকেই। আমরা স্বাধীন হয়েছি ১৯৪৭ সনে, আর গৃহযুদ্ধ সমাপ্ত করে সমাজতান্ত্রিক চীনের প্রতিষ্ঠা আমাদের স্বাধীনতার দু'বছর পরে, ১৯৪৯ সনে। তারপর থেকেই দু'দেশের মধ্যে সুদৃঢ় বন্ধুত্বের সম্পর্ক।

কিন্তু ১৯৫৮ সন থেকে কী যে হলো! ওই সীমান্তরেখা নিয়ে দু'দেশের শান্তি ক্রমশ অশান্তিতে পরিণত হতে থাকল। সোভিয়েটের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্বের

সম্পর্কটা চীন ভাল চোখে দেখেনি। কারণ, ঐ দুই দেশের পার্টি ও সরকার তখন আর বন্ধু নয়। কেন বন্ধুত্ব ক্রমশ ঘোর শত্রুতায় পরিণত হলো—তার বিবরণী দেবার স্থান এটা নয়। শুধু চোখের উপর দেখালাম—কোথায় গেল দুই বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক দেশের আন্তর্জাতিক মৈত্রী ও একতা, আর কোথায়ই বা গেল সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে উভয়ের মিলিত সংগ্রামের প্রতিজ্ঞা।

সোভিয়েটের সঙ্গে ভারতের সুসম্পর্কই কি চীনের এই উগ্রমূর্তি ধারণের কারণ? জানি না। যে চীনকে আমরা এত ভালবাসি, যে দেশের সাধারণ মানুষদেরও আমরা প্রশংসা করি—দেশগঠনে তাদের কঠোর পরিশ্রম ও সহিষ্ণুতা দেখে—তারই সঙ্গে লেগে গেল আমাদের হিমালয়ের উপরে অবস্থিত সীমানা নিয়ে বিতর্ক ও বৈরিতা? ১৯৫৯ সনে লাদাকে প্রথম অস্ত্র নিক্ষিপ্ত হলো চীনা রক্ষীদের পক্ষ থেকে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীদের উপর। পাল্টাপাল্টি গুলি বিনিময় হলো কিছুদিন। হতাহত হলো দু'পক্ষেরই কিছু সীমান্তরক্ষী। অবশেষে চীন ঘোষণা করে বসল—ভারতবর্ষ সাম্রাজ্যবাদী দেশ। আমরা আছি বেশ, আমরা যে কি তা আমাদের জানতে হবে অন্যদেশের কাছ থেকে!

ভারত সরকার সীমান্তের দাবী, অর্থাৎ ম্যাকমোহন লাইন ছাড়তে নারাজ। আর চীন সরকারের দাবী যে কোন্ পর্যন্ত পৌছাল সেটা বুঝতে গিয়ে তো চেঙ্গিস্ খাঁর ভারত-অভিযানের ইতিহাসও ঘাঁটাঘাঁটি করা শুরু হয়ে গেল। সীমান্ত নিয়ে লড়াই যদি এত দূরই পৌছায় তাহলে ভারতও তো শ্রীলংকা দখল করে বসে থাকতে পারত। ইতিহাস তো বিজয় সিংহ-র 'হেলায় লঙ্কা করিল জয়' বলেই বীরত্ব কীর্তন করেছে। কিন্তু ইতিহাসে কি এই দাবী চিরকাল বহাল থাকে? অবস্থার পরিবর্তনে সীমান্ত-রেখার পরিবর্তন তো কত দেশেই কত হয়।

কিন্তু আমাদের পার্টির দুর্ভাগ্য যে তার উপরই ভার পড়ল অন্যায়টা চীনের নয়—ভারতের, একথা প্রচার করবার। প্রচারে আমাকেও বেরুতে হবে। ভেবে ভেবে যেন আর কুল পাই না। না হয় ভারত সরকারের কিছু অন্যায় দাবী থাকলই। কি এসে যায় তাতে? চীন কি শুধু ভারত সরকারকেই দেখল? ৫০ কোটি জনতার সমুদ্রও তো ছিল! চীনের প্রতি তাদের শ্রদ্ধা-ভালবাসার উত্তাল তরঙ্গ চীন সরকার কি দেখতে পেলেন না? ভারত সরকার সাম্রাজ্যবাদী হয়ে কা'কে দখল করবে? চীনকে? চীন কি জানত না অস্ত্রবলে তখন ভারত সরকার কতটুকু বলীয়ান? আর সাম্রাজ্যবাদী যদি হয়ই তবে তো পাকিস্তানের উপরেই ভারত সরকারের ঝাঁপিয়ে পড়া স্বাভাবিক ছিল। কারণ দেশভাগের ক্ষতটা থেকে তখনও যে তাজা রক্ত ঝরছে! ইতিহাস-ভূগোল দেখিয়ে অনেক

ইতিহাসবিদই তখন চীনের দাবীকে ভারতের উত্তর খণ্ডের প্রায় অনেকটা পর্যন্তই পৌঁছে দিয়েছিলেন। কিন্তু ৫০০ বছরের যে ইতিহাস-ভূগোল তা কি ৫০০ বছর পরেও অবিকল থাকে? তবে ভারতকেই বা দু'ভাগ হতে হলো কেন? বার্লিনকেও চোখের উপর দু'ভাগ হতে কেন দেখা গেল? পূর্ব ইউরোপের মানচিত্রটা ৫০০ বছর আগে যা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও কি তাই থাকল? অথবা এখনই কি তাকে আবার সেই ৫০০ বছর আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব? এসব কে বোঝে? আর কা'কেই বা বোঝাব?

তবু চীনের পার্টির প্রতি বিশ্বাসে ও আমার পার্টির নির্দেশে লোককে বোঝাতে গিয়ে আর একবার অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মতো আমিও পশ্চিম বাঙলার জিলায় জিলায় ঘুরতে বেরুলাম এবং আর একবার সাধারণ মানুষের বিরোধিতার মুখে পড়লাম। আমার নিজস্ব এলেকা কালীঘাটেও করলাম অনেক সভা। কতদূর বোঝাতে পেরেছিলাম তা জানি না। দিনাজপুরের বালুরঘাট শহরের মিটিংটার কথা এই প্রসঙ্গে আমার বিশেষ করে মনে পড়ে। গিয়ে শুনলাম—কংগ্রেস এবং আর. এস. পি—কেউই আমাদের মিটিং করতে দেবে না সেখানে। তাদের ভয়ে কোন দোকান একটা মাইক ভাড়া দিতেও রাজী হলো না। আমি সোজা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে চলে গেলাম। জিজ্ঞেস করলাম—'আপনার এখানে জনসভা করা কি নিষিদ্ধ?' উনি বললেন, 'না-তো!' আমি জানিয়ে এলাম—'আমি সভা করব। অশান্তি কিছু হলে আমি দায়ী নই।'

মিটিং-এ মাইক পেলাম না। কিন্তু তাকিয়ে দেখি মাঠ ভর্তি লোক। বালুরঘাটে এত লোক না কি হয় নয় না সাধারণত। বক্তৃতা করতে উঠে বলেছিলাম গণতন্ত্রের কথা। বলেছিলাম—'আমার কথার সঙ্গে শ্রোতাদের কেউ হয়তো একমত হবেন—কেউ বা হবেন না। কিন্তু আমাকে বলতে না দেওয়া কি কারো পক্ষেই গণতন্ত্র ও সৌজন্যের পরিচায়ক হবে? না মাইক বন্ধ করে দিয়ে আমার কণ্ঠস্বরকে বন্ধ করা সম্ভব হবে?'

দেখলাম সভাটা নড়েচড়ে বসল। আমার সীমান্ত-ব্যাপারে যা কিছু বিদ্যাবুদ্ধি ছিল তার সাহায্যে বলতে লাগলাম। আমার গলাটা অবশ্য সভার শেষ প্রান্তে পৌঁছুচ্ছে না। লোকেরা অসন্তুষ্ট হচ্ছে। হঠাৎ দেখলাম আর. এস. পি. তার নিজের মাইক নিয়ে এলো। তারপর সভা ভালই হলো। কি বোঝালাম আর শ্রোতারা কি বুঝলেন জানি না। কিন্তু একটা জিনিস ভাল লাগল। এত বিরাগ সত্বেও আর. এস. পি. তাদের মাইকটা দিলেন এবং পরের দিন কংগ্রেস ও আর. এস. পি. উভয়েই আমাদের কাছ দুঃখ প্রকাশ করে গেলেন। আর

কিছু না হোক, কণ্ঠরোধের অপচেষ্টাটা অন্তত ঠেকাতে পেরেছি বলে আমার আনন্দ হয়েছিল।

আমি তো প্রচার করে বেড়াচ্ছি কিন্তু এদিকে পার্টি-কর্মীরা যে ঝগড়া করে কূল পাচ্ছেন না। সোভিয়েটে স্টালিন-যুগের অবসানের পর আমাদের পার্টিতে কেউ স্টালিনপন্থী, কেউ স্টালিন-বিরোধী তো হয়েই ছিলেন। এর উপর আবার চীনপন্থী ও চীন-বিরোধীতেও তারা দু'ভাগ হয়ে গেলেন। স্টালিনপন্থী ও চীনপন্থীরা এক পক্ষ এবং বিরোধীরা অন্য পক্ষ।

এই অভ্যন্তরীণ খণ্ডিত পার্টি নিয়েই আমরা চলছি। সাধারণ মানুষ একটা চিন্তা নিয়ে বেশীদিন থাকতে পারে না। লাদাকে বা লংজুতে কি ঘটনা ঘটল —তাই নিয়ে বেশী ভাববার অবসর কোথায় মানুষের? হুড়মুড় করে নিত্য নতুন সমস্যা তাদের মাথায় চাপে। তখন সেই সমস্যার মোকাবিলাতেই তাকে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়তে হয়। কমিউনিস্ট পার্টিকেও সেই সব নিয়ে মাথা ঘামাতে হয়।

বস্তুত যুদ্ধের আগে পর্যন্ত ভারত-চীন সীমান্ত-সংঘাত মানুষের মনে তেমন একটা ঝড় তুলতে পারেনি। এর কারণ তাদের নিজেদের সমস্যাই এত প্রবল যে নিজের সরকারের প্রতি দিনে দিনে ভক্তির বদলে বিরক্তিটাই বাড়ছিল। তাই চীনের প্রশ্নটা আপাতত চাপা পড়ল, কংগ্রেসের তরফ থেকে তাকে খুঁচিয়ে তুলতে চাইলেও।

খাদ্য-আন্দোলন ও তৃতীয় নির্বাচন

আবার আমরা দেশজুড়ে দুর্ভিক্ষের মুখে পড়লাম। ব্যাপারটা ১৯৪৩ সনের মতো না হলেও তার কাছাকাছি বটে। দুর্ভিক্ষ তো আমাদের নিত্যসঙ্গী। এসব দেখে দেখে আর দুর্ভিক্ষ-পীড়িত লোকদের কান্না শুনে শুনে যেন গা সওয়া হয়ে গেছে। ক্রমশ দলে দলে গ্রামবাসীরা আবার কলকাতার ফুটপাথে ভিক্ষুকের সংসার পেতে বসতে আরম্ভ করেছে। এও আর চোখে লাগে না। এ নিয়ে আর একখানা 'নবান্ন' নাটক মঞ্চস্থ করলে বোধহয় তা দেখতেও বেশী লোক যাবে না। সুতরাং এর প্রতিকারের জন্য এবার আন্দোলন করাই হলো পার্টির নির্দেশ। সমস্ত বিরোধী দলকে একসঙ্গে নিয়ে এই আন্দোলন হবে।

১৯৫৯ সনেই আবার আমাদের গ্রামে গ্রামে জিলায় জিলায় প্রচারে নামতে হলো। সেই বছরে প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্য নষ্ট হয়েছিল ঠিকই। কিন্তু যা ছিল তা নিঃশব্দে কালোবাজারে চলে যায় আর কাঠের পুতুলের মতো সরকার নীরব দর্শক হয়ে থাকেন—এমন অবস্থা কে কবে দেখেছে? ১৯৪৩ সন থেকে সরকারের যে ব্যাধি তা আজও গেল না। চাল-ডাল-তেল-নুন-চিনিসহ হঠাৎ হঠাৎ যে কোন জিনিসই বাজার থেকে উধাও হয়ে যায়—আর সরকারের সমগ্র শাসনযন্ত্রটি তা খুঁজে বের করতে পারে না। এসব নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস তাঁরা আর জনসাধারণকে সরবরাহ করতেও পারেন না। দেখে দেখে জনসাধারণেরও চোখ খুলেছে। তাঁরা কিছু দিতে পারেন না এবং দেবেন না—এটাই সত্য। কারণ যা-ই থাক্। খাদ্যমন্ত্রী প্রফুল্ল সেনের কাছে তো যাওয়াই যায় না। তিনি সর্বদা রেগেই টং হয়ে আছেন। আইন সভায় কথাটা আমাকে একবার বলতেও হয়েছিল। প্রতিনিধিদল গেলে তাদের সঙ্গে মন্ত্রী হয়ে এমন কটুকথা বলতে আমি আর কাউকেই শুনিনি।

প্রচার শেষে ময়দানে খাদ্যের দাবীতে একটা বিরাট জমায়েত করার কথা। জমায়েতটি দেখে আমরাও বিস্মিত হয়েছিলাম। অস্থিচর্মসার, অর্ধউলঙ্গ দেহ নিয়ে মাঠ জুড়ে বসে আছে আমাদের গ্রামের কৃষককুল—যাদের মেহনতের ফলে আমাদের অন্ন জোটে। আমাদের প্ল্যান ছিল সভাশেষে আমরা রাইটার্স বিল্ডিং ঘিরে বসে থাকব—যতক্ষণ আমরা খাদ্যের প্রতিশ্রুতি না পাই—ততক্ষণ।

কিন্তু খাদ্যমন্ত্রী কেন যে ভয়ে অবশ হয়ে গেলেন তা আমাদের বুদ্ধির অগম্য।

অথচ এই ভুখা মিছিল রাইটার্স বিল্ডিং দখল করতে যায় নি। হাতে তাদের বড়জোর সামান্য একটা চিড়ে-মুড়ির পুটুলি ছিল। আমরা মঞ্চ থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম লাঠি ও বন্দুকধারী পুলিসের কী বিরাট আয়োজন। রাইটার্স বিল্ডিং-এর কাছে যাবার সব পথ রুদ্ধ করে একটা বিরাট যুদ্ধের মোকাবিলা করার জন্যই তারা যেন দাঁড়িয়ে আছে। আমার ভয় হলো, এরা কাদের মারবে? এই পেটে-পিঠে এক-হওয়া মানুষগুলোকে? সভায় তখন প্রচণ্ড গরম বক্তৃতা চলছিল। যেন এই সভা থেকেই আমরা সরকার দখল করতে যাব—ভাবটা এইরকম। আমার খুব খারাপ লাগছিল। মনে হচ্ছিল এই ভাবে বক্তৃতা করা ঠিক নয়। সরকার এদের পেটাবার সুযোগ পা'ক, এ আমি চাইনি। তাই সভায় আমার বক্তব্যে আমি বলেছিলাম, 'আমরা রাজ্য জয় করতে আসিনি, শুধু দু'মুঠো অন্ন চাইতে এসেছি। আমরা কাউকে রক্তচক্ষু দেখাতেও আসিনি—কারো রক্তচক্ষু দেখতেও চাই না। খাদ্যমন্ত্রী যদি শুনতে পান তো স্পষ্টই বলছি—আমরা খাদ্য ছাড়া আর কিছু চাইতে আসিনি। তিনি নিষ্ঠুর হয়ে এদের ফিরিয়ে দিতে পারেন, কিন্তু ইতিহাস কখনও এই ব্যবহার ক্ষমা করবে না।' সভায় বক্তৃতা করতে আমাকেই পাঠানো হয়েছিল। অন্য নেতারা প্রকাশ্যে ছিলেন না। আমার উপর নির্দেশ ছিল বক্তৃতা করেই অলক্ষ্যে সভা ছেড়ে বেরিয়ে আসার। তাই করলাম।

কিন্তু যে ভয় আমি করেছিলাম, সরকার ঠিক সেই কাণ্ডটিই করে বসলেন। সভাশেষে একটা মিছিল রাইটার্সের দিকে পা বাড়াতেই পুলিস তাদের পেটাতে শুরু করল। গ্রামের কৃষক এসেছে কলকাতা শহরে। পালাবার পথঘাটও তারা জানে না। শুধু মুখ বুজে পড়ে পড়ে তারা মার খেল এবং নারী-পুরুষ মিলে সম্ভবত ৮০জনকে খুন করল কংগ্রেসী সরকারের পুলিস বাহিনী। না, এদের মারা হলো বন্দুকের গুলিতে নয়। শুধু লাঠি দিয়ে থেৎলে থেৎলেই এদের শেষ করা হয়েছিল প্রকাশ্য রাজপথে। সরকার বলতে পারেন—এতই যদি তোমাদের দরদ তবে ওদের শহরে এনেছিলে কেন? খাদ্যমন্ত্রীর কাছে খাদ্য চাইতে আসার অধিকারও কি ওদের নেই? না, এ কাজটা মহা অপরাধের? আমরাও জিজ্ঞাসা করি—মন্ত্রীরাই বা কবে রাজতক্ত ছেড়ে এইসব না-খাওয়া মানুষের খবর নিতে গিয়ে থাকেন? রাজতক্তে বসলে কি শুধু মারবার অধিকার জন্মে? খাবার দেবার দায়-দায়িত্ব নেই?

সরকারের পক্ষে এই হত্যাকাণ্ডের ফল যে ভাল হয়নি তা বুঝতে পারা গেল খবরের কাগজগুলির ধিক্কারে। ছবিতেও তারা ঐ নৃশংস হত্যাকাণ্ডের সমস্ত

বীভৎসতা প্রকাশ করে দিল।

সত্যিই এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডে দেশসুদ্ধ লোক শিউরে উঠল যেন। ধিক্কারে ও প্রতিবাদে কলকাতা মুখর হয়ে উঠল। ঐসব শহীদ কৃষক নারী-পুরুষের বীভৎস ছবি ও পোস্টারে দেওয়াল ভরে গেল। কংগ্রেসী শাসকদের আসল রূপ আর গোপন রইল না। এই নিয়ে প্রতিবাদ আন্দোলন চলতে লাগল। কয়েকদিন ধরে জনতার হরতাল ও স্ট্রাইক যেমন চলতে থাকল তেমনি সরকারও নীরব দর্শকের ভূমিকায় ছিল না। সরকারের গোলাগুলি চলেছিল জনতার উপর।

আমাদের পার্টির অভ্যন্তরীণ গোলমাল সাময়িক চাপা পড়লেও চীন নিয়ে বিরোধের ফলে যে-যার মতামতে ক্রমশ শক্ত হতে থাকল। এসব বিতর্ক করতে করতে ১৯৬২-র মার্চে তৃতীয় সাধারণ নির্বাচন এসে গেল। কার্যত পার্টি তখন দু'ভাগ। এই নিয়ে নির্বাচনে লড়াই করা কষ্টকর। মনে উৎসাহ না থাকলে একাজ করা সত্যিই কঠিন। এই কারণে এবারের নির্বাচনে আমি দাঁড়াতে চাইনি। নির্বাচনে জিতে গেলে আবার আমাকে জড়িয়ে পড়তে হবে পার্টির টানাপোড়েনের মধ্যে, এটা আমার অভিপ্রেত ছিল না। তাছাড়া আমার এলাকাতেও পার্টি তখন দু'ভাগ। বিশেষভাবে একভাগ উগ্র চীনপন্থী, যা আমি নই। তাই প্রার্থী হিসাবে আমাকে মেনে নিতে তাদের ঘোরতর আপত্তি। এই অবস্থায় তাদের পছন্দমতো প্রার্থী দিলে আসনটা রাখা যাবে—একথা নেতৃত্বকে বোঝাতে আমি অনেক চেষ্টা করলাম। আরও একটা কথা, এলাকার প্রতি আমার উদাসীনতার জন্য স্থানীয় লোকেরা আমাকে জেতানোর জন্য বিশেষ আগ্রহী হবে না—এ-ও আমি জানতাম। কিন্তু ঐ এলাকা থেকে আমাকে মাথা হেঁট করে ফিরে আসতে হবে, একথা জেনেও নেতৃত্ব আমাকে সেখানেই পাঠালেন জ্যোতি বাবু বললেন, 'একসঙ্গে এই তো আমাদের শেষ নির্বাচন, ওখানে দেবার মতো লোক নেই, তাই আপনিই যান।' কথাটা আমিও জানতাম এবং এই জন্যই আমার বিন্দুমাত্র আগ্রহ ছিল না।

এসব জেনেশুনেই আমি এলাকায় গেলাম। কাজ করার লোক পেলাম অর্ধেক। যারা আমাকে চায়নি তারা নানা অজুহাতে আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরতে নারাজ। এমনিতেই জনসমর্থন কম ছিল, তার উপর আমরাও নির্বাচনের কাজ সুষ্ঠুভাবে চালাতে পারলাম না। সুতরাং হেরে গেলাম আমি। সেই রাত্রিতে খুব নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিলাম, এটা মনে আছে। মনে হয়েছিল, বেঁচে গেলাম।

নির্বাচনে পার্টির আসন ৪৬ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৫০ হলো। বামদলের মিলিত

আসন ৬১ থেকে ৭২-এ উঠল। ভোট সংখ্যাও বাড়ল কিছুটা।

এবারেও বিকল্প সরকারের আহ্বান দেওয়া হয়েছিল এবং গুরুত্ব সহকারে সে সম্পর্কে প্রচারও করা হয়েছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও পার্টির আসন বাড়ল মাত্র ৪টি এবং বামদলের একত্রে বৃদ্ধি পেল ১১টি। অর্থাৎ, বোঝা গেল এবারেও বিকল্প সরকারের ডাক দেওয়া ঠিক হয়নি এবং তা প্রত্যাখ্যাত হওয়ায় পার্টির মর্যাদাও বাড়েনি বিন্দুমাত্র। আমার অন্তত তাই মনে হয়েছিল। মানুষ বৃহত্তর বিরোধী দল চেয়েছিল এবং সেইটুকু পর্যন্তই তারা অগ্রসর হয়েছিল।

পর পর তিনটি নির্বাচনে আমাদের শহরের আসন সংখ্যা যেভাবে বেড়েছে গ্রামাঞ্চলে সেভাবে আসন বাড়েনি। এর কারণ হিসাবে একটা কথাই আমার মনে হয়, গ্রামের মানুষের মন আমরা তখন বুঝিনি। কৃষকরা কেন কংগ্রেসকে ভোট দেয় এবং কমিউনিস্ট পার্টিকে কেন তারা আপন বলে ভাবতে পারে না এরও কারণ অনুসন্ধান করা হয়নি কোনদিন। আর এটা না করেই বিকল্প সরকারের ডাক দেওয়া তৎকালীন বাস্তব পরিস্থিতিতে ঠিক হয়নি।

নির্বাচনে এটাই ছিল আমার শেষ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কিন্তু কালীঘাটে সেই সময় যাদের দেখতাম—তাদের কথা এখনও মনে পড়ে। অবশ্য এতকাল পরে তাঁরা হয়তো কালীঘাটে বাস করেন না। তবু যাদের সেদিন দেখেছিলাম, তাদের কথা বললে এখনও হয়তো খারাপ লাগবে না শুনতে।

অপ্সরী কলকাতা

জন্মকাল থেকে রূপসী বরিশাল দেখে মুগ্ধ হয়েছিলাম, আর মধ্যবয়সে মুগ্ধ হয়েছি অপ্সরী কলকাতাকে দেখে। প্রাচীন আর নবীনে, পুরাতন আর নতুনে জড়াজড়ি করা কলকাতার মতো এমন জায়গা ভূভারতে খুব কমই আছে। যে একবার কলকাতায় থেকেছে সে আর একে ছাড়তে চায় না। কালীঘাটে বার তিনেক নির্বাচন করে আমার আর কিছু লাভ হোক বা না হোক, এই কলকাতার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ পেয়েছিলাম। নির্বাচনে হেরে গিয়ে আমি আর ওখানে যাইনি। তাই আমার দেখা কালীঘাট বা কলকাতার কথাটা এখন হয়তো বলা যায়।

নির্বাচনে যতটা বাড়ি বাড়ি ঘুরতে হয় ততটা ঘোরাঘুরি করা আর কোন সময় প্রয়োজন হয় না। যে মানুষেরা অন্য দিনে মূল্যহীন, তারাই নির্বাচনে অতি মূল্যবান হয়ে ওঠেন। বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাপ্তবয়স্ক নারী-পুরুষ একটি করে ভোটের মালিক এবং নির্বাচনপ্রার্থীর পক্ষে সেই ভোট একান্ত অপরিহার্য। অতএব ভোটারের দুয়ারে ভোট-প্রার্থীকে হাতজোড় করে দাঁড়াতেই হবে। এটাই ছিল আমার সুযোগ, তাদেরকে দেখবার ও জানবার।

নির্বাচনে না গেছি এমন এলাকা বা জিলা খুব কমই ছিল। যেসব জায়গায় কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী ছিলেন, বক্তা হিসাবে সেসব জায়গায় গিয়ে মানুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ কম পেয়েছি। এর ব্যতিক্রম কালীঘাট—তাই তার কথাই বলি। তাছাড়া কালীঘাটই তো জোব চার্ণকের আমলের আদি কলকাতা। মনে হয় তখনকার কলকাতাকে খুঁজলে তাকে একমাত্র কালীঘাটেই পাওয়া যাবে। তার পরিবর্তনও আমি তিনটে নির্বাচনের সময় অবধি দেখার সুযোগ পেয়েছি। লক্ষ্য করার পক্ষে এই সময়টা নিতান্ত কম নয়।

প্রথম নির্বাচনে কালীঘাট মন্দিরের খোদ পাণ্ডারাই আমাকে সমর্থন করে বসলেন। মন্দিরের চাতালে বসে আরতির পর সন্ধ্যাবেলা আমার মতো একজন ঘোর কমিউনিস্ট, অর্থাৎ বিধর্মী লোক, পাণ্ডাদের কাছে নির্বাচনী বক্তৃতা করছে। ব্যাপারটা যেন ভাবাই যায় না। এইসব ধর্মীয় লোকেরা চিরকাল শাসককুলের সঙ্গেই থাকেন। এবারে তাদের এই প্রতিকূলতা যেন নিতান্তই ব্যতিক্রম। কলকাতা কি তাহলে পাল্টাচ্ছে? মন্দিরের ট্রাস্ট মালিক ছিলেন ঐ পাড়ার হালদারগোষ্ঠী—যাদের জন্য পাড়ার রাস্তার নামই হলো হালদার পাড়া রোড।

হালদারদের পরিবারগোষ্ঠী সে সময়ে ডালপালা মেলে ওখানে একটি প্রাচীন বটবৃক্ষের মতো বিরাজ করছিল। এঁরা প্রাচীনতায় কলকাতার আদিবাসিন্দা হবার যোগ্যতা রাখেন, বিত্তের দিক দিয়ে ভাগবাটোয়ারা সত্ত্বেও ঐশ্বর্যবান। চরিত্রে স্বাভাবিকভাবেই এঁরা ছিলেন রক্ষণশীল, চেহারাতেও যেন তৎকালীন জমিদার-বংশের ছাপ লেগে ছিল। সকলেই সুপুরুষ। এই পরিবারেরই একটি যুবক—কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগ দিল। যেন বটবৃক্ষের মূলেই পড়ল একটি ছোট্ট কুঠারাঘাত, আর সেই সুবাদেই ওঁদের অন্দরমহলে আমার প্রবেশ। অন্যেরা কংগ্রেস হলেও আমি কিন্তু তাঁদের বিরাগভাজন ছিলাম না।

কালীঘাটের পাণ্ডাদের এই মত-পরিবর্তনে এই পরিবারের কিছু প্রভাব ছিল কিনা জানি না, কিন্তু দেখেছিলাম অল্পবয়সী কিছু পাণ্ডা-ছেলে পার্টির পোস্টার, পতাকা ইত্যাদি যেমন লাগায় তেমনি মিটিং-এ দাঁড়িয়ে বেশ বক্তৃতাও করে। চাতালের মিটিং হয়ে গেলে কিছু কিছু বৃদ্ধ পাণ্ডা আমাকে আশীর্বাদ করতেন এবং মন্দিরের প্রসাদ খাইয়ে তবে ছাড়তেন। আশীর্বাদের ফুলও আমার মাথার উপর ছিটিয়ে দিতেন।

অবশ্য ধর্মীয় প্রসঙ্গে কোন কথা আমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করতেন না এবং স্বভাবতই আমার বক্তব্য আমি চাল-ডাল, তেল-নুন প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতাম।

কিন্তু তা হলেও হালদার পাড়ায় ও মন্দিরের পাণ্ডাদের মধ্যে এই যে ভাঙ্গন এটা শুধু আমার কাছে নয়, সকলের কাছেই আদি হিন্দুসমাজের মধ্যে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা বলে মনে হয়েছিল। এটাকে প্রগতিশীলতার দিকে পদক্ষেপই বলা যায়। পরবর্তী সময়ে পাণ্ডা-পরিবারের আরো কিছু যুবক কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হয়ে যান।

আজও আমি কাউকে কালীঘাটে বেড়াতে নিয়ে গেলে সেই সব পরিচিত পাণ্ডারা আমাকে ঘিরে ধরেন, খাওয়ান এবং কেন আর নির্বাচনে দাঁড়াই না তা নিয়ে অভিযোগ করেন।

কালীঘাটের অদূরেই একটি পল্লী আছে, যাকে নিষিদ্ধপল্লী বলা হয় এবং 'অভ্যস্ত' লোকেরা বাদে সেখানে কেউ বড় একটা প্রবেশ করেন না। কিন্তু নির্বাচন-প্রার্থীকে সেখানেও যেতে হতো। যেহেতু আমি মহিলাপ্রার্থী আর এই পল্লীর ভোটাররাও সবাই মেয়ে, সেইহেতু তাদের প্রতিটি ঘরে আমার না যেয়ে উপায় ছিল না।

আমার একটা কৌতূহল ছিল। সেটা হলো—গঙ্গাপাড়ের এই নিষিদ্ধপল্লীর

মেয়েরা রোজ সকালে গঙ্গাস্নান করেই কি তাদের পাপস্খালনের আত্মতৃপ্তিটা মনে মনে অনুভব করেন ? না, খানিকটা জ্বালা থেকেও যায় ? ওখানে গিয়ে আমি মনে মনে ভাবতাম—এদের কাছে আমি কোন বার্তা বহন করে এনেছি ? কি বলব আমি এদের কাছে ?

সেই বরিশালের গান্ধীজীর মিটিং-এর কথা আমার মনে পড়ত। তখনই মনে হতো আমি নিজে তো আর গান্ধীজীর মতো বিশাল বটবৃক্ষ নই যে এদের এই অসম্মানের জীবন ছেড়ে চলে আসার ডাক দেব, আর আমার ছায়াতলেই এদের আশ্রয় দিতে সক্ষম হব।

বাড়িউলীরা কথা না বললে সত্যিই আমার মুখে কথা যোগাত না। ওদের অভিযোগ ছিল 'পুলিসের অত্যাচারের' বিরুদ্ধে। ওদের বক্তব্য ছিল : অন্যসব ব্যবসার মতো এটাও ওদের জীবিকার জন্য ব্যবসা। অন্য ব্যবসায়ে যখন পুলিস আসে না তখন এদের উপরই বা উপদ্রব হবে কেন ? আর থানায় নিয়ে গিয়ে টাকা পেলেই তো পুলিস এদের ছেড়ে দেয়। মাসের মধ্যে দু'একবার পুলিস রাউণ্ডে বেরোয়। সম্ভবত টাকার দরকার পড়লেই এটা করা হয়। এ ব্যাপারে আমার যে কি করার আছে তা মাথায় আসত না। আমার বক্তব্য এই লাইন ধরে মোটেই এগুতো না। আমি বলতাম—তোমরা কি জানো কেন তোমাদের পেটের ভাতের জন্য নিজেকে এমন বিক্রি করে দিতে হয় ? এজন্য দায়ী তো আমাদের সমাজের কুসংস্কার, নিষ্ঠুর ব্যবস্থা এবং নারীসমাজের উন্নতির প্রতি সরকারের উদাসীনতা। বক্তব্যকে যথাসাধ্য মর্মস্পর্শী করে বলার চেষ্টা করা সত্ত্বেও দেখতাম—পাষাণ-হৃদয়ে সাড়া জাগছে না এতটুকু। আর যে দালালগুলির সাহায্যে আমরা পল্লীতে ঢুকতাম—তারাও দেখতাম বেশ বিরক্ত। কারণ, এই মেয়েদের রোজগারের একটা ভাগ পায় দালালরা। পুলিসের উপদ্রবে তারাও ক্ষতিগ্রস্ত। অতএব আমার বক্তৃতা তারা অপ্রাসঙ্গিক মনে করত। পুলিস-উপদ্রবের কিছু প্রতিকার আমি করতে পারি কিনা তারা সে কথাই জানতে চায়। কিন্তু আমার মুখ থেকে কোনমতেই কোন আশাপ্রদ প্রতিশ্রুতির কথা বেরুত না।

এদের প্রতি আমার সহানুভূতির কমতি ছিল না, কিন্তু ওদের ভোটের উপর আমার একেবারেই ভরসা ছিল না। কারণ জানতাম—বাড়িউলী, দালাল, জমিদার ও নিজেদের ব্যবসার টান উপেক্ষা করে এরা কখনই সদলবলে আমাকে ভোট দিতে আসতে পারে না।

তবে আমি উৎসুক ছিলাম এদের জীবনযাত্রা জানার জন্য। সেজন্য অনেক

ঘরেই আমি ঢুকেছি এবং অনেকের জীবনকথাও জানবার সুযোগ পেয়েছি। অল্পবয়সী সুন্দরী মেয়েদের দেখলেই তাদের ঘরে ঢুকতাম। পা পিছলে যাবার ছোট্ট একটু ইতিহাস অথবা সামাজিক নিষ্ঠুরতার বলির ইতিহাস অনেকটাই পেয়ে যেতাম। খুঁজতাম—এদের মধ্যে 'চন্দ্রমুখী'রা লুকিয়ে আছে কিনা। সে খোঁজ পাওয়া আমার পক্ষে সত্যি সম্ভব ছিল না। তবে সুন্দরী মেয়েদের অনেকের চোখে বড় বড় জলের ফোঁটা দেখেছি। ঘর-বর ও সন্তান পেতে কোন নারী না চায় ? তাই বোধহয় এদের চাপা দীর্ঘশ্বাসটা কানে আসত আমার।

পৃথিবীব্যাপী এই এক ব্যাধি—যার কোন প্রতিকার ও বিকল্প ব্যবস্থা আজও কেউ খুঁজে পায়নি, অন্তত ধনতন্ত্রী দুনিয়ায়। বরং এই পেশাকে আরও ভদ্র পোশাক পরিয়ে ও মর্যাদা দিয়ে নাম দেওয়া হয়েছে—'কলগাঁল' বা 'ক্যাবারেগাঁল'। এরা বড় বড় পয়সাওয়ালা লোকের মনোরঞ্জনের জন্য মোটা পয়সায় ভাড়া খাটে এবং বড় বড় হোটেলে যুগল নারী-পুরুষের সামনে উলঙ্গ নৃত্য দেখাবার জন্য ব্যবহৃত হয়। জীবনের ঘূর্ণিচক্রে এ পথে আসার পেছনে হয়তো এদের আরও অনেক করুণ কাহিনী লুকিয়ে আছে। এদেরই উপার্জনে হয়তো পিতৃ-পরিবার বা স্বামীর সংসার বাঁচে। কিন্তু এসবের মধ্যে এখন আর কেউ অন্যায় বা অসামাজিক কিছু দেখে না। বরং আমোদ-প্রমোদের অনিবার্য অঙ্গ হিসাবেই এগুলো স্বীকৃত। তাই কালীঘাটের নিষিদ্ধপল্লী নিয়েও সমাজ এখন আর মাথা ঘামায় না।

আমার ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে আমাদের বর্তমান সমাজে এর কোন প্রতিকার আমি খুঁজে পাইনি। সমাজতান্ত্রিক দেশ হয়তো নারীসমাজকে উপার্জনের পথ খুলে দিয়ে দারিদ্র্যের কারণে নিজেকে বাধ্য হয়ে বিক্রি করার অপমান থেকে বাঁচাতে পেরেছে। আমার মনে হয়—সমাজব্যবস্থার ঐ রূপটা ছাড়া এর আর কোন সমাধান নির্ভরযোগ্য নয়। সেই পথের সন্ধান এদেশের হতভাগ্য মেয়েরা কবে পাবে ? কত যুগ আর প্রতীক্ষা করতে হবে ?

আরও অনেক লোকজন আছেন কালীঘাটে, তাদের কথায় আসি এবার। আমার পূর্ববাঙলার মানুষদের, বিশেষত বরিশালের মানুষদের, সাক্ষাৎ পাই কালীঘাটের অলিগলিতে। তবে কালীঘাটে তারা উদ্বাস্তু হয়ে আসেননি, এরা ছিলেন বরিশাল ছেড়ে আসা কালীঘাটের বেশ পুরনো বাসিন্দা। তখনকার দিনে যারা কলকাতায় চলে আসতেন তারা মায়ের মন্দিরের পাশে গঙ্গার কাছাকাছি থাকাটাই বেশী পছন্দ করতেন। ফলে এরা কালীঘাটের আদি বাসিন্দাদের দলেই পড়েন। কিন্তু এটা আশ্চর্য যে, বহু পুরনো দিনের প্রবাসী হওয়া সত্ত্বেও

বরিশালের প্রতি তাদের আনুগত্য এতই বেশী যে এই ভোটগুলোর উপর আমার ছিল একচেটিয়া অধিকার। ও পাড়ায় আমার জয়লাভের পক্ষেএকটা বড় শক্তি বোধহয় ছিলেন এই বরিশালবাসীরা। অবশ্য পূর্ববঙ্গীয় মানুষ ওখানে আরও অনেকেই ছিলেন এবং এই 'বাঙ্গালের' প্রতি তাদেরও দুর্বলতা কম দেখিনি।

কালীঘাটের আর একটি বৈশিষ্ট্য পোটো পাড়া। কালীঘাটের পট প্রসিদ্ধ। এখন দেশ-বিদেশে চালান যায়। ওদের হাতের কাজ আমি বসে বসে দেখতাম। ওরা জাতশিল্পী। অথচ খেতে পায় না। ওরা ছিল আমার অনুগত ভোটার। কয়েকটি শিশু ছেলেকে দেখে মনে হয়েছিল যেন জন্মশিল্পী। নানারকম পুতুল, পশুপাখি, ঠাকুর-দেবতা, এসবের ক্ষুদ্র সংস্করণ ওদের ছোট ছোট হাতের নিপুণ শিল্পকৌশলে কী আশ্চর্য সুন্দর হয়েই না বাস্তব রূপ ধারণ করত। ওই ছেলেরা আমার ভোটার নয়, কিন্তু প্রচারক ছিল। এই শিল্পীদের বস্তিতে আর রাস্তায় দুঃখীর মতো পড়ে থাকতে দেখে বড় কষ্ট হতো। এদের পরিশ্রম অনেক ব্যবসায়ীর লাভের উৎস। কিন্তু তাদের কাছে এই শিল্পীদের কোন দাম নেই।

কালীঘাট এলাকাটা পুরনো। তাই অনেক বাড়ি দু'চারশো বছর পার করে দিয়েও প্রাচীন কলকাতার সাক্ষী হয়ে আজও দাঁড়িয়ে আছে। এর মধ্যে সেকাল ও একাল দুয়েরই সাক্ষাৎ মিলবে। এক একটা বাড়িতে ঢুকে মনে হতো এক্ষুণি বুঝি চাপা পড়ব। অন্ধকার, ধ্বসে পড়া দেওয়াল, জল আর পায়খানার আদিম ব্যবস্থা—তবু এক একটি কামরা নিয়ে এক একটি পরিবার বাস করেন। বস্তিবাসী এরা নন। পেশায় ভদ্রলোক। কিন্তু কলকাতা শহরে মাথা গুঁজতে হলে এ বাড়িকেই তো রাজপ্রসাদ মনে করতে হবে। এর মধ্যে স্কুল-কলেজে পড়া মেয়ে, অফিসে চাকরী করা মেয়েদেরও দেখা পেতাম। আবার পাশাপাশি অতিমাত্রায় পর্দানশীন—সেই 'কলেজ রো'-তে দেখা গামছা-পরা মহিলাদেরও সাক্ষাৎ মিলত। এদের মধ্যে পূর্ববঙ্গীয়রা ছিল ভোট সম্পর্কে সরব এবং পশ্চিমবঙ্গীয়রা যথেষ্ট নীরব।

কালীঘাট এলাকার ঐ সব পুরনো বাড়িগুলির, বিশেষ করে ছোট বাড়ির যারা মালিক ছিলেন তাদের দুঃখের কাহিনী আমাকে বসে বসে শুনতে হতো। হয়তো তাদের সম্বল মাত্র দু'খানি কামরা। একখানা ভাড়া দিয়ে আর এক-খানায় নিজেরা বাস করেন। আয়ের মধ্যে ঐ ভাড়ার টাকাটুকুই সার। তখন-কার সময়ে কতই বা ভাড়া ছিল? কর্তা-গিন্নী হয়তো দু'একটা পোষ্য নিয়ে ঐ টাকাতেই বেঁচে থাকতেন। কী যে আইন হলো! এই সব বাড়িরও মূল্য-নির্ণয় করা শুরু হলো। এক বৃদ্ধ এসে চোখের জলে আমাকে একদিন বলেছিলেন—

'হাতচারেক জায়গার একটি ক্ষুদ্র ঠাকুরঘর আমার ছাদের উপরে আছে। তাকেও একখানা কামরা হিসাবে ওরা ধরল। বাড়ির দাম ও ট্যাক্স যা ধরা হলো তাতে এই পোড়ো বাড়িটুকু—আমার পৈতৃক ভিটেটুকুই বুঝি এবার ছাড়তে হবে। কারণ ট্যাক্স দিয়ে ভাড়ার টাকার যা হাতে থাকবে তাতে খাওয়া চলবে না। বরং বিক্রি করে জায়গাটুকুর যা দাম পাব—তাই নিয়ে বস্তিতে চলে যাব।' টপ্ টপ্ করে চোখের জল পড়তে লাগল বৃদ্ধের। তাকে আমি কী সান্ত্বনা দেব! আইনগুলো তো গরীবদের আর রেহাই দেয় না, এবং যারা মূল্য-নির্ণয় করতে আসেন—তাদের হাতে দু'পয়সা গুঁজে দিয়ে রেহাই পাবার ক্ষমতাও এসব গরীবদের থাকে না। এরকম বহু বাড়িওয়ালার সঙ্গেই সাক্ষাৎ ঘটত। বছর দু'চার পরে সত্যিই দেখা যেত সেই সব পুরনো বাড়িগুলো লোপাট হয়ে গেছে, তার জায়গায় উঠেছে আধুনিক বাড়ি। আর সেই পরিচিত লোকেরা কোথায় যে হারিয়ে গেছে, কে জানে!

অনেক বস্তি দেখেছি—কিন্তু কালীঘাটের বস্তি তো সেই আদিকালের বস্তি। এর কোন তুলনা নেই। প্রতি বর্ষায় মা-গঙ্গা তার তীরে অবস্থিত বস্তি-গুলোর লোকদের ঘরে ঢুকে স্নান করিয়ে দিয়ে যান। এতেও নাকি করার কিছু নেই। বুকবন্ধ আদিগঙ্গা সামান্য বর্ষাতেই ফেঁপে ওঠে। শুধু বর্ষায় নয়, বান এলেও মা-গঙ্গা উঠে আসেন ঘরে।

এই সব বস্তিতে রিক্শাওয়ালা থেকে শুরু করে অফিসের বাবুরাও থাকেন। অনেকে ভাড়া দিতে পারেন, অনেকে তাও পারেন না। সমস্যায় পড়েন বাড়ি-ওয়ালারা। ভাড়া না পেলে তারা খাবেন কি? দু'দলই আমার কাছে আসতেন। ভাড়াটেদের নালিশ ছিল উচ্ছেদ করা নিয়ে। জিজ্ঞাসা করতাম, কতদিনের ভাড়া বাকী? না—দু বছরের। বলতাম, 'ভাড়া না দিয়ে তো থাকার কোন আইন নেই—ওটা তো দিতেই হবে।' জবাব শুনতাম—'দেবো কোথা থেকে?' ব্যস, কথা ফুরিয়ে গেল। বাড়িওয়ালা এলে বলতাম, 'আর কয়েকটা মাস সময় দিন, দিয়ে দেবে। তার জবাব হতো—'দু'বছর হয়ে গেল—আমি খাই কি?'

এর কোন মীমাংসা আছে কি? ওদিকে 'ঠিকা প্রজা আইন' 'বস্তি-উন্নয়ন আইন,' কত কি হলো। জানি না ফ্ল্যাট বাড়ি তুলে বস্তির চেহারা পাল্টে দেওয়া হয়েছে কিনা এখন। ঐসব আইনের আমি সমর্থক হলেও—দশ বছরের মধ্যে তার কাজ কিন্তু শুরু হতে দেখিনি। বরং দেখেছি এর উল্টোটা ঘটতে। ঠিকা প্রজাকে টাকায় তুষ্ট করে স্বয়ং জমিদার নেমেছেন বস্তি-উচ্ছেদে। একদিন পুলিস ও গুণ্ডাবাহিনী কর্তৃক একটা বস্তি ভাঙ্গার সংবাদ পেয়ে ছুটে গেলাম। সে এক

নিদারুণ দৃশ্য ! চালাগুলি দমাদম পিটিয়ে ভাঙ্গা হচ্ছে, মানুষগুলো কাঁদছে পাগলের মতো, ভাতের হাঁড়ি, কাঁথা-বিছানা, কলসী গড়াচ্ছে একসঙ্গে। জমিদারের স্বার্থ—জমিটা খালি হলেই তিনি ফ্ল্যাট বাড়ি তুলবেন। হুবহু গ্রামের ভিটেবাড়ি থেকে নায়েব মশাইদের প্রজা-উচ্ছেদের মতো ঘটনা। উচ্ছেদ-হওয়া ঐসব বস্তি-বাসীরা হয় কোন খালি জায়গায় হোগলার চালা ও বেড়া দিয়ে নতুন ঘর তুলে আবার বাক্স-বিছানা খোলে, নয়তো বেওয়ারিশ ফুটপাথে পাতে নতুন সংসার।

সেদিন অবশ্য আমার সামনে পুলিস ও গুণ্ডা দু'পক্ষই রণে ভঙ্গ দিয়েছিল। কারণ কোর্টের কোন উচ্ছেদ নোটিস তাদের হাতে ছিল না। ওটা ছিল পিছনের দরজা দিয়ে জমিদারের চক্রান্ত।

কিন্তু এই করে তো গরীবকে বাঁচানো যায় না। তৃতীয় নির্বাচনের সময় যখন এলাকায় ঘুরেছি—অর্ধেক চেনা মুখ তখন হারিয়ে গেছে। ভাঙ্গা বাড়ি-গুলো আর নেই। উঠেছে চমৎকার সব ফ্ল্যাট বাড়ি। ভাড়াটেরা অবাঙালী, হয়তো বা বাড়ির মালিকও তারাই। এরা কি আর কোন বামপন্থীকে ঘরে ঢুকতে দেয় ? গুঁড়িয়ে যাওয়া বহু বাড়ি থেকে আমাকে দাওয়ায় বসিয়ে সাদরে এগিয়ে দেওয়া সামান্য জলখাবারটুকু শেষ পর্যন্ত উঠে গেল। ওখান থেকে আমার উঠে আসার এটাও হয়তো একটা কারণ ছিল।

এ চিত্র শুধু কালীঘাটের নয়, পুরো কলকাতারও চিত্র এটা। তাই বলতে ইচ্ছা হয়—সুন্দরী, তিলোত্তমা কলকাতা, তোমাকে নমস্কার ! তোমার আলো-ঝলমল চৌরঙ্গী ও পার্ক ষ্ট্রীট, হোটেল এবং বার, কলগার্ল আর ক্যাবারে, মোটর গাড়ির মিছিল, বাস-ট্রামের দুরন্ত বেগ, ১৮ তলা ১৪ তলা আকাশচুম্বী মনো-হারিণী অট্টালিকা, এমনকি পানের দোকানের নিয়নের ঝলকানি—এসবের তলায় যে কত কান্না, কত ব্যথা, কত অত্যাচার, কত নিষ্ঠুরতা, কত অন্ধকার লুকানো রয়েছে—তার খোঁজ কি তুমি আর রাখো ? তুমি সুন্দরী-কল্লোলিনী তিলোত্তমা হও, আর নীচুতলার মানুষেরা 'লোয়ার ডেপথ' থেকে 'লোয়েস্ট ডেপথে' চলে যাক্—তাতে তোমার কি আসে যায় ! হয়তো কোনকালে আর একজন গোর্কি এসে এদের অন্ধকার জীবনযাত্রার কাহিনী শোনাবেন।

ভাগ্যিস এককালে বিবেকানন্দ, বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথের পদধূলি কলকাতা মাথায় তুলে নিয়েছিল, তাই আমরা মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকেরা এখনও তাঁদের সৃষ্টি ও কীর্তির মধ্যে মুখ গুঁজে সংস্কৃতির চর্চা করি, তার স্বর্গ-নরকের কোন খোঁজ রাখি না। আর কখনও বা মিছিল-মিটিং করে গণতন্ত্রের জয়ধ্বনি দিয়ে বাড়ি ফিরি। কলকাতার 'আলো-অন্ধকার' নিয়ে মাথা ঘামাবার প্রয়োজন বোধ করি না।

চীন-ভারত যুদ্ধ এবং তার প্রতিক্রিয়া

চীন ও ভারতের মধ্যে সীমানা-সংঘর্ষ শেষপর্যন্ত যুদ্ধে পরিণত হবে এজন্য না প্রস্তুত ছিল ভারতবাসী, না প্রস্তুত ছিল ভারত সরকার। এ যেন হঠাৎ বজ্র-পাতের মতোই একটা ঘটনা।

হিমালয়ের হিমশীতল তুষার এলাকায় দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করার প্রস্তুতি ভারতীয় বাহিনীর ছিল না। অথচ অনভ্যস্ত ভারতীয় জওয়ানদের উপযুক্ত শীতবস্ত্র ছাড়াই যেতে হয়েছিল চীনের দক্ষ ও বরফে অভ্যস্ত সৈনিকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। অসম যুদ্ধে ভারতীয় বাহিনী তাই দাঁড়াতে পারেনি। তারা হাজারে হাজারে প্রাণ দিয়েছে। অস্ত্রের অভাবও তাদের ছিল। এই দুর্বলতার সুযোগে চীন নেফা পর্যন্ত ভারতীয় বাহিনীকে তাড়া করে নামিয়ে এনেছিল। ভয়ে তেজপুর পর্যন্ত জনশূন্য হয়ে যায়। মাত্র ১৮ দিনের ঘটনা তবু ভারতের ক্ষয়ক্ষতি হলো প্রচুর। অপমানের তো সীমা ছিল না। পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু সম্ভবত রাগের মাথায় বলেছিলেন—যদি ওরা সীমান্ত অতিক্রম করে, তবে 'থ্রো দেম আউট।' কথাটা না বলে বোধহয় তাঁর উপায়ও ছিল না। কারণ তাঁর ক্যাবিনেট সদস্যরা এটা চাইছিলেন। বিপদে পড়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী আর স্বয়ং প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণ মেননও। ভারতের উপর চীন ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে এ তাঁদের ধারণার বাহিরে ছিল। কৃষ্ণমেনন তো চীনকে বন্ধু হিসেবে এত বিশ্বাস করেছিলেন যে এরকম অপমানকর যুদ্ধের জন্য তিনি প্রস্তুতই ছিলেন না।

প্রধানমন্ত্রী যদি চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা না করতেন তাহলে তাঁর বিপদ ছিল—হয়তো তাঁকে সরেও যেতে হতো। আবার চীন যদি একতরফা সরে যেতে আর একটা দিনও দেরি করত তাহলে হয়তো পরের দিন পণ্ডিতজী গদিচ্যুত হতেন। কৃষ্ণমেনন তো পরবর্তী সময়ে পরাজয়ের সমস্ত গ্লানি মাথায় নিয়ে এবং অপ্রস্তুতির সব অপরাধে অপরাধী হয়ে মন্ত্রীত্ব ছেড়ে চলেই গেলেন। নেহরুজীও হয়তো জীবনসায়াহ্নে এই আঘাতটা না পেলে আরও কয়েকটা বছর বাঁচতে পারতেন। একেই বলে দুর্ভাগ্য। পণ্ডিতজী ও মেননজী দু'জনেই তো ছিলেন চীনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। কিন্তু তার ফল হলো এই!

সোভিয়েট-চীন সীমান্তের দুই ধারে বিশাল বিশাল দুই বাহিনী দাঁড়িয়ে আছে কত বছর ধরে। সর্বদাই মনে হয় এই বুঝি যুদ্ধ লাগে। কিন্তু মাঝে মাঝে

ঠোকাঠুকি হলেও তেমন কিছু ঘটে না। কারণ, উভয়েই রাখে উভয়ের শক্তির খবর। এবং এও জানে যুদ্ধ করে ঐ সীমান্ত-সমস্যার মীমাংসা কোনদিনই হবে না। তাই উভয় বাহিনী দাঁড়িয়ে আছে তো আছেই। আর উভয় সরকার থেকে থেকে একে অপরকে শুধু হুমকি দিয়ে যাচ্ছে।

কিন্তু ভারতের কথা আলাদা। ভারত হলো দুর্বল প্রতিবেশী। তাকে একটা ধাক্কা মেরেই শিক্ষা দেওয়া যায়, এই ছিল তখনকার অবস্থা। শিক্ষা ভারতবাসী পেল, কিন্তু চীন পেল ভারতবাসীর অগাধ ভালোবাসার পরিবর্তে তাদের লাঞ্ছিত, অপমানিত ও বিক্ষুব্ধ মনের বিদ্বেষ-জ্বালা। একটা সোশ্যালিস্ট দেশের পক্ষে প্রতিবেশী বন্ধু দেশের কাছে এতবড় নৈতিক পরাজয়ের ঘটনা ইতিহাসে বড় একটা নেই। আজ চীন পুনরায় ভারতের বন্ধুত্ব কামনা করছে। ভারতও নিশ্চয়ই তা চায়, সমঝোতাও হয়তো হবে কোন কালে। কিন্তু অবিশ্বাস কাটিয়ে উঠে দুই বিশাল জনমানসের হারিয়ে যাওয়া প্রীতি ও ভালোবাসার সেতুবন্ধন হবে কি? একটা প্রশ্নের জবাব আমি কিছুতেই পাই না। ভারতকে এতবড় একটা আঘাত চীন কেন দিল? ভারত সাম্রাজ্যবাদী এবং চীনের ভূখণ্ড দখলে আগ্রহী—একথা মাও-সেতুং হাজার বার ঘোষণা করলেও—এটা চীনের অন্তরের কথা বলে আমি কোনমতে বিশ্বাস করতে পারি না। তবে কি ভারত-সোভিয়েট বন্ধুত্বই চীনের গাত্রদাহের কারণ? সত্যিই কি চীন বিশ্বাস করেছিল ভারত ও সোভিয়েট একত্রে চীনের উপর হামলা করবে? সেই জন্যই কি ভারতের ঘাড়ের উপরে তার প্রতিরক্ষার বোঝাটা চাপিয়ে দেওয়ার দরকার মনে হয়েছিল? আর ভারত যাতে এসব কুমতলব না করে তার জন্যই কি একটু শক্তি-প্রদর্শনের দরকার পড়েছিল? ইতিহাস-ভূগোলের ব্যাখ্যা দিয়ে একটা সোশ্যালিস্ট দেশকে আমি অন্তত চিনতে চাই না। আমি জানতে চাই—তার আসল প্রয়োজনটা কি? সেটা কি একান্তই জাতীয় স্বার্থ? চীন-সোভিয়েটের শত্রুতা কি দু'দেশকেই 'আন্তর্জাতিক সাম্য-মৈত্রী'র কথাটা ভুলিয়ে দিয়ে একমাত্র 'জাতীয় স্বার্থসর্বস্ব' করে তুলেছে? নয়তো চীন-মার্কিন বন্ধুত্বেরও বা অন্য আর কি ব্যাখ্যা হতে পারে?

যাই হোক সর্বনাশ হলো আমাদের। পার্টি তো ভাঙলই, আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রবাদের নৈতিকতা ও মূল্যবোধ সম্বন্ধে এতকালের বিশ্বাসটাও পরাস্ত হয়ে গেল।

তাছাড়া, সেই থেকে চীন-ভারত সীমান্তে ভারতের পক্ষে যুদ্ধসজ্জার যে প্রয়োজন ঘটল—তার জন্য দায়ী কে? ভারতের মতো গরীব প্রতিবেশী দেশকে মুখের গ্রাসের বিনিময়ে 'বন্দুকের নল' তৈরির পথে ঠেলে দিল সমাজ-

তাত্ত্বিক চীন, এটা সত্যিই ভাবা যায় না।

চীন-ভারত প্রশ্নে পার্টি তখন পরিষ্কার দু'ভাগ হয়ে গেল। কোন্ পক্ষ 'ন্যায় যুদ্ধ' করছে আর কোন্ পক্ষ 'অন্যায় যুদ্ধে' লিপ্ত, তার বিচার করতে আমরা নিজেরাই ঘায়েল হলাম। আজ মনে হয় উভয়েরই রাজনৈতিক স্বার্থে চীন-ভারতের মধ্যে সমঝোতা হয়তো হবে, কিন্তু আমাদের খণ্ডিত পার্টি আর বোধহয় জোড়া লাগবে না। অবশ্য তাতে চীনেরই বা কি, আর ভারতেরই বা কি? বন্ধুত্ব হলে তো 'রাজায় রাজায়' হবে। পার্টির দুঃখে আর সংকটে চীনের কাতর হবার দিন বোধহয় চলে গেছে।

আমাদের পার্টি ভাগ হতে যেটুকু বাকী ছিল, ভারত সরকার নিজেই তা করে দিল। যে রাত্রে কমিউনিস্ট পার্টিকে বেআইনী ঘোষণা না করেও পুলিস তার একাংশকে গ্রেপ্তার করতে শুরু করল, সে রাত্রে আমি ও জলি ক'ল চিন্তিত মনে প্রায় সারাক্ষণই জেগে ছিলাম। পার্টি বেআইনী হবে এবং পুলিস আসবে এরকম একটা আশঙ্কা আমাদের মনে ছিল। যুদ্ধ লাগার সঙ্গে সঙ্গেই এরকম বিপদ আসবে জেনে প্রস্তুতও ছিলাম। শেষ রাতে পুলিসও এলো। বাড়িতে আমরা দু'জন বসে আছি। অপেক্ষা করছি কখন পুলিস বলবে—'চলুন'। কিন্তু পুলিস তা বললো না। কি যেন খুঁজল, কাকে যেন খুঁজল। পরে 'কিছু পাওয়া গেল না' লেখা কাগজটা আমাদের দিয়ে সই করিয়ে নিল। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, 'আপনারা কেন এসেছিলেন? কা'কে চাইছেন?' ওরা একটু হেসে চলে গেল। আমরা বোকা হয়েই বসে রইলাম। জলি ক'ল বললেন, 'সর্বনাশ হয়ে গেল। পুলিস আমাদের নিল না, কিন্তু ওরা বেছে বেছে নিশ্চয়ই আজ রাত্রে অনেককে ধরেছে। পার্টি ভেঙ্গে দেবার এতবড় সুযোগ কি পুলিস ছাড়ে?' ভোরের অপেক্ষায় বসে রইলাম। সকালেই একজন ফোন করে জেনে নিল আমাদের বাড়ি পুলিস এসেছিল কিনা। এবার বুঝলাম পুলিস কা'কে খুঁজছিল এবং সে কোথায় আছে। এর কাছেই বারে বারে শুনতাম—'এ-পার্টি ভাঙ্গা দরকার।' সকাল হলে খবরের কাগজে দেখা গেল—কারা গ্রেপ্তার হয়েছেন, আর কারা গ্রেপ্তার হননি। এরপর পুরোপুরি ভেঙ্গে গেল পার্টি।

এবার আমাকে যেতে হবে। এ পার্টির কোন অংশের সঙ্গেই আমি আর আমার স্থান করে নিতে পারব না। আমি কোন অংশকেই প্রতিপক্ষ ভাবতে পারি না। প্রায় ২৫/৩০ বছরের পার্টি-জীবন আমার। আমার ধমনীতে এদেশে সোশ্যালিজম প্রতিষ্ঠা করার জন্য উষ্ণ রক্ত অপেক্ষা করছিল। এজন্য আমি আমার ক্ষুদ্র জীবন বলি দেবার পরীক্ষাতেও দাঁড়াতে প্রস্তুত ছিলাম। মনে পড়ে, পার্টিকে

আমরা ক'জন মিলে কী খোঁজাই না খুঁজেছি, কী ভালোই না বেসেছি, কত কিছুই না শিখেছি পার্টির কাছ থেকে। নিজের হাতেই তো গড়েছি কত কিছুই। বাড়ির আত্মীয়-স্বজন আমার আর ক'জনই বা ছিল? পার্টি-জীবনে হাজার হাজার পরমাত্মীয়ের সঙ্গেই তো এতকাল একসূত্রে বাঁধা ছিলাম। এ জীবনের সত্যি কোন তুলনা হয় না। এই পার্টিতে এসে আমার জীবনে যে জনসংযোগ ঘটেছে, তারই রন্ধ্রে রন্ধ্রে আমার মনের শিকড় প্রবিষ্ট হয়ে গেছে। সেই বন্ধন ছিন্ন করা কি সম্ভব?

কিন্তু তবু এই পার্টিকে ছেড়ে যেতে হবে, তাতে যত কষ্টই হোক্। যে আদর্শ নিয়ে একদা পার্টিতে এসেছিলাম সেই আদর্শ এই টুকরো হওয়া পার্টিতে আমি আর খুঁজে পাব না। যাঁদেরকে পুলিস ধরল না তাঁরা আবার পার্টি চালু করার চেষ্টা করছিলেন। আমাকে তাঁরা ডেকেছিলেন, কিন্তু আমি যাইনি। বিরক্তি ছাড়া মনে আর তখন কিছুই নেই। যাঁরা মতান্তরে-মনান্তরে পার্টিকে ভাঙ্গ-ছিলেন, আমার বিশ্বাস শুধুমাত্র আদর্শের সংগ্রাম তাঁরা কেউ-ই করছিলেন না। তাঁদের অন্য কিছু মতলব ছিল। এর চেয়ে মানুষের মনের কথা জানবার চেষ্টায় যদি আমরা সবাই জনতার মধ্যে মিশে যেতে পারতাম হয়তো-বা পথ খুঁজে পেতাম, হয়তো-বা পার্টিকে বাঁচাতেও পারতাম। নৈয়ায়িকদের মতো তর্কযুদ্ধে একে অপরকে পরাস্ত করার নেশা আমাদের এমনভাবে পেয়ে বসত না।

আমাদের মধ্যে একের প্রতি অপরের সন্দেহ ও অবিশ্বাস কত নিম্নস্তরে পৌঁছেছিল, যাবার আগে সেটা জেনে বড় আঘাত পেয়েছিলাম। তখনও পুলিসের ধরপাকড়, জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদি চলছিল। হঠাৎ একদিন সকালে কালীঘাটের তিনটি ছেলে আমার কাছে এলো। ওদের নাম আজ আর বলতে চাই না। ওরা সকলেই আমার বড় স্নেহের পাত্র। এখন ওরা বড় হয়েছে, পার্টি-নেতৃত্বেও আছে কেউ কেউ।

ওদেরকে ভবানীপুর থানা থেকে পুলিস এসে ধরে নিয়ে গিয়ে দিনকয়েক লক্-আপে আটকে রেখেছিল। অনবরত জেরা চলছিল ওরা চীনপন্থী কিনা তা জানার জন্য। ওদের জবাবে পুলিস অফিসার খুশি না হয়ে বলেছেন, 'আপনারা 'না' বললে কি হবে, জানেন কি জলি ক'ল আমাদের কাছে যে লিস্ট দিয়েছে তাতে আপনাদের নাম আছে?' পুলিসের এই কথাতেই ঐ ছেলেরা একেবারে ভেঙ্গে পড়েছে। ওদের জিলা সেক্রেটারী কিনা নিজেই এই বিশ্বাসঘাতকতা করল!

আমি আমার নিজের অতীত অভিজ্ঞতা দিয়ে পুলিসের এই চিরকালের অপকৌশলের কথা ওদের বোঝাতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু ওরা কেউ তা

মানেনি। ওদের চোখে জল দেখেছিলাম। ওরা চলে গেল। আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ি পিটতে লাগল। আমরা তাহলে পুলিসের দালাল ?

ডাক্তার গণি ছিলেন আমাদের অকৃত্রিম বন্ধু। শুধু পার্টি-বন্ধুই নন, তারও বেশী। তিনি হঠাৎ বম্বে থেকে কলকাতা স্টেশনে নামতেই তাকে পুলিস ধরে নিয়ে গেল। খবর পেয়ে আমি ছুটে গেলাম তাঁর স্ত্রীর কাছে। ডাক্তারের সঙ্গে দেখা করা, জিনিসপত্র দেওয়া ও ভাতা পাবার জন্য কি করা যায় এ নিয়ে পরামর্শ করতে রোজই যেতাম তাঁদের বাড়ি। একদিন উনি আমাকে নানা কথার মধ্যে বোঝালেন—কেউ কেউ বলে আমি ওদের বাড়ি গেলে নাকি ডাক্তার গণির মুক্তি বিলম্বিত হতে পারে। কথাটার অর্থ আমি বুঝে পেলাম না। পাড়ার ছেলেদের জিজ্ঞেস করায় তারা বললো—ডাক্তার গণি জেল গেটে ঢোকামাত্রই ওখানকার কোন নেতা নাকি তাঁকে বলেছেন, 'সেকি মশাই, জলির লিস্টে আপনারও নাম ছিল, এ তো জানতাম না।' গণি সাহেব সম্ভবত স্ত্রীকে একথা বলে থাকবেন। তাই তাঁর স্ত্রীর ঐ ভয়। অবশ্য বাইরে এসে গণি সাহেব জলি ও আমাকে যেদিন তাঁর ডাক্তারখানায় অভ্যর্থনা করলেন সেদিন তার চোখ সজল দেখেছিলাম। তিনি আমাদের হাত জড়িয়ে ধরে তাঁর আন্তরিকতা প্রকাশ করেছিলেন। বড় বড় নেতাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার জন্য দুঃখ প্রকাশ করে বললেন—'বোধহয় ওঁদের এভাবে না জানলেই আমার পক্ষে ভালো হতো।'

এরকম বিশ্বাসঘাতকতার অভিযোগ আরও পেতে থাকলাম। স্নেহাংশু আচার্যকে গ্রেপ্তার করার দিনদুই পরে পার্ক সার্কাস বাজারের সামনে আমাকে এক কমরেড বলে বসল, 'দেখলেন, স্নেহাংশুদাকেও জলি ধরিয়ে দিল।' এর জবাবে কোন কথা বলতেও আমার ঘৃণা করতে লাগল। কারণ, আমি নিশ্চিত জানতাম—এই সব অভিযোগ আগাগোড়া মিথ্যা দিয়ে তৈরি। যাহোক যেদিন সকালে স্নেহাংশু গ্রেপ্তার হয় তার আগের রাত্রেই আমি স্নেহাংশুর কাছে গিয়েছিলাম জলি ক'লের জন্য স্কুলে একটা চাকরির কথা বলতে। তখন আমরা আর্থিক সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছি। ওর একটা কাজ না হলে চলা দায়। তাই ওখানে যাওয়া। সেদিন ওদের সঙ্গে গল্পসল্প করেছিলাম। ঘা না খেলে মানুষের আন্তরিকতায় কি অবিশ্বাস করা যায় ? গ্রেপ্তারের পর থেকে আমার প্রতি ওদের বিরূপতা লক্ষ্য করছিলাম। সন্দেহের বিষ যে এমন করে সর্বত্র ছড়িয়েছে, এবার সেটা বুঝে গেলাম। এখানে আর এক মুহূর্ত থাকতে ইচ্ছে করছিল না।

•

জলি ক'লও তখন হাঁফ ছেড়ে বাঁচতে চান। কেমন করে বেরিয়ে আসা

যায়, তার পথ খুঁজছেন তিনি। আমি তাঁকে পার্টি ছেড়ে দিতে বললাম। কলকাতা ছেড়ে না গেলে ফের জড়িয়ে যাবার আশঙ্কা, তাই উনি দিল্লী চলে গেলেন। আমাকে খবর দিলে পরে আমি যাব, এখন প্রতীক্ষায় দিন গুণতে থাকলাম। মাসখানেক পরে আমিও একদিন সন্ধ্যায় ট্রেনে উঠলাম। সারাটা পথ বুকের ভেতর যেন কিসের একটা জ্বলুনীতে কষ্ট পাচ্ছিলাম। মনে হচ্ছিল আমার সমস্ত অতীত পুড়ে ছাই হয়ে গেল, সব পরমাত্মীয়রা একসঙ্গেই হারিয়ে গেল। এইভাবে যবনিকা নেমে এলো আমার পার্টি-জীবনে।

* * * * *

দিল্লীতে গিয়ে অন্ন-সংস্থানের একটা ব্যবস্থা হলো বটে, কিন্তু মনের আশ্রয় কোথায়? পার্টি-জীবন ছাড়া অন্য জীবন আমার সত্যি হাস্যকর মনে হচ্ছিল। আমার মহিলা সহকর্মীদের অনেকেই বলতেন, পার্টি ছাড়লেও গণসংগঠন কেন ছেড়ে দেবেন? এতে কাজ করতে তো কোন বাধা নেই? কি জবাব দেব এর? আমি তো জানি, এতকাল পরে আমার পক্ষে বাইরের একজন অরাজনৈতিক লোকের মতো গণসংগঠন করা আর সম্ভব নয়। যে মহিলা সমিতি ও মহিলা ফেডারেশনের প্রতিষ্ঠাত্রীদের মধ্যে আমি অন্যতম—সেই প্রতিষ্ঠানে আজ আমার কি এটাই হবে পরিচয়? সহকর্মীদের আমি বোঝাতেও পারছি না যে পার্টি ছাড়লে গণসংগঠনেও আমার আর বিশেষ কোন ভূমিকা থাকে না—ওরা এটা বুঝতেও চাইছেন না। আমার অস্তিত্বের এই সঙ্কট ওরা বুঝতে না পারলে কি করা যাবে? আমি নিরুপায়, আমাকে পার্টি ও গণসংগঠন দুই-ই ছেড়ে যেতে হবে। এতে আমার শিরায় শিরায় টান ধরলেও উপায় নেই। বিবেকের সঙ্গে তো লুকোচুরি করা চলে না।

তবে পার্টি ছাড়লেই যে মার্কসবাদ ছাড়তে হবে, এমন কোন কথা নেই। সুতরাং এই ভাবেই চলুক আপাতত। আমার গভীর বিশ্বাস ছিল এবং আজও আছে, একদিন না একদিন ভাগ-হওয়া পার্টি আবার কাছাকাছি আসবে। হয়তো বা মিলেও যাবে কোনকালে। কর্মক্ষমতা না থাকলেও সেদিন আমি হয়তো পার্টির সঙ্গে আবার মনের মিল খুঁজে পাব।

আজ দীর্ঘ বিশ বছর পরে তারই লক্ষণ দেখছি। চীন-ভারত কাছাকাছি আসতে চায়, ভাঙ্গা পার্টিও এখন কাছে আসার পথ খোঁজে। কেন যে মিথ্যে জল ঘোলা হলো, কেন যে আমরা সব ভেঙ্গেচুরে দিয়ে বসে থাকলাম—এখনও আমি তা ভেবে পাই না।

* * * * *

দিল্লীতে থাকার সময়ে একটা কাজ আমি করেছিলাম, যার কিছু ব্যাখ্যার দরকার। পার্টির কমরেড ভূপেশ গুপ্তের সঙ্গে মাঝে মাঝে আমাদের দেখা হতো। আমাদের জন্য তিনি কষ্ট বোধ করতেন। জলি ক'লকে তিনি সরকারী কোন কাজে সুযোগ করে দেবার জন্য চেষ্টা করতেও চেয়েছিলেন। আমরা সেটা গ্রহণ করতে অক্ষমতা জানিয়েছিলাম। আর আমরা যখন দিল্লীতে একটা ঘর পাবার জন্য ঘুরে মরছি তখন তিনি তাঁর কোয়ার্টারের দু' খানা ঘর আমাদের জন্য ছেড়ে দিতে চাইলে আমরা তাও সেদিন গ্রহণ করিনি। এতে তিনি বেশ দুঃখিত হয়েছিলেন।

এই পরিস্থিতিতেই রাজ্যসভায় ভূপেশ গুপ্তের পুনর্নির্বাচনের সময় এসে গিয়েছিল। পার্টি তখনও সম্পূর্ণ দু'ভাগ হয়নি। তখনও পর্যন্ত একটাই অফিস। ভূপেশ গুপ্ত জানতে পারলেন পার্টির বড় অংশটি তাঁকে মনোনয়ন দিতে অনিচ্ছুক। অর্থাৎ, পার্টি থেকে ভূপেশবাবুর বদলে অন্য কোন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেওয়ার চেষ্টা চলছিল। ভূপেশবাবু আমাকে একথা জানিয়ে বললেন, ভোট ভাগাভাগি হলে বোধহয় দু'একটা ভোট কম হতে পারে। আমি প্রাদেশিক কমিটির সদস্য। সুতরাং আমি কলকাতা গিয়ে এই মিটিং-এ উপস্থিত থেকে তাঁকে যেন ভোট দিই—এই প্রস্তাব তিনি করেন। আমি পার্টি ছেড়ে চলে এসেছি, সেকথা সবাই জানে। যদিও আমি আনুষ্ঠানিকভাবে কোন পদত্যাগ-পত্র দিয়ে আসিনি। সুতরাং মিটিং-এ উপস্থিত হয়ে ভোট দেবার অধিকারটা আমার তখনও সরু সুতোয় ঝুলছিল। নৈতিক দিক থেকে দেখলে অবশ্য অধিকারটা ছিলই না।

কিন্তু ভূপেশ গুপ্ত পার্টির সংকীর্ণ দলাদলির শিকার হবেন এবং রাজ্যসভায় যেতে পারবেন না—এটা আমার কাছে অত্যন্ত অন্যায় মনে হয়েছিল। এর বিরুদ্ধে আমি যদি আমার নৈতিক না হোক, আনুষ্ঠানিক অধিকারটুকু প্রয়োগ করি, তবে আমার মাথাটা একটু নীচু হলেও একটা মস্তবড় অন্যায় ও অবিবেচনার কাজ আমি ঠেকাতে পারি। শুধু এই কথাটা মনে করেই আমি কলকাতায় গিয়েছিলাম এবং মিটিং-এ উপস্থিত হয়ে ভূপেশ গুপ্তের পক্ষে ভোটটি দিয়েছিলাম। অনেকের মুখে সেদিন একটু বিদ্রূপের হাসিও দেখেছিলাম।

কিন্তু মনে হয় কাজটা আমি ঠিকই করেছিলাম। ভোটের দিন বিরোধী অংশের একজন অনুপস্থিত ছিলেন তাই ভূপেশবাবু আমার ভোটসহ ২ ভোটে জিতে মনোনয়ন পেয়েছিলেন। ভূপেশবাবুকে রাজ্যসভায় যেতে না দিলে সাধারণ মানুষের কাছে পার্টির এই কাজটা প্রশংসা পেত বলে মনে হয় না।

শেষ কথা

বরিশালের কাহিনী দিয়ে এই লেখা শুরু করেছিলাম আর তা শেষ হলো আমার পার্টি-জীবনের সমাপ্তিতে। যা লিখেছি তার সবটুকু আমার নিজের অভিজ্ঞতা। তবু সব কথা লেখা হলো না। কারণ অনেক কিছুই ভুলে গেছি। সারা বাঙলায় সে সময়ে যত ঘটনা ঘটেছে, মহিলা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এই বাঙলায় নারী-সমাজের যত অভ্যুত্থান চোখে দেখেছি এবং তাকে ঘিরে যত কাহিনী জন্ম নিয়েছে, সে সবের অনেকটাই আজ হারিয়ে গেছে। এই লেখায় ধরে রাখতে পেরেছি শুধু আমাদের বিশ বছরের সম্মিলিত কাজকর্মের একটি ভগ্নাংশ মাত্র। প্রত্যক্ষভাবে আমি যেটুকুর সঙ্গে জড়িত ছিলাম, এখন মনে হচ্ছে সেইটুকুও বুঝি আমার পক্ষে বলা সম্ভব হলো না। অনেক কথাই আবছা মনে পড়ছে। তা আর লেখা গেল না। আমার ধারণা, সঙ্গীদের মধ্যে যদি কেউ তা লেখার চেষ্টা করেন, তাঁদের কলম থেকেও এমনি হাজারো কথা-কাহিনী বেরিয়ে আসবে। কিন্তু তাঁদের সকলের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে একটি পূর্ণাঙ্গ চিত্র দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হয়নি। তার কারণ আমার ভগ্নস্বাস্থ্য ছাড়া অন্য কিছু নয়।

ঠিক এই একই কারণে আমার লেখায় তৎকালীন সারা ভারতের নারী-আন্দোলনের বিচিত্র ঘটনাবলীও স্থান পায়নি। সব প্রদেশে নানা সম্মেলন উপলক্ষে আমরা সব কর্মীরা বহুবার মিলিত হয়েছি। তাঁদের পরিচালিত আন্দোলনের কথা এবং সকলের কর্মবহুল জীবনের কথাও শুনেছি। কিন্তু এত-কাল পরে সেসব আর স্মরণে আনতে পারিনি এবং সেই মালমসলা পুনর্বার এই লেখার জন্য সংগ্রহ করাও সম্ভব হয়নি। এই অবস্থায় আমার লেখায় সব কিছু না পাওয়ার অভিযোগ তৎকালীন সহকর্মী ও সমকালীন কর্মীদের মধ্যে থাকবেই। এসব ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা প্রার্থনা করে রাখছি।

তবু শেষ করার আগে নারীমুক্তি ও নারীসমাজের অধিকার সম্পর্কে একটু আলোচনা করা দরকার বলে মনে করছি। নারীর অধিকার অর্জনের জন্য আমরা এতকাল অসংখ্য আন্দোলন করেছি। এবার বোধহয় একটু ফিরে তাকিয়ে দেখা দরকার—কী পেলাম আমরা।

নারীশিক্ষা প্রবর্তনে ও নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় যাঁরা আমাদের প্রথম পথপ্রদর্শক ছিলেন, তাঁদের অবদান এদেশের নারীসমাজ চিরদিন কৃতজ্ঞ-

চিত্তে স্মরণ করবে। তাঁরা স্মরণে রাখবে এদেশে নবজাগরণের যুগে পুরুষের পাশাপাশি নারীসমাজের অগ্রগতির কথা এবং শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে ও সাহিত্যে তৎকালীন নারীসমাজের একাংশের স্বচ্ছন্দ বিচরণের কথাও। এসব নিঃসন্দেহে আমাদের গর্বের বিষয়।

সন্দেহ নেই, নারীসমাজের নবজাগরণ শুরু হয় স্বদেশী আন্দোলনের হাত ধরে। বস্তুত, দেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শুধু দেশমুক্তির ব্যাপার নয়, তা নারী-মুক্তিরও ধাত্রী। স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত হয়েই নারীসমাজ স্বাধীনচিন্তা ও আত্মোপলব্ধির প্রথম স্বাদ গ্রহণ করে। কতকটা স্বতঃসিদ্ধের মতো স্বাধীনতা সংগ্রামই মানুষের মনে নারীর সমান অধিকারের চিন্তাও জাগ্রত করে। স্ত্রী-শিক্ষার বিস্তার শুরু হয় তখন থেকে। আমাদের মতন শিক্ষাপ্রাপ্ত নারীরা সেই যুগের সৃষ্টি। সংগ্রামের সঙ্গে নারীর এই সংযোগ যদি না ঘটত তবে স্বাধীনতা লাভের পর প্রথম সংবিধান প্রণয়নের সময় এদেশের নারীসমাজের ভোটাধিকারের স্বীকৃতি এত সহজে স্থান পেত কিনা সন্দেহ। সংগ্রামে নারীরাও যে পুরুষের পাশাপাশি থেকেছে, প্রাণ দিয়েছে, নির্ভয়ে নির্যাতনের সামনে দাঁড়িয়েছে, অশেষ দুঃখ বরণ করেছে, একথা তো অস্বীকার করা যায় না। এই পথ ধরে তাই এদেশে নারীর রাজনৈতিক অধিকার ধীরে ধীরে তাদের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, স্বাধীনতা সংগ্রামেরই আশীর্বাদ হিসেবে।

তবুও সর্বাঙ্গীণ নারীমুক্তির জন্য এটাই সব নয়। এই অধিকারের ভিত্তিতে নারীসমাজের পাওনা আরও অনেক দূর পর্যন্ত পৌঁছে যায়, সামাজিক-অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমান অধিকার আর মর্যাদাও তার প্রাপ্য।

স্বাধীনতা সংগ্রামের পাশাপাশি শুরু হয়েছিল নারীসমাজের নিজস্ব মুক্তি-আন্দোলন। এক সময়ে এই আন্দোলনকে পরিচালিত করা এবং এর শক্তি বৃদ্ধির জন্য নারীসমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন কিছু কমিউনিস্ট মহিলাকর্মী। আবার কেবলমাত্র কমিউনিস্ট মেয়েরাই এ কাজ করেন নি, আরও বহু অকমিউনিস্ট মহিলা সমিতি এবং উদারপন্থী মহিলারাও এ-কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। কখনও একসঙ্গে, কখনও পৃথকভাবে আমরা চলেছি। কি আমরা পেরেছি আর কি পারিনি—আমার লেখা জুড়ে সে কথাই কিছুটা বলার চেষ্টা করেছি।

এ সব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারীর অধিকার সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান অনেক সমৃদ্ধ হয়েছে, বিশেষভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশে মুক্তিপ্রাপ্ত নারীর নতুন ধরনের জীবনযাত্রার উদাহরণ থেকে আমরা অনেক রসদ সংগ্রহ করেছি।

অবশ্য ওদের পদ্ধতি-প্রণালীর মধ্যে আমরা আমাদের ভবিষ্যতের ছবি দেখতে পারি কিন্তু আমাদের বর্তমান তো তার ধারেকাছেও নয়। আমাদের সমস্যা ভিন্নতর। সমাজতন্ত্রের দরজা আমাদের সামনে খোলা নয় যে বিনা বাধায় আমরা সব সমস্যার সমাধান করতে পারি। সামন্ততান্ত্রিক রীতিনীতি, অভ্যাস ও ধ্যানধারণায় আমরা এখনও জড়িয়ে আছি।

এসব সত্ত্বেও মেয়েরা এখন ক্রমবর্ধিত সংখ্যায় শিক্ষিত হচ্ছেন ও উপার্জনের পথে যেতে পারছেন। অবশ্য দেশ জুড়ে শিক্ষিতের সংখ্যা আজও যেখানে ৩০ শতাংশের উর্ধ্বে ওঠেনি, সেখানে নতুন পথে আসা মেয়েদের সংখ্যা আর কতই বা হবে!

আমি ভাবছি অন্য কথা। স্বাবলম্বী মেয়েদের সামনে তাদের নতুন জীবন-পদ্ধতি নতুন কি কি সমস্যার সৃষ্টি করছে এবং তার সমাধান কোন্ পথে সম্ভব হবে—এবার সেটা চিন্তা করার বোধহয় সময় এসেছে।

স্বাবলম্বী মেয়েরা জীবিকা ও গৃহকর্ম—এই দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে কি অধুনা মুশকিলে পড়ছেন? পড়ারই কথা। সাধারণত আমাদের সংসার পুরুষ-প্রধান। সুতরাং সন্তান-পালন ও গৃহস্থালীর কাজ সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত থাকে মেয়েদের উপরেই। অর্থাৎ একটি গৃহিণীকে উপার্জনক্ষেত্রে যাবার আগে রান্না-বান্না শেষ করা, ছেলেমেয়েদের স্নানাহারপর্ব সমাধা করা, স্বামীর সকালের চা থেকে আরম্ভ করে অফিসের ভাত বেড়ে দেওয়া—এ সব নিত্যকর্তব্য শেষ করতে হয়। তারপর নিজের অফিস বা কর্মস্থলে যাবার কথা ভাববার সময় পায় সে। যৌথ পরিবারের ব্যবস্থা এখন বাতিল। সুতরাং গৃহিণীকে হয় একলা হাতে অথবা গৃহভৃত্যের আংশিক সহায়তায় এ সমস্ত কাজ সমাধা করতে হয়। আবার কর্মক্ষেত্র থেকে ফিরেও ক্লান্ত স্বামী ও ছেলেমেয়েদের জরুরী প্রয়োজন মেটানোর কাজে লাগতে হয় তাকে। তারপরেই রাতের রান্না-খাওয়া শেষ করে মহিলাটি একটু নিঃশ্বাস নেবার সময় পান। এই জীবনযাত্রা মেয়েটির পক্ষে দুঃসহ, না সুসহ? মধ্যবিত্ত সংসারে অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষের একলার রোজগারে আজ আর চলে না। সুতরাং স্ত্রীর চাকরী সখের নয়, প্রয়োজনেই করতে হয়। সর্বক্ষণের গৃহভৃত্য নিয়োগ করাও আজকাল ব্যয়সাপেক্ষ। একলা হাতে সব দায়িত্ব পালনের পর ছেলেমেয়েদের প্রতি মায়ের যত্নে ঘাটতি পড়াই স্বাভাবিক। তাতে ছেলেমেয়েরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়, মায়ের মনও প্রসন্ন থাকে না। এদেশে ক্রেশ, কিণ্ডার গার্ডেন এখনও তেমন গড়ে ওঠেনি। সুতরাং শিশুর যত্ন প্রয়োজন মতো হয় না। এছাড়া উপার্জনরত স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মনস্তাত্ত্বিক ভারসাম্যে কিছুটা ব্যাঘাত

ঘটাও আমাদের বর্তমান সামাজিক অবস্থায় স্বাভাবিক। আর উপার্জনের পরিমাণ যদি স্ত্রীর বেশী হয় তো মানসিক দ্বন্দ্ব শুরু হতে দেরি লাগে না। অবশ্য এসব অন্তরায়ের জন্য 'রান্নাঘরেই গৃহিণীর স্থান'—এই ছিটলাগী সমাধান আমরা বেছে নিতে পারি না। তাই বদলাবার প্রয়োজন হয়েছে বহু পুরনো পারিবারিক অভ্যাস ও সামাজিক রীতিনীতি।

এ সমস্ত পরস্পর বিরোধী সমস্যা এদেশে বড় আকারে হয়তো দেখা দেয়নি এখনও। কিন্তু গৃহিণীরা চাকরি করলে সন্তানের অযত্ন হয় এবং সংসারে শৃঙ্খলা থাকে না—এ কথাটা আজকাল শুনতে পাওয়া যায়। বিশেষত পিতা অথবা মাতার সর্বক্ষণের মনোযোগ না পেলে বর্তমানের আবহাওয়ায় ছেলেমেয়ে মানুষ করা বেশ কঠিন—এও সত্য।

এই সব বাস্তব ও মানসিক সমস্যার সমাধানকল্পে পাশ্চাত্য দেশে ও সমাজতান্ত্রিক দেশে বহুবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ছেলেমেয়েদের জন্য সেখানে ক্রেশ, কিণ্ডার গার্ডেনের চালাও ব্যবস্থা আছে। আধুনিক সাজসরঞ্জামের সাহায্যে ঘর-গৃহস্থালী করাও অনেক সহজসাধ্য। আমাদের খাদ্যাভ্যাস ওদেশে নেই। প্রয়োজন বোধে ওটা সংক্ষিপ্ত এবং দোকানের নানা রকমারী 'টিনফুডে' অভ্যস্ত হয়ে তারা রান্নাঘরের ঝামেলা কমাতে পেরেছে। আমাদের রন্ধনশালায় ডাল, সুক্তো, ঝোল, চচ্চড়ি প্রভৃতি নানাবিধ উপকরণ নিত্যকার ব্যাপার। ওসব দেশে বিস্তৃত খাদ্যতালিকা দৈনন্দিন ব্যাপার নয়, ছুটির দিনের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

চীনে নারীসমাজের কর্মশক্তিকে উৎপাদনের কাজে লাগাবার জন্য 'কমিউন', অর্থাৎ মিলিত গৃহস্থালীর ব্যবস্থা চলেছিল দীর্ঘদিন। এখন সমাজবিজ্ঞানীরা অনুভব করছেন, এ ব্যবস্থা শিশুদের পক্ষে ক্ষতিকারক। ছেলেমেয়েরা পিতামাতার সান্নিধ্য না পেয়ে স্বাভাবিক মানুষ হিসাবে তৈরি হচ্ছে না। সুতরাং তাঁরা আবার পরিবারমুখীন সমাজের কথা চিন্তা করছেন। প্রত্যেক দেশে এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলতেই থাকবে এবং তা থেকে নতুন পথ আর পদ্ধতিও বেরিয়ে আসবে।

পাশ্চাত্য দেশে এত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও সংসারে গোলমাল বাঁধছে। মেয়েরা স্বামী-পুত্রের যত্নের জন্য বাড়তি পরিশ্রমে বিমুখ হচ্ছেন। সমস্যা এড়াতে তাঁরা বিবাহ-বিচ্ছেদের পথে যাচ্ছেন। একের বেশী সন্তানের জননী হতেও চাইছেন না। নারী-পুরুষের সম্বন্ধটা বৈধ সামাজিক বিবাহ-বন্ধনের গণ্ডীর মধ্যে আটকে না থেকে বন্ধুত্বের সম্পর্ক নিয়ে অবাধ জীবন-যাপনের পথে পা বাড়িয়েছে। এ সব সমস্যার কথা আমি প্রত্যক্ষদর্শীর কাছে জেনেছি। কিন্তু

এটা কতটা ব্যাপক তা অবশ্য আমার জানা নেই।

পশ্চিমী দেশগুলিতে লোকসংখ্যা বিশেষ বাড়ছে না। সন্তান-পালনে বিনা খরচে এত সুব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও মেয়েরা একটির বেশী সন্তানের কামনা করেন না। মেয়েরা কেউ নিরক্ষরও নন। তবুও একাধিক সন্তানের দায়িত্ব বহনে তাঁরা নারাজ। মেয়েদের এই মনোভাব নিয়ে এখন সমাজ-বিজ্ঞানীরা চিন্তিত। বেশী বিবাহ-বিচ্ছেদও তাঁদের দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে। সন্তানেরা স্বাভাবিক স্নেহ-মমতার পরিবেশে মানুষ হতে পারে না। অনেক সময়েই তারা বেশী মদ্যপ হয় এবং সুস্থ মানুষ হয়ে বেড়ে না উঠে প্রবলেম চাইল্ডের সংখ্যাই বৃদ্ধি করে।

একটি সন্তান আজকাল এদেশেও অনেক মেয়ে পছন্দ করেন। মধ্যবিত্ত সংসারে এর বড় কারণ—সন্তান মানুষ করার সঙ্গতির অভাব। ভালো স্কুল, ভালো খাবার ও পোশাকপরিচ্ছদ দিয়ে একটি শিশুকে মানুষ করতেই তারা হিমসিম খায়। পরিবার-পরিকল্পনায় তিনটি শিশু পর্যন্ত স্বীকৃত। তবুও মায়েরা আর্থিক অসুবিধা থাকলে এক সন্তানের বেশী কামনা করে না। অবশ্য উপর তলায় সামান্য সংখ্যক পরিবারের এই জন্ম-নিয়ন্ত্রণ আমাদের দেশের জনসংখ্যা বৃদ্ধির উপর কোন রেখাপাতই করে না। নীচের তলায় অবাধ জন্মদানের অধিকারে বিশ্বাসী লোকেরা আজও গতানুগতিক পথের অনুসারী।

উপরতলার ঐ সামান্য সংখ্যক পরিবারের এক সন্তানের জীবনে আবার নতুন ধরনের সামাজিক সমস্যাও দেখা দেয়। যদি কয়েক পুরুষ ধরে এই ধরনের জন্ম-সংকোচন চলে তবে ভবিষ্যতে ছেলেমেয়েরা ভাই-বোন, কাকা-পিসী প্রভৃতি সম্পর্কে ক্রমশ অজ্ঞই হতে থাকবে। এও স্বাভাবিক অবস্থা নয়।

নারীমুক্তির সামনে এইসব সমস্যার উদ্ভব হতে দেখে আমাদের সাবধান হওয়া উচিত। আমাদের দেখা প্রয়োজন নারীর নলব্ধ অধিকারকে বাস্তবে প্রয়োগের সময় সংসারে ও সমাজে যেন কোন অসামঞ্জস্য না ঘটে। আইনমাফিক অনেক অধিকার এ দেশের নারীরা পেয়েছেন। সীমাবদ্ধ হলেও শিক্ষা ও জীবিকার দ্বারও নারীর কাছে উন্মুক্ত। সমান বেতন, প্রসূতিভাতা—এসব পেতে এখন আর বাধা নেই। সম্পত্তিতে ও বিবাহ-ব্যবস্থায় নারীর সমান মর্যাদা স্বীকৃত। বিবাহবিচ্ছেদের অধিকার এদেশে এখনও তেমন কোন সঙ্কট সৃষ্টি করেনি।

আইনের অধিকার সত্ত্বেও কর্মক্ষেত্রে নারীর প্রতিষ্ঠার পথে আজও নানা পারিবারিক ও সামাজিক বাধা বিদ্যমান। তদুপরি সরকারও বহু ব্যাপারে উদাসীন। শিশুপালনের উপযুক্ত ব্যবস্থা, যা নারী-মুক্তির পথে একান্ত আবশ্যক, তাকে সহজলভ্য করে দিতে সরকার এখনও অক্ষম।

কতকাল ধরেই তো এসব দাবী সম্বলিত প্রস্তাব সভা-সমিতির মাধ্যমে প্রচার করা হয়েছে। সরকারের কাছেও বারে বারে উপস্থিত হয়েছেন মেয়েরা। কিন্তু বিশেষ কিছু ফল পাওয়া যায়নি। এবার আন্দোলনে না নামলে মেয়েদের জীবিকার অধিকার খর্ব হতে বাধ্য।

এ ব্যাপারে পাশ্চত্য দেশ অনেক এগিয়ে গেছে। সমাজতান্ত্রিক দেশে তো কথাই নেই। সেখানে শিশুদের জাতীয় সম্পদ মনে করা হয়, নারীর অধিকার অলঙ্ঘ্যনীয় বলে বিবেচিত হয়। তাই দরাজ হাতে সরকার এ সবের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন।

কিছুদিন আগে সোভিয়েট দূতাবাসের একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হওয়ায় নানা গল্পের মধ্যে এই আলোচনাটা উঠেছিল। ওঁরা এ ব্যাপারে কি করেন তা জানবার জন্য আমিই তুলেছিলাম কথাটা। ভদ্রলোকটির মতে সমস্যা সমাধানে সব চেয়ে বড় কথা হলো—'এ্যাড্জাস্টমেণ্ট'। অর্থাৎ, সামঞ্জস্য বিধানের পথ স্বামী স্ত্রীকে মিলিতভাবে বের করে নিতে হবে। উনি নিজে সাংবাদিক, স্ত্রী ইঞ্জিনিয়ার। দেশে উভয়েই কর্মরত ছিলেন। তাঁদের দেশের ব্যবস্থার কথা বলতে গিয়ে তিনি বলছিলেন, স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের জন্য কর্মক্ষেত্র খোলা আছে, শিশুপালনের জন্য সরকারী ব্যবস্থাও যথেষ্ট। সন্তানের পিতামাতা নিজেরাই স্থির করবেন—সংসার রক্ষা ও সন্তান-পালনের জন্য কে কতটা সময় দেবেন। এঁরা দুজনে মিলে স্থির করেছেন—স্বামী দোকান-বাজার, কেনাকাটা সব কববেন, বাচ্চারা কিণ্ডার গার্ডেন বা স্কুলে যাবে। মহিলাটির চাকরি হবে দিনে মাত্র ৪ ঘণ্টার জন্য, ৮ ঘণ্টার জন্য নয়। ভদ্রলোক করবেন ৮ ঘণ্টার কাজ। স্ত্রী অল্প সময় চাকরি করার জন্য বাচ্চাদের নিয়ে থাকতে সময় পাবেন বেশী।

আমি একটু খোঁচা দিলাম। বেশ ব্যবস্থা তো! ইঞ্জিনিয়ার মহিলা তাঁর পুরো কর্মক্ষমতা সমাজকে দেবেন না, চার ঘণ্টার কাজে রোজগার কম, এ কেমন সমান অধিকার হলো? উনি বললেন, আমরা দুজনে মিলে আমাদের ছোট সংসারের জন্য সব চেয়ে যেটা ভাল ব্যবস্থা হতে পারে—সেটাই স্থির করে নিয়েছি। আমার স্ত্রী শিশুদের দেখাশুনার জন্য যে সময় ব্যয় করে থাকেন—সেটা সামাজিক দায়িত্ব পালন করা হিসেবেই গৃহীত হয়। আর আমাদের উভয়ের উপার্জন মিলিয়ে আমাদের সংসার ভালই চলে। ভদ্রলোকটি এরপর হেসে বললেন, 'বাচ্চাদের যত্নের জন্য মায়ের প্রয়োজন সব থেকে বেশী নয় কি? অবশ্য আমিও সাধ্যমতো তাদের যত্ন নিয়ে থাকি।' তাছাড়া উনি বললেন, শিশুপালনের প্রয়োজনে মেয়েদের যতদিন এইভাবে অল্প বা অর্ধেক সময়ের জন্য

উপার্জন করতে যেতে হয়, সেইসব ক্ষেত্রে পূর্ণ বেতনের ব্যবস্থা হবে—এরকম পরিকল্পনাও প্রস্তুত হচ্ছে আমাদের দেশে।

বুঝলাম, এদের কাছে সবটাই সহজ হয়ে গেছে। একদিকে নিজেদের স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গী ও পরস্পরের সহযোগিতা, অপর দিকে সরকার থেকে গার্হস্থ্য-ব্যবস্থা ও শিশুপালন ব্যবস্থায় সমভাবে দায়িত্ব গ্রহণের জন্ম এটা সম্ভব হয়েছে।

ওঁর কাছে অবশ্য সব খবর পেলাম না। বিবাহ-বিচ্ছেদের আধিক্য, বিবাহ ছাড়াই ছেলেমেয়েদের মিলিত জীবনযাত্রার প্রতি ঝোঁক, সন্তানের দায়িত্ব নিতে মেয়েদের অনীহা ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে তিনি শুধু বললেন, এ সবের অধিকার তাদের দেশে স্বীকৃত, তবে কোন ব্যাপারেই কোন আধিক্যের খবর তার জানা নেই।

আমাদের দেশে যেটুকু অধিকার মেয়েরা লাভ করেছেন তার প্রয়োগক্ষেত্রে যে সমস্যা ও অসামঞ্জস্য সৃষ্টি হয়েছে তার একটা কারণ হলো আমাদের দৃষ্টি-ভঙ্গীর অস্বচ্ছতা, সন্তান-পালনে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা দানে সরকারের অক্ষমতা এবং সবচেয়ে বড় কারণ এদেশের পিতৃতান্ত্রিক প্রথার কল্যাণে পুরুষের মজ্জাগত জমিদারসুলভ অভ্যাস। যে-সমাজ পুরুষের হাতে নারীর লাঞ্ছনার ঘটনায় নিত্য কলঙ্কিত হয়ে থাকে, সে সমাজে শিক্ষাদীক্ষা সত্ত্বেও স্ত্রীর প্রতি স্বামীর দৃষ্টি-ভঙ্গীর মৌলিক পরিবর্তন হওয়া কঠিন এবং সময়-সাপেক্ষ। আমাদের সমাজে স্বামী সেবা পায় আর স্ত্রী সেবা করে, এটাই নিয়ম। উভয়ই উভয়ের সেবা বা সহযোগিতা করবে—এটা নিয়ম নয়। জমিদারী না থাকলেও অন্তত 'স্ত্রী' নামক একটি বাধ্য প্রজা এদেশের গরীব স্বামীও পেয়ে থাকে। নতুন যুগের দৌলতে সেই প্রজাটি যদি শিক্ষা পায়, অফিসে যায় ও টাকা রোজগার করে, তাতে স্বামীর তেমন মাথাব্যথা নেই যতক্ষণ তার অভ্যস্ত পাওনায় নড়চড় না হয়। তৃষ্ণার্ত স্বামীকে স্ত্রী ব্যস্ত হয়ে এক গ্লাস জল দেবে এটা নিয়ম, কিন্তু এর উল্টোটা যেন বেনিয়ম। সংঘাতের মূল কারণ এইখানে।

সামন্ততান্ত্রিক বদঅভ্যাস বা কুসংস্কারে শুধু যে আমরাই ভুগছি তা নয়। সব দেশেই বলতে গেলে মেয়েদের ভাগ্যে এই একই ব্যবস্থা চলে, যতদিন তারা প্রাচীন অবক্ষয়ী অনুশাসন থেকে মুক্তি না পায়। খোদ সোভিয়েট রাশিয়াকে নারী-মুক্তির পথ উন্মুক্ত করার জন্ম কী কঠিনতম সংগ্রামই না করতে হয়েছিল!

রুশ-বিপ্লবের পরে মহানায়ক লেনিন আইন করে মেয়েদের সমস্ত অধিকার প্রদান করলেন। গ্রামে গ্রামে পার্টির নারী-কর্মীরা ছুটলেন মেয়েদের কাছে নতুন অধিকার ও জীবনের বার্তা পৌঁছে দিতে। একটি গ্রামের মেয়েরা এসব

অদ্ভুত কথাবার্তা বিশ্বাস তো করলই না, উল্টে খুব খারাপ মেয়েমানুষ মনে করে তাদের কয়েকজনকে মেরেই ফেললো।

পরের দল গেল রাঁধুনী, ফুলওয়ালা এই সব নানা বেশে। অনেক ধৈর্য ব্যয় করে এবং অপেক্ষার পর তারা মেয়েদের মন পেল। হঠাৎ একদিন কর্তারা বাড়ি ফিরে দেখে, কারো বৌ আর ঘরে নেই। একটা পোড়ো বাড়িতে বসে তারা নাকি মিটিং করছে। কর্তারা চোখ ছানাবড়া করে ছুটল সেখানে। কিন্তু মেয়েরা তাদের হাতে একটা দরখাস্ত বাড়িয়ে দিল—সই করতে। দরখাস্তে লেখা আছে—আমাদের মারতে পারবে না, ঘরে শিকল দিয়ে রাখা চলবে না, একটার বেশী বিয়ে করতে পারবে না—ইত্যাদি শর্ত। এগুলি মেনে নিয়ে সই করলেই তবে তারা ঘরে ফিরবে। পুরুষেরা সই করল ও অবাক হয়ে বলতে লাগল—নিজের বৌকে নিজে মারতে পারব না?

সোভিয়েটের মেয়েরা বিগত ৫০ / ৬০ বছরের অর্ধেকটাই হয়তো কাটিয়ে দিয়েছে এই সব অন্যায় অবিচারের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রাম করে। তাদের ভাগ্য ভালো, সামনে-পেছনে সোভিয়েট সরকার উপস্থিত থেকে নারীর জয়যাত্রার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছে। এর ফলে সমাজ ও সংসারের রূপ কি হয়েছে একটি রুশ-দম্পতির বর্তমান দিনযাপনের নমুনা থেকে তা বোঝা যায়।

ভাবছি, এই সীমারেখায় পৌছাতে আমাদের আর কতকাল লাগবে? কত সংগ্রাম করতে হবে? আজ আমরা যেখানে পৌছেছি সেখানে আসতে শতাধিক বছর কেটেছে। বাঞ্ছিত লক্ষ্যে পৌছাতে যদি আরও শতবর্ষের সাধনা প্রয়োজন হয় তবে সেই সাধনাতেও এ দেশের নারীসমাজকে সিদ্ধি লাভ করতে হবে। অচলায়তনকে ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দিয়ে তাদেরই তো আনতে হবে শোষণহীন মুক্তপ্রাণের স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক সমাজ।

আমার শুধু একটাই দুঃখ, ততদিন আমি হয়তো বেঁচে থাকব না। কিন্তু আমার কৈশোর-যৌবনের স্বপ্ন ও সংগ্রাম একদিন না একদিন সফল হবেই, এই অটল বিশ্বাস নিয়ে জীবনসায়াহ্নে বুকের আগুন বুকে চেপেই আমি কাল কাটাচ্ছি। আমার পার্টি, আমার এককালের সঙ্গীসাথীরা কিংবা নতুন প্রজন্মের অন্য কোন কমরেড যদি সেই আগুনে উত্তপ্ত হতে চায়, তবে আমি তাঁদের সকলকেই আমার বুকে জড়িয়ে ধরার জন্য এখনও প্রস্তুত।